তৃতীয় মেরু

নির্মল আচার্য

রক্তস্বাক্ষর পাবলিকেশন
৭বি, ধীরেন ধর সরণী,
কলিকাতা-৭০০০১২

TRITIO MERU

A BEST NOVEL

BY

NIRMAL ACHARJEE

পঞ্চম সংস্করণ

প্রকাশিকা : উমা দেবী, রত্নাক্ষর পাবলিকেশন, ৭বি, ধীরেন ধর সরণী, কলিকাতা-১২ মুদ্রক : হরিপদ পাত্র, সত্যনারায়ণ প্রেস
১, রমাপ্রসাদ রায় লেন, কলিকাতা-৬

যাঁরা তাম্রপত্র পাননি

ভূমিকা

তৃতীয় মেরুর বাসিন্দারা কেউ কল্পিত নন। এস্‌কিমোদের মতন-ই ঐতিহাসিক পুরুষ সবাই। মনুঠাকুর আজ লোকান্তরিত হোলেও তাঁর ছেলে সুশান্ত এখনো বেঁচে। সে তেমনি ঘাস আর পোকা-মাকড়দের নাম দিয়ে তার খাতা ভরতি কোরে চলেছে। বিদেহী গুরুদাস নন্দী মশাই অন্য লোকে বোসে তাঁর আকাশ দুর্লভ বাঁশ-বন হাতের নাগালের বাইরে চলে যাওয়ায় নীলমনিদের ওপোর শনি চোখ হানচেন সত্যি। কিন্তু তাঁর দু-ছেলে বোদে ওরফে বোম্বিনাথ,—ভোলানাথরা সে-বাঁশবন উত্তরাধিকার সূত্রে আগলে বোসে আছে তেমনি।

শরৎ আসে। আসে হেমন্ত। সোনামুখী বিল তেমনি দেয় অঢেল সোনা। কিন্তু সে-সোনা শিয়রে সাপ হোয়ে আছে তেমনি ভূমিহীনদের। দেশ ব্যবচ্ছেদের পর গোরুর চালানী বনমালী ব্যাপারি চলে এসেচে ভারতে। এ-উপশহরে তাকে চেনে না এমন একজন নাগরিকের সাথে অন্তত: আমার পরিচয় নেই। "ট" বাজার থেকে কারণবারি পান করে বে-হেড হোয়ে চাকদা রোডে তার বে-সামাল চলা ফেরার মুখ চেনে না এমন একজন নাগরিকও দুর্লভ। আর বেদানা সুলভ ছিরি হারিয়ে ফেললেও বেদানা কিন্তু আজো বেঁচে। যদিও বনমালীর সাথে সে এখোন ছিন্ন সম্পর্ক. শহীদ সাঁইপণ্ডিত যোগিশ্বরদের গোষ্ঠী বেঁচে না থাকলেও ইতিহাসে কিন্তু অমর। অবজ্ঞাত সর্বহারার ইতিহাসে। এসব কারণে তত্ত্বগত দিক থেকে বিচার কোরে দেখলে "তৃতীয় মেরু"কে ঐতিহাসিক উপন্যাস বোলতে হয়।

······পরিশেষে বিশ্ব সাহিত্যের সূত্র-সংগা-যাই হোক না কেন "তৃতীয় মেরু" কিন্তু বিশ্ব সাহিত্যের দরবারে তার আসন দাবি জানিয়ে রাখচে।

নির্মল আচার্য

নিবেদন

বাঙলা কথাসাহিত্যের দরবারে বটতলার উপন্যাসের কমতি নেই। এবং মূলতঃ নাগর জীবনের চালচিত্রের হাটও জমজমাট কিন্তু গ্রামীণ সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষের জীবনকেন্দ্রিক পটভূমিতে যথার্থ সামাজিক উপন্যাসের সংখ্যা নিতান্তই অল্প।

প্রগতিশীল সাহিত্যিক নির্মল আচার্য বাঙলা সাহিত্যে তাঁর তৃতীয় মেরু উপন্যাস-খানি সৃষ্টি করে একটা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখী দাঁড়িয়েছেন। সমাজের দাঁড়ি-পাল্লায় যাদের মূল্য হয় না, সামাজিকতার কৌলিন্যের কাছে যারা চিরকাল অবহেলিত, অবাঞ্ছিত—সমাজের দুঃশাসনের আগুনে পোড়-খাওয়া সেইসব শোষিত নিষ্পেষিত সংগ্রামী মুচি জীবনকে গ্রহণ করে তিনি বৃহদায়তন যে অসাধারণ উপন্যাস সৃষ্টি করেছেন, তাকে নিতান্তই দুঃসাহসিক বলতে হয়। এই অনাবিষ্কৃত মানুষের সমাজে অমূল্য এক লোকায়ত সাংস্কৃতিক দিকও অবহেলার বস্তু হয়ে ছড়িয়ে রয়েছে। এদের জীবনযাত্রার, হৃদয়ের তথ্য ও তত্ত্ব আবিষ্কার করতে গিয়ে তিনি ঐতিহাসিকের দায়িত্ব পালন করেছেন বলে আমরা মনে করি। এদের সংস্কার, বিশ্বাস, সংগ্রাম, সুখদুঃখ, অভাব, অনটন অথচ সরল সহজ জীবনযাপন এবং লোকায়ত সংস্কৃতিকে নিপুণভাবে চিত্রায়িত করেছেন তাঁর এ উপন্যাসে।

বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর এই বলিষ্ঠ প্রয়াস নিঃসন্দেহে একটা ব্যতিক্রমী সংযোজন। আমরা তাঁর এই অসাধারণ উপন্যাসটি প্রকাশ করতে পেরে নিজেদের গৌরবান্বিত মনে করছি।

রক্তস্বাক্ষর পাবলিকেশন
৭বি, ধীরেন ধর সরণী,
কলিকাতা-৭০০০১২

প্রকাশিকা

লেখকের অন্যান্য বই :

কবিতা :

- মহাকবিতা
- নিলান্তিকা
- উত্তরসাধক
- বিপ্লবী মেঘদূত
- বাঁশের বাঁশী

উপন্যাস :

- প্রত্যাশিত সন্তান
- একই পাখী রঙ্‌ আলাদা
- চিরযাত্রী
- বিলচরের নীল হাঁস
- তিন আর দুই যোগফল এক
- নীল ঘাসে লাল রোদ
- সছিদ্র জল
- গাড়োয়ান পাড়া রোড
- যে কবিতা সর্বগতা
- মন কিন্তু সূর্যমুখী

ভ্রমণ-কাহিনী :

- হলুদ তীর্থ

গল্প :

- আগামী দিনের গল্প সংগ্রহ
- সাকিনা ভাবী
- ভালোবাসার দান

তৃতীয় মেরু প্রসঙ্গে অভিমত

শ্রীযুক্ত নির্মল আচার্য মহাশয়ের 'তৃতীয় মেরু' বইখানি পাঠ করিলাম, বইখানি বাহ্যতঃ উপন্যাস, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে উপন্যাসের চেয়ে অনেক কিছুর সমাবেশ ইহাতে আছে। বাঙ্গালাদেশের একটি অচ্ছুত অবহেলিত হিন্দু সমাজে ইহাই একটি তথ্যপূর্ণ চিত্রণ—যে সমাজে গিয়া তাহার স্ত্রী-পুরুষ-শিশুদের প্রতি মানবিক দরদ লইয়া তাহাদের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা তাহাদের ভাল-মন্দ সব কিছু খুঁটিনাটির সঙ্গে দেখিয়া লোকচক্ষে রসোত্তীর্ণ কথা-সাহিত্যের মাধ্যমে ধরিয়া দেওয়া—ইহাতেই গ্রন্থাকারের অসাধারণ কৃতিত্ব। ইহা একটি Documentary গ্রন্থ। তথ্য পুস্তক যাহার একটি চিরন্তন মূল্য আছে। বাঙ্গালার ঋষিদাস বা হিন্দু মুচি সমাজের জীবনচর্যার অপূর্ব আলোকচিত্র—তাহাদের রীতি-নীতি, ধরণ-ধারণ ভাষা-ভঙ্গী জীবনের সব বিষয়েই তাহার যেমনটি-ই আছে তাহার প্রকাশনা, ইহাই হইল ইহার অন্যতম অদ্ভুত বিশেষত্ব। ভাষানুশীলক বিধায় আমি এখনি ইহাতে ব্যবহৃত ঋষিদাস সমাজের মধ্যে প্রচলিত শব্দ সম্ভারে সংগ্রহ সম্পূর্ণাঙ্গ বাঙ্গালা অভিধানের পরিপোষণের জন্য করিয়া লইবার ব্যবস্থা করিয়াছি।

গ্রন্থকারের 'তৃতীয় মেরু' বইখানি বাস্তবিকই বাঙ্গালা সাহিত্যে একটি নূতন জিনিষ হইয়াছে, এবং ইহার প্রভাব সুদূর প্রসারী হইবেই।

স্বাঃ—ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

'তৃতীয় মেরু' একখানি উপন্যাস। অবজ্ঞাত উপেক্ষিত বাঙ্গালার এক প্রাচীন সম্প্রদায়ের এযাবৎ অনাবিষ্কৃত মনোজ্ঞ উপাখ্যান।

বাঙ্গালার একটি সম্প্রদায় "মুচি" নামে পরিচিত। অতি নিম্ন স্তরের সম্প্রদায়। ইহারা মৃত গরুর মাংস ভক্ষণ করে। তাহার চামড়া কাটিয়া আনিয়া কিছু অর্থ পায়। গ্রামকে পরিষ্কৃত রাখিতে এই সজাগ প্রহরীগণের প্রশংসিত কার্য সেদিনও অব্যাহত ছিল। এই সম্প্রদায় গ্রামের অন্যতম স্বাস্থ্য রক্ষক। গ্রামের অর্থনীতিরও ইহারা অতি নগন্য পরিচালক।

সুলেখক নির্মল আচায চব্বিশ পরগণা থাকিয়া এই সম্প্রদায়ের একটি প্রায় সর্বাঙ্গ সুন্দর আলেখ্য অঙ্কন করিয়াছেন। ইহাদের জন্ম মৃত্যু ও বিবাহাদি কাজের আচার অনুষ্ঠান, ইহাদের সামাজিক ব্যবহার নারীপুরুষের ভালবাসা বিরহ, আশা আকাঙ্ক্ষা, সততা কৃতজ্ঞতা, প্রতারণা ছলনা ও প্রতিহিংসা লেখকের চিত্রকল্পে অতি পরিচ্ছন্নভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে। মনে হয় লেখক বহুদিন আত্মগোপন পূর্বক এই সম্প্রদায়ের মধ্যে বাস করিয়াছেন এবং সর্বক্ষণের জন্য অতন্দ্র থাকিয়া ইহাদের আপাদ মস্তকের সংবাদ জানিয়াছেন। দুইচারি জন মুচি নরনারীর অন্তরঙ্গতায় এত সংবাদ পাওয়া সম্ভব নহে। লেখকের দৃষ্টি যেন ঋষির দৃষ্টি। সম্প্রদায়ের বাহির হইতে একেবারে অন্তঃস্থল পর্যন্ত না দেখিলে এ হেন একখানি পূর্ণাঙ্গ ছবি তিনি আমাদিগকে উপহার দিতে পারিতেন না।

লেখক শুধু মানুষের কথা বলিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। কত নাম না জানা ধান্য, কত অজ্ঞাতনামা তরুতৃণ লতাগুল্ম, কত পাখি কীট পতঙ্গ তিনি আমাদের সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছেন। এই অসাধ্য সাধনের জন্য বারবার তাঁহাকে অন্তরের সাধুবাদ জানাইয়াছি।

স্বাঃ—ডঃ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

তৃতীয় মেরু-র লেখক শ্রীনির্মল আচার্য বয়সে প্রবীণ এবং একাধিক উপন্যাসের রচয়িতা হলেও সাহিত্য-ক্ষেত্রে আজও তেমন সুপরিচিত নন। কিন্তু অসংশয়ে বলতে পারি এই উপন্যাসটি বাংলা কথাসাহিত্যে তাঁকে প্রতিষ্ঠা দেবে।

বাংলার এক দীর্ঘ দিনের অবহেলিত ও নিগৃহীত সম্প্রদায় মুচি বা 'ঋষি'দের জীবনকথা এই উপন্যাসের মূল উপজীব্য। মুচিদের হতদারিদ্র্য নিত্য অভাব অভিযোগকে সাথী করে কায়ক্লেশে বেঁচে থাকবার চেষ্টা, বর্ণাভিমানী উঁচু জাতের মানুষদের ঘৃণা আর অবজ্ঞার তাপে সদামলিন তাদের বিশীর্ণ অস্তিত্ব, তাদের জীবিকার উপায় ও জীবনযাত্রার পদ্ধতি, তাদের নিজেদের মধ্যে জ্ঞাতিকলহ, তাদের কামজীবন ও বন্যতা, তাদের নিসর্গপ্রীতি—সব এই উপন্যাসে ছবির মতো ফুটে উঠেছে। মুচিদের জীবন লেখক খুব কাছে থেকে দেখবার সুযোগ পেয়েছেন এবং তাদের দিনচর্যার খুঁটি-নাটি বৃত্তান্ত গভীর মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন—তা নয় তো এমন আন্তরিকতা লেখায় কখনও আসতে পারতো না। সব চেয়ে অবাক হয়েছি গ্রামজীবনের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত কৃষির সংস্কার আর অরণ্য প্রকৃতির বিবিধ বৈচিত্র্যের বিষয়ে লেখকের গভীর জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে। পল্লীর গাছগাছালি ফুল লতাপাতা ভেষজ এবং পাখি আর নিম্নতর প্রাণীজগতের এমন নিখুঁত ও জীবন্ত বর্ণনা বিভূতিভূষণের লেখায় ছাড়া আর কারও লেখায় পেয়েছি বলে মনে পড়ছে না। পল্লী-প্রকৃতি সৌগন্ধে এই বইখানি এমন ভরপুর যে, এক এক সময় মনে হয় কাহিনী অংশকেও ছাড়িয়ে গেছে তাঁর এই প্রকৃতি চেতনার কাব্য-সুবাসিত সৌন্দর্য।

বাংলার মুচিদের জীবন নিয়ে এই বোধ করি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস।

—নারায়ণ চৌধুরী

তাং—(২রা ভাদ্র ১৩৭০) যুগান্তর

প্রিয়বরেষু

আপনার লেখা বিস্ময়কর উপন্যাস 'তৃতীয় মেরু' যেদিন পেলাম সেইদিনই সন্ধ্যা থেকে রাত একটার মধ্যে বইখানি এক নিঃশ্বাসে পড়ে শেষ করি। একথা মুক্ত কণ্ঠে বলতে পারি আপনার এই উপন্যাসখানি একালের প্রগতিশীল বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করবে। সর্বহারা মুচিদের অভিশপ্ত জীবন-যাত্রা ও তাদের সমাজকে আপনি আপনার বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির অনুবীক্ষণ যন্ত্রে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখেছেন। উচ্চবর্ণের হিন্দু সমাজের পৈশাচিক ঘৃণা ও অত্যাচারের বলি এই দুর্ভাগা মুচিদের বিচিত্র জীবনের ছবি আপনি প্রথম শ্রেণীর শিল্পীর দক্ষতায় আপনার বলিষ্ঠ লেখনীতে জীবন্ত ভাষায় ফুটিয়ে তুলেছেন। মুচি সমাজের শুধু অবর্ণনীয় দুঃখ দুর্দশাকেই বড় কোরে দেখান নি, দেখিয়েছেন তাদের প্রতিটি ব্যথাদীর্ণ বুকের প্রেম ভালবাসা মায়ামমতা শিল্পচেতনা ও নৈসর্গিক সৌন্দর্য প্রীতি। প্রকৃত আধুনিক সাহিত্যের এই দিকটি সম্পর্কে Jack Lindsay বলেছেন: The New art which depicts the development of people through straggle in the word of nuclear fission, must be also an art in which sensuous richness and rythmic concentration build images of joy and beauty. কথাগুলি কথা-শিল্পী মাত্রেরই মনে রাখা উচিত। "তৃতীয় মেরুর" ইংরাজী অনুবাদ পড়লে লিণ্ডসে খুশি হতেন। বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের পর আপনার নিসর্গপ্রেম বর্ণাঢ্যতায় অনন্য সাধারণ। পাঁচশো পৃষ্ঠাব্যাপী কাহিনী বিন্যাসেও অসাধারণ শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন। মননধর্মী শ্রেণীসচেতনতায় আপনি সাবধানী। তার পরিচয় প্রতিটি চরিত্র চিত্রণের মধ্যেই পেয়েছি। বইখানি পড়ে বোঝা গেল মুচিদের সংগ্রামী জীবন আপনি খুব কাছের থেকে দেখেছেন। শরৎচন্দ্র নবীন ঔপন্যাসিকদের বলতেন, "যা নিজের চোখে দ্যাখোনি তা নিয়ে লিখতে যেও না"। কথাটা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। সাহিত্যের সংজ্ঞাই হ'লো "অভিজ্ঞতার অভিব্যক্তি"। Expression of Experience is Literature এই সংজ্ঞার মাপকাঠিতে বিচার করলে আপনাকে সাহিত্যরসিক মাত্রেই বলবেন সার্থক জীবন শিল্পী।

স্বাঃ—বিমলচন্দ্র ঘোষ

ওধারে সোনামুখী বিল আর এধারে মুচিপাড়া। মাঝখানে সরু লম্বা একফালি বাচড়া জমি। গোরুর মাথা, শিরদাঁড়া, অস্থিকঙ্কাল বিকীর্ণ। এ বুঝি এক মোটা ব্যবধানের দাঁড়ি টানা সোনামুখীরই অছুৎ পাড়া থেকে আপনাকে রাখতে ছুৎমার্গের নিরাপত্তায়।

পলিমাটির মতন উর্বর সোনামুখী বিল। কয়লার মতন কালো তার রঙ। খোয়া-খীরের মতন শক্ত সুস্বাদু তার মাটি। আর সে মাটি ডাকলে ডাক শোনে। সোনা দেয়। আশ্চর্য কিন্তু সোনামুখীর কিনারের বাসিন্দা হোয়েও এপাড়া ভূমিহীন। ভৌমলক্ষ্মীর করুণা দেয়নি একে সূচাগ্র মাটি কি একরত্তি সোনা। তবু এ-পাড়ার সাথে ও-বিলের এক নিবিড় যোগাযোগ সব ব্যবধান সব বৈপরীত্যকে দিয়েছিল বিলুপ্ত কোরে। যার মূল্য স্বত্ব-স্বামীত্বর থেকে অনেক দামী।

মাঘের সকাল। তারন রিশি তার ছোটটো উঠোনের মাঝখানে রোদ পিট কোরে বোসে। পাশে কতকগুলো তলতাবাঁশের লম্বা লম্বা চেরা টুকরো। সামনে পোতা হুলন্ত লোহার আছাড়ওয়ালা চওড়া দা। চাঁচের শলা বানাচ্ছে তারন। পাতলা চওড়া শলা। এমন সময় বৌ মন্থরা আসে প্রাতরাশ নিয়ে। মেটে শান্কী। থালার মতন চ্যাপটা না। কচ্ছপের খোলার মতন খোল। তাতে মাছির মাথার মতন লাল রং মোটা আউশ চালের কড়ো কড়ো ভাত। গোটা চারেক কাঁচা আকাশ লংকা। কাঁচা পেঁয়াজ গোটা দুয়েক আর সরষের তেল। মেটে বদ্নার জলে হাত ধুয়ে খেতে বসে তারন। ভাত মাখতে মাখতে অনুসন্ধিৎসু চোখ চায়, নূন কই? মন্থরা জিব কেটে মন্থরা গতি চলে নূন আনতে।

মেয়াউ-মেয়াউ। বৈদূর্যমণির মতন জ্বলজ্বলে চোখ নিসকালি হোলা বেড়ালটা ছুটে আসে পাতের ধারে। তারনের পোষা বেড়াল। হাঁড়ি মারার যম। রোজ নালিশ আসছে পাড়া থেকে। মাছ দুধ ভাত খাওয়ার। রোজ মন্তব্য পেশ করে তারা, অতো যদি বেড়াল পোষার শখ বুড়ো বয়সে, বেঁধে পুষতে হয়। পরের খেতি করা ক্যানো? আত্মকৃত এ অন্যায়কে স্বীকৃতি দেয় তারন। মানে চুপচাপ থাকে। ঘাড় গুঁজে তামাক টানে। আর চাঁচের

শলা বানায়।

মেয়াউ, মেয়াউ। আবার ডাকে হোলাটা। একমুঠো ভাত দেয় পাতের গোড়ায়। খানিক তফাতে গোল হোয়ে শুয়ে রোদ পোয়াচ্চে খেঁকী কুকুরটা। সেও এবার লোভী চোখ চায়। ল্যাজ নাড়ে। তারো দাবী একমুঠোর। একগাদা মাছি ভন্‌ভন্‌ কোরচে ভাতের ওপোর। ভ্রূক্ষেপ নেই তারনের। সে ভীমের মতন নাগাড়ে খেয়ে চলেছে—নির্বিকার নির্ভেজাল মনে। এ-ঝামেলা একদিনের না। নিত্য-নৈমিত্তিকের।

গোয়াল ঘরের চাল ঘেষে একখানা চালা দেয়া। এটাই রান্নাঘর। বেড়া নেই। আলগা। উঠোনের কোণে ছাতরাণো একটা আতা গাছ। তার তলায় একটা আখা কাটা। শুকনো খরার সময় ওখানেই চালিয়ে নেয়া হয় রান্নাবান্নার কাজ। কেরোসিনের মেটে টেমি জ্বলে। যেদিন তেল থাকে না, নারকেল পাতা কি পাকাটি জ্বালিয়ে রান্না খাওয়া সারা হয়। ফড়িং, পোকা-মাকড় উড়ে এসে পড়ে ভাত-ব্যন্ননে। দমকা বাতাস ছড়িয়ে দিয়ে যায় এক খাবলা ধুলো-বালি। তারন খেয়ে চলে চুপচাপ। পোকা-মাকড়, হাওয়া-অন্ধকারের উপদ্রব ওর গা সওয়া। একলা ওর নয়, এ-পাড়ার।

মন্থরা কিন্তু হাত নেড়ে মাছি তাড়ায়। তার হাতে মোটা ডালিমফুলী কাচের চুড়ি। ডালিমের ফুলের মতন-ই লাল টুকটুকে। রূপোর চুড়ির সাথে মিলে মিশে তারা ধরে ঐক্যতান। প্রজাপতিওয়ালা টানা পরানো প্রকাণ্ড কেন্নু মুড়ি নথ দুলতে থাকে মন্থরার ফ্যাটা নাকে। রামায়ণের মন্থরার মতন-ই কালো মোটা সোটা মন্থরা।

খেতে খেতে তারন ঘন ঘন তাকায় বৌ-এর পানে।—বলি সে-গুয়োটার ছেলে কোথায়?

—কী জানি? গুল্‌তি বাঁশ নিয়ে বেরিয়েচে। সে কোন্ বিহানের কথা।

মুখ খিঁচিয়ে ওঠে তারন, গুল্‌তি বাঁশ? উনার কোন্ বাবার শেরাদ্ধ চটকাতে হবে গুল্‌তি বাঁশ দিয়ে? ও-গুয়োটার ছেলের বে দিয়ে দাও। ষোলো চুঙোর বুদ্ধি এক চুঙোয় ঢুকুক। বুঝুকগে ব্যাটা ঘান টেনে একবার।

—তা দাও দিয়ে। মানা কোরচে কে? মন্থরার জবাব।

—কাল কয়ে রেখেচি, আমি জো তুলে দেবো, তুই চাঁচ বুনবি। এতবেলা

কত মুল্লুক চাঁচ বোনা হোয়ে যেতো। কেবল খাবে আর বাউদণ্ডি কোরে বেড়াবে। গুয়োটার ছেলে। আসুক আগে, আজ ওর একদিন আর আমার একদিন।

মন্থরা বাধা দেয়। থাক, আর গাল দিতে হবে না। অ'নধারা ছেলেরা খেলেই বেড়ায়। ও চাঁচ তুলে দেবে আর উনি তাই বেচে পয়সা কামাবে।

—ঐতো, তোমার আস্ফলানিতেই তো হোয়েছে অমনধারা। পাতেই আঁচায় তারন, তারপর সরে জুতসই হোয়ে বসে দার গোড়ায় এবং লেগে যায় শলা বানাতে।

স্থূল নিতম্বা মন্থরা শান্কী নিয়ে হেলতে দুলতে চলে যায় রান্নাঘরের পেছনে আদাড়মুখো।

—ও বড়ো বৌ! তারন ডাকে।

—এই যে হোচ্ছে। এঁটো শান্কী ধুতে ধুতে আদাড় থেকে ডাক শোনে মন্থরা। একটু পরে-ই সে আসে তারনের ধারে। কলকেয় তামাক সেজে আগুন তুলে ফুঁ দিতে দিতে এবং বাঁশের গায় হেলান দিয়ে রাখা হুঁকোটা নিয়ে তার নৈচেয় কলকে চড়িয়ে বাড়িয়ে ধরে। তারন হুঁকো নিয়ে কাঁধে বাধিয়ে বেশ মেজাজী চালে টানে। আর তল্লা বাঁশ চিরে চাঁচের শলা বানায়।

—ওবা, বা!

তামাক টানা বন্ধ রেখে ঘাড় উঁচু কোরে তাকায় তারন। দেখে তার গুণধর পুত্তুর শ্রীমান শশী শিকারী আর তার সাঙাতরা। নিরো, ইস্টম, বোস্টম। সবারি কাঁধে বিলম্বিত গুলতি বাঁশ। মানে দুটো কোরে ছিলা পরানো ধনুক। আর কোঁচড়ে মাটির গুলি। সবারি হাতে ঝুলছে পাখি। শশী পেয়েচে সব থেকে বেশী। চার রকম চারটে। বক, ফিঙে, দোয়েল, শালিক। এদের বেশ-বিন্যাস স্মরণ করিয়ে দেয় ইতিহাসের প্রস্তর যুগ।

শিকার প্রতিভা বুঝি শশীর সহজাত। চোদ্দো-পনেরো বছর বয়স হোলো ওর। শিকারে গিয়ে কোনদিন খালি হাতে ফেরে নি এ পর্যন্ত। প্রতিভাবান এ পুত্রের মুখ চেয়ে এখন সব রাগ জল হোয়ে যায় তারনের।

বেতের মতন লিকলিকে চেহারা শশীর। যাকে বলে তালপাতার সেপাই। ঘোলের ডাবুরপানা পেটটা চলেচে আগে আগে। ঝুটি কোরে চুল বাঁধা। মানসা শোধ না দেয়া পর্যন্ত চুল কাটা চলবে না। নিশান কালীর মানসা। শশীর অগ্রণী পেট নিয়ে ইস্টমরা পেরায় ঠাট্টা করে। বলে, ওর পেটে নাকি

সাওন্নাল ঢুকেচে। ঐ-পেটের বাঁ ধারে একটা দাগ। পিলে "হেনে" নেয়া হোয়েচে। ফি বছর শীতের সময় এক গুজরাটী বুড়ো আসে। লিভার-পিলে-অগ্রমাস-কামল সারে। বাত ভালো করে। দাঁতের পোকা বের কোরে দেয়। এ-কীর্তি-চিহ্ন তারি। সে পোড়া শিক ঠেসে ধোরেচে পিলের মুখে। তবু কিন্তু মুখপোড়া পিলের দাপ-দাপট অব্যাহত। শশীর বাঁ-কানের নেতি ফুটো কোরে পেতলের তারের মাকড়ী পরানো। তেমনি বাঁ-পায় লোহার বালা। এর সব কিছুই তাৎপর্যপূর্ণ। মন্থরার পর পর তিনটে ছেলে হোয়ে মারা যায়। ওঝা মন্তব্য করে, হালে পানি না পাওয়ার পর, একই ছেলে আসা-যাওয়া কোরচে। ও সন্তান না, শয়তান। সুতরাং ঐ-শয়তান আসার পথরোধ না করা পর্যন্ত এ-পোয়াতি সন্তানবতী হোতে পারে না। তখোন ওঝার নির্দেশমাফিক ঐ মরা ছেলের কড়ে আঙুল কেটে শ্মশানে নিয়ে গিয়ে গর্তে উপুড় কোরে শুইয়ে মাটি চাপা দেয়া হয়। তারপর শশীর জন্ম। তখোন আবার ওঝার নির্দেশানুসারে শশীর কানে ওঠে মাকড়ী। পায় বালা। এমন ঢের ছেলে-মেয়ে আছে এ-পাড়ায়, যারা এবম্বিধ স্মারকচিহ্ন বয়ে নিয়ে বেড়ায়। এদের দেখলে নিঃসন্দেহে রায় দেওয়া চলে, এ সব শিশুদের অগ্রজাত ভাইবোনেরা ছিলো—অনেকবার এ পৃথিবীতে এসে গেছে যারা। যা হোক পরপর তিনছেলে হারানোর পর পাওয়া এ-শশী-ধন। তাই মন্থরার বেশি রকমের আদুরে ছেলে এ। তারনেরো। যদিও ছেলের অগোচরে একদিন একশোবার বাপান্ত কোরে লাভবান হয় তারন নিজেই। কিন্তু ছেলে গোচরে এলেই সব রাগ জল। ঐ বাপান্ত গালটা আবার মন্থরার কর্ণশূল। বেজায় আপত্তিকর। এরো একটা অনিবার্য রহস্য আছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ কোরতে হয়। শশী গর্ভে আসবার আগে মন্থরা একদিন স্বপ্নে দেখচে, ওর বাবা এসে সামনে দাঁড়িয়েচে। বোলচে, খুকী আমি তোর কাছে এলাম। এর অনতিপরেই মন্থরা অন্তঃসত্তা হয়। যা হোক বাবার মতন লিকলিকে চেহারা হোলে-ও শশী কিন্তু বাপ-ঠাকুরদার মুখ পায় নি। ওর মুখের ছাঁচ নাকি হুবহু ওর দাদুর মতন।

শশী বলে, আমি বা, পাখি বানিয়ে ফেলি এখ্খুনি। ক্যামন? ওমা, ছুরিখান দে তো।

তারন আপত্তি করে, তুই বা, এট্টু চাঁচ বোন্ তারে। আমি জো তুলে দিচ্চি। পাখি বানাবেনে তোর মেয়ে।

—হ্যা, মা বুঝি পাখি বানাতে পারে ? ও সব বাদ ত্থায়। জানো না ? সেদিনকের কুকো পাখিটা ? একগাদা মাংস হওয়ার কথা। শেষকালে এট্টুকখানি মাংস হোলো ! মা পা'র ওপোরের মাংস নেয় না। মাংসসুদ্ধ মাথা বাদ ত্থায়। নাড়ি ফেলে ত্থায়। বোলতে বোলতে সে ঘরে ছুটে যায় এবং তেমনি ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে আসে। হাতে তার লম্বা ছুরি। চোখ ঝলসানো চক্‌চকে।

উঠোনের ধুলোয়-ই জাবড়ে বসে গেছে শশী। হাত দিয়েই পটাপট ছাড়ায় পাখনাগুলো। যেনো ওর খুব পরিচিত মেশিনের পার্টস্‌গুলো খুলে রাখে। তারপর বুক বরাবর ছুরি চালায়। পেঁয়াজের খোসার মতন খসায় জিলজেলে পাতলা চামড়া। একফালি কাঠের উপোর ছুরি পাতে। আছাড় চেপে ধরে পা দিয়ে। কচুর মত কাটতে থাকে মাংসের ফালি। সার্জারির স্পেশালিস্ট ডাক্‌তার বুঝি অস্ত্রোপচার কোরচে অকুণ্ঠ ছুরি চালিয়ে। নিরো-ইস্টমরা থ হোয়ে গেছে। ভাবচে, শিকারে যেমন ওর নির্ঘাত নিষ্ঠা তেমনি শিকার বানানোয়।

তারনের চোখের পলক নেই। বলে, সামাল, বা, সামাল। এট্টু সুম্‌ঝে চালা চাকু। বলা যায় দৈবী-সৈবীর কথা।

কিন্তু স্নেহাতুর তারন ভুল করে, তার ছেলের এ-প্রবৃত্তি-প্রতিভা কাদের রক্তদত্ত। যারা পর্বত-গুহা, জল-জঙ্গল ঘেটেচে, মুঠো কোরে ধোরেচে অতিকায় জানোয়ারদের কেশর, পাথরের ভল্ল দিয়ে রুখেচে বুনোমোষ-গন্ডার-হরিণ-শুয়োরদের, ঝলসে খেয়েচে বনমোরগ-উটপাখীর মাংস। তারা যে শশীর পিতৃ-পুরুষরা, তাদেরই শরিকানা স্বত্বয় ও স্বত্ববান, এ-কথা বোধ করি তারনের অজানা।

শ্রীমান্ শশী জবাব দেয়, কী বোললি বা ? হাত কাটবে। তার দিরিং আছে। বোলেই সে ছুরির গতিবেগ বাড়িয়ে দেয় ডবল মাত্রায়।

তারপরই ইস্টমদের দিকে তাকিয়ে বলে, তোদের পাখীগুলো এগিয়ে দে ইস্টম। আমিই বানিয়ে দিচ্চি। তারপর ধাক কোরে খেয়ে আবার বেরোবো। এবার কিন্তু তেলীর পুকুরে যাবো না।

—তবে ? ইস্টম জিজ্ঞেস করে।

—মালীর বাগে। ওখেনে কুকো পাখির আমদানী খুব। ওঃ। কুকো পাখির যা চবর ! চুকিয়ে উঠে শশীর জিব।

—ক্যানো হোরেল ঘুঘু ? হোরেল ঘুঘুর বুঝি চবর কম ? নিরো বলে।

—আরে ধেৎ শালা, পাখি চিনিস তুই ? বালুই পাখির কাছে আবার হোরেল ঘুঘু ? ছোটটো হোলে কি হবে ? যতোটুকু মাংস ততোটুকু চবর। একেবারে তেল চপচপে। প্রতিবাদ করে ইস্টম।

—তবে বাজি রাখ শালা। নিরো বলে।

—রাখ শালা বাজি। এই শশে, শুন্‌চিস্ তো ? বল, কী বাজি রাখবি ? নিরো জিগ্যেস করে।

—গুলিভাঁড়ের একভাঁড় তাড়ি। তুই ?

—দু ভাঁড়। শুন্‌লি তো শশে ? এই কালা ?

সবগুলো পাখির মাংস তোয়ের শেষ হয়েছে শশীর। সে এখোন একটা বকের মাথা নিয়ে তার লম্বা স্থচলো ঠোঁটের ওপোর পরীখ্যে চালিয়েচে। যে-ঠোঁট দিয়ে সোনামুখীর জলে রূপালী মোহনপুটি মাছ শিকার কোরতো বকটা।

—দাঁড়া, বোলচি। বুদ্ধির গোড়ায় ধোমা দিয়ে নিই আগে। বোলতে বোলতে সে ছুটে যায় বাবার ধারে এবং রক্ত মাখানো হাতে-ই তারনের মুখের হুঁকো এক রকম জোর কোরেই কেড়ে নেয়, বা দেখি।

তারপর ঘন ঘন টানতে টানতে ওদের দিকে এগিয়ে আসে, বলে, তোরা শালারা পাখি চিনিস ? খেতে হয় তাই খাস। তবে বাবুই বোলিস, আর ঘুঘু বোলিস, কাঠঠোকরার ধার ঘেঁষতে পারে কেউ ? খাসির চবরের মতোন খানা খানা চবর ও মাংসর গায় জড়ানো।

অকাট্য সিদ্ধান্ত। যেহেতু শশী বোলেচে। এরপর কি নিরো আর কি ইস্টম, বোস্টম কারো মন্তব্য আর পাত্তা পায় না। এমনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রভাব খুদে মাতব্বর শশীর।

দুপোরের পর ওদের মালীর বাগে শিকারে যাওয়ার কথা। কিন্তু আজকের মতো সে-শিকার মুলতুবী থেকে যায়। এক অপ্রত্যাশিত স্থযোগ ওদের মুখে তুলে দেয় আর এক শিকার। যা মালীর বাগের পাখি শিকারের চেয়ে অনেক বড়ো। অনেক লোভনীয়।

কোনো রকমে দুপুরে খাওয়া শেষ কোরে তারন আবার লেগে গেছে চাঁচের শলা বানাতে। শশীকেও ধোরে এনে বসিয়েচে। একটা জো তুলে দিয়েচে ওকে। জো ধরে শশী চাঁচ বুনে চলেচে। বাপ-বেটায় রফা হোয়েচে, ওর দলবল না আসা পর্যন্ত শশী সাহায্য কোরবে বাবাকে। তারপর ওর অব্যাহত অভিযান।

রফা কোরে তারন অবিশ্যি ছেলেকে বড়ো একটা কাজে বসায় না। আজ কিন্তু বাধ্য হোয়েচে। ধান গোলাজাত করার মরশুম এটা। তাই অনেক জায়গা থেকে এসেচে চাঁচের বায়না। বাঁশ শিল্পী হিসেবে তারন রিশি এ-দিগের এক ডাকে চেনা। তারপর চাঁচের শলা বানানোয় হাত ওর আরো পাকা। যে-শলা বানানোর ওপোর নির্ভর করে চাঁচের পরমায়ুর। তাই খদ্দেরের ভীড় এতো ওর দোরগোড়ায়। বাপে-বেটায় কোনো কথা কওয়া-কওয়ি হোচ্চে না। পুরোদমে যাচ্চে কাজ কোরে। এমন সময় যোগিশ্বর আসে। তারনের কাকা। অনেকদিন থেকেই আলাদা। তারনের বাবা তখোন বেঁচে। বেঁটে খপ্‌পর শুট্‌কো মানুষটা এই যোগিশ্বর। হাত-পা নড়িনড়ি। দাদযোড়া পেটটা। যেন একটা গুলি-ভাঁড়। খসখসে গা। কুনো ব্যাঙ একটা বুঝি এই মোত্তর বেরিয়ে আসে গর্ত থেকে। বলে, হ্যারা তারন, ওঠ্‌ তো চট্ কোরে। ছুরি-চাকু নে।

ছুরি-চাকুর নাম আসল ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেয়। তারনের কুঁচে চোখ ঠেকে গিয়ে যোগিশ্বরের কপালে। জিগ্যেস করে, কোথায় মাল, কাকা?

যোগিশ্বর একবার এদিক-ওদিক ফালুক ফলুক কোরে তাকিয়ে নেয়। —আছে। গাঙ্‌ ভাড়ে। তাড়াতাড়ি ওঠ। উত্তরপাড়ারা টের পেলে মুশ্‌কিল। খাস্‌খুস কোরে যোগিশ্বর বলে।

এদিকে শশীর জলদ হাত চুপচাপ। তারো চোখ উঠেচে ওর ঠাকুরদার কপালে।

—আমিও যাবো কিন্তু দাদা। শশী বায়না ধরে।

—যাবি তো চল্‌। ফিস্‌ফিসে ধমক দিয়ে বলে ঠাকুরদা।

তড়াক কোরে উঠে দাঁড়ায় শশী। প্রশ্ন করে, আমার সেই বড়ো ছুরিখানা নেব দাদা? হোগলপাত ছুরি?

—নে।

মাটিতে পোতা হুলন্ত আছাড়ওলা দা তুলে ফেলে তারন। শলাগুলো তাড়াতাড়ি কোরে সরিয়ে রাখতে রাখতে বলে, পেলেই বা টের উত্তরপাড়ারা। ওটা তো আমাদের ঘের কাকা।

—ঘের তো আমাদের। কিন্তু গিয়ে যদি পড়ে বাপু, তখোন তো আর তাড়ানো যায় না। তোরা আসতে লাগ। আমি তারে ভুতো-কানাইদের ডেকে নেই।

চোট পায় চলে যোগিশ্বর। পঁচাত্তর বছরের বুড়ো পঁয়ত্রিশ বছরের যুব-

চাঞ্চল্য ফিরে পেয়েচে।

মজা গাঙ বুড়ি ভদ্দর। কিন্তু এর এপার-ওপার উঁচো খাড়াই পাড় পষ্ট স্বাখ্যর দেয় একদিন ছিলো এর প্রশস্ত উদারধারা। ছিলো প্রখর বহতা। এই বুড়ি ভদ্দরের গা-ঘেঁষা গেরাম নুরপুর। যার উত্তর সীমান্তে মুচিপাড়া। ঠিক কেঁচো সাপের মতন একটা সরু-শীর্ণ সোঁতা হিলবিলিয়ে উঠে এসেচে সোনামুখীর বিল থেকে এবং মিলে গিয়েচে শুকনো মাঠের সন্তায়। এ-সোঁতার গা ঘেঁষাঘেঁষি আবার ঘর ভাঙার মুচিপাড়া। ওটা গাঁয়ের দখ্যিণ সীমান্ত। দরকারের নেহাৎ দায়-দায়িত্ব ঘাড়ে না চাপা পর্যন্ত এধারে কেউ পা মাড়ায় না। বুঝি এ-রকম মতলোবের ওপোর ভিত্তি স্থাপন কোরেই এ-সব পাড়াকে ভিৎ গাড়তে দেয়া হোয়েচে। তাই দেখা যায় মুচিপাড়ার শেষে আর পাড়া নেই। মুচিপাড়ার শেষে আর নেই হাট। নেই মুচিঘাটার শেষে ঘাট কি শ্মশান। মড়ক-মহামারীর মতন-ই ওদের ছোঁয়াচকে রাখা হোয়েচে হুঁশিয়ারী এক্তিয়ারে। বুড়ি ভদ্দরের ধারে মস্ত চওড়া একফালি পতিত জমি। নুরপুরের গো-ভাগাড়। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত গোরু-মোষের মাথা-শিরদাঁড়া-হাড়গোড় পাঁজরার কাটি। বিস্তীর্ণ কংকাল ভূমি। শেয়াল-কুকুর-শকুনের ভোগ-স্বত্বর। আঁচড়া-আঁচড়ি, কামড়া-কামড়ি, ঠোকরা-ঠুকরিতে গোল্‌জার।

দলবল নিয়ে পৌছয় যোগিশ্বর। দেখে মস্ত বড়ো এক দামড়া গোরু। ফুলে আরো মস্ত হোয়ে পড়েচে এবং পৌছনোর আগেই শুরু হোয়ে গেছে ঠোকরা-ঠুকরি। ওরা হামলা দিতেই সরে যায় কুকুর-গৃধিনী পাল।

—ওঃ! পাঁচশো টাকার দামড়া! কিসে মলো কাকা? তারন প্রশ্‌ন করে।

এ-দিগরে খুব নামডাক গো-চিকিৎসক যোগিশ্বর। ওষুধ ওর গাছ-গাছড়া আর ঝাড়-ফুক-মন্তর। এ দিয়েই ও ভালো করে গোরুর তিলে-খোর-ব্যাঙা-পশ্চিমে। শীত মরশুমে পয়সাও কামায় বেশ রকম। গোরুর কবিরাজ হিসেবে খুড়োর কাছে তারনের এ-জিজ্ঞাসাবাদ। এ-ছাড়া যোগিশ্বরের আরো দুটো সাইড্‌ বিজিনেস্‌ আছে। ছাগোল-গোরু ছাট দেওয়া। মানে, খাসি-বলদ বানানো। অবিশ্যি বিজ্ঞান-প্রণালী আবিষ্কারের পর এখোন ও-কারবারে অনেকটা ভাটা পড়েছে। যা হোক যোগিশ্বর এ-বাবদ পয়সা পায়। আর পায়—সিদে—চাল, ডাল, তেল-মশলা।

তাচ্ছিল্যভরেই ভাইপোর কথার জবাব দেয় যোগিশ্বর, কী জানি? খোর-

টোর কি হবে। নে, ছুলে ফ্যাল ঝটপট।

ছুরি নিয়ে গোরুর ধারে এগিয়ে যায় তারন। পেছনে ভূতো, কানাই। চওড়া পাতলাওয়ালা বগী দা হাতে। ছুরি চালানোর আগে তারন গোরুর ল্যাজের বালাজ, গার লোম ধরে টানে। তারপর চেঁচিয়ে ওঠে, কাকা, এ খোর না। এ সাপিয়ে ছিলো। এই গ্যাখো না ভুস্ ভুস্ কোরে ল্যাজের বালাজ-পশম উঠে যাচ্চে। বোলতে বোলতে মুঠো মুঠো গার পশম তুলে ফেলে।

শশী তো আল্হাদে আটখানা। নিশ্পিশ্ কোরচে ওর ছুরি ধরা হাত। বাবার বদলে চামড়া তোলবার হুকুমটা যদি তাকেই দিতো ঠাকুর-দা, তা হলে বর্তে যেতো ও। দেখিয়ে দিতো ওর হাতের মুন্সীয়ানা। তবু ছটফটে হোয়ে ওঠে ওর শিশু মন। বাবার এ-গড়িমসি ভাব সহ্য হয় না। শুধোয়, দাদা, তোলবো খাল।

চমকে ওঠে যোগিশ্বর, ওরে দাদুরে, তুই কখোনো পারিস! চামে পোচ লাগলে সব্বোনাশ হোয়ে যাবে একেবারে।

সে-কাণ্ডজ্ঞান ভালোই হোয়েচে শশীর। ও শিখেচে চামড়ায় পোঁচ লাগলে তা একদম অবিক্রী। তখোন জলেই ফেলে দিতে হবে। জোর প্রতিবাদ করে সে, না'মনে দাদা। আমি কি পাগোল? চামে পোঁচ দেবো। এই গ্যাখো না।

হোগোলপাত ছুরি ঘুরোতে ঘুরোতে লম্বা ধাপে এগিয়ে যায় সে। তারন ততোখ্যন বুক বরাবর ছুরি চালিয়ে চামড়া ফেড়ে ফেলতে লেগেছে।

—দেখি বা, তুই সর।

তারন সরে আসে। বুঝদার ছেলের কাছে বরাবর ও খাটো।

সুষ্ঠুভাবেই চামড়াটা চিরে ফেলে শশী। ওর ছুরি চালানোর ছান্দসিক-গতি অবাক কোরে দেয় বুড়ো বাপ-ঠাকুরদা-কাকাদের। রোগা ঘ্যানা ছেলের কৃতিত্বে বুক ফুলে ওঠে তারনের।

ওপোর দিকটার চামড়া তোলা হোয়ে গেছে। এবার গোরুর লাশটাকে উল্টে দিতে হয়। ভূতো কানাই এগিয়ে যায়। বলে, সর তুই এবার বাপ। আমরা ঠিক কোরে দিচ্চি। শশী সরে আসে ভূতোরা উল্টে ফেলে মরা গোরুটা। কানাই চেয়ে নেয় ছুরিখানা। বলে, এবার তুই এট্টু জিরো।

শশী থেমে গেছে। রক্ত মাখানো ওর দু-হাত। বুকে মুখে অসংখ্য রক্তর ছিটে শুকিয়ে জমে উঠেচে। শশীর অস্ত্রোপচার ভাবিয়ে দিয়েচে ওর কানাই কাকাকে। তাই জলদ ছুরি চলচে না ওর। কানাই ভাবে, একফোঁটা ছেলে কী কোরে এতো নিখুঁতভাবে চামড়া তুললো! এককুচি মাংস লেগে নেই চামড়ার গায়।

বুড়ো যোগ্যিশ্বর একটু তফাতে এসে বুড়বুড় কোরে তামাক টানছিলো। হঠাৎ বোলে ওঠে, হদ্দ্যাখ তারন, দেখিচিস?

তারন চেয়ে দেখে ঢেলা বন ভেঙে একদল লোক ছুটে আসচে এদিকে। ঘর ভাঙার মুচিরা। ছেলে-বুড়ো যুবো সব রকম বয়েসের লোক আছে সে-দলে। এমন কি ফুলবর রিশিও। ও-পাড়ার মাতব্বর। তাদের হাতে ঝুড়ি ধামা, দা, হোগোলপাত ছুরি পর্যন্ত।

দেখেই তেতে ওঠে তারন। কী আস্পর্ধা! কাকা?

কিন্তু কাকার তরফ থেকে জবাব আসবার আগেই জবাব গ্যায় ভূতো, আসুক না শালারা। ছুরি মারবো আগেই, খাল তুলে নেবো ওই ফুলবর শ্যালোর।

—ধেৎ ও বোলতে নেই। তাড়া দিয়ে ওঠে যোগিশ্বর।

—ক্যানো? এটা কি মগের মুল্লুক পেয়েচে! এ আমাদের ঘের না? ওদের ঘেরে গেলে এতোবেলা যে খাল কেলিয়ে নিতো আমাদের। না কি বড়দা? ওই প্রশ্ন ভূতোর তারনকে লখ্য কোরে।

ভূতোর বক্তব্যটা আদৌ বেঠিক না। অবিশ্যি চামড়া নেয়া না হোলেও চামড়া ছিঁড়ে নেয়ার ব্যাপারটা বহুবার ঘটেচে। সীমানা লংঘন কোরে অনধিকার প্রবেশ এবং মুখের শিকার লুটপাট কোরে আনার বাবদ। শেষ পর্যন্ত দু-পাড়ার মোড়ল-মাতব্বররা সালিশী বৈঠকে বিবাদ নিষ্পত্তি কোরেচে গাঁ ভাগাভাগি কোরে নিয়ে। কিন্তু স্বাখ্যরিত চুক্তির কালির রঙ চটতে থাকার সাথে সাথে যেমন তার প্রতিশ্রুতিতে ধোরতে থাকে ফাটল, তেমনি মৌখিক চুক্তির ফলবৃন্তও হোয়ে ওঠে নড়বড়ে। তাই এলাকা ভেঙে ঘরভাঙারা এসে পড়ে বে-এলাকায়। কিন্তু এ বিসম্বাদ মাংসর নয়। চামড়ার।

ভূতোর কথার কোনো উত্তর দেয় না তারন। সে কাকার মুখের হুঁকো এনে লাগিয়েচে নিজের মুখে একঘেয়ে বুড়বুড় ধ্বনি সৃষ্টি কোরে টেনে চলেচে।

যোগিগ্যশ্বর উত্তর ছায়, তোরি কথা ঠিক। খাল তুলেই নিতো। তা যাক গে। দ্বন্দ্ব-মারে কাজ নেই। আসচে, একখান দুখান নিয়ে যাবে নে।

ভূতোর বোধ করি আরো কিছু বক্তব্য ছিলো। কিন্তু ফুলবর সদলবলে এসে পড়ায় থেমে যায় সে। বুড়ো কাকার কথার ওপোর কথা বলা যায় না।

ফুলবরকে আসতে দেখে সম্বর্ধনা জানায় যোগিগ্যশ্বর, আরে এসো এসো ভাই এসো। ওরে তারন, হুঁকো দে।

হোগোলপাত ছুরিখানা ফুলবরের হাতেই। যোগিগ্যশ্বরের পাশে গিয়ে বসে সে। দু-মাতব্বরে বেজায় ভাব। দু-পাড়ায় মাথা ফাটাফাটি হোচ্চে. মাংস-চামড়া নিয়ে চলেচে কামড়াকামড়ি। মাতব্বররা চুপচাপ। খুঁটির মতন সোজা। কারো গায়ে নখের আঁচড় লাগে না। তারপর বিসম্বাদ চূড়ান্তে পেঁাছয় এবং ধীরে ধীরে যখোন নামতে থাকে তখন-ই মাতব্বররা মাথা গলায়। ওরা জানে, ঐ সব বাঁদর-ভূতের দলরা ক্ষেপে ওঠার প্রথমটায় থামাতে যেতে নেই। সে-প্রয়াস পর্য্যবসিত হয় ব্যর্থতায়। রক্ত যখোন মগজের ছাতে উঠে নামতে শুরু করে তখোনি ফেলতে হয় মিটমাটের টোপ। তাহলেই জনতা সে-টোপ গেলে এবং মাতব্বররাও বাহবা পায়।

ফুলবর তামাক খেতে থাকে। যোগিগ্যশ্বর মুখে একজাতীয় শব্দ কোরে বলে, মহা মুশকিল। মাতব্বর হওয়া সাত জম্মের অধম্ম ভাই।

ফুলবর ঠিক বুঝতে পারে না কথাটা। যোগিগ্যশ্বরের পানে তাকায়, কী হোল আবার?

—আরে ভাই, যতো সব বাঁদর-ভূত নিয়ে কারবার। ক্যানো বলো? তোমাদের আসতে দেখে তেরিয়া হোয়ে উঠেচে সব।

—ক্যানো! বিস্ময় প্রকাশ করে ফুলবর।

যোগিগ্যশ্বর হেসে বলে, এ-ঘেরে তোমরা আসবে ক্যানো? বে-এলেকায়?

এবার ফুলবরও যোগ দেয় সে-হাসিতে। বলে, ওরে তা আমরা দুখোন হাড়গোড়ো পাবো না? চামড়া চাচ্চি?

—তাই বোঝো। মানে তোমাদের হাতে ছুরি দেখেচে কিনা, তাইতে ওদের মাথা খারাপ হোয়ে গেছে।

—ওরে হোলাম যার মুচির ছাবাল, তার আমি ছুরি নিয়ে বেরোবো না তো, বেরোবে কি ওই মন্থঠাকুর? এসব বাঁদর-ভূতদের কী কোরলে রাগ শোধ যায়? বলোতো ভাই?

—হ্যা, কাণ্ডাকাণ্ড গ্যান্ নেই তো। তা তুমি কী কোরে টের পেলে ফুলবর ভাই? যোগ্যিশ্বর শুধোয়।

—ওরে, আমি কি টের পেয়েচি ভাই? টের পেয়েছিলো গুড়ে। শকুন উড়তে দেখে। গুড়ে বললে, শা-শা কোরে শকুন নামছে গাঙ ছ্যাড়ে।

—ও—ওরে, ও গুড়ে তা দাঁড়িয়ে আছিস ক্যানো এখেনে তোরা? ওদিকে যা। ও তারন, বাবা ভূতো, সবার ঝুড়িতে দুখোন-চারখানা কোরে দিয়ে দে। কেও যেন বাদ না যায়।

গুড়ের সাথে ফুলবরের দলবল এধারে এসে দাঁড়িয়েচে। এক ঘরের মতন। কেনো না লাইন অব ডিমারকেশন্ পেরিয়ে ওরা এসেচে একতিয়ারের বাইরে। অনধিকার প্রবেশ মস্তবড়ো অপরাধ। মাতব্বরের বিনা হুকুমে ওদিকে এগোতে পারে না। যোগ দিতে পারে না শিকার পাওয়ার উল্লাসে। এখোন যোগ্যিশ্বরের অনুমতি পেয়ে এগিয়ে যায় ওরা। এদিকেও বোসে নেই কেউ। চামড়া তোলার পরে ভূতো-কানাই কুড়ুল ধোরেচে। শশী মোত্তরখানেক জিরিয়ে নিয়ে বাবার হুঁকোয় দু-টান মাত্তর দিয়ে কাজে লেগে গেছে। তার যোগোলপাত ছুরি ডাবিয়ে তাল তাল মাংস কেটে ধামা ভর্তি কোরচে। ফুলবরকে হুঁকো দিয়ে তারন-ও দা ধোরেচে।

যোগ্যিশ্বর তাড়া দেয়, ওরে সন্ধ্যো হোয়ে এলো। ঝটপট। ও তারন, শশে তো এসেচে। বলি, গা ভেরে এসেচিস তো সব?

তারন কি কচি খোকাটি? ষাটের কাছাকাছি যায় বয়েস পৌছল? সে গা না ভেরে বাড়ি থেকে বেরোবে! বের কোরে আনবে তার ছেলেকে? ওর কি খেয়াল নেই? কোথায় চলেচে? আর কী কাজে? এতো বড়ো মালটা সামলে আনতে সন্ধ্যে উৎরে যাবে। তখোন এ-গাঙ চরের ভাগাড়টা এসে যাবে গোদানদের অবিসম্বাদী অধিকারে। তারন কি তা জানে না? জানে না তারন সে চলেচে গোদানদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিতে? সুতরাং ফাঁক পেলে তাকেও ওরা গ্রাসের মধ্যে পুরে ফেলবে? ওর বাবার মুখে শুনেচে, গোরু কাটার পর তিনদিন পর্যন্ত ওরা পেছন পেছন ঘোরে। ওর দিদিমা বোলতো, গোরু নাকি গোদানো হয়! মরা গোরুর পরে ওদের বেজায় লোভ। যখোন না পায়, জ্যান্ত গোরু ঠেসে মেরে ঘাড় মটকে রক্ত খায়। সোনামুখীর বিলে অমন কতো গোরু প্রত্যক্ষ কোরেচে তারন। শিং সুদ্ধ পুতে ফেলেচে গোদানোয়। ওর ঠাকুমা টিয়ে পাখির মতন পড়িয়ে পড়িয়ে

শিখোয়ে গেছে, আর কাউকে ভয় না করিস, খেতি নেই। কিন্তু গোদানোকে ভয় কোরে চলিস চিরকাল। তাই অথ্যরে অথ্যরে ঠাকুমার কথা পালন কোরে চলে। মুচিপাড়া বর্গেই চলে। কেবল শশী কিছুই গেরাহ্য কোরতে চায় না। দারুণ বেয়াড়া ছেলেটা তারনের।

মনে মনে একটু বিরক্ত হয় তারন। ভাবে, বুড়ো হোলে মানুষের বুঝি বোধশোধ কমে যায়। বলে, এসেচি।

বাড়ি ফিরে শশী দেখে সাঙাতরা চটে আগুন হোয়ে আছে। ওর ওপোর তাদের অভিযোগ, মালীর বাগে শিকারে নাই বা গেল শশী। কিন্তু যে-লোভনীয় শিকার নিয়ে সে ঘরে ফিরল, তারা ক্যানো বাতিল হোলো তার থেকে।

যাহোক শশীর মাতব্বরী বুদ্ধি রস্ত কোরল ওদের। সে বন্ধুদের নেমন্তন্ন কোরে খাওয়ায়। বাড়ি বাড়ি মাংস বিতরণ কোরে আসে। সে-রাতের পাড়া মাংস আর তাড়ির গন্ধে হোয়ে থাকে মশগুল। সারারাতই চলে হৈ-হুল্লোড়। এবং তা শ্লীলতা বর্জিত। কিন্তু বাড়ির বের হয় না কেউই। সবার মনের কল্পনা রাজ্যে টহল দিয়ে বেড়ায় গোদানোরা। শিংওয়ালা কিম্ভূত-কিমাকার গোদানোরা। যাদের শরীরে ছায়া নেই। পায়ের পাতা পেছন দিকে ফেরানো। ঘরের আনাচে কানাচে রাস্তার মোড়ে মোড়ে দল বেঁধে সব ওৎ পেতে রয়েচে।

পরদিন সকালে তারন যখোন উঠল তখোন রোদের রং একদম পালটে গেছে। কালকের তাড়ির নেশা ছোটে নি। রিমঝিম রং কোরচে মাথার মধ্যে। চোখ লাল। উঠেই কাজে লেগে যায় সে। কাল বাড়ি ফিরে আর মোটেই কাজ হয়নি। না শলা বানানো। না চাঁচ বোনা। কাল ভাগাড় থেকে পেছন লাগা গোদানোরা মনের ভাগাড়ে সারারাত অবাধ বিচরণ কোরেচে। বুকখানা এমনি কুঁচড়ে দিয়েছিলো যার দরুণ উঠোনে বোসে কাজ করার সাহস পায়নি। পেলে অনেকখানি এগোতে পারতো। ঘুমঘোরে শিংওয়ালা গোদানোদের রুখে আসতে দেখেচেও দু-একবার। আতংকে জড়িয়ে ধোরেচে মন্থরাকে। মন্থরার দশাও তথৈবচ। কী ভয় আর কী নেশা দু-দিক থেকেই। বরং মাত্রা ডিঙোনো। তার বিশাল চোখ ঢুল-ঢুল। এখোনো সে-চোখে লাল কাটেনি। তবু তাকেও উঠে কাজে লাগতে হোয়েছে। তারো হাতে মেলা কাজ। চার পাঁচটা বড়ো চামড়া সাফ কোরতে হবে। ছোট

চামড়াও জমেচে গোটা কয়েক। মানে ছাগোলের চামড়া। সবগুলোতে খাড়ি নুন মাখাতে হবে। দিতে হবে রোদে মেলে। উঠোনে চওড়া কাঠের পাট এনে পাতে মন্থরা। তার ওপোর চামড়া বিছোয়। খড়ি নুন জল দিয়ে পরিষ্কার কোরতে লেগে যায়। তারন চাঁচ বুনতে বুনতে জিগ্যেস করে—শশে গেল কোথায় ও বড়ো বউ?

—কী জানি? ওকি বোলে যায়? কোথায় যায়?

—আজ আবার গুলতি বাঁশ নিয়ে বেরোলো নাকি?

—না আ। টেনে টেনে জবাব দেয় মন্থরা।

মানে হাঁড়িতে আজ মাংসর প্রাচুর্য। তাই শিকারে বেরোনোর সম্ভাবনাও কম। মন্থরার টেনে টেনে জবাব দেয়ার এ-অর্থ তারন বুঝতে পারে। কিন্তু প্রাচুর্য যে ওর শিকার প্রবৃত্তি নিবৃত্ত কোরতে পারে এ-বিশ্বাস তারনের নেই। তাই প্রশ্ন করে, দেখো তো গুলতিখানা আছে নাকি?

কাচনির বেড়ার গায় ঝুলোনো থাকে গুলতি বাঁশ। মন্থরা উঁকি মারে। বলে, কই দেখচি নে তো?

—তবে? হারামজাদার কাণ্ড।

—ক্যানো কী দরকার?

—না কিছু না। খানিকটে খেদ মেশানো তারনের জবাবে।

দরকার নিশ্চিত। এখুনি খদ্দের আসবে। মাল সরবরাহ করার ওয়াদা আজ। অন্ততঃ কাউকে কাউকে। তাই জো তুলে দিলে খানিকটে এগিয়ে দিতে পারতো শশী।

—ওগো ভাত দেবো? মন্থরা শুধোয়। কিন্তু জবাব দেয়ার আগেই তারনের পেছনে পায়ের শব্দ। ঘাড় তুলে দেখে,—হিরু বাছাড়। চাঁচের খদ্দের।

—আসুন বাছাড় মশাই।

—আমার চাঁচ কই? ও তারন?

তারন ছুটতে ছুটতে গিয়ে একখানা পিঁড়ি আনে। ভালো কোরে গামছায় মুছে পেতে দেয়। বলে, বসুন, বাছাড় মশাই।

বাছাড় মশাই বসেন না। কেউ-ই বসে না মুচিবাড়ি। একমাত্তর মনু ঠাকুর আর বিপিন সাঁই ছাড়া। গোটা মুচিপাড়ায় অচ্ছুৎ পোকা সব সময় কিলবিল কোরচে। তাকালে গা ঘিনঘিন করে। বমি ওঠে। দরকারের অনিবার্য তাগিদ মানুষকে এখানে টেনে আনে। তাই তেল মেখে ডিঙি মেরে মেরে

আসে তারা। ঝটপট কাজ মিটিয়ে গাঙে ডুব দিয়ে বাড়ি ঢোকে।

—একটু বসুন বাছাড় মশাই। বাছাড় মশাই বোসবেন না জানা সত্ত্বেও অনুরোধ করে তারন। যদি বসেন চরিতার্থ হয়। এমনি তার অনুরোধ ভংগী।

চামড়ার গন্ধ বাড়িময়। নাকে গামছা জড়িয়ে আছেন বাছাড়মশাই। উত্তর করেন, নাঃ! লজ্জা করে না বোস্‌তে বোল্‌তে তোদের? এখানে কি মানুষ আসে? থু-থু!

অপ্রস্তুত হয় তারন! আমতা আমতা কোরে কয়, কী কোরি? কী কোরি বাছাড় মশাই?

—কী কোরি, কী কোরি? ক্যানো? ঘর-বাড়ি সাফ-সাফার রাখা যায় না? আর ওই নোংরা ঘাঁটা তোরা ছাড়তে পারলি নে!

—কী কোরি? পেটের জ্বালায়······

—তবু বলে, পেটের জ্বালায়? আরে বাঁশের কাজে কী কম পয়সা? তাই কর। জন খাট্‌। মেয়েরা ধান কুড়োক। তোদের রোজগারের রাস্তা তো চারধার খোলা। ওই নোংরা না ছান্‌লে আর পেটের জ্বালা জুড়োয় না—না? তা তোদের মাথা খেয়েচে ওই মনু ঠাকুর আর বিপিন সাঁই। বলি আমাদের চাঁচ কই?

—আপনি এখোন যাও বাছাড়মশাই। আমি কাল বিহানে দিয়ে আসবো।

—ঠিক যাবি কিন্তু। খুব সকালে না, বেলা-টেলা হোলে যাস।

বাছাড়মশাই চলে যান। তারন খেতে বসে। তখোনো খাওয়া শেষ হয় নি। মনু ঠাকুর এসে ডাকেন, ও তারন!

—বসুন বট্‌ঠাকুর।

তারন ঘুরে ভাতের শানকিটা আড়াল কোরে বসে। ঘুরে বসার হেতু মাংস-ভাত খাচ্চে সে। কালকের সেই মাংস। মনু ঠাকুর সবি জানেন এবং তারনকে বোল্‌বেনও না কিছু। তবু ভদ্দর লোক। বামুন মানুষ। সংকোচ আসা স্বাভাবিক।

—আমি এলাম। বলি আমার খড়টা কেটে দিচ্চো কবে? ছোট্‌টো পিঁড়িটার ওপোর বসে মনু ঠাকুর জিগ্যেস করেন।

মুচিবাড়ি এসে পিঁড়িতে বসেন একমাত্তর মনু ঠাকুর আর বিপিন সাঁই। অবিশ্যি আগে বোস্‌তেন না। আজ বছর চারেক ধোরে বোস্‌চেন। মনু ঠাকুরের বসার মূলে একটা হেতু আছে। কিন্তু সাঁই মশাই-এর কথা আলাদা। উনি সৃষ্টিছাড়া মানুষ। ও-পাড়ার অভয় মিশি একদিন বাঁশ কিনতে যায়

ঠাকুরবাড়ি। তখোন দুপোর ঝাঁ-ঝাঁ কোরচে। ঠাকুরগিন্নী তাঁর ছ-মেসে ছেলেকে নিয়ে বারান্দায় ঘুমোচ্চেন। ছেলেটা গড়িয়ে পড়ে গেছে নীচেয়। তবু ঘুম ভাঙেনি গিন্নীর। বাচ্চার কান্না শুনে একটা শেয়াল বাগান থেকে বেরিয়ে আসচে। এমন সময় অভয় হাজির। সে ছুটে গিয়ে লোভী শেয়ালের কবল থেকে শিশুকে টেনে তোলে ছোঁয়াছুঁয়ির নিষিদ্ধ আইন ভংগ কোরে। এ-দিন থেকে মনু ঠাকুরের জীবন-দর্শনের এক নোতুন দিক খুলে যায়। সেটা হোচ্চে ছোঁয়াছুঁয়ির গোণ্ডি পেরোনো শুধু তাঁর সন্তানের নয়। সমাজ-জীবনেরও রক্ষাকবচ। তবে এ-প্রভাবের প্রতিফলন পড়েচে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে। পারিবারিক পরিবেশে নয়। সেখানে রাজদরবারে পাহারাওয়ালার মতন টহল দিচ্চে সনাতনীতন্ত্র।

গামছায় মুখ মুচতে মুচতে তারন এসে সামনে দাঁড়ায়। বলে, পেরনাম হই বট্‌ঠাকুর।

—কল্যেণ হোক।

মনু ঠাকুরের ইচ্ছে হয় তারন তাঁর পার ধুলো নিক। পার ধুলো নিয়ে তাঁকে চরিতার্থ করুক সে-উদ্দেশ্যে না। মানে তারন তাঁকে ছুঁক। বট্‌ঠাকুরকে প্রণাম দিয়ে ভুল বশতঃ তারন পার ধুলো নিতে গিয়ে আবার হাত গুটিয়ে এনেচে। এতে প্রতিবাদ করেচেন মনু ঠাকুর। স্বচ্ছন্দে পার ধুলো তুমি নিতে পারো তারন।

জিব কেটে তারন বোলেচে, ও সব্বোনাশ! তা কি হয় বট্‌ঠাকুর! কী পাপে এ-ঘরে এসেচি। বামুনের গা ছুঁয়ে আবার নরকে পড়বো!

মনু ঠাকুর বোঝান তাকে। তার ও-ধারণা ভুল। প্রসংগক্রমে রুইদাসের জীবনকথা শোনান। শোনে সব তারন। কিন্তু যুগ যুগ ধোরে চালু সংস্কারকে ডিঙোতে পারে না।

তারন বলে, আমি যেতাম বট্‌ঠাকুর। কিন্তু অনেকগুলো চাঁচের বায়না ধোরেচি। এ-গুলো সাবাড় কোরে আপনার কাজে হাত দেবো।

—বড়ো দেরি হোয়ে গেল। ফি-বছর পোষ মাসেই খড় কাটা হোয়ে যায় আর এবার মাঘের আধাআধি হোল পেরায়।

—যাক্ বট্‌ঠাকুর। অভয় ওদের নিয়ে গিয়ে পড়বো। আর আপনার কাজ সাবাড় না কোরে কোথাও যাবো না। এবার কি ঘর ছাওয়ার কাজ আছে নাকি বট্‌ঠাকুর?

—আছে না। আটচালা খুপি দিতে হবে। রান্নাঘর, ঢেঁকিশালা উচিয়ে ছাইতে হবে। আর মনে ভাবছি, একখানা নোতুন ঘর বাঁধবো।

—কোন্ পোতায় বট্‌ঠাকুর?

—বড়ো ঘরের পাশেই। উত্তরপোতায়।

—তা মন্দ হবে না। তা হোলে ও-দিকটা একদম আঁট-সাট হোয়ে যাবে।

—সেও বটে। আর ভাবচি, যোগ্যিশ্বরের তো আম পেকেচে। বোঁটা খসতে বাকী। ওকে দিয়ে আর একখানা ঘরের জুত দিয়ে নিই। থাক ওর হাতের আরেকটা চিহ্ন।

—তা ঠিক। কাকার মতন মিস্ত্রী আর হবে না বট্‌ঠাকুর।

তারনের কথাটা মোটেই অতিরঞ্জিত না। বাঁশ-শিল্পী হিসেবে যেমন ওর কৃতিত্ব অনস্বীকার্য তেমনি ঘরামী কি গৃহ-শিল্পীর দিক থেকে যোগ্যিশ্বরের জুড়ি এ-অঞ্চলে নেই। দেখা যায় প্রতিভা অনেক ক্ষেত্রে চলে বংশের ধারা বেয়ে। যোগ্যিশ্বরের বাবা রসময় কি ঠাকুরদাদা তিলক রিশির ঘর ছাওয়ার কথা প্রবাদের মতন-ই আজো পর্যন্ত জনতার মুখে ফিরচে। তিলক নাকি ঘর ছেয়ে দিয়াশলাই ঠুকে দিত চালে! আল্‌গা কুটোগুলো পুড়িয়ে দেয়ার মতলবে। আগুনের সাধ্য হোতো না ওই মজবুত ছাউনির মধ্যে ঢোকবার। রসময়ের কৃতিত্ব অবিশ্যি অতটা অনন্যসুলভ না হলেও ঘর ছেয়ে সে নীচেয় নামতো কুটো ধোরে ঝুলে। যোগ্যিশ্বরের শিল্প-সাধনা এতটা মার্কামারা নয় বটে। তবে তার ছাউনির আয়ুষ্কাল পনেরো-বিশ বছরের গ্যারান্টি।

—যাক্, আমি এখোন উঠি। বাছাড় এসেচিলো ক্যানো তারন?

—ওই যে চাঁচের জন্যি বট্‌ঠাকুর।

—আর কিছু বলে না?

—হুঃ; বলে বৈকি। আপনি আর সাঁই মশাই আমাদের মাথা খেয়ে রেখেচো বট্‌ঠাকুর।

—তাই নাকি? ক্যানো? চাপা হাসি মুখ জিগ্যেস করেন মনু ঠাকুর।

—আমরা নোংরা ঘেঁটি নাকি আপনাদের আস্কারা পেয়ে!

—ও, তা তুমি কিছু বললে না?

—হ্যা—আ। বোললাম, পেটের জ্বালায় না ঘেঁটে কী কোরি বাছাড় মশাই?

—তারপর?

—উনি বলে, তোদের পেটের জ্বালা আর জুড়োবে না। ক্যানো? জন খাট্। বাঁশের কাজ কর। মেয়েরা বিলে ধান কুড়োক। দিব্যি চলে যাবে।

মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে মন্নু ঠাকুর বলেন, এবার এলে বোলো তো তারন, মেয়েরা বিলে ধান কুড়োতে নাই বা গেলো। তার চেয়ে দু-চার বিঘে জমি দেন আমাদের। লাঙল কোরি। আপনাদের মতন আমাদেরো খামারে ধান উঠুক।

তারন আপত্তি করে, না বট্ঠাকুর। জমির কপাল কি আর আমরা কোরে এসেচি? মাটির দরকার নেই। আপনারা পায় রেখো। তাতেই হবে।

তারনরা জানে, মাটির কপাল আলাদা। এ সব ছোটো কপালে তা হয় না। তাই সোনামুখী বিল ওদের শিয়রে থেকেও ওরা তার এক ছটাক জমির মালিক হোতে পারে নি। চায়ও না হোতে। সোনামুখীর ফসলসম্ভার যারা ভোগ কোরচে তারাই করুক। ওরা ঝরে-পড়া ধানগুলো খুট্তে পেলেই সুখী, সন্তুষ্ট।

মন্নু ঠাকুর চলে যান।

পরদিন তারন-শশী দু-বাপ-বেটা চাঁচের বাণ্ডিল ঘাড়ে চলে বাছাড় বাড়ী। উঁচু উঁচু মটকাওয়ালা আটচালা চৌরি ঘর। ঘর সমান উঁচু ধানের গাদি। চার-চারটে গোলা। খামারে ধান মাড়াই হোচ্চে। গোলায় উঠচে। ওরা চাঁচের বাণ্ডিল দু-টো সোজা কোরে বসিয়ে নিজেরা বোসে পড়ে।

তারন ডাকে—বাছাড় মশাই?

ছোটো ছেলেটা কোলে বাছাড় মশাই ভেতর থেকে বেরিয়ে আসেন।

—চাঁচ এনোচো তারন? মাপো তো।

চাঁচ পেতে ফেলে মাপে ভজিয়ে দেয় তারন।

ছেলেটা কোলে থাকতে চায় না। হামা দিয়ে বেড়াবে। বাছাড়মশাই ছেড়ে দেন তাকে। সে মুক্তোর মতন চকচকে কচি দাঁত মেলিয়ে হামা দিয়ে যায় শশীর ধারে। বাছাড়মশায়ের বিধবা শালী ভেতর থেকে ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে আসেন। চেঁচিয়ে ওঠেন, ওরে ছুঁয়ে দিলে! ছুঁয়ে দিলে! সর সর। এই কানা ছোঁড়া দেখতে পাচ্চিস নে?

ধমক খেয়ে পিছিয়ে যায় শশী।

এবার বাছাড় মশায়ের ঘাড়ে চাপেন বিধবা শালী, তোমারি বা কাণ্ডজ্ঞানটা কী? ছেলেটা ছেড়ে দিয়ে রগড় দেখচো? না? তিন-চারদিন সর্দিতে

হাসফাস কোরচে। চান কোরবে না। ছুঁয়ে ফেললে কী উপায় হোতো? হাড়ি-মুচি নিয়ে রাতদিন তোমার হাট-ঘাট। বোলতে বোলতে আর একবার মুখ ঝামটা দিয়ে একপিঠ এলো চুল দুলিয়ে চলে যান। তারনও বকতে থাকে শশীকে। বাছাড়মশাই বলেন, বুঝলি তারন, ভদ্দর লোক বাড়ি বুঝে-সুঝে উঠতে বোসতে হয়। ছেলেকে শিখ্যে দিস।

—আমি শিখ্যে দেয় বাছাড় মশাই। গুয়োটার ছেলে যে শোনে না।

খুদে মাতব্বর শশী যেন বেয়াকুব বনে গিয়েচে। চিরচলিত প্রথা সম্পর্কে হুঁশিয়ারী না থেকে বুঝি অন্যায়-ই কোরে ফেলেচে সে। শিশুকে ধারে-কাছে আসতে দেখে, ওর উচিত ছিলো বাড়ির ত্রিসীমানা পেরিয়ে যাওয়া।

তারনরা চলে যাওয়ার পিট পিট বাছাড়মশায়ের শালী আসেন তুলসী জল নিয়ে এবং চাঁচে, উঠোনে এমন কি রাস্তা পর্যন্ত ছিটিয়ে দেন।

বিপিন সাঁই পণ্ডিত হিসেবে যেমন নামকরা তেমনি কি তার চেয়েও বরং বেশী নামী কাঠের মিস্ত্রি হিসেবে। নকৃশা করা দরজা-জানালা বানানোয়, শাল-কাঁঠাল কাঠের বাক্সো গড়ায় হাত তার নিখুঁত। সেকালের পিরামিডের মতন-ই মাত্তর একখানি কাঠ কুঁদে একটা দেব-মূর্তি রচনা তার অনবদ্য শিল্প কুশলী সৃষ্টির প্রতিশ্রুতি। নুরপুরের দখ্যিণ সীমান্তে বুড়ি ভদ্দরের ধারে ছোট্‌টো খোড়ো ঘরখানা সাঁই পণ্ডিতের। নিজের গড়া ঘর। কাচনির বেড়া দেওয়াও তাঁরি হাতে। নিজের মুঠোয় বাইশ ধোরে, নিন্‌-মুগুর চালিয়ে বানানো দরজা-জানালা। সাদাসিদে ফার্নিচার,—একটা ছোটো টেবিল, খান কয়েক চেয়ার-বেঞ্চি। একটা সিগারেট ভদ্দরভাবে যতটুকু সময় টানা চলে ঠিক ততোটুকু-ই তফাতে গোলপাতার ছাওয়া একখানা দো-চালা বাংলা ঘর। উটের পিঠের মতন কুঁজো মটকাওয়ালা। সাঁই পণ্ডিতের পাঠশালা। বর্তমান ওটা এল-পি স্কুল। সাঁই মশাই-এর সাম্প্রতিক ইচ্ছে এটাকে আপার প্রাইমারীতে নিয়ে যাওয়া। তাই দ্বিতীয় মান পাশ করা ছাত্তরদের ছেড়ে দেন নি এবার। নিজের খরচায় কাঠ কিনে দুটো বেঞ্চি বানিয়ে দিয়েচেন তাদের জন্য। এই পাঠশালা অন্ত জীবন সাঁই পণ্ডিতের। কি সকাল কি বিকেল। সকালে পাতা লেখান। অংক কষান। ডাক পড়ান। আর বিকেলে নেন বই-এর পড়া। শনিবার হাফ ইস্কুল। মানে একবেলা। এদিন চলে পুরানো পড়ার ঝালাই। আর এরি ফাঁকে নিন-মুগুর-র‍্যাঁদা চালিয়ে করেন কাঠ-শিল্প চর্চা।

সাঁই পণ্ডিতের মনটা আজ ভালো নেই। তিনি ইস্কুলে আসেন। ছাত্তরা উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার দেয়। সর্দার পোড়ো তারাপদ তার দৈনন্দিন কর্তব্য মাফিক পণ্ডিতের সামনে এসে যোড়হাতে দাঁড়ায় এবং নালিশ জানায়। পণ্ডিত মশাই, যোগিন্দর আড়ার ওপোর উঠে ঘোড়া ছুটোচ্ছিলো। আমার মানা শোনেনি।

অন্যমনস্ক পণ্ডিত প্রশ্ন্ন করেন, তারপর?

—বেলাত আলি বিষ্টুর মোস্তা কেড়ে নিয়েচে। এবারো ওর চুল ধোরে টেনেচে। আমি বোললাম, নালিশ কোরে দেবো পণ্ডিত মশাই এলে। ও বোললে, নালিশ কোরলে হালিশ খাওয়াবো।

পণ্ডিত মশাই সাড়া দেন না। মাথা ঝাঁকান। অন্যদিন এক নম্বর আর্জি পেশ করার সাথে সাথেই আসামীর ডাক পড়ে এবং শুরু হয় জরুরি বিচার। অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে সায়েস্তা করা হয় বেত মারা। একবাড়ি-দুবাড়ি কি তিনবাড়ি। অথবা কানধরা অবস্থায় বেঞ্চির ওপোর নীল ডাউন।

একবার এদিক-ওদিক তাকিয়ে নিয়ে সাঁই মশাই জিগ্যেস করেন, সর্দার পোড়োকে, এই তারাপদ সতে আসেনি?

—নাতো।

—কালকেও তো আসে নি? তাই না?

—হ্যাঁ। তারাপদ বলে।

মনের ওপোর ফুটে থাকা সন্দেহের কাঁটাখানা খচ্‌খচ্‌ কোরে ওঠে। মাসখানেক মাত্তর এসেচে সতীশ এ-পাঠশালায়। এরি ফাঁকে মোড়ল-মাতব্বরের মধ্যে চাপা গুঞ্জন উঠচে। ওর অনুপস্থিতি কি ঐ-গুঞ্জনেরি প্রতিক্রিয়া? কিন্তু ময়নার খবর কী? ওর ভাড়ানী মা ময়না? রোজ সকালে সে পশ্চিমপাড়ায় যায় ধান ভানতে। আগে আগে চলে পেট ডাগর ছেলেটা। গলায় ঝুলচে কালো কারে গাঁথা ডজনখানেক মাদুলি। কোনোটা লোহার। কোনোটা তামার। তিন ধাতুর, আট ধাতুর-ও বা কোনো কোনোটা। কোমরে লাল ঘুন্‌সী। হাতেও তেমনি লাল সুতোয় জড়ানো একটা ফুটো কড়ি। একটা রূপোর যশম। আর খান দুই গাছের শেকড়। নেহাল ফকিরের দেওয়া। তড়কা-পালাজ্বরের দাওয়াই। বেজায় টরটরে ছেলে। পাখির মতন বুলি কপ্‌চাতে কপ্‌চাতে হাঁটে। ইস্কুলের ধারে এসে ঢিলটান পড়ে ওর হাঁটনায়। নামিয়ে নামিয়ে পোড়োরা শত্‌কে পড়ে। ও শোনে। ময়না ওর গা ঠ্যালা

গ্যায়। বলে, তা হাঁট।

বিকেলে ফেরে ময়না। তেমনি আগে আগে চলেচে ছেলেটা। মাথায় একটা পুঁটলি। ওতে তুষ-কুঁড়ো। আবার থেমে যায় পাঠশালার দোর গোড়ায়। পোড়োরা তখোন ছড়া পড়ে :

কালো জল, শাদা ফুল,
গাছের ফল, গাঙের কূল।

শিশুর পা চলে না। ময়না ঠ্যালা গ্যায়। টেনে টেনে বলে, ও-রে-তা হাঁট। বেলা গেলো যে।

একদিন সকালবেলায় সাঁই পণ্ডিত ছাত্তরের একটা আঁক কষতে দিয়ে কেবল মাত্তর হাজিরা বই খুলেচেন। এমন সময় কানে আসে :

একের পিটে শূন্য দিলে দশ হয়,
দশের শূন্য নামে হাতে এক রয়।
একের পিঠে এক দিলে এগারো হয়,
এগারোর এক নামে······

চকিত চোখ চান বিপিন পণ্ডিত। দেখেন টরটরে ছেলেটা মায়ের আগে হেঁটেচে নামিয়ে নামিয়ে শত্‌কে পড়তে পড়তে। পণ্ডিতের চোখে চোখ ঠেকতেই থেমে যায় সে। ইস্‌কুল পেরিয়ে আবার শুরু হয় পড়া :

এগারোর এক নামে হাতে এক রয়।
একের পিঠে দুই দিলে বার হয়,
বারোর দুই নামে হাতে এক রয়।

অবাক হোয়ে শোনেন সাঁই মশাই। এর পরের দিনের ঘটনা। ময়না বাড়ি ফিরচে ছেলেকে আগে কোরে। ওর মাথায় তেমনি তুষ-কুঁড়োর পুঁটলি। আর মুখে কালো জলের ছড়া তরতর কোরে নেয়ে বেয়ে চলচে। শাদা ফুলের খই ফুটচে। খুশীতে ফল-শীষ দুলচে পল্লবে। গাঙ কূল হোয়ে উঠেচে ঢেউ মুখর। বনের পাখির কাকলির মতন ছাড়া পাওয়া ঐ শিশুর মুখের ছড়া সচিত্র সজীব হোয়ে উঠেচে। বিস্ময়-বিমুগ্ধ হোয়ে যান বিপিন পণ্ডিত। তাঁর পণ্ডিতী মনের দরজা খুলে যায়। দেখেন অনাবাদী জমির মতন ওর পতিত মগজের মাটিতে প্রচুর ফসল ফলবে। যদি নাকি বিধিবদ্ধ প্রণালী দিয়ে চাষ-কারকিত বীজ বোনা যায়। এই বুদ্ধি-বৃত্তি নিয়ে সাঁই মশাই ধরেন গিয়ে ওর মাকে।

সতীশ-কে ইস্কুলে পাঠাও। মা প্রথমটা মোটেই রাজি হয় না। বলে, ইস্কুলে গেলে ও বাঁচবে না। কেন না ওরা থাকে ইল্লত-অনাচারের মধ্যে। লেখাপড়ার পবিত্র ছোঁয়াচ সইবে না ওদের। সাঁই পণ্ডিত কিন্তু না-ছোড়-বান্দা। কারণ তিনি বাস্তবধর্মী। মনু ঠাকুরের মতন ভাববাদী নন। তাঁর মুচিপাড়ায় আনাগোনার মানে ওদের বে-হিসেবী বিশৃংখল সমাজকে শৃংখলার চেতনাবোধ দিতে। মনু ঠাকুরের চেতনা ব্যক্তিকেন্দ্রিক। অচ্ছুৎ এ-সমাজকে আর যে-চোখে গ্যাখে দেখুক। তিনি এর মধ্যে তলিয়ে যেতে চান। এ-ধরণের চেতনা আবেগ সাপেক্ষ্য। তার সাঁই পণ্ডিতের চেতনা সমাজকেন্দ্রিক। সব রকম ভাবাবেগকে তফাৎ রেখে নির্জলা বিজ্ঞান ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা দিয়ে, নিতে চান সার্বিক অধিকার। যা হোক অনেক বোঝানোর পর ওর মা রাজি হয়। সতীশের বই-দপ্তর, কাগজ-কলম মায় জামা-কাপড় পর্যন্তর ভার ঘাড়ে নেন সাঁই পণ্ডিত।

এহেন পাওয়া সতীশকে পরপর দু-দিন অনুপস্থিত দেখার পর কী কোরে সাঁই পণ্ডিতের মন ভালো থাকে? ছুটির পর সোজা চলে যান তিনি ওদের বাড়ী। উঠোনে পা দিয়েই গ্যাখেন খেজুর পাতার পাটির ওপোর সতীশ শুয়ে। শিথেনে বোসে ওর মা।

—কী হোয়েচে?

—অসুখ কোরেচে। ময়না বলে।

—কবে? পাশে বোসে নাড়ী টেপেন সাঁই মশাই।

ময়না বলে,—আজ দু-দিন। কাল তো চৌপর রাত ঘুমোয় নি। কেবল আতাড়ি-বাতাড়ি কোরেচে বিছেনায়। আর ভুল বকেচে।

—এখোনো জ্বর ছাড়ে নি। ভয় নেই। দেখাচ্চো কাউকে?

—নেহাল ফকির কে। এই মোত্তর নিয়ে এলাম ব্যবস্থা।

এবার ব্যবস্থা-পত্তরগুলোর ওপোর নজর পড়ে বিপিন পণ্ডিতের। সতীশের শিথেনে রাখা এক ঘট জল। মালায় শরষের তেল। পড়া জল। পড়া তেল। ঐ-পড়া জল খাবে। আর ঐ-পড়া তেল মেখে এঁদো পুকুর থেকে একশো আটটা ডুব দিয়ে আসবে। আর পথ্য হবে; সাজো দই-পরগুদো-ভাত। মানে সন্ত পাতা দই আর সন্ত রাঁধা জল দেওয়া ভাত।

সাঁই মশাই জিগ্যেস করেন, হাজারি ডাক্তারের ওষুধ-এনে দেবো? তাড়া-তাড়ি জ্বর সেরে যাবে।

আকাশ থেকে পড়ে ময়না, ডাক্তারী ওষুধ! সে কী! না, না, না। এই যে ওষুধ দিয়েচে ফকির। বোলতে বোলতে আঁচোলের মুড়ো খুলে এক রকম লাল বড়ি বের কোরে দেখায়।

একখানা শিলের ওপোর ভাটি পাতা, শালতে মাদারের ছাল আর বুড়ি পান। দেখে অনুমানেই বোঝেন সাঁই মশাই, নেহাল ফকিরের দাওয়াই-এর অনুপান ও-গুলো।

নেহাল ফকিরের একচেটে পসার মুচিপাড়ায়। যদিও ঝাঁপার বিশ্বনাথ এ-ডাক সাইটে এর থেকেও নামজাদা এবং বাকসিদ্ধ ফকির। এর কারণ কোনো হিঁদু ফকির মুচি চিকিচ্চে করে না। মুচিবাড়ি এলে গোবরছড়া কি তুলসীজল ছিটোতে হয়। এ-ঝামেলা কে পোহায়—বারবার? তারপর জলপড়া ফকিরদের আবশ্যিক পুঁজি। সুতরাং মুচির জলের ঘটের পাশে অন্যের ঘট রাখা মানেই সে জলের জাত মেরে নেয়া। কে চায় ওই জাতমারা জল খেয়ে শ্রেণী-সত্তার বিলোপ ঘটাতে? অতএব ছোঁওয়া-ছুঁয়িকে এড়িয়ে চলাই নির্ভেজালের কাজ। কিন্তু আশ্চর্য! বাংলার বাইরে গেলে বাঙালীতে-বাঙালীতে শ্রেণী বৈষম্যের প্রশ্‌ন-ও যেমন বাইরে চলে যায় তেমনি অনিবার্য দরকারের তাগিদ এলে সর্বধর্মের সমন্বয় দেখি মুছলমান ফকিরের থানঘরে। মানে ডিস্‌পেনসারিতে।

নেহাল ফকির হোচ্চেন মাদারডাঙার গোলাম আলির শিষ্য। তিনিও সিদ্ধ পুরুষ। জেন্‌ চালান দেন। তাঁর চামড়ার দলে শয়তান বাঁধা। যদি কোনো হিঁদু রোগীর ঘাড়ে জেন কি শয়তান ভর করে তখোন নেহাল ফকির কি গোলাম আলির শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া বিকল্প পথ নেই এবং যে চামড়া কাটার দরুণ মুচিদের ছায়া ডিঙোনো পর্যন্ত নিষিদ্ধ, ফকির ছায়েবরা তখোন ওই চামড়ার দল দিয়েই বর্ণ-হিঁদু রোগীদের ঝাড়ান। মানে রীতিমত চাব্‌কে দেন এবং তাতেও যদি শয়তান না ছাড়ে, তখোন ওই চামড়ার দল মুখে কোরে নিতে হয় রোগীকে। গোলাম আলি ফকিরের পানি পড়াও আশ্চর্য। শোনা যায়, এঁর নানা খোদার কুল-কালাম পড়ে ফুঁ দিতেই দাউ দাউ কোরে আগুন জ্বলে উঠতো ঘটের পানিতে। গোলাম আলির পড়া পানি অতটা জোরালো না হোলেও সেই ধারে কেটে আসচে। তাই সে-পানির জাত যায় না। কায়েত-বামুনের ঘটের সারে মুচির ঘট অপাংক্তেয় নয়।

গোলাম আলির 'নানা'র আমলে রমজান মাসে বিরাট মেলা বোসতো

ফকির বাড়ির থানঘরের সামনে। বহু দূর-দূরান্তরের লোক সমাগম হোতো। কোনো জাতের ধর্মের জিগ্যেসা ছিলো না এখানে। ঈদ-উৎসবের দিন দেওয়া হোতো মস্ত বড়ো ম্যাজমান্। ফকির মিচ্‌কিনদের অবারিত আনাগোনা ছিলো খয়রাতী দোরগোড়ায়। ফকিরবাড়ির সামনে শান বাঁধানো প্রকাণ্ড দীঘি। ভোজপর্বের আগের দিন ফকির-ফকিরনী শুদ্ধাচারে ঘাটে এসে জল-পীরকে জানান্ দিতেন। পরদিন সকালে দেখা যেতো সিঁড়ির ওপোর বড়ো বড়ো ডেগ-কড়াই-হাতা-বেড়ি প্রভৃতি রান্নার সরঞ্জাম। সে-সাথে একঘড়া সোনার মোহর। খাওয়া-দাওয়া মিটে গেলে ওইসব বাসন-কোসন তক্‌তকে ঝক্‌ঝকে করে মেজে ঘসে রাতের আঁধারে রেখে আসা হোতো শানের ঘাটে। নিশুত রাতে জলপীর এসে নাকি নিয়ে যেতেন দীঘির পশ্চিমপাড়ে পীরের দরগা। গ্রাম-গ্রামান্তরের লোকরা আসে এখানে হাজত দিতে। খাসী-মুরগী আনে। আনে চাল-ডাল, কাঠ-পাতা। সারি সারি আকা কাটা হয়। যে মুচিদের ধোপা-নাপিত নেই, হাট-ঘাট এমন কি শ্মশান পর্যন্ত আলাদা, তারাও বিধর্মী গোলাম আলি ফকিরের দরগায় মানত দিতে এসে পাশাপাশি রান্না-খাওয়ার অনুমোদন পায়।

পরদিন ইস্‌কুলের ছুটির পর সাঁই মশাই সরাসরি গিয়ে পৌছন সতীশদের বাড়ি। ময়না তখোন কতকগুলো লতা-পাতা বাটচে। পণ্ডিতকে দেখে তাড়াতাড়ি উঠে যায় এবং একটা তালপাতার 'চাটকোল' এনে দেয় বোসতে।

—কেমন আছে? বোলতে বোলতে সাঁই পণ্ডিত সতীশের বিছানার পাশে বোসে পড়েন এবং হাতটা টেনে নিয়ে নাড়ী পরীখ্যে কোরতে থাকেন, ও কী বাটচো?

—বায়ডলনের পাতা। মথম বানিয়ে মাথায় দিতে বোলেচে ফকির। ময়না বলে।

—তাই তো, কিন্তু আজকে যে জ্বর বেড়েচে। সর্দিটাও বেশি দেখচি।

—কিন্তু ফকির বোললে ও—গরমের জ্বর। ঠাণ্ডা কোরলে সেরে যাবে।

সাঁই পণ্ডিতের মন সায় দেয় না। সতীশের নাড়ীর অবস্থা গেল দিনের থেকে খারাপ। যেমন জ্বর তেমনি সর্দি-কাশি। এরপর এঁদো পুকুরে একশো আট ডুব! পথ্য—পান্তাভাত দই! আর মাথায় মথম! এতো খাল কেটে নোনা জল ঢোকানো। মানে নিমোনিয়াকে ডেকে আনা।

—আর নয় তো হাজারির ওষুধ এনে দিই ? কী বলো ?

শিউরে ওঠে ময়নার বুক। সে রাজি হয় না। বলে, না, না। ডাক্তারী ওষুধে অসুখ সারে না। ফকিরে মত্তে আছে। যা করে বাবা পাগল।

চিন্তিত সাঁই পণ্ডিতের মুখে চাপা হাসি। ময়না প্রতিবাদ করে, হাসচো আপনি! সে-বার কেউ বলে নি ও বাঁচবে। কান্না-কাটা পড়ে গেচিলো। তখোন মোটে এক বছর বয়েস ওর। ঠাকুর বললে, সরকারী ডাক্তারখানায় নিয়ে যাও। সুঁই ফুঁড়ে দিলে যদি বাঁচে। তা'ও তো নেহাল ফকির ভালো কোরলো।

—কী হোয়েছিলো সেবার ?

—'পরঘাট' কোরেছিলো। ময়না বলে।

'পরঘাট' সম্পর্কে সাঁই পণ্ডিতের আস্থা মোটেই নেই। কেন না কারণের সাথে কার্যের সামঞ্জস্যর একদম অভাব। মৃতবৎসারা মানে যাদের সন্তান হোয়ে বাঁচে না, তারাই করে 'পরঘাট'। শনি-মংগলবারে অন্য শিশুর বুক-পিঠের ময়লা তুলে নেয়। আর নেয় মাথার চুল কেটে। তারপর আরেক শনি-মংগলবার দেখে মাতুলী পুরে ধারণ করে। তার ফলে সাথে সাথেই ওই শিশুর জ্বর-বিকার হোয়ে মারা যায়। আর মৃতবৎসা হয় সন্তানবতী। দশ-পনেরো বছর বয়েস পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের ওপোর এ-মায়ণবিদ্যা প্রয়োগ করা চলে। মাথার কি বুক-পিঠের ময়লা ছাড়াও কাপড়ের কোণা কেটেও মাতুলি পোরা হয় এবং তারও ফলশ্রুতি ওই একই। এমনি ধারা 'পরঘাট' কোরে শিশু-নিধন মুচিপাড়ায় হামেশা-ই ঘটচে।

—ও-ও! পরঘাট! তবে ছাখো দু-চারদিন। কিন্তু পড়াশুনোর খেতি হোচ্চে ওর।

পড়াশুনোর ক্ষতির দিকে তেমন নজর দেয় না ময়না। বলে, জীবনে বাঁচে তো হবে। আর না হয় না হবে।

সাঁই পণ্ডিত এবার প্রতিবাদ করেন না। কেন না পাকা বাঁশ নোয়াতে গেলে ভেঙেই যায়। বহু যুগ থেকে কু-সংস্কার দখল কোরে আছে ওদের সমাজকে। তারই মধ্যে থেকে জবর দখল কোরে আনতে হোয়েচে সতীশকে। এখোন ময়না যদি বোলে বসে, ইস্‌কুলের ছোঁয়াচ ওর ধাতে সয় নি। তাতেই অসুখ কোরেচে। তা হোলেই তো হেথ্ যা! সাঁই পণ্ডিত চুপ কোরে যান।

ময়না মন্তব্য করে, ওঃ! সেবার কী জ্বর! গায় ধান ছোঁয়ালে খই হোয়ে

যেতো! বোলতে বোলতে সতীশের মাথায় মথম দিয়ে ছায়।

সাঁই পণ্ডিত বলেন, কিন্তু থান ছোঁয়ালে ওর গায় এখোনো খই ফোটে, ময়না। তুমি ফকিরকে বোলো ব্যবস্থা পালটে দিতে।

ময়না মন্তব্য করে, যা করে বাবা পাগোল! থুইচি তার পায় ঠেলে।

আসবার সময় দোকান থেকে কিছু বিস্‌কুট-মিছরি এনেছিলেন পণ্ডিত-মশাই। এখোন পকেট থেকে সে-গুলো বের কোরে সতীশের হাতে দেন, খা।

বিস্‌কুট-মিছরি পেয়ে মহা খুশী সতীশ। অপূর্ব এ-সামগ্রী জুটো এই ওর জীবনে প্রথম খেলো।

রাতের দিকে জ্বর বেড়ে যায় সতীশের। সারা রাত সে নিজেও ঘুমোয় না; ঘুমোতে দেয় না ওর মাকেও। সকালে ময়না যায় নেহাল ফকিরের থানঘরে। জমজমে থানঘর। সব রকমের রোগী। ম্যালেরিয়া-কালাজ্বর-পীলেজ্বর, একঘেয়ে জ্বর, দো-সতীনে জ্বর। এসেচে ডাইনে পাওয়া, পেঁচোয় পাওয়া, বাতাস লাগা, ভূত-পেত্‌নী-জেন্‌ লাগা রোগীরা। ভীড় বেশি কিন্তু রোগিনীদের।

ময়না ফকির ছায়েবের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। জলের ঘটিটা রাখে।

—কেমন আছে? ফকির ছায়েব জিগ্যেস করেন।

—বড্ডো বেড়েচে। যেমন জ্বর তেমনি কাশি। বুকের মধ্যি ঘড়ঘড় কোরচে। সারা রাত মোটেই ঘুমোয় নি। ময়না বলে।

ফকির ছায়েব চোখ বুজিয়ে থাকেন একটু সময়। তারপর মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে মন্তব্য রাখেন, কুপথ্য কোরেচে যে।

ময়না প্রতিবাদ করে, কই? না তো বাবা। কিছুই কু-পথ্যি করেনি।

প্রতিবাদের প্রতিবাদ রাখেন নেহাল ফকির, আমি দেখচি যে। কুপথ্য না কোরলে অসুখ বাড়ে কখোনো?

নরম কেটে যায় ময়না। ফকির ছায়েবও তার দুর্বল মনের সুযোগ নেন, ওই যে আমি দেখচি, কুপথ্য কোরেচে। কী খেয়েচে? মাংস? না?

বিনা পয়সার মাংস রিশি পুরুদের বরাতে প্রায়ই জোটে এবং অসুখ-বিসুখকে অগ্রাহ্য কোরে উপস্থিত এ দাঁউ ছাড়ে না। সবার জানা এ তথ্যের ওপোর ভিত্তি উপস্থাপন কোরেই ফকির ছায়েব এ জোর বক্তব্য পেশ করেন। কিন্তু অনুমান অনেক সময়ই অনুমানের গণ্ডি ডিঙোতে পারে না। এক্ষেত্রে তাই ঘটল।

ময়না বলে, মাংস! না, বাবা। বিস্‌কুট মিছিরি খেয়েচিলো।

আকাশ থেকে পড়েন ফকির ছায়েব, বিস্কুট মিছরি! সব্বোনাশ! তা হোলে আর মাংসর বাকি থাকলো কী? আরে ঐ তো মাংস দিয়ে বানানো।

তার মানে ফকির ছায়েব প্রতিপন্ন কোরতে চান, তাঁর ভবিষ্যৎবাণী অকাট্য। মাংস আর বিস্কুট মিছরি অভিন্ন পদার্থ।

দম ভরে মন্তর পড়ে, ঘটিতে জোর ফুঁ দেন ফকির ছায়েব। বলেন, নিয়ে যাও। রোজ তিনবার কোরে খেতে দেবে এ-পানি। আর পথ্য কেবল বিস্কুট মিছরি। আর এঁদো পুকুরে একশো ডুব। যাও। তিনদিন পরে আবার ব্যবস্থা নিয়ে যাবে।

কিন্তু তিনদিন আর যেতে পায় না। সতীশের অবস্থা খারাপের দিকেই চলে। বেগতিক দেখে নেহাল ফকির ময়নাকে পাঠিয়ে দেন মাদারডাঙায়। তাঁর ওস্তাদজী গোলাম আলি ফকিরের কাছে।

গোলাম আলির থানঘর আরো জমজমে। ময়না পৌঁছে ছাথে ফকির ছায়েব তখোন একজন রোগীকে নিয়ে ব্যস্ত। রোগীর অবস্থা কাহিল। তাই গোরুর গাড়ী কোরে আনতে হোয়েচে। সাথে এসেচে তার মা। ফকিরের ব্যবস্থা ছিলো দুধ গুড় ভাত। আর তিনবার কোরে কাঁচাজলে স্নান। স্নানের বেলায় অবিশ্যি গাফিলতি হয়নি তার। কিন্তু একঘেয়ে দুধ গুড়ে অরুচি হওয়ায় একটু মুরগির মাংস খেয়েচিলো। তারই ফলে অসুখ বেড়ে গেছে এবং অন্তর্যামী ফকিরও তা ধোরে ফেলেচেন। তাই চোটপাট কোরচেন, কেন তাঁর নির্দেশ লংঘন করা হোয়েচে? রোগীর হোয়ে তার মা ফকিরের হাত-পা ধোরে বারবার এ ঘাট স্বীকার কোরচে। শেষ পর্যন্ত ফকির ছায়েব রায় দেন, সাতদিন কেবলমাত্তর মুরগির গোস্ত ভাত খাবে। আর তিনবারের পরিবর্তে ছবার ডুববে পুকুর ঘাটে। এ প্রসঙ্গে কেন্দ্র কোরে সমাগত রোগী মহলে গোলাম আলির লোকাতীত কীর্তি-কাহিনী সম্পর্কে অনেক কিছু বলাবলি হোচ্চে। ঘটনাস্থল কেশবপুর মুচিপাড়া। রোগী—শিশুবর রিশি। রোগ,—রাতদিন সব সময় গা জ্বালা। ফকির ব্যবস্থা দিলেন, ঝাল ভাজা খেতে হবে। আর গায় মাখতে হবে ঝালবাটা। তাই কোরে শিশুবরের জলুনির অবসান ঘটে। কিছুদিন বাদে ওর পাশের বাড়ির মানিক রিশি আক্রান্ত হয় অনুরূপ জলুনি রোগে। সে তখোন শিশুবরের নির্দেশ মতে ঝাল ভাজা খায়। আর গায়ও মাখে ঝাল বাটা। আর যাবে কোথায়? জ্বালা বেড়ে যায়। কাটা পাটার মত ছটফট্ কোরতে থাকে মানিক এবং গোলাম আলির পায়ে ধর্ণা দেয়। সব ঘটনা খুলে বলে। মুচকে

হেসে দাড়ি নাড়ান ফকির এবং ব্যবস্থা দেন, পনেরো দিন একটানা ঝাল ভাজা খাবি। আর গায় মাখবি ঝাল বাটা। এবার আর শুকনো ঝাল না। কাঁচা আকাশ লংকা। আশ্চর্য! বাড়ী ফিরে মানিক গা ভরে ঝাল বাটা মাখল। লাল টুকটুকে ঝাল। মনে হোলো, সে বুঝি রক্ত চন্দন লেপে দিয়েচে সারা গায়।

ফাঁক বুঝে ফকির ছায়েবের ধারে এগিয়ে যায় ময়না। সতীশের অসুখের কথা জানান্ ছায় এবং আরো জানায়, তাঁর শিষ্য নেহাল ফকিরের নির্দেশেই এসেচে সে। ফকির ছায়েবের উদার চোখ গিয়ে ঠ্যাকে ময়নার পটোল চেরা চোখে। তিনি জোর ফুঁ দিয়ে দেন ওর ঘটির জলে। পড়ে দেন সরষের তেল। দেন প্রাথমিক ব্যবস্থা,—দুধ গুড় ভাত, কাঁচা জলে স্নান। ঢিপ কোরে পায়ের গোড়ায় মাথা ঠেকিয়ে ময়না বাড়ী ফেরে।

কিন্তু তুলসীতলায় নামানো রোগী পর্যন্ত ফিরিয়ে আনেন যে—গোলাম আলি ফকির, আজ তিনদিন পর্যন্ত দেখেও সতীশের অসুখ কমাতে পারচেন না তিনি। বরং বেড়েই চলেচে। জ্বর অবিচ্ছেদী। গলার মধ্যে ঘড়ঘড়ানি। বুক-পিঠ ব্যথা। দম নিতে প্রাণ বেরিয়ে যায়। কাশতে কাশতে হার্টফেল করে বুঝি। পাড়ার বড়ো কেউ একটা এ ধারে ঘেষে না। একমাত্তর তারন—যোগিশ্বর ছাড়া। তাও হয় তো বা দিন অন্তর একবার আসে। উঠোনে দাঁড়িয়ে উঁকি-ঝুঁকি মেরে যায়। ওকালতি কোরে যায় ফকিরে চিকিচ্চের স-পথ্যে। হুঁশিয়ার থাকতে বলে সাঁই পণ্ডিতের ডাক্তারী দাওয়াই সম্পর্কে।

সাঁই পণ্ডিতের আসা অবিশ্যি কামাই নেই। রোজ একবার কোরে এসে দেখে যান তিনি। কিন্তু করার কিছু নেই তাঁর। কেননা তাঁর আসা-যাওয়াকে ময়না সন্দেহের চোখে ছাখে। পাছে আবার তিনি ডাক্তারী ওষুধের প্রস্তাব করেন। পাছে আবার পকেটে কোরে বিস্কুট মিছরি এনে সতীশের হাতে দেন। তাঁর দেওয়া বিস্কুট মিছরি খেয়েই যে সতীশের অসুখ বেড়ে গেছে একথা ময়নার মুখে শোনার পর একদিন বিস্কুট মিছরি এনেও সাঁই মশাই আবার ফিরিয়ে নিয়ে গেছেন। ব্যথাক্রান্ত মন সতীশকে দেওয়ার সাহস পায় নি।

সন্ধ্যের আগে আজো একবার সাঁই পণ্ডিত এসে দেখে যান। কিন্তু সন্ধ্যের পর সতীশের জ্বর যায় বেড়ে। বেহুঁস হোয়ে পড়ে সে। কাত্রাতে থাকে। ঘোরালো হোয়ে ওঠে বুকের ঘড়ঘড়ানি। চঞ্চল হোয়ে ওঠে অসহায় ময়না। পাশেই ওর সতীন ছেলেদের বাড়ী। এক উঠোন বোলতেই হয়। কিন্তু একটা

মাটির পাঁচিলের মাধ্যমে এক বাড়ী হোয়েচে দু বাড়ী। ছেদ পড়েচে সব রকম সুবাদ সম্পর্ক। কারণ একটা ছিলো বৈকি এর।

হঠাৎ কানাই-এর বৌ মারা যায়। বড়ো ছেলে পুন্ন্যি তখোন পুরো জোয়ান। তিন সন্তানের বাবা। মেঝো-ছোটো হাজরা বসারও সোমত্ত বৌ-ঘরে। এমন অবস্থায় একদিন কানাঘুসো ওঠে, কানাই আবার বিয়ে কোরচে। বিয়ে নয় নিকে। একথা শুনে পুন্ন্যি একদম তাতাল খাঁ হোয়ে ওঠে। পাড়ার মুরুব্বিদের কাছে গিয়ে নালিশ জানায়, বাবা যদি নিকে করে, তাহলে বাড়ী ছাড়বে সে। বুড়ো বয়েসে তার এ ঘোড়া রোগ ক্যানো? বয়েসের দিক থেকে কানাই সাড়ে পাঁচের কোঠায় পৌঁছেচে অবিশ্যি। কিন্তু শরীর তার মজবুত। ঋজু শিরদাঁড়া। তাগড়া জোয়ানদেরো হিমসিম খেতে হয় তাকে কাবু কোরতে। তারপর শিল্পী মানুষ কানাই। উত্তরসাধিকা নইলে তার শিল্পসাধনা ব্যাহত হয়। এ অপমৃত্যু বরদাস্ত কোরতে পারে না সে। সোজাসুজি ময়নাকে নিয়ে ঘরে এসে ওঠে একাদন। পুন্ন্যি তখোন বাড়ি ছাড়ে না। কিন্তু হাঁড়ি ছাড়ে। বাপ ব্যাটা আলাপ বন্ধ হোয়ে যায়। হাজরা, বসা কোনো রকমে এক হাঁড়িতে টিকে থাকল কানাই বেঁচে থাকা পর্যন্ত। তারপর হাঁড়ি ছাড়ল। এবং দেওয়ালের মধ্যবর্তীতায় ছাড়ল বাড়ীও। বিধবা ময়না ত কোলে ছেলে নিয়ে একেবারে অসহায়। শিল্পীর বৌ হোলো-ভাড়ানী।

মাঝে মাঝে বেজায় অস্থিরতা কোরচে সতীশ। বালিশ থেকে মাথা গড়িয়ে পড়চে কখোনো। কখোনো বা বিছেনা ছেড়ে ও-নিজেই গড়িয়ে যাচ্চে মেঝের ওপোর। আবার উঠে বোসে বিছেনা হাতড়ায়। দুর্বল শরীর ঢলে পড়ে। আবার উঠে বেহুস্ হোয়ে যায়। ছেলের দশা দেখে ভয় পায় ময়না। এতো বড়ো জম্‌জমে পাড়া তবু কিন্তু একাকীত্ব ওকে দিশেহারা কোরে তোলে। অথচ তিন বছর আগেকার কথা মাত্তর। এ-পাড়া, ও-পাড়া, দু-পাড়া লোকের আসর বোসেচে এ-বাড়ী। সারারাত ঢোলক-শানাই বেজেচে। ছোটো-বড়ো দু-রকমের তামাক পুড়েচে। চলেচে তাড়ি ঢালাঢালি। কোন্ মাতব্বর না-এসেচে-এ-ওস্তাদ ঢুলীর সান্নিধ্যে—? নোতুন নোতুন গানের গৎ বাজানো শিখতে? সে-সুখী-রাতের কল-কল্লোলে ময়নার প্রায়ই ঘুমোনো হয়নি। কোথায় সে কলচ্ছটা-মুখর রাতের আসর? একবার উঁকি মেরে ও-চাইচে না এ-দুঃখী রাতকে!

এমন সময় তেলীর পুকুরের বয়ড়া বনে ভুতুম পেঁচা ডেকে ওঠে, ভূত্-ভুত্-

ভূত্-ভূত্। ময়নার-বুক ওঠে শিউরে। উত্তপ্ত ছেলেকে বুকের মধ্যে আগ্‌লে নেয়। আবার ভুতুম ডাকে,—ভূত্-ভূত্-ভূত্-ভূত্। পাথর ছিড়ে পড়ে ময়নার বুকে। বাইরে কালো-রাতের মতন দুশ্চিন্তার রাত ঢেলে পড়ে ওর মনের ওপোরে। ক্যানো ঘন-ঘন ভুতুম পেঁচা ডাকে? ভুতুম ডাকাতো অ-লখ্যণ। ওর শোনা আছে, রাতে যদি গাঁয় যমদূত আসে, তবে ভুতুম ডাকে ঘন ঘন। ভূতের চেয়েও কিম্‌ভূত-কিমাকার যমদূতরা। তাই ভূতের বাহন ভুতুমরা ওদের দেখে অমন আর্তরব করে। কিন্তু ক্যানো-যমদূত এলো গেরামে? কার তলব হোলো? এ-কথা ময়না আর ভাবতে পারে না। সে চোখ বুজিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরে। ছেলে যে ওর বুকের হৃৎপিণ্ড। কাকেও ছিঁড়ে নিয়ে যেতে দেবে না।

ঝাঁ-ঝাঁ-করে মহানিশা। একে তো মাঘ মাসের রাত লম্বা। আরো ময়নার দুখের রাত। এ-বুঝি পোয়াতে চাইচে না। উত্তুরে হাওয়া কলার বাস্‌নার বেড়ার গায় মৃদু ঝাঁকুনি ভ্যায়। ময়না চমকে ওঠে। ঐ বুঝি এলো। তার সাতরাজার ধন এক মাণিক চুরি কোরতে। ছেলের মুখের ওপোর ঝুঁকে পড়ে। ওর কপাল পর্শ করে। মিট্‌মিট্ কোরে জ্বলা মেটে টেমিটা এগিয়ে এনে শিয়রে রাখে। পষ্ট দেখতে পায় যাতে ছেলের মুখ। ওর চোখের সাথে কে চালাকি কোরবে—কে ফাঁকি দিয়ে কেড়ে নেবে এ-টুনি পাঁখির ধন?

ঝপ্।

পুন্যিদের উঠোনের দেঁড়ো গাছটার শুক্‌নো বাল্‌তো খসে পড়ে। ঘরের কানাচে পেয়ারা গাছতলায় মচ্‌মচে পাতার ওপোর শেয়াল-গণ্ড গোক্‌লো আর নয় ভামদের চলার খস্‌খসানী শব্দ, বাদুর, মেউ পেঁচা এবং আরো কতো কি অনামী রাতচরা পাখির উড়ন্ত ডানা-ধ্বনি প্রতি মুহূর্ত্ত চলে যমদূতের মিথ্যে আগমনী অভিনয় কোরে। রাত-সমুদ্দুর-আবর্ত্তে ময়নাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলা খেলে।

কিন্তু পাড়ার কুকুরগুলোরো আজ এতো বাড়াবাড়ি ক্যানো? রোজ রাতে তারা ডাকে সত্যি। কিন্তু এমন একঘেয়ে ঘেউঘেউ করে না তো। বিশেষ কোরে ওর ঘরের কানাচে, বাড়ির আশেপাশে এমন মাতামাতি। ময়না জানে, রাতের বেলায় মুচিপাড়ায়-ই সব থেকে বেশি রকম কুকুর ডাকে এবং এ-বেশি ডাকার কারণও তার অজানা নয়। রাতের আঁধার ঘোরালো হোয়ে ওঠার সাথে সাথে গোটা মুচিপাড়াটা এসে যায় গোদানোদের একচেটে দখলে। তারা ওৎ

পেতে থাকে আনাচে কানাচে, গলি-ঘুজি-আদাড়ে-চাঁদাড়ে। ওই সব ছায়ামূর্ত্তিরা অদৃশ্য হল্‌লা কোরে বেড়ায় রাস্তার মোড়ে মোড়ে এবং একটু ক্রটি বিচ্যুতি পেলেই আর রেহাই খ্যায় না। গোরুর মতন ঠেসে একদম পুঁতে ফেলে শক্তো-শুক্‌নো মাটিতেই। দানবীয় শক্তির এমনি মহিমা। ওদের চোখে-মুখে আবার উন্মত্ত বিখ্যোভ্। এ বিখ্যোভের কারণ ময়না জানে। জানে মুচিপাড়ার সবাই।

গোরু মরে গো-দানো হয়। আবার গো-দানোর উপজীব্য মরা গোরু। যারা ওদের মুখের গ্রাস কেড়ে নেয়, এমন কি হাড়-মাংস-চামড়া পর্যন্ত খ্যায় না; ফাঁক পেলে তাদেরি বা ছাড়বে ক্যানো দানোরা? অবিশ্যি রাত হওয়ার সাথে সাথে যে-মুচিদের মগজ তুনিয়াময় খ্যাখে ওই সব কল্পিত অশরীরী গোষ্ঠীর বিখ্যুব্ধ মিছিল, তাদের সম্পর্কে হুঁশিয়ারীরও অন্ত নেই ওদের। হাতে লোহার অস্তর বাহুতে মাদুলি। লন্ঠন অভাবে পাটকাঠির কাড়্ জ্বেলে তবে বাইরে বেরোবে। সতীশের অসুখ হওয়া পর্যন্ত ময়নাও এ-সম্পর্কে ঢের সতর্ক হোয়েচে। ঘরের আলো নিবোয় না, কোমরে ঘুন্‌সীর সাথে লোহার জালের কাটি গেঁথে দিয়েচে। নেহাল ফকিরের কাছ থেকে শ্বেত সরষে ইঁদুরের মাটি পড়ে এনে বাড়ী বন্ধ কোরে ফেলেচে। তবে বাড়ীর চারধারে এমনি কুকুর ঘেউ-ঘেউ করে ক্যানো? ছোটোবেলা থেকে ময়না শুনে আসচে, ঐ সব বিদেহী অপদেবতাদের কুকুররা দেখতে পেয়ে ডাকে। শুধু মাত্তর শেয়াল দেখে ডাকে না। কিন্তু আজকে এতো দৌরাত্ম্যি ক্যানো? তবে কি যমদূতদের সাথে যোগ-সাজস কোরে একজোটে হানা দিয়েচে গোদানোরা? এমন সময় সোনামুখী বিলের পশ্চিম পারে রাতের তৃতীয় যামার্ধ ঘোষণা করে একদল পাতি শেয়াল, —হুক্কা-হুয়া হুক্-ক্যাক্কাহু। কলার বাস্‌নার বেড়ার ফাঁক দিয়ে সশংক ময়না তাকায়, খ্যাখে আকাশ মাটি গম্ভীর রাত-সমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্চে সোনামুখী বিল।

আর সামুদ্রিক পোকার মতন ঐ-কালো জলে কিলবিল্ কোরচে যমদূত গোদানোর দলবল। কেউ কাবুলিওয়ালার মতন দাড়িওয়ালা, পাগড়ি মাথায়। কারো ঘাড়ে লাঠি। অবিকল কাছারির বরকন্দাজ হনুমান সিং। কেউবা মাথা শূন্য কবন্ধ। আবার কারো ধড়টা মানুষের। মুখটা গোরুর। শূয়োর মুখো, শেয়াল মুখো কেউ কেউ-বা। তারা বিচিত্র। ভয়াবহ অবয়ব। অবাধ-গতি-বিধি। সর্বগামী তারা। বীভৎস উল্‌লাসে উল্‌লসিত। ময়নার মনে হয়, ঐ লম্‌বা লম্‌বা শিং চালিয়ে কলার বাস্‌নার বেড়া ছিঁড়ে ছুটে এসে এখনি ওরা ঘরে ঢুকল বুঝি। ভাবে, একবার গলা ছেড়ে জোরে চেঁচিয়ে ওঠে। কিন্তু জরো

ছেলে পাছে ভয় পায়। তা হোলে তো আরো বিপদ। এমন সময় নড়াচড়া কোরে ওঠে সতীশ। ওর বুকের পরে হাত রাখে ময়না। বলে, জল খাবি ? ও সতে! বাবা সতীশ, জল খাবি ?

মাথা নেড়ে সায় ছায় সতীশ।

ঘটির পড়া-জল ওর গালে ঢেলে ছায় ময়না।

—বাবা পাগল! ওর যা হোয়ে থাকে ভালো কোরে দাও। ও দুধে নেয়ে উঠুক।

জল খাওয়ার পর সতীশ বুঝি সত্যি-সত্যিই ঘুমোয়। শিয়রে বোসে বোসে ঝিমোতে থাকে ময়না। হঠাৎ কাকের ডাক শুনে ধড়মড় কোরে চোখ চায়! ছাখে, মনু ঠাকুরদের উঁচু আটচালার মটকার ওপোর গোলাকার সূর্য। ঠিক ওদের ভাত খাওয়া মেটে শান্‌কীর মতন গোল। এবং লালও তেমনি। হাতের উল্‌টো পিঠ দিয়ে সতীশের কপাল ছোয়। ছাখে অল্প অল্প ঘাম।

সারারাত ময়নার মনের ওপোর এমন কি এ-পাড়ার পথ-ঘাট, আকাশ-বাতাস পর্যন্ত দল মাদল কোরে বেরিয়েচে ভূতের দৌরাত্মি। ও ভেবেচে, তছনছ হোয়ে গেছে গাঁখানা। কিন্তু রাত পোহালে ছাখে, কোথাও কিছু নড়েনি। সবি ঠিকঠাক আছে। কেবল ঝরা পেয়ারা পাতায় ঢেকে গেছে উঠোনখানা। নারকেল তলায় পড়ে আছে শুকনো বাল্‌তোটা ঝড়-ঝাপটা যা রয়েচে ওর মনে। তছনছ হোয়েচে ওর মনই কেবল।

সতীশের জ্বরটা এখোন একটু কমের দিকে। শশীকে ডেকে এনে ওর কাছে বসিয়ে ফকির বাড়ি যায় ময়না। ছেলেকে একলা রেখে যেতে আজ আর সাহস হয় না ওর। কী জানি দানো দোত্যিরা তো নজরের বাইরেই ঘোরাফেরা করে। সুতরাং দিনমানেও আসতে বাধা নেই ওদের। বিশেষ কোরে যমদূতের সাথে জোট বেঁধেচে যখোন।

শশী রাতদিন শিকার নিয়েই মেতে থাকে। এদিকে বড়ো একটা পা বাড়ানোর ফুরসুৎ কোথায় ওর ? এখোন সতীশকে দেখে শিউরে ওঠে। কী চেহারা হোয়ে গেছে! চেনার হাল নেই মোটেই।

সতীশের হাতখানা ওর হাতের মধ্যে টেনে নেয় শশী। বলে, এ কী। তুই কী হোয়ে গেচিস রে সতে।

—আমার যে অসুখ। ঘ্যাঙড়াতে ঘ্যাঙড়াতে সতীশ বলে।

—অসুখ হোয়েচে তা জানি। কিন্তু তুই যে এতো নাটিয়ে গেচিস,

জানিনে তো।

—তুই তো আসিস্ নে তার……

—জানিনে তোর অসুখ এতো বেড়েচে। এখোন থেকে আসবো। এবার তুই সেরে ওঠ সতে। তোকে আমাদের দলে টেনে নেবো। তা তুই ইস্কুলে গেলি ক্যান্রে সতে?

—তা কী! বিস্ময় বোধ করে সতীশ।

—আটকার মধ্যি থাকলে শরীল বুঝি ভালো থাকে? রোদ্দুর জল লাগলে, বন-বাদাড় ধুঁড়লে, কোথায় পালিয়ে যায় অসুখ। ইস্কুলে না গেলে অসুখ কোরতো না তোর। ওরে তোর পণ্ডিত নাকি বিস্কুট-মিছরি দেছিলো তোরে? সত্যি?

মাথা নেড়ে সায় ছায় সতীশ।

—তা তুই খেয়েছিলি!

আবার সতীশ ঘাড় কাৎ কোরে সায় ছায়।

শশী ফেটে পড়ে বিস্ময়ে, ও সব্বনাশ! খুড়ী তাই বোলছিলো। শুনে 'বা' রাগ করে। বলে, মিছরি খেলে ভালো মানুষের সর্দি হয়। তোর চোখ-মুখ সব ভ্যাব্-ভ্যাব্ কোরচে শেলেম্ময়। এবার তুই সেরে ওঠ্ সতে। আমার আরেকটা গুলতি আছে। তোরে দেবো।

—আমি যে চালতে পারি নে? সতীশ বলে।

—দূর পাগলা। ও শিখতে আর কত্খন? এক মোস্তরে শিখিয়ে দেবো তোরে! আমিতো নিজে-নিজেই শিখেচি। এই ছাখ্না—

বোল্তে বোল্তে সে কতকগুলো ঢিল কুড়িয়ে আনে এবং বাঁ-হাতের মধ্যমা আঙুলকে গুল্তি বাঁশের ছিলা কল্পনা কোরে প্রথমে ঘরের খুঁটি, তারপর তিরিশ-চল্লিশ-পঞ্চাশ হাত দূরের নারকেল সজ্নে গাছের গোলাকার শাদা পদার্থগুলোকে টারগেট কোরে শুরু করে গুলী-চালনা। তারপর নানান ধরণের কায়দা-কছরত-সারফতে গুলী চালার বিশদ বিশদ বিশ্লেষণ এবং কী কোরে এক-চোখ বুজিয়ে আরেক চোখ দিয়ে নিরীখ কোরলে তাকে অব্যর্থ নিরীখের কোটায় উৎরে দেওয়া যায়, সতীশ-কে সে-কথাও শোনাতে ভুল করে না। শশী দেখে শিকারের কায়দা-কাহিনী সতীশ খুব আগ্রহ দিয়েই দেখচে—শুনচে। তার রোগাতুর মুখেও উৎসাহের প্রচুর সঞ্চার হোয়েচে। তাই শশীরও উৎসাহ জাগে অফুরন্ত। সে বলে:

—তুই সেরে ওঠ্ সতে। এক জায়গায় নিয়ে যাবো।

—কোথায়? সতীশের ড্যাবা ড্যাবা চোখ আরো ড্যাবা ড্যাবা হোয়ে ওঠে।

—শিকারে।

—সে কোথায় রে।

—খলিল নগর। বুড়ি ভদ্দরের বাঁকে। খুব ব-ড়ো ও বাঁকটা। আর কুঁজ বক যা বসে ওখেনে, সে তোরে বোলবো কী সতে? মাছ-রাঙা, হোটুটিটি-ও দেখলাম মেলা।

—তুই কেবল দেখে এসেচিস? মারতে পারিস নি?

—নারে। আমি তো গুলতি নিয়ে যাই নি।

—তবে?

—আমি গেছিলাম 'বা'র সাথে। মালের খোঁজ পেয়ে।

—মাল?

—হ্যাঁ। দু-খোন মাল। খুব বড়ো বড়ো। একটা গাই আর একটা দামড়া।

—ভালো ছিলো?

—খুব ভালো। একেবারে আন্ টাটকা। ক্যানো, খুড়ী জানে। তোর অসুখ। তাই আনলে না। যাক্ গে মনে। তুই সেরে ওঠ্। মালের কি মানান্তার আছে?

ফোঁস কোরে নিশ্বেস ফেলে সতীশ। লালায়িত হোয়ে ওঠে ওর শিশু মন। চামড়ার জন্য নয়। চামড়ার দাবি এখোনো পৌছয় নি ওর। কেন না চামড়া কাটতে শেখে নি আজো! আখ্যেপ ওর—যদি ভালো থাকতো, বিনা পয়সার মাংসটা বরাত থেকে ফস্কে যেতো না।

চালাক ছেলে শশী ধোরে ফেলে সতীশের মনের ভাব। বলে, তুই মন খারাপ কোরিস নে। সতে। মালের কি মানান্তার? সেরে ওঠ্। কতো মাল জুটবে। আর গুলতি চালা শিখোবো তোরে। রোজ মাংস খেতে পাবি।

এমনি কোরে পাখি-শিকারের অনেক কথা-কাহিনা শোনায় ওকে শশী। শোনায় অনেক পাখির নাম। কাট-ঠোক্‌রা, তুলো ফুগ্‌দী. কলা মোচা, সামকুড়—থেকে কুল্‌ল মাছাল পর্যন্ত। কোন্ পাখির কী-রকম গতিবিধি, কে কোন ঠাঁই ভালোবাসে। মানে ডাঙা, না জলা জমি? ঝোপ-ঝাড়? না আড়-আড়াল? কোন্ পাখির মাংসে চর্বি বেশি?, কার মাংস নরম? কার জুটুর?

ঝলমল কোরে ওঠে সতীশের ফ্যাকাশে মুখ।

হঠাৎ শশীর মনে পড়ে যায় আজ সকালে ওদের মালীর বাগে শিকারে যাওয়ার কথা। ও-ই দলবলদের ডেকে নেবে। তারা ঠিক এখোনো অপেখ্যা কোরচে। মন উশ্‌খুশ কোরে ওঠে ওর। প্রোগ্রাম ফেল্ কোরবার ছেলে শশী নয়।

—তাইতো। খুড়ী এখোনো ফেরে না যে! এতো সময় কী করে? কোন্ ফকিরের থানে গেছেরে সতে? নেহালের?

—না। গোলাম আলির।

—তাই তো। ওখেনে যে ভীড়। তা-গোলাম আলির থানে গেলো ক্যান্‌রে খুড়ী? তোর এতো কী অসুখ কোরেচে? আমি তো দেখচি কিচ্ছু হয় নি। আচ্ছা কোরে ডুবে ফুড়ে আয়। তিন-চারবার ভাত খা। আর গা ফুঁ দিয়ে বেড়া। সব সেরে যাবে। ঐ যে খুড়ী আসচে। অনেকদিন বাঁচবে তুমি খুড়ী। এই মোত্তর তোমার নাম কোরছি।

ময়নার হাতে তেলপড়া-জলপড়া। আর বগলডাবায় একপাঁজা গাছ-গাছড়া। লতা-পাতা। তার মধ্যে আছে কাঁটাকচু, বাসক পাতা, তেলাকুচো, ভাট-আচ্‌ছোট্।

—তা ঠিক কথা বোলেচিস্ বাপু। আমি না বাঁচলে আর বাঁচবে কে?

—সতে, আমি চললাম। আবার আসবো।

শিকারের নেশা পেয়ে বোসেচে শশীকে। তীরবেগে ছুটে যায় সে। সারা দিনমান তবু সতীশকে একটু ঝরঝরে দেখায়। কিন্তু বেলা ডোবার সাথে সাথে ওর জ্বর উঠতে থাকে। বে-হুঁশ্‌ হোয়ে পড়ে। সে সাথে ময়নারো মনে বেড়ে যায় ভূত-পেরেত আর দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনার উপদ্রব। সাঁই পণ্ডিত আসেন। নিয়মিত সময়। ঘড়ি না থাকলেও ঘড়ির কাঁটার সাথে বুঝি ওঁর চলার গতিকে মিলিয়ে নেয়া। তিনি সতীশের নাড়ী টেপেন। কোনই উন্নতি বোঝেন না। সেই সর্দি। সেই ঘড়ঘড়ানি। সেই হাই ফিভার।

—কেমন ছিলে কাল রাতে?

—কোথায় কেমন? ঠাই বোসে। কী কোরে যে রাত কেটেচে সে ভগবান জানে।

—ক্যানো?

—যেমন জ্বর তেমনি বুকের মধ্যি ঘড়ঘড়ানি। যেনো যাঁতায় ডাল ভাঙে।

উঠে বোসে বিছেনা হাতড়ায়। আবার বে-হুঁশ্ হোয়ে পড়ে। ভয়েতে মরি।

ভূতের ভয়টা গোপন কোরে যায় ময়না এবং ছেলের অসুখের ভয়-ই যে ওকে ভীতু কোরে তোলে এইটে-ই বড়ো কোরে শোনায় সাঁই পণ্ডিত-কে।

—বোললাম ডাক্তারী ওষুধ খাওয়াও। তাতো শুনবে না।

সে-কথা কানে করে না ময়না। বোলে যায়, রাত আসচে, না ভাবনা আসচে মনে। বুকের মধ্যি আসচে রাত কোরে। দিনমান তো আপনারা এসো যাও। কিন্তু রাত্তিরে একটা কাক্-কুলিরো খোঁজ পাই নে। এতো বড়ো পাড়াখানা নিঝ্ঝুম। কে আসচে আমার বাড়ী চৌকী দিতে?

—কেউ আসে না!

—আসচে। কে আসবে?

—ক্যানো ওরা? আমি মরে গেলেও একবার ফিরে তাকায় না। তার বাড়ী চৌকী দিচ্চে।

সাঁই পণ্ডিত বলেন, কিন্তু রাগ নয় তোমার পরে আছে। তোমার ছেলের কী দোষ?

—তা হোয়েচে। ওরি পরে তো রাগ। উকুন হোলে কবে এতোদিনে নখে টিপে মেরে ফেলতো। দু-বেলা ওর মাথা-মুড়ো না খেয়ে, কেউ জল খায় ও-বাড়ীর?

—তাই নাকি!

—মিথ্যে কথা বলিতো নরকেও যেন ঠাঁই না হয় আমার। এইতো অসুখে পড়েছে, তবু বাবার আমার গাল-খেতে কামাই নেই। পরশুদিনেকের কথা, আমাকে শোনায়ে শোনায়ে বোলচে, দোহাই মা-নিশেন কালী, এবারের ব্যায়রাম যেনো না সারে। ওতেই যেনো 'খ্যায়' হয়। জোড়া পাঁঠা দিয়ে পুজো দেবো তোমার। শুনেচো কথা?

—খুব শুনেচি। শরীক হিংসা তো? ও সব ঠাঁই আছে। ময়না প্রতিবাদ করে, না। তা এমনধারা নেই কোথাও। সাধে বলে কি ছোটো জাত?

ময়নার এ-কথায় সায় দেন না সাঁই পণ্ডিত। শরীক হিংসার দাপ-দাপট তথাকথিত ছোটো জাতের চেয়ে বড়ো জাতের মধ্যেই প্রভাব প্রতিপত্তিশালী বেশি। যার রক্তাক্ত স্বাথ্যর মহাভারতের পাতায় অনপনেয়।

—ওকে ঘরে তোলো। বাইরে বেজায় ঠাণ্ডা।

সতীশের পাটি ছেড়ে তালপাতার 'চাটকোলে' গিয়ে বসল সাঁই পণ্ডিত।

বাইরে কন্‌কনে হিম পড়া শুরু হোয়েচে। সতীশকে এখুনি ঘরে নেয়া দরকার। ময়নাও তা বুঝেচে। কিন্তু একমাত্তর পাটি। সাঁই মশাইকে উঠতে বোলতেও পারে না। তাই তাঁর চলে যাওয়া পর্যন্ত অপেখ্যা কোরতেই হবে।

সতীশকে ঘরে শুয়ে রেখে ময়না এসে বসে ঝাঁপের দোর গোড়ায়। সাঁই মশাই তালপাতার 'চাটকোলে'র ওপোর দিব্যি আরামচে গ্যাঁট্ হোয়ে বোসে গেছেন।

—আজ আপনার যেতে কষ্ট হবে। ময়না বলে।

—ক্যানো? বিস্মিত চোখ চান সাঁই মশাই।

—যে আঁধারী রাত। কোলের মানুষ তাই দেখা যায় না।

—ও-ও, এই জন্যে? খুব পারবো। আঁধারে চলা আমার অভ্যেস আছে।

—তবু ঐ-সাঁকোটার জন্যি ভারি মুশ্‌কিল। একটা মাত্তর বাঁশ। তাও যেমন মড়কানো, ধরাটখানাও তেমনি নড়বড়ে। দিনমানে পার হতে গেলে তাই পা টলে।

—তোমার টলে। কিন্তু আমার টলে না।

হাই তুলতে তুলতে ময়না বলে, আপনি আছো তাই গা এখনো পাতলা ঠেক্‌ছে। নইলে এতোখ্যন……

—এতোখ্যন কী? কী হোতো এতোখ্যন?

—ভার হোয়ে উঠতো সারা গা। মনে শুধু খারাপখান ডাকতো। ঝাঁপ আটকে দিতাম কখোন এতোবেলা।

সাঁই পণ্ডিত সায় দেন, তা সত্যি। এ-পুরীর মধ্যে একলা একলা একটা জ্বরো ছেলে নিয়ে ভয়-ই করে সত্যি।

—কী করি বলো? সবিতো অদ্দেষ্ট। লোক থাকতেও লোক নেই। যেমন তেমন একজন কেউ থাকলে কতো সাহস।

প্রত্যেকবারই সাঁই পণ্ডিত লখ্য করেন, ময়নার কথা কওয়ার ধরণ। সত্যিই সে তার রোগী ছেলের লেগে নিতান্ত অসহায় এবং আন্তরিকতা দিয়েই চাইচে একজন দোসর মানুষ।

চুপচাপ কাটে খানিকখ্যন। ঘন ঘন হাই তোলে ময়না। ঠাই কালকের লম্বা রাত কেটে গেছে ওর ভয়-দুর্ভাবনার মধ্যে দিয়ে। চোখের ঘুম চোখের নীচের কাজল-ছাপ হোয়ে উঠেচে। এখোন-ও একটু ঘুমোতে চায় শুধু। এটা বেশ অনুভব করেন সাঁই পণ্ডিত। বলেন, যাও তুমি একটু ঘুমিয়ে নাও গে।

ওর পাশে গিয়ে শুয়ে পড়ো।

ঘুমিয়ে হয়তো পড়তো ময়না। অন্ততঃ বিছেনায় গিয়ে শুতোই তো বটে। কিন্তু দরজা আলগা রেখে কী কোরে শোয়? আর সাঁই মশাই বোসে থাকতে দরজা ভেজিয়েই বা ত্থায় কী কোরে? তবু উনি বোসে আছেন, তাই ময়নার বুকে জোর আছে ঢের। কিন্তু উঁনিই বা আর কতোখন থাকবেন? জোর হিম পড়া শুরু হোয়েচে। শেষ মাঘ জানিয়ে যাচ্চে আচ্ছা মতো। ঘুটঘুটে আঁধার ঢেকে ফেলেচে গলি-ঘুজি-পথ-ঘাট। এ-পাড়া একদম নিঝঝুম। কেবল উত্তরপাড়ায় ভূতোদের বাড়ী ঢোলক বাজচে। মাঝে মাঝে ভেসে আসচে শানাই-এর সুর। বাজনার তালিম দেওয়া হোচ্‌চে। বোধ করি কোথাও বিয়ের বায়না পেয়েচে ওরা। কিন্তু ওঠ্‌বার কোনোই লখ্যণ নেই সাঁই মশাই-তে। ব্যাপার কী? চিন্তা কোরে কিনারা পায় না ময়না।

—বাবারে। গোদানো। গোদানো!

চেঁচিয়ে ওঠে সতীশ। ছুটে গিয়ে ময়না পাঁজা কোরে ধরে। বুকে থাবা মারে। থুড়থুড়ি ত্থায়। বলে, কই? কোথায় গোদানো, বাবা? কিচ্ছু না—কিচ্ছু না।

সাঁই মশাইও ঘরে ঢোকেন। হাতটা টেনে নিয়ে নাড়ী ত্থাখেন সতীশের। ছলছল কোরচে ময়নার দিশেহারা আকুল চোখ। ঘন ঘন সাঁই পণ্ডিতের পানে তাকায়।

—ভয় নেই। জ্বরটা বেড়েচে কিনা খুব। তাই ভুল বোকচে। এক কাজ কর। মাথায় জলধারানী কোরলে, এখুনি জ্বর নেমে যাবে। শান্ত হোয়ে ঘুমোবে ও।

বোলতে বোলতে সাঁই পণ্ডিত এক প্রকার ছুটেই নীচে নেমে যান এবং উঠোনের কোণ থেকে একটা মানকচুর পাতা ছিঁড়ে আনেন। বেড়ার গায় হেলান দিয়ে রাখা দাখানাও তাঁর চোখ এড়ায় নি। সেটা নিয়ে একটা নালা কেটে ফেলেন। যাতে জলটা গড়িয়ে বাইরে পড়ে। কলসি-পিঁড়ির ওপোর রাখা মস্ত মেটে কলসি ভরা জল। মেটে বদনায় কোরে নিজেই আনেন সে জল গড়িয়ে এবং সতীশের মাথায় ঢালেন সরু ধারা। ময়না বোসেচে ওকে আড়কোলা কোরে নিয়ে।

ঘণ্টা দেড়েক চলে যায়। কলসির জল আসে ফুরিয়ে। সতীশও ঘুমিয়ে পড়ে। এবার হাত ত্থাখেন সাঁই মশাই। জ্বর এখোন অনেক কমে গেছে।

নাড়ীর গতিবেগও অনেক শান্ত।

—ওকে শুইয়ে দাও এখোন। ফিসফিস কোরে বলেন সাঁই পণ্ডিত।

একভাবে বোসে থেকে পায় ঝিঁ ঝিঁ ধোরে গেছে ময়নার। সতীশকে শুইয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায়। দু-এক পা কোরে বাইরে যায়। উঠোনে নামে। আবার ঘরে ঢোকে। এবং দোর গোড়ায় পা দিতেই সোনামুখীর পশ্চিম পার থেকে ভেসে আসে শেয়ালের ডাক। তৃতীয় প্রহর রাতের ইশতেহার। এখোন আশ্বস্ত হয় ময়না। আর সাঁই পণ্ডিতের যাওয়ার সম্ভাবনা নেই। আজ শবরী গৃহেই রাতযাপন হবে এ মহান অতিথির। কিন্তু আতিথ্য দেবে তাকে কী কোরে? যার অশুচি ছোঁয়াচকে সংক্রামক ব্যাধির মত এড়িয়ে রেখে দেওয়া হোয়েচে। দৈবাৎ পর্শে গঙ্গাজল-তুলসী ছুঁয়ে শুদ্ধ হোতে হয়। কোনো দিন অতিথি পা বাড়ায় নি যার ঘরে অতিথি সৎকারের হাত কী আছে তার? আর জানেই বা কী?

শেয়ালের ডাক শুনে সন্ত্রাসে বিলপানে তাকায় ময়না। স্যাখে মাটির তলা থেকে আকাশের ছাদ পর্যন্ত জমাট বাঁধা অথৈ আঁধার। লোনা গাঙের কসফরাসের মতন ওই রাতের গাঙ ভেসে চলেচে অজস্র জোনাকী স্ফুলিঙ্গ—উড়ন্ত হীরক বিন্দুদল। পেয়ারার পাকা পাতা ঝরে টুপটাপ কোরে। বাদুড় এসে উড়ে বসে ডালে। তার ঝাঁকানিতে খসে পড়ে আধ-খাওয়া শিথিল বৃন্ত পাকা ফলরা। ভেঙে পড়ে শুকনো ডাল। মচ্‌মচে পাতার ওপোর নিরাতঙ্কে চরে বেড়ায় বাঘ ধাড়া-গও গোকুলোপাতি শেয়ালরা। মাথার ওপোর ভেসে যায় রাত-পাখির সঞ্চরণশীল পাখ্‌নার আওয়াজ। কুকুরগুলো একঘেয়ে ডাকে ঘেউ-ঘেউ। বয়ড়া বনে ভূত্‌ম—ভূত্‌-ভূত্‌-ভূত্‌-ভূত্‌। গেলো রাতের মতনই শব্দ জোটের অব্যাহত মিছিল চলেচে। ময়নার কল্পনা রাজ্যে কিন্তু যমদূত গোদানোরা আজ আর মোটেই একনায়কত্ব চালাতে সাহস করে না।

সতীশ তেমনি শান্ত হোয়ে ঘুমোয়। ময়না ঝিমোয় তার ধারে বোসে আর বেড়ার কোণায় একটা বাঁশের খুঁটি হেলান দিয়ে সাঁই পণ্ডিত। অনিদ্র, অভুক্ত। মেটে-দেলকোয় টিম্‌টিম্‌ জ্বলে মেটে টেমিটা।

এমনি কোরে কেটে যায় আরো খানিক সময়। শিশির ধোওয়া রাতের কালি ওঠে ফ্যাকাশে হোয়ে। বেড়ার ফাঁক দিয়ে উঁকি মারে তারা বিরল আকাশ। নীচের চষা মাটির শাদা মাঠ। মাঠের পারে মন্থু ঠাকুরদের

খড়বন। আগা বাঁকানো বাঁশ্নী বাঁশের ঝাড়।

নিঃশব্দে সতীশের শিয়রে এসে বসেন সাঁই পণ্ডিত। ডান হাতটা টেনে নেন। নাড়ী টেপেন। ময়না এই মোত্তর একটু ঘুমিয়ে ছিলো। ধড়মড় কোরে উঠে বসে।

—ঘুমোও তুমি। জ্বর এখোন অনেক কম। আমি চোললাম। বোলতে বোলতে আলোটা নিবিয়ে দিয়ে বেরিয়ে যান সাঁই মশাই।

টাইফয়েডকে এক সময় বলা হোতো মেয়াদী জ্বর। তাও মানে ওর ছেড়ে যাওয়ার ভার ছিলো ওর নিজেরি মেহেরবানির ওপোর। ডাক্তারদের কোনোই হাত ছিলো না। তাঁরা শুধু চলতেন রোগের পেছন পেছন। উপসর্গদের পাহারা দিয়ে। হার্টকে দিতেন গার্ড আর যুগিয়ে যেতেন রোগীদের জীবন-সংগ্রামে টিকে থাকবার মতন শক্তি-সামর্থ।

একুশ দিনের দিন সন্ধ্যের সময় সতীশের জ্বর ছেড়ে যায়। গোলাম আলি ফকিরের দাওয়াই-এর কাছে শেষ পর্যন্ত হার মানতে হয় সান্নিপাতিক জ্বরের। নিসর্গের কোলে ছেড়ে দেওয়া মানুষদের ধাতে লতাপাতার শক্তির জয়-ঘোষণা এ নোতুন নয়। ধূলো-বালি ঘেষা জল-জংগল চরা শরীরে ধূলো-মাটি আর জল-জংগলই হোচ্চে অমোঘ দাওয়াই।

রোজকার মতন আজো সাঁই পণ্ডিত আসেন। নাড়ী টেপেন। চোখের পাতা টেনে ছাখেন। রায় দেন, ভালো আছে। আর ভয় নেই। আজ কী ব্যবস্থা দিয়েচে ফকির?

—ব্যবস্থা পালটায় নি। ওই দুধ-গুড়-ভাত, কাঁচা জলে চ্যান্। ফকির বলে, গা ঢিমে দিলে, তবে তরকারি-ভাত দেবে।

—তরকারি! চমকে ওঠেন সাঁইমশাই।

একুশদিন ভোগা টাইফয়েডের রোগী। দুর্বল নাড়ী। শক্ত জিনিস খেয়ে যদি পেট খারাপ করে তো মুশ্কিল। বিশেষ করে টাইফয়েডের স্বভাবই হোচ্চে পুনরাক্রমণকারী। সাবধান কোরে দেন:

—এখোন শক্ত জিনিষ মোটেই খেতে দেবে না। পেট খারাপ হোলেই মুশ্কিল কিন্তু।

এ সাবধানী কথায় ময়না তেমন সাড়া ছায় না।

বলে, যা করে বাবা পাগোল। আর ফকির যা ব্যবস্থা ছায়। দুধ-গুড়-

ভাতের পর নেহাল ফকির স্থায়,— কাঁচা কচুর তরকারি আর মুরগীর মাংস আর গোলাম আলি স্থায়, সে-সাথে কাঁচা তেঁতুলের টক।

আকাশ থেকে পড়েন সাঁই পণ্ডিত, কাঁচা তেঁতুলের টক। বস্তু-বিজ্ঞান সম্পর্কে ফকিরদের ধারণা চমক লাগায় সাঁই পণ্ডিতকে।

—ও কী! কাঁচা তেঁতুলের নাম শুনে অমন চমকে উঠলে ক্যানো আপনি?

আপনার অবাক বিস্ময় ধরা দেন না পণ্ডিত। বলেন, কই? না তো!

সস্মিত হাসি মুখ ময়নার। মুখ নেড়ে বলে সে, না? ভাড়াচ্চো বুঝি আপনি?

সতীশের অসুখ থেকে এ-বাড়ি আসা-যাওয়া পর্যন্ত ময়নার মুখে এই প্রথম হাসি দেখলেন সাঁই মশাই। ছ্যাখেন ওর চোখ-মুখ-কপালভরা অনেক চাকচিক্য। কলম আঁকানো ভুরুর মাঝখানটায় নীল রাখাল ফোঁটাটাকে দেখায় ঠিক যেন এক টুকরো উজ্জ্বল পান্না। ভাসা ভাসা টানা চোখ বিস্ফারিত। বেশিতর কালো সে চোখের মণি। সতীশকে ভালোর দিকে দেখে তারো মন ভালো। নিরুপদ্রব মগজ। তাই বুঝি অবকাশ পাওয়া সে মগজে একটা জিগ্যেসার উদয় হয়, বড়োলোকরা তো ভাগ্যবাদের বড়াই করে। অথচ টাকা-পয়সা সাথে কোরে আসে না কেউ। এখানে এসেই ছল-চাতুরীর মারফতে ঐশ্বর্যের মালিক হোয়ে বসে। তাহোলে ঐশ্বর্য কি ঈশ্বরদত্ত সামগ্রী? না মানুষের সহজাত জিনিষ? কোন্‌টা বোলবো? বৈষম্য যদি ঈশ্বরেরই অভিপ্রেত, তবে অচ্ছুৎ মেয়ে ময়না কেনো এতো রূপ পেলে? ভারতী ক্যানো অকৃপণ মনে উজোড় কোরে দিলেন সুর-শিল্প-প্রতিভা কানাই ঢুলীকে? তারনই বা ক্যানো হোলো বেত-বাঁশ-শিল্পী? স্বচ্ছ চোখেই দেখতে পান সাঁই পণ্ডিত, ছুৎমার্গ মানুষের তৈরী। বৈষম্যের নেপম্‌ বোমা ফাটিয়ে চলেচে মানুষ। জীবন-মরণের মতন, চাঁদ-সূর্য-জল-বাতাসের মতন এ দুনিয়ার সব কিছু সবার সমান সমান। তথাকথিত উঁচু সমাজের ওপোর বীতশ্রদ্ধ হোয়ে যান সাঁই পণ্ডিত। সোয়াইট জারের ভাবাদর্শে আবিষ্ট হয়ে পড়েন।

আমতা আমতা কোরে জবাব দেন পণ্ডিত, তা বটে। তবে জানো কি? কাঁচা তেঁতুল খেলে ভালো মানুষের সর্দি হয়। আর ওতো সর্দিতেই ভুগচে।

জলের মতন বোলে যায় ময়না, বাবা পাগলের দয়ায় কিছু হবে না। ফকির

বলে কি জানো?

—না তো। কী?

—কয়, যাতে বাড়ে, তাতেই আবার কমে।

দ্রব্যগুণ সম্পর্কে সাঁই পণ্ডিতের জ্ঞান-গম্যি একেবারে সীমিত। তাই তিনি আর তর্ক করেন না। অন্য কথা পাড়েন, সতীশের অসুখ হোলে পুন্নুরা কেউই আসে নি?

—না।

—আচ্ছা, তোমার পরে রাগটা ক্যানো?

—সে অনেক কথা। শুনে আপনার কাজ কী?

—তবু।

ঢোক গিলে নিয়ে ময়না বলে, উনি তো বুড়ো বয়েসে আমায় ঘরে আনে। এ বিয়ের পুন্নুর মত ছিলো না। তাই আমি এ বাড়ি যেদিন পা দিলাম, সে-দিনই দু-বাড়ি হোয়ে গেলো।

সাঁই পণ্ডিত বলেন, ওতো হামেশাই দেখে থাকি। সৎ-মার সাথে বনাবনি প্রায়ই হয় না। কিন্তু তুমি তো অনেকদিন থেকেই ওদের ভাতেও না, সাথেও না। তবে আসা-যাওয়া, কথা কওয়া-কওয়ি বন্ধ ক্যানো? এক হাঁড়িতে থাকলেই খটামটি হয়। কিন্তু তা যখোন নেই, তা হোলে নিশ্চয়ই অন্য ব্যাপার আছে। তুমি ভাঁড়াচ্চো।

এবার ঘাড় নোয়ায় ময়না। বলে, আছে বৈকি।

—কী সেটা? সাঁই পণ্ডিত প্রশ্নকর্তা।

—বজ্জাত হোচ্চে ঐ পুন্নুটা। হাজরা, বসা অতোটা না। মা বোলে অবিশ্যি কেউ কোনোদিন ডাকে না।

—ও-ও। তা পুন্নু বুঝি কিছু দিতে চায় না তোমাদের?

—না। তা না। আর দেবে কী? কী-ই বা আছে এ-বাড়ি? ঐ পেয়ারা গাছটা। আর নারকেল গাছটা। তা ওর ভুগী আমরা না।

—তবে?

—উনি মারা যাওয়ার দিনকতক পর পুন্নু ঘন-ঘন আসা-যাওয়া কোরতে থাকে। বলে, ভয় কী তোমার? ভেবো না আমরা আছি। সত্তেরে 'দিষ্টি মুখ' দেবো। গামালে যাবো সাথে-সঙ্গে কোরে নিয়ে। চামড়ার ভাগও দেবো। ভাবলাম, বংশের বড়ো ছেলে তো। মা নয় তুটো। কিন্তু বাবা

তো এক। ছোটো ভায়েরে ক্যানো দরদ কোরবে না? থেমে যায় ময়না।

উৎসুক সাঁই মশাই প্রশ্ন করেন, তারপর?

ময়না ঢোক গেলে। শুরু করে, আসা-যাওয়ার বিরাম নেই। ভাত খায় বাড়ি। আর "কুলি" ফেলে এসে এ বাড়ি। মাংস রান্নায়, পিঠে গড়ায় ডাকে। নেমন্তন্ন করে খাওয়ায়। একদিন পিঠে গড়ে দিয়ে বাড়ি ফিরতে অনেক রাত হোলো। পুন্ন্যি সতের সাথে খেয়ে এ ঘরে এসে বোসেচে। সতে ঘুমিয়ে পড়েচে। এ কথা সে-কথার পরে পান গুছিয়ে বাড়িয়ে ধরি। পান নিতে যেয়ে খপ্ কোরে আমার হাত এঁটে ধরে। বলে, একটা কথা শোনো। আমি বলি, কী কথা? বলে, আমি যা বলি, শুনতে হবে। ওঃ। আমার গা'র রোঁয়া খাড়া হয়ে উঠচে। এই ত্যাখো।

বোলতে বোলতে ময়না হাত বাড়িয়ে ধরে সাঁই পণ্ডিতের দিকে।

—তারপর? সোজা হোয়ে বসেন সাঁই পণ্ডিত।

আমি চেঁচিয়ে উঠি, কী শুনতে হবে? কী কথা? আমার হাতে চাপ ত্যায়। খাসখুস কোরে কয়, চেঁচিয়ো না। আস্তে কও। শুনবে তো? বোললাম, না। উঠে যাও। আমি শোবো। জোর কোরে হাত ছিনিয়ে নিলাম।

—তারপর?

—তবু পাছ ছাড়ে না। দু-তিন কিতে জোর-জবরদস্তির চেষ্টাও করে। তারপর সীতেকে ধোরলে ঘটক। সীতে আসে যায়। নানান রকম লোভ দেখায়। বলে, এক বাড়ির মধ্যি। ওর সাথে নষ্ট হোলে কেউ কিছু বোলতে সাহস কোরবে না। রাগে ঝাল বেটে দ্যায় গায়। একদিন আচ্ছা কোরে খারাই-ধোয়া ধুয়ে দিলাম সীতেকে। সেই থেকে সীতে আর ঘেষে না। ও কিন্তু তাকে-তাকে থাকলে কী কোরে আমাকে জব্দ কোরবে।

—ও-ও। তাই বুঝি জব্দ কোরচে? কিন্তু আপদ-বিপদে...

ময়না বাধা ত্যায়, না, না। সে জব্দ করা হোয়ে গেছে। সাঁই পণ্ডিতের বিস্মিত চোখ ঠ্যাকে গিয়ে ময়নার চোখে, কী রকম?

—ও-পাড়ার ভুতোরে আপনি চেনো ঠিক?

—খুব চিনি।

—উনি থাকতে ও পেরায় আসতো বাজনা শিখতে। দাদা বোলে

ডাকতো। সে সুবাদে আমি ওর বৌদি। পুন্যু আমাকে জব্দ কোরবে শুনে, ও বলে, ভয় কী বৌদি? আমরা তো আছি। দেখি, এ কতো ভাত দুধ দিয়ে খেয়েচে। তুমি সতেকে আমার সাথে দাও। সে থেকে সতে ওর সাথে গামালে যায়। ওরা চামড়া ছুলে দ্যায়। আর ও মাথায় কোরে বয়ে আনে। ডেকেডুকে খাওয়ায় মাঝে-সাঝে। পয়সাও দ্যায় কিছু কিছু। এর মধ্যি পাড়ায় রটে গেলো, পুন্যুই রটালে, ভূতোর সাথে আমার নিকে হোচ্চে।

হেসে ওঠেন সাঁই মশাই, তা বেশ তো। কোরলেই তো পারতে। তোমার তো বয়েস অল্প। ভূতোও বুড়ো না।

ময়না জিব কামড়ায়, না। ছিঃ। শোনো আপনি।

—বলো।

—পুন্যুই রটায় আবার পুন্যুই চোটপাট করে, ভূতো, শালার ছোটো ভেগে এতদূর আস্‌ফলানি ওর! ও কিনা এ-পাড়ায় আসে টোপ ফেলতে! আর দেখে নেবো ছিনাল মাগীটাকেও। আর ছিনালীর জায়গা পায় না?

—তারপর? হাসি হাসি মুখ সাঁই পণ্ডিত শুধোন।

—ভূতো শুনে হাসে। কেয়ার করে না মোটেই। আর কোরবে কিসের লেগে? ভূতোর নখের টিপ সইতে পারে পুন্যু? একদিন সন্ধ্যেবেলা ভূতো বেড়াতে আসে। চলে যাওয়ার পর পুন্যু ধেয়ে এলো ঢেঁকির ছ্যা নিয়ে,—হারামজাদা ছিনাল মাগী, তোর এতো "মুনজানী?" ছোটো ভেগে এনে ঘরে তুলিস? বসা ছুটে এসে ঠেকালে। তাই রখ্যে। নইলে ওই ছ্যা'র বাড়ি পড়লে মাথা ছাতু-ছাতু হোয়ে যেতো সেদিন। তারপর কী খ্যাঁড়া কবি গাওয়াটা না গাইলে। সে-কাজানো-খাজলানো মুখে তুলে বলা যায়? আমার মা নাকি ছিলো সাত ভাতারী। ভাতার থাকতেও আমি নাকি এক রাত্তিরে চোদ্দজন মরদ পার করেচি। ঢেকির ছ্যা দিয়ে আমার স্থলুনি......

ময়নার নিজেরি গাওয়া অনর্গল খ্যাঁড়া কবি বিব্রত কোরে তোলে সাঁই পণ্ডিতকে। বাধা দেন তিনি, থাক থাক। আর বোলতে হবে না। ছাখো তো সতে কাঁদচে ক্যানো? ওর বোধ করি খিদে পেয়েচে।

ঘরের মধ্যে ছুটে যায় ময়না।

সতীশের অসুখ বাড়াবাড়ির পর আজ ক'দিন উঠোউঠি এ-বাড়ি আসেন যান সাঁই পণ্ডিত। কিন্তু কলাপাতার বেড়া ঘেরা ময়নার ছোট্টো এ-দোচালা ঘরখানা কি তার গরীবানা আসবাব-পত্তরগুলোর ওপোর বড়ো একটা নজর করেননি।

বাজিয়ে হিসেবে এ-অঞ্চলে নামকরা ছিলো কানাই ঢুলী। ফি-বছর চড়ক পুজোর ঠাকুরবাড়ি ডাক ছিলো তার বাঁধা। তা ছাড়া বিয়ে-পৈতে-অন্নপ্রাশন তো আছেই। এতে পয়সাও যেমন পেতো কানাই তেমনি পেতো প্রচুর বকৃশিষ। জামা-কাপড়, থালা-ঘটি-বাটি-ও। ঠাকুরবাড়ির ঝাড়ের বাঁশ, খেতের খড় ছিলো তার বার্ষিক বরাদ্দ পাওনা। যা দিয়ে পশ্চিমপোতায় ছ-চালা একখানা বড়ো ঘর-ও বেঁধেছিলো। সে-ঘরটা এখোন আর নেই। তার ভিটেয় মানকচু লাগিয়েচে ময়না। ছ-সাত বছর হোতে চলল, কানাই চলে গেছে। কিন্তু ঠাকুরবাড়ির বার্ষিক পাওনা বাঁশ-খড় চলে যায় নি। সে নিজেই খড়ের বোঝা বয়ে আনে। বাঁশ কেটে আনে ঝাড় থেকে। মনু ঠাকুরের ঢালা হুকুম দেওয়া আছে। দরকার মাফিক ময়না যেনো ঝাড়ের বাঁশ, গাদার খড় নিয়ে আসে। পাড়ার লোক বেগার নিয়ে ঐ-বাঁশ-খড় দিয়ে ঘর ছেয়ে নেয় ময়না। ঝোড়ো মাস আসার আগে নেয় খুঁটি পুতিয়ে। বকশিষ পাওয়া পিতল-কাঁসা আজ আর একখানাও ঘরে নেই। সে-বকশিষ যে পেয়েছিলো, ছমাস যাবত অসুখে ভুগে সে-ই খেয়ে গেছে।

ঘরের মধ্যে তাকান সাঁই মশাই। পিতল-কাঁসা কি ভরণের কোনো রকম তৈজস-পত্তর দেখতে পান না। সব মাটির। বেড়ার পশ্চিমধারে গাদা করা মেটে ভাড়-হাড়ি-কুড়ি। তার সবগুলো নিখুঁত নয়। ফাটা-ফুটো। কানা ভাঙা। গোটা দুই মেটে কলসী। মেটে দেল্‌কো। বদ্‌না। এমন কি চেরাগটা পর্যন্ত মাটির। মাটির ঘরে মাটির আসবাবপত্তর নিয়ে ময়না একদম মাটির কাছাকাছির মানুষ হোয়ে আছে। ময়না বোলে নয়। ষোলো আনা পাড়াটাই।

ময়লা বিছেনা-পত্তর। এবং সে-ময়লা-সাফ্‌ কোরবার পথ নেই। এমনি জীর্ণ, পুরোনো। সোডা কি খারে সেদ্ধ কোরে পাটে আছ্‌ড়ে কেচে আনতে গেলেই, তা থুয়ে আস্‌তে হবে জলে। ছ-সাত বছর আগেকার পাওয়া বকশিষ এ-লেপ-কাঁথাগুলো। শিল্পী নেই। সে-সাথে চলে গেছে তার সাধনালব্ধ ফল। বেড়ার গায় ঝুলচে গোলাকারে জড়ানো গোটা তিনেক খেজুরপাতার পাটি। আরো দু-তিনটে পাটির মতন পাটা বোনা। চিকোনো রয়েচে আর কতকগুলো পাতা। এ ময়নার নিজেরি হাতে গড়া শিল্প।

আড়ার থেকে ঝুলে পড়েচে দু-তিন-চার থাকওয়ালা পাঁচ-ছটা সিকে। লাল-নীল-হল্‌দে পাড়ের সুতোয় নকৃশা করা। বট্‌ ঠাকুরুণের কাছ থেকে ঐ-পাড়গুলো চেয়ে আনা ময়নার। বট্‌ ঠাকরুণ মানে মনু ঠাকুরের বৌ। শিল্পীর বৌ-ও শিল্পী। এবং এ-শিল্প-সাধনার উপাদান আহরণ কোরতে হোয়েচে ওকেই। বিলের

শুটি পাট কেটে নিয়ে যাওয়ার পর ঝরতা গাছ পড়ে থাকে। ময়না সেগুলো কুড়িয়ে আটি বেঁধে জলে পচায়। তারপর ধুয়ে এনে শুকিয়ে টাকুরে কেটে সুতোর মতন সরু দড়ি বানায়। কচ্ছপের খোলায় বানানো সে-টাকুরো চালের বাতায় গোঁজা দেখেন বিপিন পণ্ডিত। দেখেন নীল তুলে ফেলা বাঁশের রুয়ো-আটনের কারু-কাজ। বেতের বাঁধনের নিখুঁত চারু-কুশলতা। ময়নার পানের চুঙো। চুনের ঘট। এমন কি খুঁটির গায়-চুন মোছা-আঙুলের ছাপগুলো পর্যন্ত চোখ এড়ায় না সাঁই পণ্ডিতের। তিনি নিজেও তো শিল্পী। শিল্পীর চোখ তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যার ওপোর-ই বেশি কোরে পড়ে। ঘরে উঠতে মাথার ওপোর ঝুলচে একখানা মেটে সরা। তাতে আরবী হরফে মন্তর লেখা। গোলাম আলি ফকির ঐ-সরা পড়ে বাড়ি বন্ধ কোরে দিয়েচেন। আরো কী কতকগুলো মোটা মোটা শেকড় চালের বাতায়, বেড়ার গায় ঝোলানো। প্রত্যেকটা-ই মহড়া দিচ্চে গোদানো-ভূত-পেরেতের আক্রমণকে! হঠাৎ সাঁই মশাই-এর চোখ পড়ে পূব ধারে আড়ার পানে। দেখেন, কানাই ঢুলীর তলা ছেঁড়া ঢোলকের কেড়েটা ঝুলচে। তার গায় জড়ানো কল্‌কা আঁকা কাপড়খানা। বিবর্ণ-বিরঙ। কালি ঝুলি মাখা। কতো উৎসব-পার্বনের আসর জয় কোরেচে ঐ-ঢোলকটা নিয়ে কানাই ঢুলী। ওর আগা-কোঁকড়া কাটি জল-তরংগর মতন ঢোলকের ওপোর নেচে উঠলে সাদিপুর, মাটকুমিরা, জগদানন্দহাটির ইংরিজী বাজনাদারের বাজনা থেমে গেছে। বাঁকড়ার বিশু-নিশুর শানাই-ক্লারিওনেট পর্যন্ত নিশ্চল-নিথর হোয়ে থেমেচে ঠোঁটের নীচেয়। আজ যন্ত্রী চলে গেছে। তাই যন্ত্র-ও সে-শোকে জরাজীর্ণ, মুহ্যমান। এ-অতীত স্মৃতি-ই বড্‌ডো বেশি কোরে আঘাত ত্থায় সাঁই পণ্ডিতকে। ফোঁস কোরে নিশ্বেস ফেলেন তিনি। দোরগোড়ায় এসে দাঁড়ায় ময়না।

—কী? ঘুমিয়ে পড়ল নাকি সতে?

—হ্যাঁ।

—কাঁদছিলো ক্যানো? খিদে পেয়েছিলো বুঝি?

—হ্যাঁ।

—কী খেতে দিলে?

—কাঁটা কচুর তরকারি। আর ভাত ছিলো একমুঠো, তাই।

—তা তুমি খাবে কী?

—আমি? আমি তো রাত্তিরে খাই নে। দোর গোড়ায় বোসে পড়ে ময়না।

মোটা মোটা হোয়ে ওঠে পণ্ডিতের চোখ।

—সেকী! ক্যানো?

—রাত বাঁধা।

—রাত বাঁধা? কী জন্য?

—ঐ সতের জন্যি।

—কদ্দিন থেকে?

—সে অনেক দিন হোলো। তখোন ওর বয়েস মোটে এক বছর। ঐ যে সেদিন বোলছিলাম, পরঘাট কোরেছিলো কান্না-কাটা পড়ে গেছিলো। কেউ বলে নি, ও বাঁচবে। নেহাৎ বাবা পাগোল পায় ঠেলে রেখে গেছে তাই। বোলেই পাগোলের উদ্দেশে যোড়হাত মাথায় ঠ্যাকায় ময়না।

বিস্ময় রেখায়িত হোয়ে ওঠে সাঁই মশাই-এর কপাল।

—সে কী! সে তো দশ বছরেরো বেশি! তা কিচ্ছু খাও না রাতে!

হেসে ওঠে ময়না। বলে, রাত বাঁধা রাখলে বুঝি খাওয়া যায়?

—কিচ্ছু খাওয়া যায় না! একদম নির্জলা!

—নিজ্জলা-ই তো।

সত্যিই তো। সতীশের অসুখ হওয়া পর্যন্ত যে-কটা দিন সাঁই-পণ্ডিত এ-বাড়ি রাত কাটাচ্চেন, জল বিন্দু-ও তো পর্শ কোরতে দেখেন নি ময়নাকে। তাহোলে দশ এগারোটা বছর এমনি কোরে উপবাসী রাত কাটচে ওর! স্তম্ভিত হোয়ে যান উনি।

—আচ্ছা কতোদিন পর্যন্ত এ-রাত বেঁধে রাখতে হবে? প্রশ্ন করেন বিপিন পণ্ডিত।

—যতোদিন না মানসা শোধ হয়।

—'গামুটি' পূজোর সময় রখ্যেকালীতলায় যোড়া পাঁটা দিয়ে পূজো দিতে হবে। তিন গাঁ মেঙে আনতে হবে গলায় কুড়ুল বেঁধে। সেই 'মাঙন' বেচে ভোগ কিনতে হবে ওকে ওজন কোরে।

—তা এতোদিন দাওনি ক্যানো? কানাই তো বছর চার-পাঁচ মারা গেছে মোটে।

—আমার খোঁচানো কামাই ছিলো না। দেব্‌তার ঋণ রাখতে নেই। কী চাও? এবার বিয়ে বাজিয়ে এসেই মানসা শুধ্‌বো। ঐ পর্যন্ত। আবার খোঁচাই। কই? কী সমাচার? এবার বড়ো পূজো বাজিয়ে হাট থেকে পাটি কিনে নিয়ে

একেবার বাড়ি ফিরবো। পুজো বাজিয়ে হাট কোরে বাড়ি হাজির। কোথায় পাটা? দড়াম কোরে হাতনেয় ফেলে দিলে মস্তমেনে এক গজাল মাছ! ছিলো তো এক ভুলো মানুষ। যখোন যা নজরে ধোরেচে, গাঁটে পয়সা থাকলে আর কথা নেই। ঘরে চাল বাড়ন্ত। হাট থেকে বিরুধ এক বোয়াল মাছ কিনে নিয়ে হাজির। বকে উঠতাম, তোমার কাণ্ডগ্যান্ হবে আর কবে? কলসীতে চাল বাড়ন্ত। সে হুঁস্ আছে? হেসে উঠতো, ও তাইতো। মাছটা দেখে লোভ হোলো। সামলাতে পারলাম না, বৌ। ভাবলাম, চাল তো হাওলাত মেলে। মাছ তো হাওলাতে পাওয়া যায় না। তা, তুমি এক কাজ কর। শশেদের বাড়িত্তে চাল কর্জ কোরে আনো।

হাসতে থাকেন সাঁই মশাই। কানাই ঢুলীর চরিত্র অজানা নয় তাঁর। পয়সা কামাই কোরতো সে। কিন্তু মমতা কোরতো না সে-পয়সার। ভালো-অভালো খেতো। নেশা-ভাঙ কোরে দিতো উড়িয়ে। সুরের ঐশ্বর্যে-ই থাকতো সে ভরপুর। কাজেই খালি হাত তার মনের—তহবিল খালি কোরতে পারে নি কোনোদিন। ভালুক ঘরের নিধু ভট্টচাষ্যি গরীব বামুন। ভিখ্যে-সিখ্যে কোরে মেয়ে পার কোরচেন। কানাই ঢুলী উপযাচক হোয়েই তার দলবল নিয়ে সে-বিয়ে বাজিয়ে এসেছিলো। এক কপর্দকও নেয় নি। এমন নজির ভুরি-ভুরি মেলে এ-অঞ্চলে। সাঁই পণ্ডিত তাঁর নিজের জীবন দিয়েই অনুভব করেন শিল্পী জীবনকে।

—ঐ-ঢোলকের কেঁড়ে-টা ভালো আছে? জিগ্যেস করেন সাঁই মশাই।

ঢোলকটার পানে তাকায় ময়না। বলে, আছে। মেলা খদ্দের আসে। ওটা কিনতে চায়।

শিল্পীর বহু শখের ঐ-স্মৃতি-সামগ্রীটুকুন ময়না হাত ছাড়া করুক, সাঁই পণ্ডিত তা চান না। তবু তার অ-স্বচ্ছলতার পানে তাকিয়ে বলেন, তা বেচে দিলে পার। বেচবে নাকি?

চাপা নিশ্বেস ফেলে ময়না বলে, না। কষ্ট তো আছেই। ওটা বেচে আর কতকাল খাবো? ভাবি, সতে যদি বাঁচে আর উনার নামটা রাখতে পারে।

ময়নার মনের সাথে ওঁর চিন্তাধারার মিল দেখে আশ্চর্য হোয়ে যান সাঁই পণ্ডিত। একটা দিকে লখ্য পড়ে তাঁর। সতীশ যে অতো শ্রুতিধর, পড়াশুনোর ওপোর অতো ঝোঁক, এর অনেকখানি ওর মায়ের অবদান। ময়নার স্বামী ছিলো এ-দেশ সে-দেশ নামকরা ঢুলী। সে এখোন চায় ঐ-শিল্প-প্রতিভা ছেলের

মধ্যে দেখে খুশী হোতে।

অচ্ছুৎ-অবজ্ঞাত এ-ঘরে বোসে সাঁই পণ্ডিতের মনের এ-দরাজ দিক খুলে যায়। দেখেন, সুন্দরের রাজপথে অগ্রগামী পথিকদের সাথে চলেচে তারন-কানাই ঢুলীর দল। ময়না-মন্থরারা। একজোটে। একসারে। মুচি বোলে এরা অছোঁয়া ক্যানো? ক্যানো নীচুতলার মানুষ? যুক্তি দিয়ে ধোরতে পারেন না। তাই তাঁর পণ্ডিতী বুদ্ধি প্রায়শ্চিত্ত সেরে যেতে চায় এ-রাতে।

—খুব ভালো কথা। ও লেখাপড়া শিখবে। তারপর শিখবে গান-বাজনা। বাপের বেটা বোলে যাতে পরিচয় দিতে পারে।

কথায় কথায় রাত হোয়ে যায়। শুক্ল পঞ্চমীর চাঁদ হেলে পড়ে সোনামুখী-বিলের পশ্চিম পারান্তে। তার তেরচা আলো কলাপাতার বেড়ার ফাঁক দিয়ে ময়নাদের নীচু হাতনেয় আঁকায় নানান রকমের জ্যামিতিক চিত্র। ঐ-চিত্রগুলোর সাথে সমতা বজায় রেখে সাঁই পণ্ডিতের মনের বোর্ডে অজস্র ফিগার গড়ে ওঠে। যার সত্যতা—ঐ-ত্রিভুজ-চতুর্ভুজের মতনই প্রমাণ কোরে দিতে পারেন উনি।

মুচিদের সমাজে চিরাচরিত চালু প্রথা বিধবা বিয়ে। ঐ-চিরন্তনী প্রথানুসারে ময়না আবার বিয়ে কোরেচে। ভালোই কোরেচে। এখোনো তার দেহে প্রচুর যৌবন। অফুরন্ত লাবণ্য। স্বচ্ছন্দে সে আবার বিয়ে কোরতে পারতো। কিন্তু কেন করে নি? এ-জিগ্যেসাই আজ কয়েক দিন ধোরে সাঁই পণ্ডিতের মনকে খোঁচাচ্চে। কিন্তু এখোন সে-উত্তর মিলে যায় মনের মারফতে, গুণী স্বামীর সে-ও একজন গুণী সমঝদার এবং সতীশের মধ্যে ঐ গুণী প্রতিভার বিকাশ দেখে সে স্বামী সম্ভোগেরি আনন্দ পাবে। পণ্ডিতের মুখের প্রশ্ন মুখেই থাকে বোবা হোয়ে। ময়নাকে আর জিগ্যেস কোরতে হয় না।

হাই তোলেন সাঁই মশাই। ময়না মনে করে, ওঁর বুঝি ঘুম পাচ্চে। বলে, রাত জেগে-জেগে আপনিও খুন হোয়ে গেলে। তা আজ তো ওকে একটু ভালো দেখাচ্চে। যাবে নাকি আপনি?

—না। আজকের রাতটা থাকি। তারপর কাল দেখা যাবে।

মনে মনে খুশী হয় ময়না। ওর আন্তরিক ইচ্ছে সাঁই পণ্ডিত থাকেন। উনি থাকলে দশ গুণ বেড়ে যায় ওর বুকের-বল। অসুস্থ সতীশের সম্পর্কেও বটে। রাজ্যময়-ভূত-পেরেত-গোদানোদের সম্পর্কেও বটে। কিন্তু ভারি লজ্জা পায় ও। অভুক্ত রাত কাটে তাঁর। অনিদ্র। একফালি তালপাতার চাটাই-এ বোসে খুঁটি হেলান দিয়ে। একটা মাদুর কি একটা বালিশ-বিছেনা দিতে পারে না ও।

—আপনি রাতে খান না? ময়না জিগ্যেস করে।

হেসে ওঠেন সাঁই পণ্ডিত। বলেন, ক্যানো খাবো না? আমার তো আর রাত বাঁধা নেই তোমার মতন। ক্যানো? খেতে দেবে নাকি?

মুখ নীচু করে ময়না। যাদের দৈবাৎ ছুঁলে জল-তুলসী-জল ছুঁয়ে তবে শুদ্ধ হোতে হয়, তাদের ঘরে খেতে চাওয়া মানে নির্মম পরিহাস করা ছাড়া কী? এ প্রশ্ন অবৈধ। বুঝতে পারেন সাঁই মশাই। বলেন, আমি তো বিকেলে খেয়েই আসি। কিন্তু আজ ভারি তেষ্টা পেয়েচে। তুমি এক ঘটি জল আর দুটো চাল দাও তো।

চুপ-চাপ বোসে থাকে ময়না। সে বিশ্বাসই কোরতে চায় না, যে সাঁই পণ্ডিত সত্যি-সত্যিই তার হাতের জল খেতে চাইচেন। দশ-বারো রাত আসচেন তিনি এ-বাড়ি। কোনোদিন চাল-জল খান না। বিশেষ কোরে শীতের রাতে আজ তেষ্টা পেয়ে বোসেচে তাঁর। কী কোরেই বা এ বিশ্বাস করে ময়না? কিন্তু ময়না জানে না সাঁই পণ্ডিত তাঁর আজন্মকৃত ভুলের প্রায়শ্চিত্ত সেরে যেতে চান এ-রাতে।

—কই? ওঠো।

ময়না ওঠে না। বলে, না। আপনাকে হাতে কোরে জল দিতে পারি নে। তার চেয়ে, চাঁদ উঠেচে। তেলীর পুকুর থেকে খেয়ে আসুন গে।

শেষের কথাটা কানে করেন না, সাঁই মশাই। বলেন, ক্যানো? তুমি হাতে কোরে জল দিতে পারবে না?

—না। আপনাকে কি হাতে কোরে জল দিতে পারি? পাপ হয়।

হেসে উড়িয়ে দেন বিপিন পণ্ডিত, দূর! জল দিলে পাপ হয় বুঝি? আমি অতিথি। অতিথিকে জল দিলে পাপ হয়! না দিলেই বরং পাপ। মহাপাপ।

কিন্তু কিছুতেই রাজি হয় না ময়না। বলে, আমাকে ছুঁলে লোকে চান করে। আর আপনি আমার জল খাবে! আর আমি তাই হাতে কোরে দেবো! ও সব্বনাশ।

বিষম মুশকিলে পড়েন সাঁই পণ্ডিত এবং শেষ অস্তর ছাড়েন এবার। তুমি তো শাস্তর জানো না ময়না। শুনো একদিন পড়ে শোনাবো রামায়ণ। রামচন্দর ভগবান। তিনি চণ্ডালের ঘরে অতিথি হোয়েছিলেন। গুহক চণ্ডাল তার নাম। তার হাতের ফল-জল খেয়েছিলেন রাম। শুধু রাম না।

লখ্যণ-সীতাও। ভাত-জলেও আপত্তি ছিলো না। কিন্তু রামচন্দর যে প্রতিজ্ঞা কোরে এসেছিলেন। চোদ্দো বছর বনে কাটাবেন কেবলমাত্তর ফল-মূল খেয়েই। আর একজন ছিলো। শবরী তার নাম। সেও তোমার মতন চণ্ডাল-মেয়ে। তারও ঘরে অতিথি হন রাম। তারও হাতের খান।

ধারাবাহিকভাবে রামায়ণী কথা ময়না শোনে নি কোনোদিন। ও জানে, দু-চারটে খাপ-ছাড়া-ছাড়া গল্প। যেমন রামের বনবাস। লখ্যণের শক্তিশেল, সীতাহরণ ইত্যাদি। ভালুক ঘরের তারক ভট্চায, বাঁকড়ার বিশু ঠাকুর এ-গাঁয়ের ভদ্দর মহলে রামায়ণ গান করেন। ওরা তফাতে দাঁড়িয়ে শুনে আসে। দূরে থেকে শোনার চেয়ে দেখার সুযোগটাই পায় বেশি। তারক-বিশু ঠাকুরের লাফ-ঝাঁপ, মুখ ঘুরোনো, চামর ঢুলোনো, আর শোনে হাট-ফেরার পথে ইষ্টম-বোষ্টম-নিরো-শশীর দল ধুয়ো গেয়ে যায়—ওর ঘরের কানাচ দিয়ে:

" ও ভাই, রাবণের শক্তিশেলে লখ্যণ পড়েন রণেতে,
ওঠো ওঠো ও ভাই লখ্যণ, দাদা বলোরে—
ও-চাঁদ বদনে এ-এ-এ।"

তারক-বিশু ঠাকুরের রামায়ণ গানের চেয়ে ইষ্টম-বোষ্টমদের ধুয়ো গানের সুর নিবিড় ছোঁয়া দেয় ময়নার বুকে। কানের ভেতর দিয়ে মরমে প্রবেশ কোরে হোয়ে ওঠে অর্থশালী। শক্তিশেল বিদ্ধ রক্তে ডুবু-ডুবু লখ্যণ-ভায়ের শোকে ময়নাও খায় চোখের জলে হাবুডুবু। ক্ষীন্ হোতে ক্ষীনতর হোয়ে ওঠে সুখ্য সুর। শীর্ণঝোরা পেরিয়ে ইষ্টম-বোষ্টমরা চলে যায় উত্তরপাড়ায়। গানের সুর আর কানে আসে না। কিন্তু তার রেশ লেগে থাকে ময়নার কানে। আর অন্তরের রণাংগনে বাণবিদ্ধ রক্তমাখা লখ্যণ-ভাইকে কোলে কোরে বোসে রামচন্দর। বুক ভেসে যাচ্চে চোখের শাঙন ধারায়।

খাপছাড়া ঐ রামায়ণী কাহিনীকে ধারাবাহিকভাবে শোনার জন্য একান্ত আগ্রহী হোয়ে ওঠে ময়না। সে সাঁই পণ্ডিতকে অনুরোধ করে, আপনি বলো তো শুনি। রামায়ণ শুনতে ভারি ইচ্ছে করে আমার। বোলেই মাথায় হাত ঠেকায় ময়না।

তা বেশ তো। শোনাচ্চি তোমাকে রামায়ণ। কিন্তু তেষ্টায় গলা আমার কাট হোয়ে গেছে। চাল-জল খাওয়াও।

ব্যাধ-কন্যা শবরী আর গুহক চণ্ডালের কথা ময়নার মনে দাগ কেটেচে।

অতিথি ফেরানো মস্ত পাপ। তাই সাঁই পণ্ডিতকে হাতে কোরে জল খেতে দেওয়ার পাপ গৌণ ঠ্যাকে তার কাছে। সে উঠে যায় জল আনতে। কিন্তু এক ঘটি জল চেয়েচেন উনি। ঘটি কোথায় পাবে সে? হাড়ি-কলসীর গাদার পানে তাকায়। দ্যাখে, একখানা মেটে সরা। তাতেই কোরে জল নিয়ে আসে। সরম অবনত মুখ। কাঁপা হাত বাড়িয়ে ধরে। পরিতৃপ্ত হোয়ে জল পান করেন সাঁই মশাই। তারপর শুরু করেন রামায়ণী কথা :—

দেশের নাম অযোধ্যা। রাজা দশরথ। তাঁর তিন রাণী। কৌশল্যা, কৈকেয়ী, সুমিত্রা। সুখী রাজ্য। কিন্তু সুখ নেই রাজা-রাণীদের মনে। বুড়ো হোয়েচেন রাজা দশরথ। রাণীদের-ও চুলে পাক ধোরেচে। আর দু-দিন বাদে তাঁরা চলে যাবেন। অথচ আজো পর্যন্ত একটা সন্তান হোলো না। রাজার অবর্তমানে এ-রাজ্য হবে ঠিক বিধবা নারীর মতন। তার না থাকবে এ-ছিরি-ছটা। না থাকবে এ-সুখ-শান্তি। সে-দুঃখের ভবিষ্যৎ খুব কাছাকাছি। মনে কোরে শিউরে ওঠেন রাজা। রাজা পুরুতকে ডাকান এবং তোড়যোড় করেন মস্ত এক যাগ-যজ্ঞর। নানা দেশ থেকে এলেন সব মুনি-ঋষিরা। বিরাট হোম হোলো। পুড়ল রাশি রাশি বেল-চন্দন-যজ্ঞডুমুর-কাট। ঢালা হোলো কলসী-কলসী খাঁটি গাওয়া ঘি। আগুনের জিব সাপের মতন লক্‌লকিয়ে ঠেকল গিয়ে আকাশে। হোম শেষ হোলো। ফোঁটা পরলেন রাজা। রাণীরা খেলেন চরু।

—চরু কী? ময়না জানতে চায়।

—দুধ-ঘি-মধু দিয়ে রাঁধা পায়েস। চরু হোমে দিতে হয়। দেবতার ভোগে লাগে।

—তারপর? ছল্‌ছল্ বিশদ চোখ চায় ময়না।

সাঁই পণ্ডিত শুরু করেন, বুড়ি হোয়ে ছিলেন রাণীরা। গায়ের চামড়া পড়েছিলো ঝুলে। তুবড়ে গিয়েছিলো গাল। কিন্তু চরুর কী আশ্চর্য শক্তি! খাওয়ার পর রাণীদের শরীর উঠল আঁট-সাঁট হোয়ে। গোলগাল। শাদা চুল-কালো কুচকুচে। রাতারাতি যুবতী হোয়ে ওঠেন তিন রাণী!

দিন চলতে থাকে। ক্রমে ক্রমে রাণীদের মুখ হোয়ে ওঠে ফ্যাকাশে। সব সময় আলসেমি ভাব। ঘন-ঘন হাই তোলেন। লখ্যণ আর ঢাকা থাকতে চায় না। খুব ঘটা কোরে "সাধ" দেওয়া হয়। সারা হয় সীমন্তোন্নয়ন। তারপর ঠিক সময় তিন রাণীর পেটে চার ছেলে হোলো। রাম, লক্ষ্মণ ভরত ও

শত্রুঘ্ন।

লাফিয়ে ওঠে ময়না তিন রাণীর চার ছেলে। সে কী। তাহোলে "জোংকা" ছেলে হোলো কার?

—সুমিত্রার। মানে ছোটো রাণীর।

—ও-ও। তারপর?

আবার রামায়ণ গান শুরু করেন সাঁই পণ্ডিত, ধাই-ধাই কোরে বেড়ে ওঠেন রাজার ছেলেরা। রাজার ছেলেতো? রূপ-ছিরি-চেহারার মোটেই অভাব নেই। যে তাকায় চোখের পলক ফেলতে পারে না। পাঁচ বছর উৎরে যায়। হাতে খড়ি দেওয়া হয় কুমারদের। তারপর পড়তে পাঠান বশিষ্ঠ মুনির পাঠশালায়। বশিষ্ঠ হোচ্চেন ওদের গুরুদেব। চার ভায়ের-ই খুব ধারালো মাথা। যা শোনে, তাই-ই শিখে ফেলে। দেখে বশিষ্ঠ পণ্ডিত তো মহাখুশী। উজোড় কোরে ঢেলে দেন তাঁর ভাঁড়ের বিদ্যে-বুদ্ধি। সব শাস্তর শেখা শেষ হয়। রাজপুত্তররা এসে পৌছয় যৌবন বয়েসে। ঠিক এমনি সময় এক বিপদ। বিশ্বামিত্র নাম কোরে এক ঋষি এলেন মিথিলা থেকে। কী সমাচার? রাম-লক্ষ্মণকে দিতে হবে!

চমকে ওঠে ময়নার বুক। সাঁই পণ্ডিতের মুখ থেকে এ-কথা বেরোনোর সাথে সাথে। সে পেছন তাকায়। ঘরে ঘুমন্ত ছেলের পানে।

—সে কী! রাম-লক্ষ্মণকে চায়! ক্যানো? জিগ্যেস করে ময়না।

—বোলচি, শোনো। ঢোক গিলে সাঁই পণ্ডিত বোলে যান, মিথিলা দেশটা মুনি ঋষির দেশ। সেখানকার রাজা পর্যন্ত একজন বড়ো ঋষি। তাঁর নাম জনক। তাই মিথিলা রাজ্যে পুজো-পার্বণ-হোম-যাগ লেগেই আছে। কিন্তু রাখ্যোস-রাখ্যোসীর উৎপাত সব পণ্ড কোরে ছ্যায়। তারা পুজোর ভোগ-সামগ্রী কেড়ে খায়। হোমের আগুন ছ্যায় নিবিয়ে। এর মধ্যে আবার এক বুড়ি রাখ্যোসী বেজায় শয়তান। তার অত্যেচারে সারা মিথিলা উঠল অতিষ্ঠ হোয়ে। রাজা জনক পর্যন্ত পারেন না তাকে দমন কোরতে। মুনিরা আর ধুনি জ্বালান না। হোম-জপ উঠল মাথায়। তখোন বিশ্বামিত্র মুনি ধ্যানে বোসে জানলেন, অযোধ্যায় ভগবান রাম অবতার হোয়ে জন্মগ্রহণ কোরেচেন। তিনি বয়েসে ছেলেমানুষ। তবু একমাত্র তাঁরি শক্তি আছে ঐ-তাড়কা রাখ্যোসীকে মারার। তাই মুনি ছুটে এসেচেন অযোধ্যায়। কিন্তু রাজা দশরথের বুড়ো বয়েসের ছেলে রাম। আরো বংশের বড়ো ছেলে। রাজার চোখের মণি। বুকের প্রাণ।

তাই রামকে না দিয়ে দেন ভরত-শত্রুঘ্নকে। কিন্তু চালাক ঋষি তা ধোরে ফেললেন। ফিরে এলেন অযোধ্যায় প্রায় মিথিলার কাছাকাছি থেকে।

এবার ব্রহ্মশাপের ভয়ে রাজা দশরথ রাম-লক্ষ্মণকে সঁপে দেন ঋষির হাতে।

মিথিলা রাজ্যে পৌঁছনোর পথেই রামচন্দ্র মেরে ফেললেন ডাকিনী রাখ্যোসী তাড়কাকে। ঝড় ভাঙা শিশুগাছের মতন পড়ল সে হুড়মুড় কোরে। পাথুরে কালো তার রঙ। জট পাকানো ধোঁয়াসে চুল। দাঁতগুলো যেনো এক একখানা কোদাল-কুড়ুল। মোটা মোটা গোরু-মোষরা হেঁটে যেতে পারে তার হা-এর খোলে। আরো অনেক ছোটোখাটো রাখ্যোস-রাখ্যোসীদের বধ কোরলেন লক্ষ্মণ। হাঁপ ছেড়ে বাঁচেন মুনি ঋষিরা। ঠাণ্ডা হয় মিথিলা নগরী।

মুনি বিশ্বামিত্র তখোন দু-ভাইকে নিয়ে চলেন রাজসভায়। পথে যেতে যেতে করেন অহল্যার শাপমোচন। অহল্যা হোচ্চেন গৌতম ঋষির বৌ। স্বামীর অভিশাপে তিনি পাথর হোয়েছিলেন। শিশু রাম ঐ-পাষাণে পা ছোঁয়াতেই অহল্যা আবার নারীজন্ম ফিরে পেলেন।

নিরখ্যর এক অছুৎ মেয়ের ঘরে বোসে রামায়ণী কথা আরম্ভ কোরেচেন সাঁই পণ্ডিত। ঐ-অছ্যুৎ মেয়ের মতন-ই শাদা-সিদে নিরাড়ম্বর ভাষায়। সে-ভাষা ময়নার হৃদয়গ্রাহী হোয়েচে। দেহ-মন হরণ কোরেচে ওর। একদম ডুবে গেছে কাব্য-কাহিনীর সরিৎ-সাগরে।

বিস্ময়ের চাকচিক্য আরো ফুটে ওঠে ওর চোখে-মুখে-কপালে। বলে, সে কী! রামের পায়ের ছোঁয়ায় পাথর মানুষ হোয়ে গেলো!

—তাই তো হয় ময়না। রামের পায়ের এমনি মহিমা! জবাব দেন সাঁই মশাই।

—আচ্ছা, অহল্যা পাষাণ হোয়েছিলো ক্যানো?

—সে-কথা আরেকদিন শুনো। রামায়ণ পড়ে শোনাবো।

জিজ্ঞাসু মন খুশী হয় না ময়নার। বলে, আচ্ছা। তারপর?

—রাম-লক্ষ্মণকে নিয়ে জনক রাজার সভায় পৌঁছন মুনি। রাজবাড়ি তখোন লেগে গেছে খুব ধুমধাম। রাজার একমাত্তর মেয়ে সীতা। তাঁর বিয়ে। জনক রাজার এক ধনুক ভাঙা পণ এ-বিয়েতে। ওই ধনুকের নাম হরধনু। যে তাতে গুন দিতে পারবে, সীতা দেবী তার গলায় মালা দেবেন। মানে ইচ্ছেবরী হবেন সীতা। নানান দেশ থেকে রাজা-রাজড়ারা এসে জুটেছেন। এক দু-জন না। তেরো তেরো লক্ষ বর। জম-জমাট রাজপুরী। দেশজোড়া নাম রাজা

দশরথের। তাঁর ছেলে রাম-লক্ষ্মণ। বয়েসে শিশু। কিন্তু মস্ত বড় বীর। তাড়কা বধ কোরেচেন। তাই জনক ঋষি খুব আদর কোরে রাজসভায় বসালেন দু-ভাইকে। রামের রূপ-চেহারা দেখে মোহিত হোয়ে যান জনক। মনে মনে ভাবেন, এই রাম যদি আমার সীতার বর হন! কী সুন্দর মানায়! কিন্তু এ-যে একেবারে দুধের বালক! ওই প্রকাণ্ড ধনুকে গুন দেওয়া তো গুন দেওয়া, উঁচু কোরে তুলতেই তো পারবে না। হায়। কেন যে আমি এ-ধনুক ভাঙা পণ কোরেছিলাম! ওদিকে সীতা দোতলার ছাদ থেকে রামকে দেখে ফেলেচেন। আপনার দেহ-মন সবই সঁপে দিয়েছেন রামের পায়ে। হাত জুড়ে আকাশের পানে চোখ চেয়ে দেবতাকে ডাকেন। রাম যেন তাঁর স্বামী হন। রাম বিনে তাঁর গতি নেই। প্রকাণ্ড ধনুক। বাজের মতন শক্ত। রাম যেনো তাঁর ফুলের মতন কোমল হাতে ওই-ধনুকে গুণ দিতে পারেন। এরপর শুরু হোলো ধনুকের ঘরে আনাগোনা। বড়ো বড়ো পালোয়ান রাজারা সব যান আর হটে আসেন। এমন কি দশমাথা কুড়িহাতওয়ালা যে রাবণ রাজা কৈলাস পাহাড় বাঁ-হাতে উঁচু কোরে তুলেছিলো, সে-ও পর্যন্ত হার মেনে ফিরে এলো। নাড়াতেও পারলো না হরধনুক।

সব শেষে ধনুকের ঘরপানে এগিয়ে যান শিশু রাম। হাটের লোক চেয়ে থাকে পলক না-পড়া চোখে। দেখবে কেমনে ওই-কচি শিশু ধনুক তোলে। কেউ কেউ মুখ টিপে হাসে। কেউ বা সাহস দ্যায়।

রামচন্দ্র ধনুকে গুন দিতে গিয়ে এমনি জোরে চাপ দেন যে, মড়-মড় কোরে ধনুকখানা একদম ভেঙে দু-খানা হোয়ে যায়। স্তম্ভিত সভা। আহ্লাদে হাততালি দিয়ে ওঠে রাজবাড়িভরা লোক। আকাশ থেকে দেবতারা ফুলবিষ্টি করেন। মেয়েরা শাঁখ বাজায়। উলু দ্যায়। খই ছড়ায়। বিশ্বামিত্র মুনি ছোটেন অযোধ্যামুখো, রাজা দশরথকে আনতে।

রাজা আসেন। সাথে ভরত-শত্রুঘ্ন। আসেন পুরুত ঠাকুর বশিষ্ঠ মুনি। আর মেলা লোক-লস্কর। বরযাত্রীর দল। খুব ধুমধাম কোরে বিয়ে হয় রাম-সীতার। শুধু রাম-সীতার না। জনক ঋষির তিন ভাইঝির সাথে তিন ভাইয়েরই বিয়ে হোয়ে যায়। ঢোলক বাজে। বাজে সানাই। আরও অনেক রকম বাজনা বাজে। বাজিও পোড়ে হরেক রকমের। মিষ্টি-মেঠাই রাজভোগের তো ছড়াছড়ি-গড়াগড়ি। দই-খীরের সমুদ্দুরে হাবুডুবু খেতে থাকে বিয়েবাড়ি।

বায়স্কোপের ছায়া-চিত্রের মতন ময়নার চোখের সামনে দিয়ে ভেসে চলেচে

রাম-সীতার বিয়ের ছবি। অবিশ্যি রাজবাড়ি কখোনো যায়নি ময়না। রাজার মেয়ের বিয়েও দেখেনি জীবনে। তবু কিন্তু রাম-সীতার বিয়ের বাসরে ঢুকতে ময়নার পা মোটেই বাধচে না। আয়ত চোখ উঠচে না ঝাপসা হোয়ে। এমন কি মন্নু ঠাকুরের মেয়ের বিয়েতে ওর স্বামী কানাই ঢুলীর হাতের আগা-কোঁকড়া কাটিখানা পর্যন্ত দেখচে ও। দেখচে ঐ কাটির আঘাতে মৃদু কেঁপে ওঠা ঢোলকের তলাটা। যার থেকে সৃষ্টি হোচ্চে সুর-তরংগ। তরংগায়িত কোরচে ওর মনকে। শানাই বাজিয়ে অভয় রিশির মতন ঐ অচেনা শানাইয়া শানাই-এ ফুঁ দিতেই তার তুবড়ে যাওয়া গাল উঠচে ফুলে ফুলে। আরক্ত-রেখায়িত-কুঞ্চিত হোয়ে উঠচে কপালখানা। পষ্টই তা দেখচে ময়নার স্বচ্ছ অবিস্মিত-আয়ত চোখ। এমন কি মন্নু ঠাকুরের মেয়ের বিয়েতে যে যশোদা ঠাকরুণ বেত-লতার মতন কেঁপে-কেঁপে বরণ কোরেছিলেন ধান-দুর্বো-হলুদ দিয়ে, আর অভয় ধোরে-ছিলো শানাই-এ গান :—

এতোদিন ছিলেরে হলুদ বনের মাঝারে,
আজ এয়োচো হলুদ তুমি রাম-সীতের বিয়েতে।

সেদিনকের ঐ-গানের মূর্ছনা যেভাবে দোলা দিয়েছিলো ময়নাকে, আজ যেনো তার চেয়ে নিবিড় কোরে দুলিয়ে দিলো ওর মনকে। সেদিন মন্নু ঠাকুরদের আঙিনার কোণ থেকেই ফিরে আসতে হোয়েছিলো ওকে। আজ কিন্তু প্রাসাদ-পুরীর অভ্যন্তরে রাম-সীতার বিয়ের বাসর ঘরে ঢুকবার ছাড়পত্র পেয়ে গেছে ও।

সাঁই পণ্ডিতকে থামতে দেখে ময়না বলে, তারপর ?

আবার শুরু হয় রামায়ণী কথা। রাজধানীতে আসেন বুড়ো রাজা দশরথ। চার ছেলে, চার পুত্রবধূ নিয়ে। খুব ঘটা কোরেই হয় চার ছেলের বৌ-ভাত। এবার ছেলের বাড়ি চলল সন্দেশ রসোগোল্লা-রাজভোগের ছড়াছড়ি। দই-খীর সমুদ্দুরের হেউঢেউ।

এখোন রাজা দশরথ চান রামকে রাজা কোরতে। আর জীবনের বাকি দিনগুলো ধর্ম-কর্ম নিয়ে কাটাতে। তোড়যোড় শুরু হোয়ে যায়। হৈ-হুল্লোড়ে জমজমে হোয়ে ওঠে রাজধানী। রাস্তার দু'ধারে লাগানো হয় হীরে-মুক্তোর নকল গাছ-গাছালি। ফুল-পাতা, রঙিন কাগজে সাজানো হয় গেট। ঝিলিক দিতে থাকে অযোধ্যা নগরী। হঠাৎ মেজো রাণী কৈকেয়ী বসেন বেঁকে।

ময়না সোজা হয়ে বসে। তার টানা ডাগর চোখজোড়া ওঠে ঝলমল কোরে, ক্যানো?

ঢোক গিলে নেন সাঁই মশাই এবং আরম্ভ করেন—কৈকেয়ী বায়না ধরেন, তাঁর পেটের ছেলে ভরতকে সিংহাসন দিতে হবে আর রামকে পাঠাতে হবে চোদ্দো বছরের মতন বনে। অবিশ্যি মেজো রাণীর এ আবদারের একটা ফাঁকও ছিলো বৈকি। রাজা দু'বার দুটো ধাক্কায় পড়েন। একবার সাংঘাতিক রকমের এক ফোঁড়া হয়। আরেকবার দৈত্যদের সাথে যুদ্ধ কোরতে গিয়ে আসেন খত-বিখ্যত হোয়ে। দু' দু'বারই রাণী কৈকেয়ী সেবা-শুশ্রূষা দিয়ে সেরে তোলেন। খুশী হয়ে রাজা তাঁকে দু'টো বকশিস দিতে চান। রাণী বলেন, ঠিক আছে। দরকার মতন চেয়ে নেবো। এখোন দাঁউ পেয়ে কৈকেয়ী ওই বকশিসের দাবী কোরে বসেন। শুনে বাজ ভেঙে পড়ে রাজা দশরথের মাথায়। হাহাকার কোরে ওঠে গোটা রাজপুরী। মোত্তরের মধ্যে সব আমোদ প্রমোদ, হৈ-হুল্লোড় ওঠে বিষাদে ভরে। ধুলোয় মূর্ছা যান বড় রাণী, ছোটো রাণী। কিন্তু কী আর হবে? পিতা কথা দিয়েছেন। সে সত্য রাখতে রাম চললেন গাছের বাকল পরে বনে। সাথী হোলেন সীতা আর লক্ষ্মণ। সূর্যদেব দেখতে পাননি যে সীতার মুখ, আজ তিনি উঠলেন পথে। তাঁর নরম পায় কুশোর কাঁটা ফুটে তরাতর হোয়ে যেতে থাকল রক্তে। এখোন থেকে চোদ্দো বছর যাবত স্বামীর সাথে তিনি ঘুরবেন বনে-বনে আর রাজভোগের বদলে খাবেন ফলমূল। রাত কাটাবেন পাতার কুঁড়েয়।

মুহূর্তের মধ্যে ময়নার জীবনের রাতকানা একটা দিক ওঠে সূর্যালোয় ঝলমলিয়ে। রাজবধূকে পেয়ে আপন পথে, আপন কুঁড়েয়, আপন পাশে। সাহসে কোমর বাঁধে মন। স্বপন দেখে নোতুন উপনিবেশের। তবু কিন্তু সীতার পায়ে ফোটা কুশ কাঁটার মতন ওর মনের কোথায় যেনো খচ্‌খচ্‌ কোরতে থাকে সূচাগ্র ধারালো ব্যথা। রাজবধূ নীচেয় নেমে এসেচেন। হোয়েচেন ওর জীবন-সংগিনী। তবু সীতার সাথে ময়নার অনেক গরমিল। অনেক রিক্ত ও। নিষ্টুর একাকীত্বে আরো নিঃস্ব। কুঁড়েঘরের ময়না সত্যিই কাঙালিনী আর ঐশ্বর্যহারা সীতা দেবীই ঐশ্বর্যশালিনী রাজলক্ষ্মী।

ফোঁস কোরে নিশ্বেস ফেলে ময়না। বলে, তারপর?

হাই তোলেন সাঁই পণ্ডিত।

—আপনার বোধ হয় ঘুম পাচ্ছে? না?

সোজা হোয়ে সাঁই মশাই বলেন,—না না।

—পান খাও আপনি?

—পান? তা দাও একটা।

ময়না কোনোদিন পান খেতে বলে না সাঁই পণ্ডিতকে। বলার সাহস হয় না। আজ চাল-জল দেওয়ার পর সে সাহসের মুখ ছুটে গেছে। ঘরে উঠে যায় সে এবং সাঁই মশাইকে পান সেজে এনে ছায়।

আস্ত পানটা গুটিয়ে মুখের মধ্যে পুরে ছান। আবার শুরু করেন কাব্য-কথা—

—রাম বনে যাওয়ার পরই 'হা রাম!' বোলে রাজা দশরথ মারা গেলেন!

হ্যাঁ, অযোধ্যায় এতো সব কাণ্ড কারখানা। কিন্তু কৈকেয়ীর ছেলে ভরত এর বিন্দু-বিসর্গও জানেন না। তিনি ছিলেন তখোন তাঁর মামার বাড়ী নন্দীগ্রামে। লোক-লস্কর ছুটল তাঁকে আনতে। ভরত বাড়ী এলেন। এসে শুনলেন মায়ের মতলবের কথা। খুব বকাবকি কোরলেন মাকে। এমন কি যে দাসী বেটি যুক্তি দিয়ে বিষিয়ে দিয়েছিলো মায়ের মন, তাকেও পর্যন্ত গালি-গালাজ, মারধোর কোরলেন ভরত। তারপর চললেন রামকে ফিরিয়ে আনতে। ভরতের সাথে চলল সারা অযোধ্যা নগরী।

চিত্রকূট পর্বতে এক বনের মধ্যে পাতার ঘর বেঁধে রাম-লক্ষণ সীতাকে নিয়ে বাস কোরছিলেন। দেখে ভরতের চোখে ঝরঝর করে জল ঝরতে থাকল। রাজার ছেলে, রাজার রাণী আজ পাতার কুঁড়েয়। বনে-বনে ঘুরে সবার ছিরি চেহারা একদম পাল্টে গেছে। রাম-লক্ষ্মণের চাঁচর চুলে জট বেঁধে গেছে। এক গাল গোঁফ-দাড়ি। পরনে গাছের ছাল। সীতাদেবীর শুকনো মুখ। তামাটে রঙ কালো চুলের। ধুলোয় ভরা কাঁটায় চেরা মা লক্ষ্মীর রাঙা পা দু'খানি। রামের পা ধরে কেঁদে পড়েন ভরত। বলেন, দাদা, আপনি বংশের বড়ো ছেলে। রাজ সিংহাসন আপনার। আমরা আপনার দাসানুদাস। আপনি বনে আসার সাথে সাথেই পিতা স্বর্গে চলে গেছেন। প্রজারা আপনাকে চায়। ঐ দেখুন, অযোধ্যা ভেঙে এসেচে আপনাকে নিয়ে যেতে। আপনি দেশে ফিরে চলুন। মেয়ে লোকের বুদ্ধি অল্প। তার কথা শুনে কেন আপনি বনে এলেন?

পিতার মরণ সংবাদ শুনে রাম শোকে ঠিক বালকের মতনই কাঁদতে থাকেন। তারপর ভরত তাঁকে অনেক উপরোধ-অনুরোধ করেন। কিন্তু কিছুতেই

ফিরাতে পারেন না। পিতার সত্য রাখতে বনে এসেচেন তিনি। সে তো কিছুতেই ভাঙতে পারেন না রাম। অগত্যা ভরত দেশে ফিরলেন রামের পাদুকা মাথায় কোরে। চোদ্দো বছর ঐ পাদুকা রাজ সিংহাসনে রাখা থাকবে। আর ভরত তার নীচেয় বোসে প্রজা পালন কোরবেন রামের হোয়ে।

এরপর চিত্রকূট পর্বত ছেড়ে তিনজন পাড়ি জমান দুর পাল্লায় এবং হাঁটতে হাঁটতে হাজির হন এসে পঞ্চবটী বনে। সুন্দর বন। আবার সে বনের ধার ঘেঁষে বয়ে গেছে গোদাবরী নদী। আয়নার মতন ঝক্‌ঝকে তার জল। সীতার খুব পছন্দ হোলো এ ঠাঁই। ডাল-পাতা ভেঙে লক্ষ্মণ গোড়লেন এক কুঁড়ে ঘর। বেশ আরামে কাটতে থাকে দিনগুলো। হঠাৎ ঘটে যায় এক বিষম ব্যাপার।

ঢোক গিলে নিতে সাঁই মশাই থামেন। বিশালতর হোয়ে ওঠে ময়নার বিশাল চোখ। জিগ্যেস করে :

—কী ব্যাপার ?

সাঁই পণ্ডিত বোলতে থাকেন, পঞ্চবটী বন যে কেবল বাঘ-ভালুকের বাতান ছিলো তা নয়। মেলা রাখ্যোসও থাকতো। হরিণ-শূয়োর মেরে খেতো তারা। দুটো রাখ্যোস ছিলো তার মধ্যে বেজায় হিংসুটে। একজনের নাম খর আর একজন দূষন। আর ছিলো এক রাখ্যোসী। শূর্পনখা তার নাম। লংকার রাবণ রাজার বোন সে। যেমন কালো তেমনি মোটা। লম্বা নাক। চওড়া গাল। কুলোর মতন নখ। গোরুর মতন কান। একদিন লক্ষ্মণকে একলা পেয়ে শূর্পনখা চুপে চুপে তার ধারে আসে এবং ভালোবাসা কোরতে চায়। মানে বামন হোয়ে চায় চাঁদ ধোরতে। শুনে তো লক্ষ্মণ ওঠেন রেগে-মেগে এবং তার নাক-কান কেটে খেঁদী-বুঁচী বানিয়ে দেন। শূর্পনখা কাঁদতে কাঁদতে লংকায় ফিরে আসে এবং আপনার দোষ লক্ষ্মণের নামে একখানা কথা দশখানা কোরে লাগায়। রাবণ রাজার তখোন বেজায় দব-রব। চাঁদ-সূর্‌য্যি তার দোরে বাঁধা। যম রাজা কাটেন তার ঘোড়ার ঘাস। শনি ঠাকুর কেচে দেন কাপড়। দেবতারা কেঁচো হোয়ে ফাই-ফরমাস কুলোন। এমনি তেজী রাজা রাবণ আর তার বোনকে লক্ষ্মণের মতন একজন 'ত্যান্‌কা' লোক, বনে-বনে ঘুরে বেড়ানো একজন ভিখিরী কিনা কোরবে অপমান। আর তাই তিনি কোরবেন বেমালুম হজম। কখ্‌খনো না। রাবণের ছিলো আবার কুড়িখানা হাত। দশটা মাথা। এক সাথে

সব হাতগুলো উঁচিয়ে দশমুখে গর্জে ওঠেন, এ অপমানের প্রতিশোধ নেবেনই তিনি। হরণ কোরে আনবেন রামের সীতা। কিন্তু যতো বড়ো বীর হোন না রাবণ রাজা, রাম-লক্ষ্মণের কাছ থেকে সীতা ছিনিয়ে আনা বড়ো সহজ ব্যাপার না। সুতরাং চালাকি ছাড়া আর পথ নেই সীতা আনার। সেই পথই ধরা হয়। মারীচ নাম কোরে এক রাখ্যোস ছিলো। রাখ্যোসরা মায়ারূপ ধোরতে ওস্তাদ। তার মানে, যখোন যা ইচ্ছে তাই হোতে পারে। সোনার হরিণ সেজে চলল মারীচ। আর রাবণ সাজলেন সন্ন্যিসী ঠাকুর। বোলোওয়ালা খড়ম পায়। হাতে কমণ্ডুল। কাঁধে ভিখ্যের ঝুলি। গেড়িমাটি ছোপানো জামা-কাপড় পরণে। মাথায় জটা। গাল ভরা চাপদাড়ি।

রাম-লক্ষ্মণ-সীতা কুটীর ধারে বোসে আছেন। এমন সময় সোনার হরিণ চলে নাচতে নাচতে ওদের সুমুখ দিয়ে। ঝিকমিক্ কোরচে তার সারা গা। তাকালে চোখ ঝল্সে যায়। এমন হরিণ জীবনে দেখেন নি সীতা। তিনি বায়না ধরেন, ঐ হরিণ তাঁকে মেরে এনে দিতে হবে। খুব সুন্দর সুন্দর আসন হবে ওর চামড়ায়। রামচন্দর ধনুকবাণ নিয়ে হরিণের পেছন পেছন ছোটেন।

যাবার সময় লক্ষ্মণকে বারবার সাবধান কোরে যান, লক্ষ্মণ, তুমি সীতাকে দেখো। আমি এখুনি হরিণ মেরে নিয়ে ফিরচি।

বেশ কিছুদূর হরিণের পেছন পেছন ধাওয়া কোরতে হয় রামকে। তারপর ফাঁক বুঝেই বাণ চালেন। আর সে বাণে হরিণ বেশী মারীচ রাখ্যোস লুটিয়ে পড়ে। সে বোঝে এ যাত্রা তার আর রখ্যে নেই। তবু মরণের সময় রাবণের উপকার কোরে মরি। তখোন ঐ দুষ্টু রাখ্যোস রামের গলার স্বর ধোরে বোলতে থাকে, ও লক্ষ্মণ! শিগ্গীর এসো। আমাকে বাঁচাও ভাই। রাখ্যোসে মেরে ফেল্লে। লক্ষ্মণ ভাই! বাঁচাও আমায়।

রামের কাতর গলা শুনে অধীর হোয়ে ওঠেন সীতা। কেঁদে ফেলেন। বলেন, শিগ্গীর যাও লক্ষ্মণ! প্রভুকে বুঝি রাখ্যোসে মেরে ফেললে!

লক্ষ্মণ কিন্তু অটল। তিনি সীতাকে কতো কোরে বোঝান। ব্যস্ত হোয়ো না দেবী। রামচন্দ্রকে মারতে পারে এমন কেউ নেই পৃথিবীতে। এখুনি হরিণ মেরে ফিরবেন।

তবু সীতা শুনতে চান না। অ-কথা কু-কথা শোনান লক্ষ্মণকে। তিনি সৎ-মা'র ছেলে। ভরতের সাথে যোগ সাজস আছে তাঁর। ভরত রাজ্য নিয়েচেন। আর লক্ষ্মণ নেবেন নারী। তাই রাখ্যোসকে দিয়ে মেরে ফেলতে

মোটেই বাধছে না তাঁর।

সীতাকে লক্ষ্মণ মায়ের মতনই দেখেন। এখোন এ-কথা শুনে ধৈর্য হারান তিনি। ধনুক-বাণ নিয়ে যাত্রা করেন। তবু যাওয়ার সময় গণ্ডি দিয়ে ঘর বেড়েন। দেবতাদের সাখ্যী মানেন এবং সীতাকে বারবার কোরে মানা কোরে যান ঘরের বাইরে না যেতে গণ্ডি মাড়িয়ে।

লক্ষ্মণ চলে যান। সন্ন্যিসী রাবণ গাছের আড়ালে ছিলেন ওৎ পেতে। এখোন ধীরে ধীরে এগিয়ে আসেন সীতার কুটীর ধারে এবং ভিখ্যে চান। বেজায় মুশ্‌কিলে পড়েন সীতা দেবী। সামান্য কিছু ফল মাত্তর আছে ঘরে। সন্ন্যিসী ভিখিরীকে এতো অল্প ভিখ্যে কী কোরে দেন? বলেন, একটু দেরী করুন ঠাকুর। ফল নিয়ে এখুনি ফিরবেন প্রভু। সাধু-সন্ন্যিসী-অতিথ্‌দের খুব ভক্তি করেন তিনি। আপনাকে পেলে খুবই খুশী হবেন।

কিন্তু সন্ন্যিসী ঠাকুর তা শোনেন না। বলেন, না। দেরী কোরতে পারি নে। বেলা হোয়ে যাচ্ছে। আশ্রমে ফিরবো। আমার পুজো-আহ্নিকের সময় বয়ে যায়। যদি কিছু থাকে, দাও তো দাও আর নয়তো বলো, চলে যাই।

তখোন যা কিছু ফল-মূল ছিলো ঘরে তাই হাত বাড়িয়ে ঝুলির মধ্যে দিতে যান সীতা। সন্ন্যিস সে-ভিক্ষে নিতে চান না। বলেন, আমার ব্রত আছে। আশ্রমে থেকে ভিখ্যে দিলে নিই নে। এই বোলে সন্ন্যিসী পা বাড়ান। এবার আরো মুশকিলে পড়ে যান সীতা দেবী। লক্ষ্মণের মানা গণ্ডি ডিঙোনো। কী কোরে ঘরের বের হবেন তিনি? আবার অতিথিকেই বা ফিরোবেন কী কোরে? এবার সাঁই পণ্ডিতের মুখে সুর হোয়ে বেরোয় রামায়ণী শোলোক :—

"জানকী ভাবেন ব্যর্থ অতিথি যাইবে।
ধর্ম-কর্ম ন হবে প্রভু কী বলিবে।।
ফল হাতে বাহির হলেন জানকী।
লইতে আইল দুষ্ট রাবণ পাতকী।"

লক্ষ্মণের মানা না মেনে গণ্ডি ডিঙিয়ে সীতা বাইরে এলেন। বুঝলে ময়না, ক্যানো এলেন ভিখ্যে দিতে? অতিথি শুধু-শুধু ফিরে যাবেন। ধর্ম-কর্ম নষ্ট হবে সে-ভয়েই।

এ-কথা শুনে ময়নার বুকের মধ্যেকার একখানা ঝুলন্ত ভারী পাথর নেমে যায়। লক্ষ্মণের নিষেধাজ্ঞা লংঘন কোরে গণ্ডি পেরিয়ে সীতা এসেচেন নিষিদ্ধ এলেকায়। কেবল মাত্তর অতিথি ফেরানোর ভয়ে। এ-কাহিনী ময়নার খুবই

ভালো লাগে। সীতার জীবনের অনুরূপ ঘটনার মিতালী ঘটবে ওর জীবনে। বহু যুগের দেওয়া সামাজিক গণ্ডি উৎরে পেরেচে আতিথ্য দিতে। ধর্ম-কর্ম রখ্যে হোয়েচে ওর। সীতার মতন সে-ও অতিথিকে ফেরায় নি। সে ভাগ্যবতী। সীতার চেয়েও ভাগ্যবতী মনে করে ময়না নিজেকে। কেন না সীতা আতিথ্য দিয়েছেন চোরাবেশী কপট অতিথিকে। আর ময়নার আতিথেয়তা দেওয়া সত্যিকারের সাধু-বুভুখ্যু-তৃষাতুরকে। নাকের ডগা ঘেঁষে মারণ-তীর ছুটে গেছে ময়নার। যদি এ-রাতের অতিথিকে ঐ সামান্যতম আতিথ্যটুকুন না দিয়ে ফেরাতো কী হোতো তা হোলে? এ-রামায়ণ-কাহিনী শক্তিশেলের মতনই বিঁধতো ময়নাকে।

ঝলমল কোরে ওঠে ময়নার কপাল। জিগ্যেস করে,—তারপর? তারপর কী হোলো?

—আবার কাল হবে। রাত পোহায়ে গেছে। আজ আর না। সাঁই পণ্ডিত বলেন।

ময়না বুঝি গাছ থেকে পড়ে। বলে, সে কী! রাত পুইয়ে গেছে! কই কুঁকড়ো পাখি "বাগ" দিলো কই? বিল-কাঁধায় শিয়াল ডাকলো কই? এর মধ্যি রাত পুইয়ে গেলো!

মেটে ল্যাম্‌পোটা তখোনো টিমটিম কোরে জ্বলচে। সাঁই মশাই ফুঁ দিয়ে সেটা নিবিয়ে দেন। এবার বেড়ার ফাঁক দিয়ে চোখ চায় ময়না। দ্যাখে, তারা বিরল ফ্যাকাশে পুব আকাশ। মন্টু ঠাকুরদের লম্বা নারকেল গাছটার মাথায় কেবল শুকতারাটাই দপ্‌দপ্‌ কোরচে। অতলছোঁয়া রামায়ণ-সমুদ্রে ময়না ওর দেহ-মন নিয়ে এমনি তলিয়ে গিয়েছিলো যে দীর্ঘরাত তার অগুনতি শব্দ-সম্ভার নিয়ে চুপে-চুপে কখোন চলে গেল ও টেরই পেলে না তা।

সুস্থ হোয়ে ওঠে সতীশ। খুব ধীরে ধীরে নয়। বরং তাড়াতাড়ি কোরেই।

টাইফয়েডের ধরণ-ছাড়ন মানে আক্রমণ থেকে আরোগ্য পর্যন্ত এ সব জাতের ঘরে এক রকম আলাদা রকমের। সে-জ্বর এ সব ঘরে আসে বুঝি একদম রূপ বদল কোরে। আবার যায়ও তেমনি। তাই তার দাওয়াই-পত্তর, সেবা-শুশ্রূষার তোয়াচও করা হয় ভিন্ন রূপ-রসে। সে-রূপ-রসের ক্ষীরছাঁচ-চন্দরপুলি ওদেরি রুচির ছাঁচে বানানো। এর থেকে প্রমাণ করা যায়—অতিথির মতন রোগকেও খানিকটে চলতে হয় দেশ-কাল-পাত্তরের প্রভাব-পরিবেশের অনুবর্তিতায়।

সতীশ আবার নিয়মিত ইস্কুল কোরচে। এবার সে একলা না। ইষ্‌টম্‌কেও বাগিয়েচে। বাগিয়েচে ও নয়, সাঁই পণ্ডিত। পণ্ডিতের অবিশ্যি টারগেট ছিলো শশী, নিরো, বোষ্‌টম্‌দের ওপোরও। কিন্তু ওরা পাকা এঁড়ে। তাই চোঁচ বসাতে পারেন নি। ইষ্‌টম্‌ ওদের চারজনের ছোটো। তবু পণ্ডিতী বুদ্ধিকে হিমসিম খেতে হোয়েচে ওকে পাঠশালায় ঢুকোতে। এমন কি হ্যান্‌ড্‌ নোটের বয়ান মাফিক প্রতিশ্রুতিও দিতে হোয়েচে সাঁই পণ্ডিতকে, ও যেতে চাওয়া মাত্তর ছেড়ে দিতে হবে। কী তেলীর পুকুরে কী মালীর বাগে শিকারে যাওয়ার অবাধ অধিকার। এমন কি গোদানো অধ্যুষিত অঞ্চল যে-বুড়ি ভদ্দরের তীর, সেখানকার বড়ো শিকারপর্বে হোগোলপাত ছুরি চালানোর ওপোর চলবে না হস্তক্ষেপ করা।

সেদিন সতীশকে কথা দিয়ে যাওয়ার পর শশী রোজ এসে একবার কোরে দেখে যায় ওকে। এখোন সতীশ সুস্থ। পাঠশালায় যায়। শশী কিন্তু তবু ফেল করে না একদিনো আসতে। শুধু তাই না, একখানা গুল্‌তিও দিয়ে দিয়েচে ওকে। যদিও গুলতিখানা পুরানো। কিন্তু সতীশের ট্রেনিং পিরিয়ড্‌টা আটকাবে না ওতে। তারপর নোতুন গুল্‌তি বানাতে আর কতকখন? সে-দায়-দায়িত্বও ঘাড়ে নিয়েচে শশী।

শনিবার হাফ ইস্কুল। তাই এ-দিনের একবেলা আর রোববারের পুরো দিনটা চলে ওদের ট্রেণিং। তা ছাড়া এর ফাঁকে ছুটি-ছাটা থাকলে তো আর কথাই নেই। উঠোনের দখ্যিণ বাড়ের সজনে গাছের গায়ের গোল-গোল শাদা দাগগুলো জরোজরো হোয়ে ওঠে গুলোলের গুলীতে। সজনে ছালের ঝাঁঝালো গন্ধে চোখ জ্বলতে থাকে গোটা পাড়ার। লখ্য বিঁধতে পারা-না পারার হৈ-হুল্লোড়ে গোল্‌জার থাকে ময়নাদের বাড়ী। শশীর অর্জ্জুন-সাধনার সাথে শিশু সতীশের একলব্য-নিষ্ঠার সমন্বয়। যার ফলশ্রুতি আনে ওদের ত্বরান্বিত ডাক মালীর বাগে কুকো পাখি শিকারে।

সেদিন শুক্কুরবার। ছুটি-ছাটা নেই। তবু কিন্তু শিকারের অত্যুগ্র নেশা ওদের ইস্কুল কামাই করায়। এবার কিন্তু ওস্তাদ শিকারী শশীর তরফ থেকে অনুরোধ আসে না। আসে নয়া শিকারী সতীশের থেকে। সে ধোরে বসে, শশে, যাবি মালীর বাগে পাখি মারতে? ওখেনে খুব কুকো পাখির আমদানি। কুকোর মাংসয় যা চবর! সাথে সাথে ওর মুখ থেকে অব্যক্ত এক শব্দ বোরোয়। লাল আসে কুকো পাখির মাংস লোভাতুর জিবেয়। বলে, যাবি শশে? চল

যাই।

শিকার-ধর্মের আদিম-প্রবৃত্তি শশীতে দানা বেঁধে গেছে। তবু সে পরীখ্যে করে সতীশকে, কিন্তু তোর মা যে বোকবে? ইস্‌কুল কামাই কোরলে? তার কী? আর সাঁই পণ্ডিত যা রাগী। কাল ইস্‌কুলে ঢুকলে একদম ছাগোল ছোলা ছুলে ফেলবে তোরে।

ভাবনার ছায়া পড়ে সতীশের কপালে। মুখ কাঁচুমাচু কোরে জবাব ছায় সে, সাঁই পণ্ডিত টের পাবে না। বোলবো—অসুখ কোরেছিলো।

—কিন্তু খুড়ী টের পাবে যে?

—না মনে। ইস্‌কুলে যাবার নাম কোরে শেলেট্‌-দপ্তর নিয়ে বোরোবো। মা ভাববে, আমি ইস্‌কুলে গেছি।

শিশু সতীশের উপস্থিত বুদ্ধির এ-চটপটে জবাবের তারিফ করে শশী। ওর কুয়াশাচ্ছন্ন মনের একটা কোণ স্বচ্ছ হোয়ে ওঠে এখোন। সতীশ ওর অনেক ছোটো। তাই ওর অবর্ত্তমান সতীশের মতন যোগ্য পাত্রে রেখে যেতে পারবে ওর শিকার-প্রতিভার উত্তরাধিকার। কারণ ইব্‌টম-বোষ্‌টমদের দিক থেকে শশী একদম নিরাশ। আগ্রহ থাকলেও শিকারীর মৌলিক শক্তির পরিচিতি নেই ওদের কারো মধ্যে। শশী আর কথা কাটাকাটি কোরতে চায় না। বলে, ঠিক কথা বোলেচিস্‌ তুই সতে। তোর খুব মাথা আছে রে। আমিও ঠিক ঐ-যুক্তি খাটাচ্চিলাম। ইস্‌কুলে পড়ে তুই তো আর সাঁই পণ্ডিতের মতন মাষ্‌টারী কোরবি নে। বরং আমার মতন কুকো পাখি মেরে বেড়াবি। তাই না? চল্‌ তবে। তোর কথা-ই থাকল।

সতীশ অভিযোগ করে, কিন্তু আমার গুল্‌তি তো জুত-সই না। আমাকে ভালো দেখে একটা গুল্‌তি দিবি তো শশে?

দ্বিধাহীন উত্তর শশীর, আমারখান-ই তোকে দেবো। ক্যামন?

আহ্লাদে আটখানা সতীশ। তবু সে নিছক স্বার্থপরের মতন থাকতে পারে না। একবার শশীর কথাও চিন্তা করে, কিন্তু তুই। তুই মারবি কী দিয়ে?

—আমি? আমার একখান হোলেই হোলো। তোর ঐ পুরোনোখানা আমি নেবো।

এ-কথার তাৎপর্য বুঝতে দেরী হয় না সতীশের। মানে শশী ওস্‌তাদ শিকারী। ওর শিকার বাগানো নোতুন-পুরোনো গুলতির অপেখ্যা রাখে না।

আর অব্যর্থ সন্ধান হোলেই হোলো।

এরপর ধনুক বদলাবদলি কোরে নেয় ওরা। ভাটি-ঝোপের মধ্যে শেলেট্-দপ্তর লুকিয়ে রাখে সতীশ এবং আরেকবার প্রমাণ কোরে ছায়—মানুষের আদিম প্রবৃত্তির জয় চিরন্তন। ইষ্‌টম্-বোষ্‌টম্-নিরোরা-ও ভিড়োয় ওদের দল।

সোনামুখীর পুব উত্তর পাড়ে মালীর বাগ। ফলের মরশুম আসে। বন-মাতা পাকা ফলের সৌরভ-লিপি দিয়ে ডাকপিয়ন বাতাসের মারফতে আমন্ত্রণ পাঠান পাড়ায় পাড়ায়। সে আমন্ত্রণে সব পাড়া সাড়া ছায়। আসে সব পাড়ারা। এক মাত্তর মুচিপাড়া ছাড়া। বন-মাতা অবিশ্যি শ্রেণীহীন সমাজ নিমন্ত্রণ করেন। তবে মুচিপাড়া কেন আসে না? ইচ্ছে কোরে আসে না? তা নয়। এ-ভোজ-সভায় ওদের পঙ্‌তি ভোজনের অধিকার নেই। তবু কিন্তু এ-আমন্ত্রণ-লিপি প্রত্যাখ্যান করে না ও-পাড়া। লোক চোখের তীক্ষ্ণ পাহারা এড়িয়ে মায়ের দেওয়া সে-প্রসাদ নিয়ে আসে। অবিশ্যি দৈবাৎ এ চুরি বিদ্যে ফাঁস হোয়ে যায়। তখোন এ-অনধিকার প্রবেশের নিষ্ঠুর মূল্য দিয়ে আসতে হয়। এ-মূল্য আদায় হয় বাবুর বাড়ির চাকোরদের মারফতে। এটা ফলের মরশুম না। তাই ঢোকার ছাড়পত্র অবাধ। ফলের মাসে বিশাল বিস্তৃত এ-বনের তলা উঠোনের মতন তকৃতকে ঝকৃঝকে ছিলো। অগুন্তি পা-চলা সরু রাস্তা সাপের মতন হিল-বিলিয়ে ঢুকেছিলো এ-বাগানে। খাড়া করা হোয়েছিলো অ-গোনা মাচা-টোঙ্। অনেক-গুলো চেরা বাঁশের পট্‌পটে পোতা হোয়েছিলো। মানুষ চোর, বাদুড় চোর, রাত চরা পাখি চোর, সব রকম চোরদের থেকে ফলের স্বত্ব কায়েম রাখতে। আজ ফলেরা বৃন্তখসা। সে-সাথে বিধি-নিষেধও খসে পড়েচে। ভেঙে-চুরে গেছে টোঙ্-মাচানগুলো। হেলে পড়েচে পটপটের বাঁশ। আর সাপ বাঁকা রাস্তা, ঝকৃঝকে গাছতলা যদিও আগলে বোসেচে গুল্ম-লতার ঘন ঝাড়রা, তবু সে-পথ, সে-মাটি অছুৎ নয় এখোন।

শশীর চোখে এ-বাগ পুরোনো; একঘেয়ে। কতো রকমের লুকোচুরি খেলার এ-বন। মানুষের চোখে লুকিয়ে করে ফল চুরি। কাঠ চুরি। পাখিদের চোখে ধুলো দিয়ে বানায় ওদের শিকার। সতীশের কিন্তু নোতুন দেখা এ-মালীর বাগ। খুবই ভালো লাগচে ওর। কোথায় সাঁই পণ্ডিতের সে-পাঠশালা? আর কোথায় এ-গহন অরণ্যানী! অসীম বিস্তৃতি। অর্থে বর্ণ-সমুদ্দুর। এখানে সীমানার মানা আপনাকে শামিল কোরে দিয়েচে হোরেল ঘুঘুর পাখনার

নির্বাধ গতিশীলতায়। সাঁই পণ্ডিতের মতন বেড়ার পরে বেড়া দিয়ে খোঁয়াড় বানায়নি কেউ এখানে। পয়লা নম্বর চাঁচের বেড়া। দু-নম্বর নিয়ম-নীতির আরো শক্ত বেড়া। যার আটক ডিঙোনো দুষ্কর। অনুজ্ঞা ব্যতিরেকে পা বাড়ানোর রাস্তা নেই। পেচ্ছাপ করা থেকে নাকঝাড়া-মোস্তা ভিজোনোর পর্যন্ত রাজিনামা নিয়ে তবে পেরোতে হয় ওই গণ্ডি। সাঁই পণ্ডিতেরি মুখে শোনা রামায়ণে লক্ষ্মণের দেওয়া সীতাকে আটকে রাখা গণ্ডির মতনই। সীতার মতন ঐ—ও গণ্ডি পেরিয়ে এসেচে। আর ঢুকবে না ওর মধ্যে। আদিম বন্য প্রবৃত্তি এমনি পাখনা মেলে ঢেকে ফেলেচে শিশু সতীশকে।

—শশে, শশে হুদ্দ্যাখ। দেখেচিস্ ?

ফিসফিসিয়ে বলে ওঠে সতীশ।

—কই না তো। শশীর ভাটার মতন চোখ ফালুক-ফুলুক কোরে তাকায়।

—উ-ই যে। তুই কি কানা শুকুর ? আমার আঙুল সন্দেসন্ধি তাকা।

লখ্য বস্তু নিরীখ কোরে তর্জনী তোলে সতীশ।

এবার শশীও দেখতে পায়। বন-কাঁকরোলে আর মাকালের লতারা আম গাছ বেয়ে উঠে নিরালা এক ঝোপ রচনা কোরেচে।

তারই মধ্যে বোসে ডাকচে এক কুকো পাখি। দাঁড়কাকের মতন ডাগর। খয়েরী রঙের পাখনায় গা-ঢাকা। ঘাড় মাথা কালো। এতো মোটা কুকো সচরাচর চোখে পড়ে না। বিষম মুশকিলে পড়ে শশী শিকারী। সে যদি একলা হোতো গাছের পাখি গাছতলায় লুটোপুটি কোরতো এতোখ্যন। ইষ্‌টম্‌-বোষ্‌টম্‌দের জন্যও বাধতো না। বাধচে সতীশের জন্য। সতীশ নয়া শিকারী। এই তার জীবনের প্রথম অভিযান। এক মাত্তর সজনে গাছছাড়া এ পর্যন্ত একটা শিকারও বেঁধেনি ওর হাতে। এই তার নোতুন লখ্য যদি ফসকে যায় তবে ওই চালাক পাখিটাকে এ মুল্লুকে আর মিলবে না। ব্যর্থতার গ্লানি তখোন গুলতির গুলীর চাইতেও বেশী বাজবে নতুন শিকারীর বুকে। অন্য দিকে সতীশের শিশু প্রেরণাকেও যদি মুসড়ে দেওয়া হয়, সে আঘাতও বাজবে না কমখানি। এ দুই সংকটের মাঝখানে হাবুডুবু খেতে থাকে শশী শিকারী।

কিন্তু দেরি করাও আর চলে না। দলবলের কোলাহলে পাখি এখুনি পালাবে। এমন সময় সতীশই ওই আবর্ত থেকে উদ্ধার করে শশীকে।

—এই শশে, মারবো ?

—পারবি তো ? ইতস্ততঃতায় আভাসিত শশীর মুখখানা।

ঘাড় কাৎ কোরে সম্মতি জানায় সতীশ। আর চোখের পলক ফেলা মুহূর্তে ধনুকের ছিলায় অব্যক্ত এক শব্দ সৃষ্টি কোরে থরথর কোরে ছিলাটা কাঁপিয়ে দিয়ে গুলী ছোটে এবং গাছের পাখিকে পেড়ে আনে গাছতলায়। গুলীর আঘাতে তার মাথাটা থেঁৎলে গেছে একদম। মাটিতে লুটিয়ে পড়ে থরথর কোরে কাঁপছে দেহটা। পাখনা ঝাপটানোর জো পর্যন্ত নেই ওর। ইষটম্ ছুটতে ছুটতে গিয়ে শিকার টেনে তোলে আর আহ্লাদে আটখানা শশী নোতুন শিকারীকে ওর বুকের মধ্যে টেনে নেয়। শিষ্যর এ সাফল্যে গুরুর বুকখানা চওড়া হোয়ে উঠেচে। তার ধারণা ভুল নয়। শশীর অবর্তমানে প্রতিভাশালী শিকারীর অভাব হবে না এ পাড়ায়।

এবার সতীশকে আগে কোরে নিয়ে পেছন পেছন চলে শশী। আর ওর পেছনে ইষটম্-বোষটম্। বয়েসের দিক দিয়ে কনিষ্ঠ হোলেও আজকের এ-শিকারীদলের অধিনায়ক হবে সতীশ, এটাই চেয়েছিলো শশী। সে ইচ্ছেটা আরো বলীয়ান হোয়েচে নয়া শিকারীর আশাতীত সাফল্যে।

কচুড়ি-শীষ আকন্দ এবং আরো অনেক রকমের নামী-অনামী গুল্মবন পায়ে দলে, গুড়ি মেরে চলেচে ওরা। দু হাতে ছিঁড়চে ঢোল কলমি-বনপুঁই ছোটো ইশা-বড়ো ইশার ডগা। আর মাথা গলানোর মতন পথ বানিয়ে নিচ্চে। গুল্মলতার গন্ধে ভুর-ভুর কোরচে ওদের সারা গা। ভরে গিয়েচে সবার মাথা ছেঁড়া লতাপাতার কুচোয়, ছিন্ন ফুলের পাপড়ি পরাগে। সতীশের পিঠের ওপোর ইঞ্চিখানেক কোরে লম্বা দু তিনটে পাতা রঙের তুলতুলে নরম পোকা হামাগুড়ি দিয়ে বেড়াচ্চে। শশীর পেছনের কাপড়ে লেগে গেছে কতকগুলো কমলালেবু রঙের গোল গোল ছোটটো পোকা। বিন্দুর মতন কালো ফুটকুলি দেওয়া গায়। সবুজ রঙের একটা গাঁদীপোকা এই মোত্তর উড়ে এসে বোসল বোষটমের ঘাড়ের মাঝখানে। কুটকুট্ কোরে কামড়ানোয় সেটা ডলে মারে বোষটম্। তীব্র ঝাঁঝালো গন্ধে ওর হাত ভরে ওঠে। একটা মাঝালি পিঁপড়ে ইষটমের কোমরের ধারে ঘুরে বেড়াচ্চে। কামড়ে দিয়েও থাকবে বুঝি। তাই খানিকটে জায়গা ফুলে উঠেচে। জ্বলচেও বৈকি। কিন্তু খেয়াল নেই সেদিক পানে। বন দলমাদল কোরে চলেচে শিকারীর দল। লম্বা-খাটো পাওয়ালা রকমারি বর্ণের ফড়িঙের ঝাঁক ঘা পেয়ে হালকা পাখনায় মৃদু আওয়াজ সৃষ্টি কোরে পাতা থেকে পাতান্তরে,

একডগা হোতে অন্য ডগার আগায় গিয়ে বোসচে। একজোড়া নাগরভাটা ঝুপটি মেরে লুকিয়ে ছিলো সতীশের একেবারে পায়ের গোড়ায়। ওদের চমক লাগিয়ে ভর-র-র কোরে এক জোরালো শব্দ তুলে ডানায় বেশ কয়েক গজ দূরে উড়ে গিয়ে বসে। তারপর গুড় গুড় কোরে ঢোকে এক ঝোপের মধ্যে। শিশু শিকারী অবিশ্যি ঐ তীব্র গতিশীল পাখি নিরীথ কোরে গুলী চালল। কিন্তু ঘায়েল করতে পারল না। পারতো যদি না নাগরভাটা ঝোপের মধ্যে না ঢুকে, সমান্তরাল দুর পাল্লায় পাড়ি জমাতো। আরো দু তিনটে নাগরভাটা ইষটম্-বোষটম্দের পায়ের ফাঁক গলিয়ে গুড় গুড় কোরে কোথায় যে ঝোপেঝাড়ে পালিয়ে গেল, তার আর হদিস মিলল না।

শশীর গোল গোল চোখ জোড়া নাগরভাটার আঁকা-বাঁকা পালানোর পথের সাথে সমতা রেখে ঘুরল যতোখ্যন না তারা ঝোপ-ঝোপনের আড়ালে হারিয়ে গেল। তারপর আপশোস কোরে মন্তব্য করে, সতে রে, নাগরভাটার মাংস যা খেতে না! মাংস না তো যেন নরম তুলো। কুঁজবক-ঝুটকুলি পাত্তা পায় না।

শশীর এ-মন্তব্যর প্রতিবাদ না কোরে পারে না সতীশ। কেননা ও প্রায়ই শোনে, মাংসর ব্যাখ্যায় শশী পঞ্চমুখ। তেড়ো, বালুই, মাছাল, যাকে যখোন প্রশংসার-চরমে পৌছে ছায়। তাই শশীর রুচির স্থির সিদ্ধান্ত সতীশের অজানা।

সে প্রশ্ন করে, আচ্ছা শশে, হোরেল ঘুঘুর মাংস ক্যামন রে? কুঁজবক, ঝুটকুলির চাইতে ভালো না? হোরেল ঘুঘুর সামনে নাগরভাটা দাঁড়াতে পারে?

বিষম মুশকিলে পড়ে যায় শশী। জলের মতন এ কথার জবাব দিতে পারে না ও। তুলনামূলক বিচারে হোরেল ঘুঘুকে নাগরভাটার নীচেয় রাখতে বাধে ওর।

আমতা আমতা কোরে উত্তর ছায়, তা ঠিক। দাঁড়াতে পারে না। তবে হোরেল ঘুঘুর পরেই নাগরভাটার ঠাঁই।

সতীশ প্রতিবাদ করে, না মনে। আমার ধারণা হোরেল ঘুঘু, কাঁক, সরাল, বেলে হাঁস এদের সবার নীচেয় নাগরভাটা। ওরা সব পাখিরা থাকে গাছে। আর নাগরভাটা গাছতলায়। গাছে আর গাছতলায় যেমন তফাৎ মাংসর বেলায়ও ঠিক ততোখানি।

সতীশের এ উপমা-শক্তি তাজ্জব বানিয়ে ছায় শশীকে। সে বোঝে, সাঁই পণ্ডিতের পাঠশালায় পড়ার ফল-এ। হেসে উঠে বলে, তুই হোলি ইস্কুলের

পোড়ো। কথার বাহারে তোর সাথে পেরে ওঠা দায়।

ছাতরানো এক আমগাছতলায় এসে পৌছয় ওরা। মালীরবাগের সব চাইতে বড়ো আমগাছ—মিছরিদানা। আকারের দিক থেকে নয় মাত্তর। প্রকারের দিক থেকেও। এক একটা ফল এক একটুকরো মিছরি। এই মিছরিদানার তলায় পা দিতেই শশীর বুকখানা ধড়াস কোরে কেঁপে ওঠে। এই কেঁপে ওঠার এক ইতিহাস আছে। মিছরিদানা ভেঁসে ওঠার সাথে সাথেই সরকারবাবু নিজেই এসে আড্ডা গাড়েন তলায়। এমন কি সরকার গিন্নীকেও দেখা যায় হামেশা। রাতে গাছের মাথায়—'হ্যাজাক' জ্বলে। চাকোররা পটপটে বাজায়। কিন্তু যে মিছরিদানা সরকার গিন্নীকে পর্যন্ত বাগে টেনে আনতে দ্বিধাবোধ করে না, সে রিশি পুত্তুরদের পরোয়া করতে যাবে কোন্ খাতিরে? তারা আকৃষ্ট হয় মিছরিদানায় এবং আইনের কড়াকড়ির সাথে সাথে মানুষের আইন লংঘনের বুদ্ধিও যেমন সমান তালে পা চালায় মুচিপাড়ার ছেলেরাও তেমনি শ্যেন-চোখের পাহারার সাথে পাল্‌লা দিয়ে আম চুরির রাস্তা আবিষ্কার করে। কবি গুরুর 'রাখালে'র পিতার মতন জগতের সব পিতা নয়। মুচিপাড়ায় তো তেমন পিতা নেই বোললেই হয়। যারা আমের সাথে দাম দিয়ে পাঠিয়ে ছেলেকে মাপ চাওয়ায়ে আনবে। তারা বরং বর্তে যায় ছেলেরা যদি সাফল্যের সাথে আম চুরি কোরে আনতে পারে এবং চুরি বিদ্যে বড়ো বিদ্যে আরেকবার নোতুন কোরে এ দৃষ্টান্ত স্থাপন কোরতে পারে। কিন্তু এ বিদ্যে মাঝে মাঝে ফাঁস হোয়ে যায়ই। তখোন বেজায় মুশকিল।

নীলমণির পরেই রিশিপাড়ার পাকা চোর ছিলো খুদিরাম। সে নাকি 'লুকুই মন্তর' জানতো। পাহারাওয়ালাদের চোখে ধুলো দিয়ে এই মন্তর বলে মিছরিদানার আম পেড়ে নিয়ে চুপিসারে চম্পট দিতো। হ্যাজাকের জ্বলজ্বলে আলোয় প্রত্যেকটা আমের থোল্ পষ্ট গণে নেওয়া যেতো। মিছরিদানার পেছন ধারে আরেকটা লম্বা আম গাছ ছিলো। পাহারাদাররা প্রথম রাতের দিকে পটপটে ঠেঙিয়ে হাঁকাহাঁকি কোরে ভারি রাতে মাচায় বোসে ঝিমোতো। ঠিক সেই ফাঁকে খুদিরাম ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে এসে ঐ লম্বা গাছে উঠতো। হাতে থাকতো নল। আগায় বাধা 'জালী'। মানে দড়ির থলে। এ-গাছ থেকে নল চালাতো ও গাছে। থলে ভরতি হোয়ে উঠলে সুড়সুড় কোরে নেমে দে চম্পট। দুর্ভাগ্যক্রমে এ পলিশি একদিন ফেল্ কোরল। থলেও ভরতি হোয়েছিলো এবং নাগালের মধ্যে

এসেও পৌঁছেছিলো আর কি! এমন সময় মড়াৎ কোরে ভেঙে গেলো লগাটা। আর রাম সিং পাহারাওয়ালার নাকের ডগা ঘেঁষে ঢপাৎ কোরে পায়ের গোড়ায় পড়ল থলে ভরতি আম!

'কা হুয়া!' বোলে চেঁচিয়ে ওঠে হনুমান তেওয়ারী। ঝিমন্ত রাম সিং সটান খাড়া হোয়ে দাঁড়িয়ে যায়। ঝুপ কোরে তলায় লাফিয়ে পড়ে খুদিরাম তো দে ছুট। কিন্তু মোটা একটা মাকালের লতায় পা জড়িয়ে যায়। সে ফাঁকে তেওয়ারী ওর মাথা নিরীখ কোরে সাড়ে তিন হাত লাঠি ঝেড়ে ছায়। অজ্ঞান হোয়ে ঢলে পড়ে খুদিরাম। মাথা কেটে ঝোঁঝালে রক্ত ঝরতে থাকে। পরদিন ধরাধরি কোরে ওকে বাড়ি নিয়ে যায় সব। সে জ্ঞান আর ফেরে নি।

সরকার মশাই গাঁতিদার মানুষ। আবার নায়েব এবং যে জমিদারবাবুর কর্মচারী তিনি, তাঁদের বছরে উনিশটে কোরে খুনের পারমিশন দেওয়া ছিলো সদাশয় বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের থেকে। সুতরাং অগস্ত্য মুনির বাতাপী রাখ্যোস হজমের মতন খুদিরাম হজম হোয়ে গেল! বাবুদের হজমী গুলীতে এমন অনেক খুদিরাম হজম হোয়েচে প্রজা মহলে। এ অবিশ্যি অনেককেলে ঘটনা। শশীরা তখোন হয়নি। কিন্তু ইতিকথা আজো তা ভুলে ফেলে নি। এ হেন কুখ্যাত মিছরিদানার তলায় এসে শশী শিকারীর বুকখানা না কেঁপে পারে? যদিও এটা ফলের মরশুম না। তবুও? কিন্তু শশী শিকারী ছাড়াও আরো অনেকের বুক কাঁপতো। সেটা অন্য কারণে। অবিশ্যি খুদিরামকে কেন্দ্র কোরেই এ বুক কাঁপার কাহিনীটা গড়ে উঠেছিলো। মিছরিদানার ফল-ভোগে বাদ সেধেছিলো যারা, তাদের প্রতিফল সে দেবেই দেবে। অনেককে স্বপ্নে দেখিয়েচে, সে ভূত হোয়ে এক গোদানোর সাথে মালীর বাগে আছে। ফাঁক পেলেই সরকার মশাই-এর ঘাড় মটকে রক্ত খাবে। অবিসম্বাদী ফলের উপস্বত্ব সে ভোগ কোরতে দেবে না। তাই এ খুদিরাম ভূতের ভয়ে বেলা ডোবার পর বড়ো কেউ এ বাগের দিকে পা বাড়াতো না। তবে মুচিপাড়াকেই সবচেয়ে বেশী কোরে পেয়ে বোসেছিলো ঐ ভূতের ভয়।

পাঁচ পাঁচজোড়া চোখ ফালুক-ফুলুক কোরে পাখি খুঁজচে। মিছরিদানার ডালে-উপডালে। ঘন পত্রকুঞ্জের মাঝ থেকে পাখির গান ভেসে আসে কানে। কিন্তু পাখি দেখা যায় না। বেশ খানিকখ্যণ কেটে যায়। সতীশের ধারালো চোখ আবিষ্কার করে, গাছের অচ্ মটকায় একটা সরু ছিটকী ডালে একজোড়া হোরেল ঘুঘু বোসে ফিরফিরে বাতাসে দোল খাচ্ছে।

—উই ভ্যাখ, শশে।

সতীশ বলার আগেই শশী দেখে ফেলেচে এবং চিন্তা কোরচে—কী কোরে দুটো পাখিই ঘায়েল করা যায়। কিন্তু গুলতি বাঁশ দিয়ে তা হয় না। সে সম্ভব হয় বন্দুক হোলে। আরো হোরেল যোড়া বড্ডো বেয়াড়া জায়গায় বোসে আছে। সরু মোটা ডালরা এমনি গা ঘেঁষাঘেষি হোয়ে আছে যে, একান্ত নিখুঁত নিরীখ না হোলে শিকার ফস্‌কে যাবেই। পাখি পেড়ে আনার বদলে ডালে প্রতিহত গুলী চুর্ণ-বিচুর্ণ হোয়ে তলায় পড়বে।

—কী কোরবি সতে? বড্ডো বে-কায়দা। পারবি? সাহস হয়? প্রশ্নকর্তা শশী।

শশীর এ প্রশ্নে আকাশ থেকে পড়ে সতীশ। বলে:

—তুই বোলিস কী শশে? সাহস হয় না! ক্যানো?

—যে ঠাসাঠাসি ডাল। মোটেই ফাঁক নেই।

—গুলতির গুলী চলার মতন ফাঁক খুব আছে রে। এই দ্যাখ্ তবে। এই বোলে কোচড় থেকে গুলী নিয়ে কান পর্যন্ত টেনে ধরে গুলতির ছিলা।

—রাখ্। সবুর কর।

কইতে কইতে শশীও গুলী বের করে। বলে, দু'জনে দুটো পাখি মারি আমরা। ক্যামন? ডান ধারেরটা তুই মার। আর বাঁ ধারেরটা আমি। কী বোলিস?

খুশীতে ঝলমল করে ওঠে সতীশের মুখ। ঘাড় কাৎ কোরে রাজিনামা দ্যায় সে। ডান পাশের পাখিটা বোসেছিলো খুব বে-কায়দায়। ঘায়েল করা বেজায় শক্ত। তাই শশীর ধারণা ছিলো, ঐ-শক্ত ভার সতীশের কাঁধে চাপালে ও নিশ্চয় মুখ কাঁচুমাচু কোরবে। কিন্তু এখোন ওর খুশীর রাজিনামা সে ধারণা উল্টে দ্যায় এবং কল্যাণকামী চোখ চায় শিশু শিকারীর আপাদ-মস্তক। আজকের ঐ শিকারপর্ব সম্পর্কে সফল-বিফল হওয়াটা বড়ো কথা নয়। প্রশ্‌ন হোচ্চে, ঐ ছোট্টো বুকটার মাঝখানে যে বিশাল প্রশস্তি রয়েচে তার তারিফ না কোরে কি পারে শশী শিকারী?

এর পরেই থরথরিয়ে কেঁপে ওঠে ছিলা-তার। আর চোখের পলক পড়ার চেয়েও কম সময়ের মধ্যে ঝপ্ কোরে তলায় এসে পড়ে পাখি-দম্পতি। আশ্চর্য হাত সতীশের। প্রথম শিকারের মতন একই লখ্য পর্যায়ে নিহত ওর দ্বিতীয় শিকার। মাথাটা থেৎলে গেছে। পড়ে আছে এক খামচা তুলোর

মতন। শশীর শিকারও আয়ত্তের মধ্যে। কিন্তু তার লখ্যভেদ নিখুঁত হয়নি। ঘাড় ভাঙা পাখি ডানা ঝাপ্টে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওস্তাদ শিকারীর লখ্য শিকার কব্জা করা। তাকে যাতনা দেওয়া নয়। নিরো ছুটতে ছুটতে গিয়ে পাখিটা ধোরে ফেলে। বোষটম্ অন্য পাখিটা কুড়িয়ে নেয়।

ইষটম নক্শা কোরে টেনে টেনে বলে, সতের পাখি ছোটো। শশের পাখি বড়ো।

কথাটা কিন্তু সম্পূর্ণ উল্টো। সতীশের পাখিটাই ডাগর বেশি। ও-কথার কোনোই প্রতিবাদ করে না সতীশ। ওর চোখ আবার আম গাছের মটকায় উঠে গেছে এবং দো-ডালার ফাঁকে পাতার আড়ে-আড়ালে খুঁজচে হোরেল ঘুঘু।

—ওরে, এখেনে আর হবে না। এগিয়ে চল ওদিকে।

—ক্যান্ রে? বিস্মিত সতীশ প্রশ্ন করে।

শশী জবাব দ্যায়, জানিস নে তো। হোরেলের যুড়ী ঘাগু পাখি আর নেই। একটা মারা পড়লে, ঝাঁক সুদ্দু মুল্লুক ছাড়বে।

—তাই নাকি? কিন্তু ঐ যে ডাকচে।

—ওরে, ও হোরেল না। অতো বোকা হোরেল ঘুঘু? ও ঝুলকুলি-মুটকুলি, ফুগদী-মুগদী।

আর প্রতিবাদ করে না সতীশ। জীবনের দুটো লখ্যভেদই ওর অভ্রান্ত হোয়েছে খাঁটি কথা। তবু ও তরুণ শিকারী। পাখি তত্ত্ব সম্পর্কে ওর বিদ্যে-বুদ্ধির দোড় ছোট্টো টুনটুনি পাখির মতনও পাখনা মেলতে পারে নি।

কষাড় বন-পুঁই, ঢোল-কলমি আর দোড়ে লতার বন ঠেলে আবার যাত্রা শুরু কোরেচে তরুণ শিকারী দল। নিরুপদ্রব আওতায় ঘা পেয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে চলেচে পোকা-পতঙ্গরা। গাঁদীপোকা, ধানী পোকা, বেঁশো পোকা। গঙ্গা ফড়িং, শামা ফড়িং, সেপো ফড়িংরা।

—ওরে সাপ! সাপ! সাপে খেলো তোকে। চেঁচিয়ে ওঠে শশী।

আচমকা দাঁড়িয়ে যায় তরুণ শিকারী। ওর ডাগর চোখ আরো ডাগর হোয়ে উঠে চারিদিক ফালুক-ফুলুক কোরে তাকায়। এবার কিন্তু হার খেয়ে যায় সতীশের ধারালো চোখ।

—ক্যামন? বড্ডো যে বোলচিলি? এবার তুই কানা হোলি ক্যান্ রে? উই দ্যাখ্। পুঁইডগার ওপোর দিয়ে হিলবিল কোরে ছুটচে। আঙুল উঁচু

কোরে দেখায় শশী।

এবার দেখতে পায় সতীশ। ওর না দেখতে পাওয়াটা মোটেই অস্বাভাবিক না। লাউডগা সাপ। পুঁইডগার রঙে আপনার বর্ণসত্তা একদম হারিয়ে ফেলেচে। কেবল মাত্তর গতিশীলতাই বাঁচিয়ে রেখেছে ওর স্থিতি স্থাপকতা।

সাপের নাম শুনে ইষটম্-বোষটম্ তো ভাঁউ-মাউ কোরে এসে জড়িয়ে ধোরেচে শশীকে। একে তো চারদিকে দুর্ভেদ্য লতা-বেষ্টনীর আটক তার ওপোর ইষটম্-বোষটমের চারখানা হাত জড়িবট্টি কোরে ধোরে কাহিল কোরে তুলেচে শশীর অবস্থা। শশী ন যযৌ ন তস্থৌ।

—ও তো লাউডগা। হেস্। তাচ্ছিল্য মন্তব্য আসে সতীশের থেকে।

ইষটম্-বোষটমের অনেক ছোটো সতীশ। তার রাখা এ বক্তব্য অনেক খেলো কোরে দ্যায় ঐ লাউডগা সাপকে। যেমন খেলো—সোনামুখী বিলে চারোয় আটকানো কেঁচো বা জলধোঁড়া সাপরা। যাদের নিয়ে ইষটম্‌রা কেঁচোর মতনই খেলা করে। তরুণ শিকারীর এ-মন্তব্যটা খুব সময়োপযোগীই হোলো। যার ফলে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল শশী।

লাউডগা সাপ অবিশ্যি ধোঁড়া-কেঁচোর গোত্রীয় নয়। বিষধর সাপের সগোত্র এরা। বোঝা গেল না, বিষধর সাপ লাউডগাকে সতীশ সত্যি সত্যিই উপেখ্যার চোখ ঠারল, না ইষটম্-বোষটমদের আক্রমণ থেকে শশীকে বাঁচানোর প্রকৌশল মাত্তর দেখালো।

গহন বন দল-মাদল কোরে চলেচে ওরা সব। নানান রকমের বুনো জানোয়ার ঝোপ-ঝাড়ের মাঝ থেকে হুড় পাড়িয়ে বার হোয়ে পালিয়ে যাচ্চে ওদের দেখতে পেয়ে। তীরবেগে ছুটে গেলো দু-তিনটে বেজি। চামরের মত ল্যাজ ফুলিয়ে। মোত্তরখানেক পরে একটা খয়রা ছুটে পালায় কান খাড়া কোরে। তীরের চেয়েও ত্বরান্বিত গতিবেগ তার। খেদা বাগাবন থেকে পর-পর বেরিয়ে আসে খেঁকশিয়াল-পাতিশিয়ালরা। এর পর-ই নড়ে ওঠে আচ্‌ছোট বাগান। আর পর মুহূর্তেই আবির্ভাব একজোড়া বন-বেড়ালের। কনক-খেত বৈদূর্যমণির মতন জলজলে চোখওয়ালা। কিন্তু কয়েক পলকের মধ্যেই বনমার্জার পালিয়ে যায় হাতি-পিপুলের কষাড় লতা-কুঞ্জে। এমনি কোরে প্রত্যেকটা লোভনীয় শিকার দৌড়ে পালায় ওদের চোখের সুমুখ দিয়ে। চমক লাগিয়ে যায় মনে-মনে। কিন্তু উপায় কী? অস্তর ওদের একমাত্তর গুলতি। মাটির গুলী। এ-দিয়ে এ-পরিবেশ

পরিস্থিতির মধ্যে পালিয়ে যাওয়া শিকার ঘায়েল করা যায় না। বিশেষ কোরে গুল্তি এমন-ই একটা অস্তর যার শিকার হোতে পারে শুধু মাত্তর ডালে বোসে থাকা পাখিরা।

এখোন এক এঁদো পুকুরের ধারে এসে পৌছয় দলবল। সূর্যর মুখ বড়ো একটা দেখতে পায় না এ-ডোবা। ঘন পাতার অন্তরাল ভেদ কোরে ছেঁড়া-ছুটো কতকগুলো রোদের টুকরো হরেক রকমের জ্যামিতিক চিত্র আঁকে এর জলে। আর পচা পাতার রসে ঘোড়ার চোনার মতন লাল জলের সত্তা প্রকাশ করে। তার মধ্যে জিল্‌জিলে চামড়ায় মোড়া পায়ের পাতায় ভর দিয়ে কট্‌কটে ব্যাঙরা। শিশু মনের কৌতূহল চরিতার্থ কোরতে নিরো গুলী ছোঁড়ে। ব্যাঙের ঝাঁক ডুব ছায় জলের মধ্যে। এমন সময় জলের কিনেরার ঢেঁকি শাকের বন নড়ে ওঠে এবং বেরিয়ে আসে এক বিদ্‌ঘুটে জানোয়ার,—গুই ঘড়েল। খস্‌খসে ঢিলে চামড়ায় ঢাকা গা। লম্বা মুখ। চওড়া ল্যাজ। খাটো খাটো পা। মাটির ওপোর দিয়ে গড়িয়েই চলে বোললেই হয়। পা-ওয়ালা এই গুই ঘড়েল সাপ দেখে বীর শিকারী শশীর-ও অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে। গুল্‌-বাঘার বাতান এই মালীরবাগ। তবু বোধ করি গুল্‌বাঘা দেখলে-ও এমন কোরে কেঁপে উঠতো না শিকারীর বুক। এর পেছনে একটা কারণ রয়েছে বৈকি। নইলে বুক কাঁপার ছেলে শশী নয়। গোসাপ সম্পর্কে এক কাহিনী চালু আছে। এ-কাহিনীর দখলকার মুচিপাড়ার বেশীর ভাগটা-ই। অন্যান্য প্রবচনের মতন-ই। গুই ঘড়েল যদি কাউকে কামড়ে আগে গিয়ে জলে ডুব দিতে পারে, তবে সে-লোকের নির্ঘাত মরণ। আর গুই ঘড়েল-কেই হোতে হয় মরণের বলি যদি ঐ-লোক আগে ডুবতে পারে। এ-ত্বজনকার মরণের মধ্যে মানুষের মরণই অবধারিত। কেন না একহাটু মাত্তর জলে গোসাপ মানুষকে কামড়ে অনায়াসে ডুব দিয়ে উপকথার রাজপুত্তুরের মতন রাখ্যোসদের কাৎ কোরতে পারবে। মানে হাটুজলে মানুষ ডুবও দিতে পারবে না, পারবে না গুই ঘড়েলকে মারতেও। তবু মরণের মুখোমুখি হোয়েও শশী শিকারী হাল ছাড়ে না। বলে, সতে শিগ্‌গীর কচা ভেঙে আন্‌। নিরো, এই ইষটম্‌, দাঁড়িয়ে আছিস্‌ যে! কচা ভাঙ, যদি বাঁচতে চাস্‌।

রা-নেই ইষটম্‌-বোষটমের মুখে। তারা থ হোয়ে গেছে একদম। পাথরের থামের মতন। লাউডগা সাপের হাত থেকে যদি বা রেহাই পেলে, গুই সাপের হাত থেকে রেহাই পাবে না। নিরো ততখ্যন জাংদা দেখে একখানা চট্‌কার ডাল ভেঙে এনেচে। ইষটম্‌-বোষটমের সাহসে কুলোচ্চে না বাগানে ঢুকতে। কে

বোলবে ঝোপের ভেতর আরো দু-চারটে গোসাপ লুকিয়ে নেই ?

সতীশ মন্তব্য করে, কচা কী হবে ? আমি গুল্‌তি দিয়ে শালাকে এখুনি নিকেষ কোরে ফেলচি। তুই তারে ঢেঁকি শাক বনের ধারে গিয়ে দাঁড়া। শালা যেনো ওর মধ্যি গিয়ে না ঢোকে। খানার মধ্যি ফেলেই ওকে সাবড়ে দেবো।

যুক্তিটা একদম অকাট্য বটেই।

তবু শশী বলে, গুল্‌তি দিয়ে। পারবি ?

—খুব পারবো।

আর প্রতিবাদ করে না শশী। তবু সে নিজের গুল্‌তির ওপোর নির্ভর কোরতে পারে না। চট্‌কার ডাল ভেঙে আনে। আরো দুটো ভেঙে ছায় ইষটম্‌-বোষটমদের। বলে :

—খানার বাড় ঘিরে দাঁড়া সব। যদি কাছাকাছির মধ্যে এসে পড়েচে দেখিস্‌, কষে বাড়ি লাগাবি। নিদেন বাড়ি। ভয় নেই। আমি আছি। বোলেই সে ছুটে গিয়ে ঢেকি শাকবনের দিক আগলে দাঁড়ায়।

গুই ঘড়েল ডোবার মধ্যে নেমে গেছে। আপনাকে সামলাতেই সে এখোন ত্রস্ত। কামড়ানোর শখ তার মোটেই নেই। পঞ্চরথীর ব্যূহ থেকে সে এখোন খুঁজচে নির্গমনের রাস্‌তা। কিন্তু অভিমন্যু যে-ব্যূহ ভেদ কোরতে পারে নি, আজাদি সামান্য এক গোসাপ তাই কোরে বসে, তা হোলে মহাভারতের পাতা থেকে বীর শিশুর নাম কাটানোর অজস্র সুপারিশ আসবে নাগলোক থেকে। তখোন ?

সতীশ ততোখ্যন কোচড় থেকে একটার পর একটা গুলী বের কোরচে, ছুঁড়চে। প্রত্যেকটা সন্ধান তার অব্যর্থ। ঘা খেয়ে ঘড়েলটা গড়াতে গড়াতে জলে গিয়ে পড়েচে এবং এক খাবলা স্বল্প পরিসর জলে ডুবচে আর ভাসচে। শশী ছাখে সতীশের গুল্‌তিতে ঘড়েলটা জখম হোয়েচে ঠিকই। কিন্তু মারা সম্ভব নয় আর। মাটির গুলী জলের মধ্যে সুবিধে কোরতে পারবে না। শশী তখোন নীচেয় নেমে যায় এবং জলের কিনারে লাঠি উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। দম নিতে যেমন মুখ ভাসান ছায়, অমনি লাঠি ঝেড়ে ছায় শশী।

—ব্যস। আর কামড়াবে শালো ? কাম ফতে। ওরে টেনে তোল্‌। ইষটম্‌-বোষটমদের নির্দেশ ছায় শশী।

কিন্তু রাবণ রাজা মারা গেলে যেমন বানররা প্রথমটা এগোতে সাহস পায় নি, ইষটম্‌-বোষটমদের দশাও হোলো এখোন তাই। ওরা বিশ্বাসই কোরতে চায় না

যে গুই ঘড়েল মেরেচে। মনে করে "কাপ্" ধোরে রয়েচে ও।

নিরো তখোন বীর পুরুষের মতন জলে নেমে যায় এবং ল্যাজ ধোরে টেনে তোলে জানোয়ারটা। একেই বলে শাপে বর। এই মোত্তর কয়েক আগে যে-গুই সাপের শিকার হোতে বোসেছিলো ওরা, এখোন সে-সাপটাই হোয়ে বোসল ওদের অপরিহার্য এক লোভনীয় শিকার! মস্ত বড়ো ঘড়েল। আট-দশ সেরের কম হবে না! অন্ততঃ পঞ্চাশটে হোরেল ঘুঘু, কম কোরে কুড়িটি কুকো পাখি মারতে পারলে তবে এর মাংসর সামিল হবে।

শিকারী জীবনের প্রথম দিনের অভাবনীয় এ-সাফল্য আচ্ছা মতন খুশী কোরে তুলেচে সতীশকে। শিষ্যর সাফল্যে গুরুর আনন্দ আরো বেশীতর। পাখি মারতে এসে গুই ঘড়েল শিকার! এ যে আঙুল ফুলে কলা নয়। কলা গাছ!

—তুই তো ঘড়েল খাস নি আর কখোনো? না সতে?

খুব মুরুব্বিয়ানা চালে প্রশ্ন করে শশী শিকারী এবং ওর প্রশ্নই উত্তর ছায় —ঘড়েলের মাংসর সাথে শশীর স্বাদটা পুরোনো হোয়ে গেছে।

—না রে। ঘড়েল খাওয়া তো খাওয়া, মোটে দেখিই নি পেরায়।

—দেখিস্ নি!

—একবার একটা দেখেছিলাম। সে ও-বছরের কথা। গাঙ ছ্যাড়ে বেতফল খেতে গিয়ে।

—তোপা মাংস রে সতে। শুধু মাংস। হাড় নেই ওতে মোটে।

মাংসের প্রসংশায় বরাবর পঞ্চমুখ শশী। এখানে ওর কাণ্ডজ্ঞান মাত্রা ডিঙোনো। অনেক শিকারীর সাথে শশীর তফাৎটা এখানেই। শিকারীরা সাধারণতঃ শিকার প্রিয়। শশী কিন্তু দুই-ই। শিকার প্রিয় এবং শিকার উপভোগ প্রিয়। খুঁটো দড়ি বাদে ও-বস্তুটার ওপোর ওর অরুচি নেই। সতীশ তাই শশীর কথায় কান ছায় না। বলে:

—চল্ শশে উত্তরদিক পানে চল্। ও-দিকেই মনে হয় মেলা পাখি। শুনেচিস্ হোরেল ঘুঘুর ডাক?

এতোবড়ো একটা শিকার মুঠোর মধ্যে এনেও ওর ভ্রূক্ষেপ নেই সেদিকে। নোতুন শিকারের সূচাগ্র নেশায় ও এখোন মশগুল্। বিস্ময়ে বিস্ফারিত হোয়ে ওঠে শশীর চোখ-মুখ। বলে:

—তোর আন্দাজ ঠিক রে সতে। মালীর বাগের উত্তর দিকটাই পাখির হাট। গাছগুলো খুব উঁচো কি না। চালাক হোরেলরা তাই ওর মগডালে আড্ডা

পাড়ে। কিন্তু এরপর আরো শিকার। এখোনো তোর শিকারে বাকি আছে।

—ক্যান রে? ডাগর ডাগর হোয়ে ওঠে সতীশের চোখজোড়া। এতো তাড়াতাড়ি ফেরার কথা স্বপ্নেও ভাবে নি। গাঙ-বিলচরা ছেলে। মাছ মারে। পোকা-মাকড় ধরে। গাছে ওঠে। ফল পাড়ে। হঠাৎ একদিন আটকা পড়ল সাঁই পণ্ডিতের খোঁয়াড়ে। আজ খোঁয়াড় ভেঙে সে-ছেলে পালিয়ে এসেচে। নিসর্গ-মায়ের কোলে। মা-ও টেনে নিয়েচেন তার হারানো ছেলেকে। মুখে দিয়েচেন অজস্র চুমো। খুলে দিয়েচেন তাঁর ছবি-ঘর। এ-ঘর ছেড়ে ওর মন আর ঘরে ফিরতে চাইচে না। ঢুকতে চাইচে না সাঁই পণ্ডিতের গারদ ঘরে।

—চল্ সতে। আজকের মতন ফেরা যাক্। এমন তোপা মালটা পচে নষ্ট হোয়ে যাবে নইলে। কাল আবার আসবো। শশীর এ-মন্তব্যে মুখ কাঁচু-মাচু করে সতীশ। তবু শশী এ-পথে নামানোর গুরু মশাই ওর। তাই জোর প্রতিবাদ করে না। বলে:

—চল্ যাই। ঐ দিকটা ঘুরেই যাই একবার।

মালীর বাগের উত্তর ভাগটা সত্যিই মনোরম। বনদেবীর নিরালা নিকেতন। শুধু আম-কাঁঠাল না। অজস্র রকম ফলের গাছ। জাম-গোলাপজাম-বিলিতী গাব, চীনের তেঁতুল-আমলকী। সব গাছ এখোন ফলরিক্ত। কেবল মাত্তর আমলকীর সরু সরু ডালের আগায় থোল্-থোল্ ফল ঝুলচে। নীলাভ শাদা ফল। সতীশের শিশুমনের লোভ হয় গাছে উঠে কয়েকটা থোল্ ছিঁড়ে আনে। আমলকী খেয়ে জল খেলে ঠিক চিনির জলের মতন মিষ্টি লাগে। একথা ওর অজানা নয়। কিন্তু সে-লোভ সামলে যায়।

এরপর ওদের শিকারপর্ব আর বড়ো একটা এগোতে পারে না। কৎবেলতলায় শুক্‌নো পাতার ওপোর একটা দিনকানা পাখি শুয়ে ছিলো। হোরেল ঘুঘুর চাইতে একটু ডাগর হবে। ছাই-রঙের পাখ্‌নার ওপোর শাদা-শাদা চক্কর দেওয়া। সতীশের হাত থেকে ঐ-পাখিটা রেহাই পেলো না। আর দু-টো ঝুঁটকুলি। চুড়োর মতন ঝাঁটি মাথায়। পুচ্ছ লাল। খয়েরী পাখ্‌না পরা পিঠ।

নিসর্গ-দেবীর এ-নিরালা নিকেতন, এর কালো ছায়া, এর মিষ্টি বাতাস, পাখির সুর আর পত্র-পল্লবের চাকচিক্য সতীশের ছেড়ে যাওয়া বিদায়ী শিশু মন এ-সবের জন্য তেমন খুঁড়ল কি না বলা যায় না। যেমনটা খুঁড়ল হোরেল ঘুঘু-ফুকো পাখির জন্য। গুল্‌তির গুলী আহত পাখির মতনই সে-মন ডানা ঝাপটাতে থাকল ওর বুকের খাঁচায়।

পেয়ারাতলায় পা বাড়াতেই সতীশ ছাখে, উঠোনের কোণায় দাঁড়িয়ে মা-ময়না। তার পলক না-ফেলা চোখ চেয়ে আছে মনু ঠাকুরদের খড়-খেতের পানে। ছেলের ইস্কুল ফেরার সময় উৎরে গেছে। আকুলি-ব্যাকুলি কোরচে তাই মা'র মন। ময়না জানে, ঘুর হোলেও ছেলে তার ঐ-পথেই আসবে। তেলীর পুকুরের আড়াআড়ি পথে আসতে মায়ের মানা। সতীশ আগে। তার পেছনে শশী। তার পেছনে নিরো। কাঁধে গুই ঘড়েলটা। লতা দিয়ে চার পা বেঁধে চট্‌কার ডালে ঝুলিয়ে নিয়েচে। আর পাখিগুলো ঝুলচে ইষটমদের হাতে। ওদের ঐ রকম বেশ দেখে ময়নার মনে কেমন এক খট্‌কা লাগে। বিশেষ কোরে শেলেট-দপ্তরের পরিবর্তে ছেলের হাতের গুল্‌তিখানাই খটকা ধরায় বেশী কোরে।

—এই, তোর শেলেট-দপ্তর কই?

সহসা মায়ের এ-কথার জবাব দিতে পারে না সতীশ। ভ্যাবাচাকা বনে যায়। ময়নার সন্দেহর হাত থেকে বাঁচানোর জন্যই চটপট জবাব ছায় শশী:

—শেলেট-দপ্তর? আমাদের বাড়ি রেখে এসেচে। বুঝলে খুড়ী? আমরা মালীর বাগ থেকে শিকার কোরে ফিরচি, সতে আসচে ইস্কুল থেকে। ঠাকুরদের খড়বনের ধারে দেখা। টেনে নিয়ে গিয়েছিলাম। ওই ছাখো খুড়ী, কত্‌তো বড়ো গুই ঘড়েল মেরে এনেচি। কলার পাতা কেটে এনে দাও। ছুলে মাংস বানাই।

—তা এখেনে ক্যানো?

—সতের অসুখের সময় একদিন বোলেছিলাম, ওরে মাংস খাওয়াবো। এখেনে কেটেকুটে ওরে খানিকটে দিয়ে যাই। কদ্দিন মাংস খায়নি সতে। এই নিরো, তুই পাতা কেটে আনগে। খুড়ী, তুমি তারে হোগলাপাত ছুরিখানা বের কোরে আনো। আমি আর সতে শেলেট-দপ্তর নিয়ে আসচি। এক দৌড়ে যাবো আর আসবো।

কথাটা বোলেই আর এক মোত্তর দাঁড়ায় না শশী-সতীশ। যে সন্দেহের হাত থেকে সতীশকে বাঁচাতে মিথ্যে ছলা-কলার অভিনয় কোরল শশী, তার ফল ফলল উল্‌টো। ওদের হাবভাব, সন্দেহকে বেশী কোরেই ঘনিয়ে তুলল ময়নার মনে। সতীশ যদি অসুখের সময় মাংস খেতে চেয়ে থাকে, স্বচ্ছন্দে শশী ওকে নেমন্তন্ন কোরে খাওয়াতে পারতো। কিংবা একটু মাংস ও দিয়ে যেতে পারতো বাড়ি। ওর দুঃখ লব্ধ শিকার সতীশদের বাড়ী এনে তোয়ের কয়া কোন্ খাতিরে? যতো বড়ো খাতিরের বন্ধু হোক, এ কেউ করে না।

এর থেকে কি এই প্রমাণ হয় না, ঐ শিকারের খানিকটার দাবীদার সতীশ? আসল ঘটনা বের করতে ময়না দস্তুর মতন ঘাটায় ইষ্টম-বোষ্টম-নিরোদের। কিন্তু শশী শিকারী ওদের এমনি টিয়ে পড়ানো পড়িয়েছে যে ময়নার জেরা হার মানে। আসল তথ্য কিছু ফাঁস করে না ওরা।

অনেক খোঁজাখুঁজির পর শেলেট দপ্তর আবিষ্কার কোরে নিয়ে যখোন দু'জন ফিরল, কলাপাতা এসে গেছে। হোগলপাত ছুরিও হাজির।

—এই দ্যাখো খুড়ী। তুমি যা মনে কোরেছিলে তা না। শেলেট-দপ্তর বাড়িয়ে ধোরে শশী বলে।

—ঠাকুর ঘরে কে? আমি তো কলা খাই নি। হাসতে হাসতে বক্তব্য রাখে ময়না।

—তার মানে? শশী জিগ্যেস করে।

কিন্তু এ প্রশ্নোত্তর এড়িয়ে যায় না:

—এই সতে, তোর মুখ অমন শুকনো-মুকনো ক্যানো? চোখ খোরেলে পড়ে গেছে। ক্যানো রে?

সতীশ চুপচাপ। জবাব দ্যায় শশী:

—কই না। হোতে পারে রোদ্দুরে বেরিয়েছে তো ইস্কুল থেকে। কই নিরো, ছুরি দে। বুঝলে খুড়ী? যা কষ্ট কোরে মেরেচি না, শালাকে। ওতো কামড়াবেই। কামড়ালে আর খায়ের থাকতো না। কাছেই ডোবা। জো সো কোরে শালা একবার ডুব দিতে পারলেই, আমরা পটোল তুলতাম। তা হলে এতক্ষণ কী হোতো খুড়ী?

বোলে ফেলেই গুই ঘড়েলের বুক বরাবর ছুরি ডাবায় শশী। প্রসঙ্গটা চাপা পড়ে যায়। ময়না অপলক চোখে চেয়ে দেখতে থাকে ওর কাণ্ড-কারখানা।

সতীশ-অন্ত জীবন সাঁই পণ্ডিতের। মুচিপাড়ার প্রথম ছাত্তর ও। মেধাবীও বটে। সে হিসেবে ছাত্র-স্নেহ তার ওপোরে খানিকটে বেশী হওয়াই স্বাভাবিক। এ ছাড়া ওর অসুখের সময় পর পর কটা রাত ওর পাশে কাটানোর পর আর এক স্নেহধারা পাখির মতন পাখা আগলে বোসেচে ঐ শিশু-শাবকটিকে। একে পুত্রস্নেহ বলাই সঙ্গত।

এ দুই স্নেহর একটা প্রজাপতি। আরেকটা পাখি। এক বর্ণাঢ্য পাখ্‌নার কোমল ছোঁয়া দিয়ে, আর সুর-গান দিয়ে ওকে সফল কোরে তুলতে চায়।

এমন মমতার টুকরো যে সতীশ হঠাৎ যখোন আজ ইস্কুল কামাই কোরল তখোন সাঁই পণ্ডিতের মন-মেজাজ বিগড়ে যাওয়ারি কথা! বিশেষ কোরে আজ কিছুদিন যাবৎ নুরপুর-খলিলনগর এবং আশেপাশের আরো অনেক গেরাম থেকে সাঁই পণ্ডিতের প্রতিপক্ষে এক বিক্ষুব্ধ গুঞ্জন উঠেচে। সাঁই মশাই মুচি ছাত্তর দিয়ে ইস্কুল ভরতি কোরচেন দিন-দিন। প্রথম-প্রথম তাদের ছোঁয়া-ছুঁয়ি তফাৎ-তফাৎ থাকত। এখোন ওদের ক্রমবর্ধমান ধারা বর্ণ-হিন্দু ছাত্তরদের নাগালের মধ্যে পৌছে গেছে। সাঁই পণ্ডিত মুচিপাড়ায় যান। মুচি বাড়ি রাত কাটান। সম্ভবতঃ ওদের ঘরে খানাপিনাও যে হয় না তাই বা কে হলপ কোরে বোলবে?

দিনের পর দিন কাটে এবং ওই চাপা গুঞ্জনের গায় ধোরতে থাকে ফাটল। আজকের এ অনুপস্থিতি তারই ফলশ্রুতি কি? সতীশের নয় শরীর খারাপ হোতে পারে। কিন্তু ইষ্টম-বোষ্টমরা অনুপস্থিত ক্যানো? কোনো রকমে গড়িমসি কোরে সময় কাটিয়ে ছুটি দিয়ে দেন।

সন্ধ্যের পর সতীশদের বাড়ি যান সাঁই মশাই। ময়না তখন রান্না ঘরে। মাংস রাঁধচে। মশলার গন্ধে বাড়িখানা মশ্‌গুল। সতীশ আকার পাশে বোসে ঘ্রাণে অর্ধ-ভোজন কোরচে। উঠোনে পা দিয়ে গলা খ্যাকার দেন সাঁই পণ্ডিত। মেটে টেমি হাতে বেরিয়ে আসে ময়না। শীতকাল হোলেও অল্প-অল্প ঘাম জমেচে কপালে। আলোর আভায় ঝলমলিয়ে উঠেচে মুখখানা।

—সতীশ কই?

—ঐ তো ঘরে বোসে আচে। চাপা হাসি মুখে ময়না বলে।

—পড়চে না! আজ ইস্কুলে যায় নি ক্যানো?

আকাশ থেকে পড়ে ময়না। বলে:

—ইস্কুলে যায় নি। গেচিলো তো। এই সতে!

সাঁই পণ্ডিতের কথা শুনেই সতীশের বুকের মধ্যে ঢেঁকির পাড় পড়া শুরু হোয়েচে। এই মাত্তর কিছুখ্যাণ আগে ওর যে শিশু মন মাংসের লোভে লালায়িত ছিলো, এখোন সে মন একদম মরা। জলভরা জিব শুকনো কাঠ। সীমিত রান্নাঘরের মধ্যে বোসে যে কল্পনার পাখি অসীম দিক-দিগন্তে উড়ছিলো। বাসা ছিলো ডালে-ডালে। আসচে কাল শনিবার হাফ ইস্কুল। কাজেই কোরবার মতলব ছিলো না। সকাল সকাল ছুটি পাওয়ার দরুণ। তাই

গুলতি লুকিয়ে রেখে যাবে ঝোপের মধ্যে। ফেরার পথে ঢুকবে মালীর বাগে। উত্তর দিকের নিরালা রাজ্যে। সেখানকার উঁচু গাছের মগডালে বসা ডাগর-ডাগর হোরেল ঘুঘু-কুকো পাখি। শিকার কোরবে। কিন্তু সে কল্পনার পাখি ওর বাস্তব শিকারের মতন আহত হোয়ে পাখা ঝাপটাতে থাকল।

—এই সতে। এই হারামজাদা! শোন্ তো।

ময়না চেঁচিয়ে ওঠে।

সতীশ চুপচাপ। ঘাড় গুঁজে বোসে আকার পাশে।

—ও ছিলো কোথায়? জিজ্ঞেস করেন সাঁই পণ্ডিত।

—কী জানি? তা হোলে পাখি মারতে গেছিল।

—পাখি মারতে! ও, তা হোলে তোমার আস্কারা আছে।

—আমি কি পাঠাইচি? আমি জানি? হেসে ওঠে ময়না।

—তবে? একলা গেছিলো?

—না। শশে ইষটম্-বোষটম্‌রা। ওরাই তো টো দিয়ে নিয়ে বের কোরেছিলো।

—ও—ও। তাই বুঝি পাখির মাংস রান্না হোচ্ছে। ছেলের কামাই খাওয়ার দেরী সইচে না আর? না? বেশ তো ও পাখি মেরে আনুক। আর তুমি রান্না কর। খাও-দাও ফুরতি কোরে বেড়াও দিব্যি। ঠিক আছে।

চোট পায় বেরিয়ে যান সাঁই মশাই। আলো হাতে ময়না পেয়ারাতলা পর্যন্ত এগিয়ে যায়। কিন্তু ততোখ্যান সাঁই পণ্ডিত রাতের গাঢ় আঁধারে হারিয়ে গেছেন।

দুঃখে-রাগে ফেটে পড়ে ময়না। একদম ছুটতে ছুটতে রান্নাঘরে ঢোকে এবং গুমগুম্ কোরে বেশ কতকগুলো কিল বসিয়ে দ্যায় সতীশের পিঠে।

—বজ্জাতি! আমার সাথে বজ্জাতি! হারামজাদা! ছুঁচো! মাংস? উনুনের ছাই দেবো তোর মুখে।

কড়াইটা ছুঁড়ে ফেলে দ্যায় উঠোনে। টুকরো টুকরো হোয়ে যায় মাটির কড়াই।

কাঁদতে কাঁদতে সতীশ ঘুমিয়ে পড়ে রান্নাঘরের মেঝেয়। অনেক রাতে ময়না ওকে তুলে নিয়ে গিয়ে ও-ঘরে শোয়ায়ে দ্যায় এবং নিজেও ওর পাশে পাটির ওপোর শুয়ে পড়ে। সারাটা রাত ঘুম হয় না ময়নার। ছেলের ওপোর আর রাগ নেই ওর। রাগ ওর, দুঃখ ওর নিজের ওপোর।

ওর অদৃষ্টের ওপোর। ছেলেকে সে কোনোদিন পেট ভরে খেতে দিতে পারে না। দয়া কোরে কেউ কোনোদিন যদি একটু মাংস দিয়ে গেলো তো ওর বরাতে জুটল। আজ ইস্‌কুলে কামাই কোরে, কতো কষ্ট কোরে রোদ-জংগল ধুঁড়ে, শিকার কোরে এনেচে। জীবন-কে মরণের মুখেও ছুঁড়ে দিতে হোয়েচে। যদি ঐ-লাউডগা সাপ কি গুই ঘড়েলটা কামড়ে দিতো ওকে? তা হোলে ওতো জন্মের মতন-ই আর এ-ঘরে ফিরতো না। তা হোলে ময়না আর কী নিয়ে থাকতো সংসারে? একথা ভাবতে-ও শিউরে ওঠে মায়ের বুক। এক একবার ভাবে, কী এমন আর দোষ কোরেচে ওর ছেলে? ও যদি শশীর সাথে আপনার খেয়াল-খুশী মাফিক-ই যেয়ে থাকে, তাতেই বা হোয়েচেটা কী? ছেলে মাংস খায় খুব ভালোবেসে। মা হোয়ে ও তা খাওয়াতে পারে নি কোনদিন। কেবল পেটেই ধোরেচে ছেলেকে। এখোন সে-ছেলে একটু বড়ো হোয়েচে। পাখি মারতে শিখেচে। একদিন ইস্‌কুল কামাই কোরে পাখি মেরে এনে যদি ওর মাংস খাওয়ার লোভ মিটোয়, তাতে মা হোয়ে ওর বাদ সাধা কি উচিত হোয়েচে? ও কোন্‌ লাট সাহেব হবে ইস্‌কুলে পড়ে? সাঁই পণ্ডিতের মতন ও কি গুরুগিরি কোরতে পারবে কোনোদিন? না-পারবে ওদের সমাজে উঠতে? ও যে-মুচি সে মুচি থাকবেই। ঢাক পিটোবে। শানাই বাজাবে। চামড়া কাটবে। ডোল-ঝুড়ি বুনবে। থাকবে চিরকাল অশুচি। যে ওকে ছোঁবে, স্নান কোরে তবে শুচি হবে সে।

ঘুমঘোরে সতীশ অনেকবার ফোঁপায়ে ফোঁপায়ে চমকে উঠেচে। ময়না ততোবার বুকে চেপে ধোরেচে ওকে। মা হোয়ে ছেলের লোভে বঞ্চনা দিয়েচে। খিদেয় দিয়েচে উপোস। এ-অনুতাপ তুষের আগুন দিয়ে পুড়িয়ে পুড়িয়ে ঝলসে দিয়েচে মায়ের বুকখানা। শেষ রাতের দিকে আকাশে চাঁদ উঠেচে। জোছনার প্রলেপ দিয়ে দিয়েচে ময়নার কপালে। পাকা ধানের সৌরভ মাখা ঠান্ডা হাওয়া ফুঁ দিয়ে দিয়েচে ওর চোখে-মুখে। কিন্তু জ্বালা জুড়োতে পারে নি কেউ। পারতেন হয়তো একজন। কিন্তু তিনি গিয়েচেন চরম উপেখ্যা দিয়ে। তা না হোলে এ-অনাসৃষ্টি কাণ্ড কখনো ঘটতো না। অথচ পণ্ডিত মানুষ তিনি। অনেক বোঝেন-সোঝেন। বুঝলেন না শুধু ময়নার মনকে। শিশু নিয়ে থাকেন তিনি। তলিয়ে দেখলেন না তবু শিশু-চরিত্রের অন্তর্নিহিত রূপোলোক। তথাপি ময়না হাল ছাড়ে নি। যদিও তিনি তার জাত না। গেয়াত্‌ না। তবু তার ওপোর ময়নার দাবী আছে। জোর আছে। ক্যানো আছে, এ-প্রশ্নের উত্তর

সে জানে না।

পেয়ারার ডাল থেকে অনেক পাতা খসল। শুকনো পাতার ওপোর দিয়ে রাতচরা জানোয়াররা অনেকবার যাতায়াত কোরল। নারকেল গাছের শুকনো বাল্‌তো ঝরে পড়ল। এরা একযোগে অনেক শব্দ সৃষ্টি কোরল। প্রত্যেকেই আশ্বাস দিলো, এবার তিনি এলেন। প্রত্যেকেই প্রতিশ্রুতি ভংগ কোরল। নিসংগ নারী হৃদয় নিয়ে প্রত্যেকেই খেলল ছিনিমিনি খেলা। যে-রাত সমুদ্রে ডুবে যাওয়া পথে তিনি ডুব দিয়েছিলেন, চাঁদের আলোয় স্বচ্ছ হোয়ে উঠল সে-পথরেখা। কিন্তু তিনি ফিরলেন না। রাত পোহালো। চালের বাতায় কিচকিচ কোরে ডাকল চড়াই পাখিরা। দাঁড়কাকরা উঠোনে মাংস টুকরো ঠুকরে খেতে লাগলো। কেউ কেউ বা ঠোঁটে কোরে নিয়ে উড়ে গেল। দেখে ময়নার মনে হোলো, ওর বুকখানাও অমনি কোরে ঠুকরে ঠুকরে খাচ্চে আরেক-দল দাঁড়কাক।

—মা, ভাত খাবো।

ঘুম থেকে উঠেই খেতে চায় সতীশ। গেল রাতের ঘটনা বোধ করি ওর শিশুমন থেকে টোপা শ্যাওলার মতন-ই ভেসে গেছে। ময়না মেটেশান্‌কিতে কোরে কড়ো কড়ো ভাত এনে ছায়। আর কাঁচা পেয়াজ। খেতে খেতে সতীশ বলে:

—মাংস কই? আমার মাংস?

—মাংস! মাংস তো ফেলে দিয়েচি মাণিক।

বিশ্বাস হয় না সতীশের। ভাবে, মা ঠিক রহস্য কোরচে। বলে:

—হুঁ? তাই না?

—সত্যি বাবা।

ভাত থেকে হাত তুলে সতীশ জিগ্যেস করে, ক্যান্? ফেলে দিলি ক্যান্?

—এ্যাত্‌তো বড়ো এক নল কেন্‌নো পড়েছিলো, বাবা। কড়াসুদ্দ্ ফেলে দিয়েচি। ঐ-ছ্যাখ উঠোনে।

সতীশ তাকায়। ছাখে, সত্যিই মেটে কড়াইখানা টুকরো টুকরো হোয়ে পড়ে আছে। ঝোলের শুক্‌নো ছিটে, মাংসর কতকগুলো টুকরো তখোনো গড়াচ্চে উঠোনের মাঝখানে।

—থাক্ গে বাবা। খেয়ে নে তুই। কেন্‌নো পড়া মাংস খেতে নেই। কাল হাটবার আছে। হাট থেকে মাংস কিনে আনিস। খাশির মাংস।

ভালো কোরে রেঁধে দেবো। সোনার মাণিক আমার! খেয়ে নাও।

সতীশ তেমনি হাত উঁচু কোরে বোসে থাকে। খায় না। কী যেনো রাজ্যির চিন্তা বোঝার মতন চেপে বোসেচে ওর মাথায়।

—নে, খেয়ে নে বাবা আমার।

সতীশ খায় না। ভাতের থালা ফেলে রেখে উঠে যায়। মা-ময়নার বুঝতে আর বাকি থাকে না; গেল রাতের ঘটনার টোপা পানার দল আবার ওর শিশুমন আচ্ছন্ন কোরে ফেলেচে।

সকাল সকাল সতীশ ইস্‌কুলে যায় ইষ্‌টম্‌-কে সাথে কোরে। যাবার সময় গুল্‌তিখানা রেখে গেলো না। মাটির গুলী-ও নিলো কোচড় পুরে। ইস্‌কুলের কাছাকাছি পৌঁছে আস্‌ছোট বনের মধ্যে লুকিয়ে রাখল। ইস্‌কুল ঘরের উত্তর পাশে পাত্‌তাড়ি বিছিয়ে দু-জন বোসল। ঐ-কোনটা-ই মুচিপাড়ার ছাত্তরদের বরাদ্দ। দু-চালা ইসকুল। সাঁই পণ্ডিত নিজের খরচায় আরেকটা চাল তুলে দিয়েছেন ঋষি পুত্তুরদের জন্য। ছোঁয়া-ছুঁয়ির একৃতিয়ার থেকে হুঁশিয়ার রাখতেই। এতেও অবিশ্যি প্রথম-প্রথম প্রতিবাদের তুমুল ঝড় ওঠে। ছাত্তররা নয় মুচি ছাত্তরদের ছোঁয়া গায় না ঠেকাল কিন্তু সাঁই পণ্ডিতের বেলায়? তাঁকে তো ইষ্‌টম্‌-সতীশদের হাত ধোরে লেখাতে হবে। পড়া নেয়ার সময় হাতে-হাতে বই দেয়া নেয়া কোরতে হবে। হাত থেকে পেন্‌সিল্‌ নিয়ে আঁক কষাতে হবে। তার কী?

এ নিয়ে দুটো দল গড়ে ওঠে। এক দল মনু ঠাকুরের। আর এক দল তারাপদ ভট্‌চায্যির। মনু ঠাকুর সাঁই পণ্ডিত পন্থী। ভট্‌চায্যি বাড়ি এক মজলিশ বসে। বিচারে মনু ঠাকুরের দল জয়ী হয়। গুরুশিষ্যের সম্পর্ক উদার। ছোঁয়া-ছুঁয়ির বাচ-বিচার সেখানে অচল। তাই সাঁই পণ্ডিতের বেলায় মুচি-শিষ্য ছোঁয়া সংক্রামক হোতে পারে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ গোতম ঋষি, দ্রোণাচার্যের নজির দেখানো হয়। এরপরেও তোলা হয় এক ফ্যাকৃড়া। এক ঘরের মধ্যে মুচি-অমুচি ছাত্তর ঢোকানো চলবে না। শেষ পর্যন্ত এ-ফ্যাকৃড়া-ও ধোপে টেকে না। যেহেতু দোচালা ঘরের একচালে মুচি আর চালে জল থাকলে সে-জল যদি চালু থাকে, তবে মুচি ছাত্তররা আলাদা চালের নীচেয় থাকলে ভিন্ন চালের অমুচিরা কেন চালু থাকবে না?

ইষটম্‌-সতীশরা ইস্‌কুলে পৌঁছনর পর-পরই আর আর পাড়ার ছাত্তররা আসতে থাকে। বামুনপাড়ার, কুমোরপাড়ার, সৎচাষীপাড়ার। মনু ঠাকুরের

ছেলে সুশান্তর সাথে সতীশের ভাব খুব। এটা অবিশ্যি সুশান্তর পৈতৃক সম্পত্তি। মানে মুচিদের সম্পর্কে ঠাকুর মশাই-এর মন ঢালোয়া। শিশু অনুকরণপ্রিয়। তাই বাবা মা'র স্বভাবের প্রতিফলন তার নরম মনের ওপোর ছাপ মেরে ছায়। সুশান্ততেও এর ব্যতিক্রম ঘটে নি। তবু মুচি-ছাত্তরদের চালের তলায় সে বোসতে পায় নি। সাঁই পণ্ডিত বোসতে দেন নি। অমুচিদের চালের শেষ প্রান্তে এবং মুচিদের চালের শুরুতে তার ঠাঁই। সতীশের থেকে বিঘেত খানেক ব্যবধান মাত্তর। কাল সতীশের কামাইটা সবচেয়ে বেশী নজর কোরচে সাঁই পণ্ডিতের চোখ। তারপরেই সুশান্তর।

—এই সতে, কাল তুই ইস্‌কুলে আসিস্ নি ক্যানো রে? কী হোয়েছিলো? ইস্‌কুল ঘরে পা দিয়েই সুশান্ত জিগ্যেস করে।

বন্ধুর সাথে মিথ্যে বোলতে পারে না সতীশ। আবার সত্যিটাও বলা যায় না এক ইস্‌কুল ছেলের সামনে। অপকর্ম না হোলেও পাখি মারার জন্য ইস্‌কুল কামাই! মস্ত বড়ো অপরাধ।

—বোলবো পরে। তুই তারে এসে বোস্।

খুব আগ্রহ নিয়েই পাত্‌তাড়ি বিছিয়ে বসে সুশান্ত। ওদের মধ্যেকার তফাৎটাও নিতান্ত শীর্ণ। চার ইঞ্চির বেশি না।

সুশান্তর মুখের কাছে মুখ নিয়ে খাস্‌খুস্ কোরে গল্প করে সতীশ। মালীর বাগের মনোজ্ঞ শিকার বর্ণনা। কুকো পাখি শিকার। হোরেল ঘুঘু শিকার। অতুচ্ছ লাউডগা সাপ থেকে তুচ্ছ দিনকানা পাখি পর্যন্ত কিছু বাদ যায় না। সুশান্তর গালের মধ্যে সাতধামা মাছি ঢুকেচে। অবাক্ হোয়ে শোনে সে রোমাঞ্চকর শিকার কাহিনী। এতো অল্প বয়েসে এমন ওস্‌তাদ শিকারী ওর বন্ধু!

সুশান্তর পাশে বোসে তারাপদ ভট্‌চাযিার ছেলে নিমু। সে বোলে ওঠে:

—এই সতে, ভারি তো আস্‌পর্ধা তোর। অতো মুখের কাছে মুখ নিয়ে কথা বোলচিস্ ক্যানো? থু-থু পড়বে ওর মুখে।

নিরুত্তর সতীশ মুখ সরিয়ে নেয়। ইষটম্ কিন্তু ছাড়িয়ে নয়। সে উত্তর ছায়:

—পড়েচে নাকি থু-থু? বড্‌ডো যে ঘেন্‌না?

—না, তা ক্যানো? মুচির আবার অতো বাড়ানী! মরা গোরুখেগো মুচি।

—কী বোল্‌লি ? মাষ্টার মশাই এলে ঠিক নালিশ কোরে দেবো।

—তা দিস। উনার নালিশেরে আমি যেনো ডরাই। উনি মুচি। উনারে মুচি না বামুন বোলতে হবে! কলা কাঁদচে আমার।

সতীশ তেমনি চুপচাপ। ফিট্‌কারীর মতন ফ্যাকাশে হোয়ে গেছে ওর মুখাবয়ব। অপরাধতত্ত্বের সবচেয়ে বিষণ্ণ ছাপ অবাধ দখল কোরে বোসেচে ওর চোখ-মুখ-কপাল। সুশান্তর মুখের ধারে মুখ বাড়িয়ে কথা বলা কতো না দোষ হোয়েচে ওর।

নিমু বোলে যায়; মা বলে, মুচি ছুঁলে চান কোরতে হয়। আমি তো রোজ চান না কোরে ঘরে উঠি নে। জামা-কাপড় কাচি। বই দপ্তরে তুলসী-জল ছিটোই। এই সুশান্ত, সরে বোস।

সতীশ ছেলেমানুষ। অতোটা জ্ঞান পৌছয় নি আজো ওর। কিন্তু ইষটমের বয়েস হোয়েচে। সে পষ্টই বোঝে, নিমুর ওই সব কথা ধার করা। মুচিদের সম্পর্কে বাড়িতে যে সব আলাপ-আলোচনা হয় বড়োদের মধ্যে, বালক নিমুর কথায় তারই প্রতিচ্ছায়া পড়েচে।

বাছাড় বাড়ীর ছেলে অতুল টিপ্‌পনী কাটে:

—সুশান্ত সরবে! তা হোয়েচে নিমুদা। ও আরো গা ঘেষে বোসবে মুচিদের। ওর বাবার লাই পেয়েই গা বেয়ে উঠেচে ওরা। বাবা কিন্তু মোটেই আসকারা দ্যায় না। মাসীও। মুচি জব্দ মাসীর কাছে।

—তাই নাকি! কেনো রে? নিমু জিগ্যেস করে।

অতুল তখোন সেদিনকের ব্যাপারটা খুলে বলে নিমুকে। তারনশশী যেদিন চাঁচ দিতে গিয়েছিলো ওদের বাড়ি। শশীর কী বুকের পাটা! অতুলের ছোটো ভাইটাকে কোলে নিতে যাচ্ছিলো ও। মাসীর চোখে পড়ে! তাই রখো। শোনায়েও দিয়েছিলো মাসী, আচ্ছা কোরে। ওরা ভদ্দরলোক বাড়ি যাওয়া আসা কোরতেও শেখে নি এখোনো।

—তা নিতো, নিতোই বা কোলে? কী হোতো?

—কী হোতো! চান না করায়ে ঘরে নেয়া যেতো? বলো তো নিমু-দা?

—তা কোরতোই নয় চান। তাতে হোতো কী তোর ভায়ের?

—ওর অসুখ কোরেচিলো তখোন। চান করালে ওকে বাঁচানো যেতো বুঝি? মাসী না, রেগে টঙ। আড়দোর পার হোতে না হোতে গোবর-ছড়া দিল। তুলসী-জল ছিটোলো। এতেও যদি শিখ্যে হয়। মাষ্‌টার মশাই

মুচি ছোঁয়। চান করে না! উনি আমাদের বাড়ি গেলে মাসী তাই পিঁড়ে ভ্যায় বোসতে। আমাদের শিখিয়ে দিয়েচে মাষ্টার-কে মাদুর দিবি নে বোসতে।

অতুলের আরো কিছু বক্তব্য ছিলো। কিন্তু সে তাকিয়ে দ্যাখে, দোর গোড়ায় বিপিন পণ্ডিত। জিব্ কামড়ে থেমে যায় অতুল। তিনি ঘরে ঢোকেন। অতুলের শেষ কথাগুলো সব-ই তাঁর কর্ণগোচর হোয়েচে। তাতে তিনি বুঝে নেন, পাঠশালায় অছুৎদের ছোঁয়া ছুঁয়ির ব্যাপারে মাতব্বরদের রায় যদিও তাঁর পখ্যে তথাপি এ নিয়ে গেরামে চাপা গুঞ্জনের বিরাম নেই।

—এই, কীরে? কী হোয়েচে?

অতুলকে লখ্য কোরে প্রশ্ন করেন সাঁই পণ্ডিত।

অতুল চুপ-চাপ। গুরুমশাই সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য তাকে দমিয়ে দিয়েচে। তাই জবাব ভ্যায় সুশান্ত:

—আপনি মুচি ছোঁন। চান করেন না। তাই ওর মাসী আপনাকে বোসতে ভ্যায়—পিঁড়ে। অতুলকে মাদুর দিতে মানা করে।

চাপা হাসি হেসে ওঠেন সাঁই পণ্ডিত। বলেন:

—ইস্কুলে বোসে এ-সব কথা ক্যানো তোদের?

সুশান্ত নালিশ করে, রোজ ওরা অমনি করে, মাষ্টার মশাই।

—ওরা কারা?

—নিমু-অতুলরা।

এরপর বিপিন মাষ্টার আসার আগে যা-যা ঘটেচে এক-এক কোরে সব বোলে ফেলে সুশান্ত। সতীশ ওর মুখের ধারে মুখ নিয়ে মালীর বাগে শিকার কাহিনীর যে বিবরণ দিয়েছিলো, সেটাও বাদ দেয় না। শুনে রাগে ফেটে পড়েন সাঁই পণ্ডিত। রাগ সতীশ-ইষ্টমের ওপোর। রাগ নিমু-অতুলের ওপোর-ও। কেনো না ইস্কুল কামাই কোরে ছাত্তরদের পখ্যে গুল্তি নিয়ে টো-টো কোরে বেড়ানো, কাক-বক মারা যেমন অন্যায়, পণ্ডিতী শাস্তর যদি তা বরদাস্ত করে, সেটা তার চেয়ে আরো বেশি অন্যায়। সুতরাং ইষ্টম-সতীশ দোষী, শাস্তির পাত্র। আর পাঠশালায় ছেলেরা আসে ঘৃণা-বিদ্বেষ শিখতে না। ভালোবাসা শিখতে। কিন্তু তার বদলে যদি ঐ-সব মনের ক্ষেতে বিদ্বেষের বীজ-ই বোনা হোয়ে যায় তবে ঐ-বীজ থেকে বিষ-ফসলই ফলবে একদিন। তাই নিমু-অতুলদের-ও সাজা অব্যাহত। কঠোর।

দেখতে দেখতে আবহাওয়া একদম পাল্‌টে যায়। কালবোশেখীর মতন ভীষণ হোয়ে ওঠে সাঁই পণ্ডিতের মনের আকাশ, মুখের আকাশ।

—এই সুশান্ত, ছাট ভেঙে আনতো। জাব্‌দা দেখে।

কঠোর পণ্ডিতী নির্দেশ। মেঘের ওপোর বজ্র-ধ্বনি বর্ষণের নির্দেশ।

—যা।

সুশান্তর গড়িমসি দেখে তাড়া দিয়ে ওঠেন পণ্ডিত মশাই।

লাঠি এসে যায়। জাব্‌দা নয়। লিকলিকে এড়াঞ্চির ডাল একখানা। তাতাল খাঁ হোয়ে ওঠেন বিপিন পণ্ডিত। মুহূর্তের মধ্যে সেটা গুঁড়ো-গুঁড়ো হোয়ে যায় সুশান্তরই পিঠে। যেহেতু সে গুরু-আজ্ঞা অমান্যকারী। জাব্‌দা লাঠি না আনার দরুণ অপরাধী। সুশান্ত পিঠ মোচড়াতে মোচড়াতে ছুটে যায় এবং লাঠি ভেঙে নিয়ে তেমনি ছুটতে ছুটতে ফিরে আসে। জাব্‌দা সোদালির ডালের লাঠি।

শাস্তি-ফল আগেই জোটে ইষ্‌টম-সতীশের বরাতে। যেহেতু ওরাই মালীর বাগের নিষিদ্ধ এলেকায় আগেই ঢুকেচে এবং আহরণ কোরে এনেচে নিষিদ্ধ ফল। এরপর নিমু-অতুলের পালা। এমনি কোরে চারজনের পিঠ বান মাছের মতন ফুলিয়ে দিয়ে সোদালির ডাল চুরমার হোয়ে যায়। গেলো দিনের চেয়েও সাঁই পণ্ডিতের মন-মেজাজ আজকে বেশী রকম বিগড়োনো। তাই ইস্‌কুলের কাজ জমে না তেমন।

ছুটি হয়। প্রাত্যহিক নিয়ম মাফিক ইষ্‌টম-সতীশরা বেরিয়ে আসে সবার পেছন পেছন। আপনাদের সংক্রামক ছোঁয়াচকে সাবধানী তফাতে রেখে।

সাঁই পণ্ডিতের হাতে লাঠি দেখে বেজায় ভড়কে গিয়েছিলো সতীশ। গণ্ডি ডিঙিয়ে বেরোনোর অপরাধে সীতার মতন-ই বিপন্ন মনে কোরেছিলো আপনাকে। এখোন তার মন-মুখ হাসি-খুশী ভরা। ঠিক ঝড়ের শেষে বনের পাখি যেন। আচ্‌ছোটের ঝোপ থেকে উদ্ধার করে গুল্‌তি, মাটির গুলী। সাঁই পণ্ডিতের এতো মারধোরের মধ্যেও মস্ত বড়ো সান্ত্বনা গতকালের শিকারে ওর অমিত সাফল্য। আর এখোন তার সামনে ঐ-প্রশস্ত মালীর বাগ। তার অজস্র শিকার-প্রাচুর্য। যার কাছে ঐ-মারধোর, বকুনি-ঝকুনি কিছুই না। কিন্তু ইষ্‌টমের বেলায়? ওর বয়েস ষোল-সতর। মান-অভিমান বোধ-শক্তির সীমানায় পা দিয়েচে ও। তাই একদিকে ঘৃণা-বিদ্বেষ, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যর ধারালো শর আরদিকে সাঁই পণ্ডিতের বেত ওর দেহ-মনকে জর্জর কোরে তুলল একযোগে।

মাঘ মাস যায় যায়। তারন তার দলবল নিয়ে হাজির হয় ঠাকুর বাড়ি। সবার-ই হাতে এক একখানা কাস্তে। বলে :

—আমরা এলাম, বট ঠাকুর।

মনু ঠাকুর এই মোত্তর একটা নোতুন গৎ বাজিয়ে ওস্তাদ শিল্পীদের সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা কোরছিলেন। সামনে দু-চারজন শ্রোতা বোসে খুব মন দিয়ে শুনছিলো।

ঠাকুর মশাই জিগ্যেস করেন, কী সমাচার তারন? খড় কাটবে নাকি?

—হ্যাঁ বট্ ঠাকুর।

—যাও কাট গে। তা "জনে" কাটবে? না ফুরিয়ে নেবে? ও তারন?

অভয়ও এসেচে তারনের দলে। সে-ই বলে :

—ফুরিয়েই তো নেই আমরা বছর বছর, বট্ ঠাকুর।

—বেশ তো। তাই নাও। ক' টাকা নেবে? আর বছর যেনো কতো নিয়েছিলে?

—সাত টাকা, বট্ ঠাকুর। তারন বলে।

—বেশ, তাই হবে। যাও কাট গে।

অভয় আপত্তি করে, এবার একটু বিবেচনা কোরো আপনি, বট ঠাকুর।

—আবার বিবেচনা। অভয় কী বলে? ও তারন?

তারন চুপচাপ। উত্তর দ্যায় এবারে অভয় :

—এবারের খড় বেজায় পোঁচে পুরু, বট্ ঠাকুর।

মনু ঠাকুর কথাটা ধোরতে পারেন না ঠিক। তারনদের পানে তাকান।

তারন বলে, ঠিক কথা কয়েচে ও, বট্ ঠাকুর। এবারের খড় বেজায় ঘন। আপনাদের হেঁড়ে তাল তলায় কোনোবার খড় হয় না। আর এবার সেখানে "হাপ্‌সে" পড়েচে খড়। যেমন পুরু তেমনি লম্বা। হয়-নয় আপনি দেখে এসো।

আপছা হাসির আভাস ফুটে ওঠে মনু ঠাকুরের মুখে। বলেন :

—আমি আর দেখে আসবো কী? আনা আষ্টেক ধোরে দেবো। যাও কাট গে।

—তা আমাদের তামাক দাও, বট্ ঠাকুর।

আটচালা চৌরী ঘর। চারপাশে তাল প্রমাণ উঁচু মাটির বারান্দা। দখ্যিণের বারান্দার নীচেয় আরেকটা ফালি বারান্দা দেওয়া। উদ্দেশ্য বোধ করি উচ্চতাকে

খর্ব করারই। তাকাতাকি করেন মন্থু ঠাকুর। বলেন :

—ওই যে চালের বাতায় গোঁজা কুলোয় মাখা তামাক, তারন।

তারন-অভয়রা ছেঁচেয় দাঁড়িয়েছিলো। নীচেয় দাঁড়িয়ে কুলো থেকে স্বচ্ছন্দে তামাক পেড়ে নেয়া যায়। তবু কুলো ছুঁতে সাহস হয় না তারনের। ওই তামাক বট্‌ঠাকুর খান। খায় অতিথি-অভ্যাগতরা। যে হেতু গুড় দিয়ে মাখা তামাক। গুড়ের সাথে পর্শ ক্রামক দোষের নিকট সুবাদ। কিন্তু অভয় এগিয়ে গিয়ে তামাক তুলে নেয়। এ-বাড়িতে গা মেলে বেড়ানোর লাইসেন্স অভয়ের সব চাইতে জোরালো। ছোঁয়া-ছঁয়ির নিষেধাজ্ঞা ডিঙিয়ে সেই তো বট্‌ঠাকুরের ছেলেকে শিয়ালের কবল থেকে কেড়ে এনেছিলো।

—আমরা চললাম। আপনি একটু মাঠের দিকে যেয়ো বট্‌ঠাকুর।

—ও তারন শোনো, শোনো তো। বলি, খাবে তো তোমরা ?

—ও মা। খাবো না ? সেকী !. খেতে আবার কোথায় যাবো বট্‌ঠাকুর ? অভয় বলল।

—পিসীমা ! ও পিসীমা ! মন্থু ঠাকুর ডাকেন।

পিসীমা আকার ছাই তুলছিলেন বোধ করি। ছাই মাখা হাতে ঝাঁপের দোর ঠেলে ভেতর থেকে বেরিয়ে আসেন।

—ওই, তারনরা খাবে।

—খাবে ! ক্যানো ?

ছানাবড়া হোয়ে ওঠে পিসীমার চোখ।

সে-চোখ দেখে ঘাবড়ে যান মন্থু ঠাকুর। বলেন :

—ওরা যে খড় কাটবে, পিসীমা।

—খড় কাটবে ? কাটুক গে। খাওয়া হবে না।

ঢালা জবাব আসে পিসীমার।

—তা খেতে আবার কোথায় যাবো ? মা-ঠাকরুণ ? বামুন বাড়ির পেরসাদ চিরকাল পেয়ে আসছি।

হাসতে হাসতে মন্তব্য রাখে অভয়।

ঘোর আপত্তি দেন পিসীমা :

—না বাপু। তোমাদের মুচ্‌নে খ্যাটন। পা থেকে মাথা অবধি তোমাদের খোল। পাঁচ পোয়া, দেড় সের চালের ধাক্কা। না, না। খাওয়া হবে না। কিছু পয়সা ধোরে দেবেখন। আর মোনোর কাণ্ড দেখলে, ঝাল

বেটে স্থায় গায়। বাবা চুকিয়ে দিবি, ন্যাটা চুকে যাবে। তা আবার খাওয়া ক্যানো? খাওয়া?

কইতে কইতে তিনি গোল গোল চোখ চান হাজারী পরামাণিকের পানে।

পরামাণিক মশাই মন্থ ঠাকুরের কাছে সেতার বাজনা শেখেন। তিনি পিসীমার হোয়ে ওকালতি করেন:

—সত্যি, দাদার কাণ্ড-ই আলাদা। উনি তো চেনেন না মুচ্‌নে হাঁড়া।

পিসীমার কাণ্ড-কারখানা দেখে একদম বেয়াকুব বনেই গিয়েছিলেন মন্থ ঠাকুর। সত্যিই তিনি মুচিদের ভালোবাসেন। হিরু বাছাড়, তারাপদ ভট্টচায্যি প্রমুখ মাতব্বররা বেজায় মুচি বিদ্বেষী। তাই মুচি পাড়ায় গিয়ে তিনি ঐ-সব মোড়ল মুরুব্বিদের সম্পর্কে বিরূপ সমালোচনা কোরতে আদৌ পিছ পা হন না।

কিন্তু একী! আজ তাঁরই বাড়ীতে—তাঁর নিজের পিসীমার থেকে কী সব ধারালো কথা ছুঁড়ে মারা হোয়েচে! সে তো কথা না—এক একখানা খাঁড়া দা এবং ঐ খাঁড়া এসে পড়েচে মুচিদের নয়, তাঁরই ঘাড়ে। আর ঘাড় থেকে দিয়েচে তাঁর মাথাটা নামিয়ে একদম মাটিতে। তবু পিসীমা। এক বারান্দা লোক বোসে। তাদের সামনে কিছু বলা যায় না। তাই মরিয়া হোয়েছিলেন তিনি এতোখ্যন। কিন্তু হাজারীর কথায় এবার সত্যিই তিনি সাড়া দেন:

—থাক। থামো হাজারী। কাণ্ডজ্ঞানটা তোমাদেরি দেখচি বলিহারি।

মন্থ ঠাকুরের চোখ-মুখের চেহারা বদলে গেছে। পরামানিক মশাই তাকিয়ে দেখেই তা টের পান এবং বোঝেন, কথাটা সিরিয়াসলি নিয়েছেন তিনি। তাই আর উচ্চবাচ্য করেন না।

—যাও তারন। খড় কাট গে।

অভয়-তারনদের গালভরা হাসি। দিন দুপোরে একবাড়ি লোকের সামনে এতোবড়ো একটা গ্লানিকর ব্যাপার ঘটল কিন্তু ওরা এখোন দেখা গেলো এতোটুকু আমল দেয় নি সেটাকে।

—আর দু-টো জলখাবারের যোগাড় কোরো মা-ঠাকরুণ।

তেমনি হাসি হাসি মুখ বলল অভয়।

—যাও তো তোমরা। চটে ওঠেন মন্থ ঠাকুর।

—আবার জলখাবার।

মুখ ঝামটা দিয়ে ভেতরে ঢোকেন পিসীমা।

শ্রোতারা চলে যায়। মন্থ ঠাকুর বাড়ীর মধ্যে ঢোকেন। ডাকেন:

—পিসীমা, ও পিসীমা !

পিসীমা তেলে-বেগুনে জ্বলে আছেন। কুটনো কুটতে কুটতে বলেন :

—বোলে পাঠাও বাবা।

শুনেও শোনেন না মন্থু ঠাকুর। হাসতে হাসতে ডাকেন :

—পিসীমা, ও পিসীমা ! শুনচো ?

—বোলে পাঠাও কান আছে।

—চট্‌চো ক্যানো ? বোলচি, জনদের জন্য কিছু জলখাবার দাও। দিয়ে আসি গে।

—কী-পিণ্ডি চট্‌কে দিতে হবে ? তোমার জনদের ? দু-আঁটি খড় কাটতে পারল না এখোনো। তিন সকালে জলখাবার। তারাপদ ঠিক কথা বলে।

—কী বলে, ও পিসীমা ? হাসতে থাকেন মন্থু ঠাকুর।

—বলে আমার ঘিলু। লাই দিয়ে মুচিপাড়ার মাথা খাচ্চিস্ তুই। এরপর হাঁড়ি-হেঁসেলে ঢুকবে। ও বড়ো বৌমা, বলি দ্যাখো তো, আর কুটবো মোচা ?

বড়ো বৌ শৈলজা চাল ধুয়ে হাঁড়িতে চড়াচ্চিলেন। উঁকি মেরে দেখে চম্‌কে ওঠেন :

—ওমা আমার কী হবে ! অতো গাদা !

—হবে আমার শেরাদ্দ। জানো না মুচ্‌নে ঠ্যালন ?

—কই দাও তাড়াতাড়ি। ধমকে ওঠেন মন্থু ঠাকুর।

—দিচ্চি। আহা হা ! উনার বাছাদের বুক "ছিন্‌নি" লাগচে। ও বড়ো বৌমা, ভাত নামিয়ে খুদগুলো ভাজো তো। পিণ্ডি চটকাই আমার।

—ক্যানো মুড়কী নেই ! কাল যে মুড়কী মেখেছিলে ?

—ওরে আমার গুরু ঠাকুর রে। নলেন গুড়ের মুড়কী নইলে সেবা হবে ক্যানো !

হাসতে হাসতে মন্থু ঠাকুর বলেন :

—ঋষি ঠাকুর পিসীমা, ঋষি ঠাকুর। গুরু ঠাকুরের চেয়ে কমতি না মোটেই।

পিসীমা তেমনি তেতে আছেন এখোনো। বলেন :

—আর গা জ্বালাস নে বাপু। ও বড়ো বৌমা, খুদ ভেজে এক হাঁড়ি মোটা আউশ চাল চড়িয়ো। আর এক খোরা মুসুরের ডাল। পাতলা কোরে রেঁধো, বাবা। যেনো দই-দই কোরো না। ও মোনো !

মন্থু ঠাকুর ঝাড় থেকে কলাপাতা কেটে আনেন। এর ফাঁকে পিসীমা

ঝোলা গুড় দিয়ে খুদ ভাজা মেখে একটা মেটে সরায় কোরে এনে রেখেচেন আর তেমনি মাটির মালসায় এক মালসা মুড়কী। নলেন গুড়ের গন্ধ ভুরভুর কোরচে। প্রথমটা আকাশ থেকে পড়েন মন্থু ঠাকুর। নলেন গুড়ের মুড়কী! কেন না গুরু ঠাকুরের ভোগ্য মুড়কী একমোত্তরে রিশি পুত্তুরদের বরাতে জুটে গেলো কী কোরে? হঠাৎ কারণটা ধোরতে পারেন তিনি। সেদিন পায়েস রান্না হোয়েচে। মুচিপাড়ার অনেকগুলো মুনিশ কাজ কোরচে। বাড়ির সবাই আন্না-আন্না কোরে পায়েস খেলো। কিন্তু মুচিদের পাতে একফোঁটা পড়ল না! এ-ব্যাপার ঘটার পর মন্থু ঠাকুর অনেকদিন পায়েস খান নি। বুঝতে পেরে পিসীমা জোর কোরে খাওয়ান। সাথে সাথে প্রতিশ্রুতিও দেন, এমনটা আর হবে না। ওই ঘটনার পুনরাবৃত্তির ভয়ই পিসীমাকে বাধ্য কোরেচে নলেন গুড়ের মুড়কী দেওয়াতে।

—জল কই পিসীমা?

পেতলের টুপ্‌নি ঘটিতে জল ঢেলে দেন পিসীমা। এ-ঘটিটা উঠোনের কোণেই পড়ে থাকে। হাত-পা ধোওয়া হয় এ-ঘটিতে। আর দেওয়া হয় মুচিদের জল খেতে। কালে ভদ্রে মাজা ঘসা হয় এটাকে।

জলখাবার নিয়ে খড়ের খেত্‌মুখো যান মন্থু ঠাকুর।

—এই মোনো, শোন। পেছন থেকে ডাকেন পিসীমা।

—ডাকচো পিসীমা? কী?

—শোন, জলখাবারগুলো "আলগোছে" ভুলে দিবি ওদের পাতায়। মেটে-পাত্তর। ছোঁয় না যেনো। আর উঁচো কোরে জল ঢেলে দিবি হাতে। বুঝলি তো?

—খুব বুঝেচি পিসীমা। চাপা হাসিমুখ চলে যান মন্থু ঠাকুর।

বাড়ির উত্তর-পশ্চিম পাশে লাগোয়া বিশাল আমবাগ। বাঁশবন। এই বাঁশবন লাগোয়া আবার একবন্দে সাতবিঘে খড়ের ভূঁই। চারটে মুনিশ। যদি ওদের কাস্তে রোজ অবিরাম আট থেকে দশঘণ্টা পোঁচ চালায় তা হোলে কম্‌চে কম আটদিন লাগবে পোঁচ তুলতে। বারো-চোদ্দো পয়সার বেশি পড়তায় ফেলতে পারবে না দিন মজুরী। অবিশ্যি একমাত্তর মুচিপাড়া ছাড়া আর কোনো পাড়ার লোক এতো অল্প পয়সায় খেত্‌-মজুর খাটতে আসবে না। মুচি-পাড়া সবচেয়ে অভাবী। তাই ওদের কাছ থেকে এই অভাবের সুযোগ-সুবিধে রীতিমত লুট কোরে নেয়া হয়। তবে এ-অগ্নিমূল্য এখোনকার মতন জিনিষের

কপালে কপালে আগুন জ্বালায় নি। চালের সের চার-পাঁচ পয়সা।

অনর্গল খড় কেটে চলেচে তারন-অভয়রা। বেশ খানিক দূর থেকে কচকচ শব্দ কানে আসে। চুকোনো কাজ। তাড়াতাড়িটা তাই মজদুরদের। মালিকের না। খাটনির দাম সাড়ে সাত টাকা। একদিনে কাজ সাবার কোরলেও যা, দশদিনেও তাই। এক ঘসা পয়সাও বেশি পাবে না। হোতো যদি দিন-মজুর হিসেবে কাজ কোরতো ওরা। তখোন তাড়া লাগাতো মালিক-তরফ।

কাজের সাড়া প্রচুর ছিলো তারনদের। কিন্তু ঘনঘন চোখ তাকাচ্চিলো ঠাকুরবাড়ির পানে। কখোন ওদের বট্‌ঠাকুর আসবেন। ' আসবেন জলখাবার নিয়ে। কেন না রাত কেটেচে জলই খেয়ে। খাবার জোটেনি। বট্‌ঠাকুরকে দেখতে পেয়ে আশ্বস্ত হয় সবার মন।

—ও তারন, ও অভয় খেয়ে নাও।

তালতলায় জলখাবারগুলো রেখে দিয়ে মনু ঠাকুর বোসে পড়েন।

ওরা খাবারের ধারে এগিয়ে আসে। কিন্তু খেতে বসে না।

—কী ভাব্‌চো? পাত্তর থেকে মুড়কী-চালভাজা তুলে নিয়ে খেয়ে নাও।

ঐটেই ইতস্ততঃ কোরচিলো ওরা। মেটে পাত্তর থেকে খাবার তুলে নেবে কী কোরে? এখোন মনু ঠাকুরের অনুজ্ঞা পেয়ে অভয় এগিয়ে যায় এবং কলাপাতায় সমান চারভাগ কোরে নিয়ে খেতে বসে।

খাওয়া শেষ হয়। সবাই হাত কোষ কোরে বাড়িয়ে ধরে মনু ঠাকুরের দিকে।

—বট্‌ঠাকুর, জল ঢেলে দাও। তারন বলে।

—ঢেলে খেতে পারচো না তোমরা? আমাকে ঢেলে দিতে হবে ক্যানো?

জোর পেয়ে অভয় এবার মনু ঠাকুরের স্বরে স্বর মিলোয়:

—তারন কাকার সব তাতেই বাড়াবাড়ি। বট্‌ঠাকুর ঢালা হুকুম দিচ্চে তবু উনার ভয়।

বোলেই সে ঘটি নিয়ে ঢক্‌ঢক্‌ কোরে জল খেয়ে নেয়।

মনু ঠাকুরের ছেলে সুশান্তকে একদিন সে শিয়ালের কবল থেকে উদ্ধার কোরেছিলো। পর্শক্রামক দোষকে পরোয়া করেনি। এই মনের জোরটাই ছিলো অভয়ের অনেকখানি সম্বল। কিন্তু অভয় বুঝতো না এ-জোর তার কতো সীমিত। এ দিয়ে সমগ্র মুচিপাড়ার বুক জোরালো কোরে তোলা যায় না।

খড় কেটে জনরা যখোন ফিরল, বেলা তখোন পড়ে গেছে। মনু ঠাকুর ঘরে

ঘুমোচ্চেন। আর পিসীমা ভবানী দেবী কোরচেন কাঁথা সেলাই এবং তাঁরি মাতুরে শুয়ে সুশান্তর মা শৈলজা।

—মা-ঠাকরুণ আমরা এসেচি। অভয় ডাকে।

—খানচারেক কলা পাতা কেটে আনো। হুকুম করেন ভবানী পিসী।

"ও বৌমা, ভাতগুলো এগিয়ে দাও। আমি তারে গামছা পরে আসি।"

বোলতে বোলতে চোট পায় উঠে যান পিসীমা এবং একখানা গামছা পরে আরেকখানা গায় জড়িয়ে নেমে আসেন। ইতিমধ্যে অভয় কলাপাতা কেটে এনেচে। পিসীমা বলেন:

—এই যে অভয়, ওই গোয়ালের মধ্যি গিয়ে বোসো সব।

ভবানী পিসীমা জানেন, গোশালা—গোবিন্দশালা। কাশীতুল্য ধাম। নিত্য পবিত্র। অস্পৃশ্যতার আধিপত্য এখানে নিস্ক্রোয়। এ-সংস্কারের ওপোর ভিত্তি স্থাপন কোরেই মুচিদের খাওয়ার ঠাঁই ওখানেই বরাদ্দ কোরেচেন তিনি।

রান্না ঘরের ছেঁচেয় মানে চালের থেকে বেশ খানিকটে তফাতে একটা টিনের থালা হাতে কোরে পিসীমা দাঁড়ান। আর শৈলজা ঘর থেকে অতি সতর্কে ডাল-ভাত ঢেলে দিতে থাকেন। মাছির মাথার মতন আকাঁড়ানো আউশ চালের ভাত। আর পাতলা হলদে জল। তলায় দু-চারটে মুসুর ডাল—অতলান্তিক জলে কুচো-মুকুতো।

—আস্তে। চেঁচিয়ে ওঠেন ভবানী পিসী।

মানে ডালের জল ছিটকে পাছে শৈলজার থালা ছুঁয়ে ফেলে। তা হোলে রান্না ঘরের হাঁড়ি-কুঁড়ি পর্যন্ত আদাড়ে বিসর্জন দিতে হবে।

ভূত খাটনি খেটে এসেচে মুনিশ্‌রা। সুতরাং ক্ষুধা তাদের নির্মম রাখ্যোসী। তাই পিসীমা কথিত একসের পাঁচপোয়া চালের ভাত-ই খেলে তারা প্রত্যেকে। হলুদ গোলা জল-ও তিন-চার বাটি কোরে।

খাওয়া শেষ হওয়া পর্যন্ত পিসীমাকে ঠাই দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। মাঝে মাঝে টুপনি ঘটির জল আলগোছে ঢেলে দেন তারন-অভয়দের হাতে। খড়ের ভুঁই-এ মনু ঠাকুরের আদেশক্রমে এই ঘটিটা-ই ওদের হাতে উঠেছিলো। বাড়ি ফেরার সাথে সাথেই ঘটির কৌলিনত্ব-ও ফিরে এসেচে আবার। অভয় চালাক লোক। সে কেবল মুখ টিপে হাসল একটু। ঘটি ছোঁয়ার ব্যাপার ফাঁস কোরে ফেলে, তুলকালাম কাণ্ড বাধাতে চাইলে না আর। ভবানী পিসীমার হুকুম মাফিক অভয়রা এঁটো কলাপাতা বাড়ির ত্রিসীমানার বাইরে রেখে আসলো। গোয়াল

ঘরে গোবরছড়া দেওয়া পাপ। তাই তুলসী জল ছিটিয়ে গাঙ থেকে নেয়ে শুচি হোয়ে ঘরে ওঠেন পিসীমা।

এমনি দেখা যায় মন্থ ঠাকুরের ব্যক্তিগত মন শিথিল হোলেও ছোঁয়াছুঁয়ি সম্পর্কে এ-বাড়ির মন কড়া হুঁশিয়ারী পাহারায় নিযুক্ত। সনাতনী প্রভাব জবর দখল কোরে বোসে আছে গোটা বাড়িখানা।

খড়কাটা পর্ব শেষ হয়। আটি বাঁধার পর বাড়িও এসে যায়। এরপর-ই শুরু হবে ঘর ছাওয়া। তারপর গৃহারম্ভের শুভ-দিন দেখে নোতুন ঘর বাঁধা। অনবদ্য ঘরামি-শিল্পী যোগ্যিশ্বরের শেষ কীর্তি প্রতিষ্ঠা। যে-যোগ্যিশ্বরের আম পেকেচে। এখোন বোঁটা খসলেই হয়।

দিন চারেক পরের ঘটনা। সেতার শিল্পী মন্থ ঠাকুর আসর জমকে বোসেচেন। এমন সময় ইষটম কাঁদো-কাঁদো হোয়ে এসে বলে :

—বট্ ঠাকুর, আমার বাবাকে মেরেচে।

বট্ ঠাকুরের ঢেউ তরতর আঙুল সেতারের তারের ওপোর থেমে যায়। জিগ্যেস করেন :

—কে মেরেচে ?

—ঐ গুরুদাস নন্দী। ঘন ঘন চোখ মুছতে থাকে ইষ্‌টম।

—ক্যানো রে ? মারলে ক্যানো ?

—বাবা বাঁশ কাটচিলো তাই। তুমি তাড়াতাড়ি চলো বট্ ঠাকুর। আমার বাবাকে মেরে ফেলল ওরা।

—ওরা কারা ?

—ঐ গুরুদাস। আর তার ছেলেরা—বোদে, ভোলা।

মোটামুটি ব্যাপারটা বুঝতে আর দেরি হয় না মন্থ ঠাকুরের। ইষ্‌টমের বাবা নীলমণি পাকা চোর মুচিপাড়ার। এর-ই শিষ্য খুদিরাম। মালীর বাগের প্রথম শহীদ। নীলমণির শিষ্য-সাবুদ মুচিপাড়ায় অনেক। চোর হিসেবে পাকা হোলেও বাঁশ শিল্পী হিসেবে-ও কাঁচা নয় এই নীলমণি। তবে এ-শিল্প-সামগ্রী পয়সা দিয়ে কেনার মতন সংস্থান নেই তার। তাই চুরি বিদ্যের মারফতেই সংগ্রহ কোরতে হয়। বাঁশের আওলাতে গুরুদাস নন্দী-ই অগ্রণী এ-গাঁয়ের। তারপরেই মন্থ ঠাকুর। মন্থ ঠাকুরের ঝাড়ের তল্‌তা বাঁশ-বাঁশনী বাঁশ যার দরকার ডোল-ডালাকুলো বানাতে অপরিহার্য, তা প্রায় নীলমণির হাতেই নিপাত হোয়েচে। চুরি বিদ্যে বড়ো বিদ্যে, সব সময় এ-বিদ্যাবত্তার পরিচয় দিতে পারে নি সে।

অনেকবার ধরা পড়েচে। কিন্তু ছেড়ে দিয়েচেন মন্থু ঠাকুর। সে-সাথে বাঁশ-ও দিয়ে দিয়েচেন। আর দিয়েচেন সাবধান কোরে। দরকার হোলে সে যেনো চেয়ে নেয়। কেনো না, না বোলে নেওয়ার অন্য নাম চুরি। বোলে নিলে সে-দোষে দুষ্ট হোতে হয় না। এমন উপদেশও দিয়েচেন। কিন্তু দুনিয়ার অনেক ক্ষেত্রের মতন-ই সে-উপদেশের জমিতে ফসল ফলে নি। নন্দী মশাই কিন্তু ছাড়িয়ে বান্দা নন। তাঁর হাতে নীলমণির চুরির মাহাত্ম্য অনেকবার খর্ব হোয়েচে। মানে নীলমণি ধরা পড়েচে। গন্ধর্ব-মার-ও খেয়েচে। দাম সমেত বাঁশ ফিরিয়ে দিয়েচে এবং মুচি মারার দরুণ চান্দ্রায়ণ-ব্রতের খরচাটাও দিতে হোয়েচে তাকে। অবিশ্যি নগদ মূল্যে নয়। মজুর খেটে সামিল কোরে দিয়েচে সে-দাম।

ঠাকুরবাড়ির দখ্যিন-পশ্চিম কোণে গুরুদাসবাবুর অবিরল বাঁশবন। ইষটমের সাথে মন্থু ঠাকুর গিয়ে পৌছন অকুস্থানে। বাঁশতলায় হাট মিলেচে লোকের। নন্দী মশাই তো আছেন-ই। তাঁর দু-ছেলে। বৌ ভুজংগিনী-ও। মাতব্বর হিরু বাছাড়। তার ভাই মথুর। এমন কি তারাপদ ভটচায্যি-ও বাদ যাননি।

বাঁশবনে ঢোকার রাস্তার ধারেই একটা ছাতিম গাছ। ঐ-ছাতিম গাছের সাথে বেঁধে ফেলা হোয়েচে নীলমণিকে। ওর-ই গামছা দিয়ে। পিঠখানা জরো জরো। মারের দাগ বান মাছের মতন ফুলে উঠেছে এবং সে-গুলো ফেটে ঝোরচে রক্তর বসুধারা। কপাল-মাথাও ফেটে গেছে। ভিজে জবজবে চুল। ভুরুর ওপোর থানা-থানা রক্ত জমে। দু-কান দিয়ে গড়িয়ে আসা কাঁচা রক্তর ধারা। অজস্র রক্তে নীলমণি লাল হোয়ে গেছে। মাজার সাথে বাঁধন দেওয়ায় বোসবার জো-নেই তার। ক্রুশবিদ্ধ যীশুর মতন গাছের গায় লেপ্‌টে আছে সে। হেঁপো রোগীর মতন শ্বাস টানচে। দু-নাক দিয়ে গড়াচ্চে রক্ত মেশা পোঁটা।

যতো বড়োই দোষী হোক, আসামীর এ-দশা দেখে ধৈর্য হারান মন্থু ঠাকুর। বলেন :

—ওকে এ-ভাবে বেঁধে রেখেচো ক্যানো? গুরুদাসদা?

নন্দীমশাই চটে ওঠেন :

—বাঁধবো না! এখোনো হোয়েচে কী বাঁধার? ও-শালাকে কুকুর দিয়ে খাওয়াবো গাছে বেঁধে। শালার মুচি টের পায় নি। গোরু-ছোলা ছুলবো ওকে। খাল্ তুলে নেবো। হারামজাদা শালা। ও চুরি করে ক্যানো?

—চুরি কোরেচে ঠিক। কিন্তু তুমি মারবার কে? পুলিশে দাও। আইন

আছে কী জন্য ?

—আইন ? আইন তো কোরচি। ওর জন্যি হতো আইন। এই বোদে! লাগা—লাগা তো।

বোদে তোয়েরই ছিলো। ছুটে গিয়ে দমাদম লাথি মারতে থাকে। ওর ভাই ভোলাও ছুটে গিয়ে চুল ধোরে গাছের গায় মাথা ঠুলতে থাকে নীলমণির।

—এই বোদে। এই ভোলা! পাজির দল।

মন্থ ঠাকুর চেঁচিয়ে ওঠেন।

নীলমণি ঘ্যাঙ্‌ড়াতে ঘ্যাঙ্‌ড়াতে বলে :

—মলাম! মরে গেলাম বট্‌ঠাকুর। ঠ্যাকাও আমাকে।

—ঠ্যাকাবেনে। গুয়োটার শালার মুচি। দেখি তোর কোন্‌ বাবা ঠ্যাকায় ?

বোলতে বোলতে চোট পায় এগিয়ে যান নন্দীমশাই এবং পা'র চটি খুলে দমাদম পিটতে থাকেন। মন্থ ঠাকুরকে দেখেই মারের মাত্রা বেড়ে যায় ওদের। নন্দী মশাই প্রমাণ কোরে দেখাতে চান নীলমণিকে বাঁচানোর তিলমাত্র সাধ্য নেই মন্থ ঠাকুরদের।

—গুরুদাস-দা! বলি হোচ্ছেটা কী। রুখে যান মন্থ ঠাকুর।

বেঁটে ঘপপর গুরুদাস। হাত-পা নড়ি-নড়ি। ঘোলের হাঁড়ির মতন পেটটা। বিরাট পুরুষ মন্থ ঠাকুরের চোট পাটে ঘাবড়ে যান। ঠাকুর মশাইয়ের সংগে নন্দী মশাইয়ের এ পর্যন্ত কোনদিন অসদ্ভাব হয় নি। তবু এ-বিরাট পুরুষের পৌরুষ সম্পর্কে তিনি ওয়াকিবহাল ছিলেন। তখোন গুরুদাসবাবুর বাবা বংকু নন্দী বেঁচে আছেন। সে-সময় গাঁয়ের মধ্যে সেরা অবস্থা ওদের। দালান বাড়ী। সিং দরজা। লোহার সিন্‌দুক। যার আকর্ষণে একদিন রাতে ডাকাত পড়ল। বন্দুক থাকলে কী হবে ? ছুঁড়বার সাহসে কুলোয় না কারো। গোলমাল শুনে মন্থ ঠাকুর ছুটলেন। ঢেকির "ছ্যা" ঘাড়ে। বাঘের মতন লাফিয়ে পড়লেন ডাকাতদলের মাঝখানে। বিক্রম দেখে ভেড়ার পালের মতন ছুটে পালালো ডাকাতরা। সে ঘটনা কী জীবনে ভুলতে পারেন নন্দী মশাই ? নরম কেটে যান তিনি। বলেন :

—শোনো বট্‌ঠাকুর, চটচো ক্যানো ? দোষটা কার শুনবে তো ?

মন্থ ঠাকুরের গোল গোল চোখ জবাফুল। উত্তর করেন তিনি :

—না, কোনো কথা শুনবো না তোমাদের গুরুদাস-দা। ভালো চাও তো

এখুনি খুলে দাও ওকে। খুলে দাও বোলচি।

ভুজংগিনী বৌ ফোঁস করে ওঠে:

—কী "সাগুড়ি" গো! উনি চোর। চুরি কোরবেন। আর উনাকে দিতে হবে আস্‌কারা। ক্যানো? বাঁশ কাটে ক্যানো? বাঁশ কি ওর বাবার ঝাড়ের।

—থামো বৌদি। তোমাকে ফোপর দালালী কোরতে ডেকেচে কে? ভারি যে জজ সাহেব হোয়ে এলে দেখচি।

নন্দী-গিন্‌নী তার বিশাল থালথুলে শরীর দুলিয়ে, নাকের খেজুর ছড়ী নথ নাচিয়ে মুখ ঝামটা দ্যায়:

—না, আমি জজ সাহেব না। জজ সাহেব হোয়ে এলেন উনি ঠাকুর।

—কলা ঠেকাই তোমার বিচারে।

বোলতে বোলতে কলার মতনই ডাগর বুড়ো আঙুল দুটো বাড়িয়ে ধরে।

—এই নীলে, চলে আয়। মন্নু ঠাকুর ডাকেন।

ছাড়া পেয়ে নীলমণি মন্নু ঠাকুরের ধারে সরে আসে। নিঃশ্বাস টানচে সে। তেমনি দু-নাক দিয়ে রক্তাক্ত পোঁটা গল্‌চে। গা-মাথা ভরা শুক্‌নো-কাঁচা রক্ত। চোখের কোণ ভরা শাদা—"ক্যাঁতর।"

—চল্‌।

নীলমনির হাত ধোরে টানেন মন্নু ঠাকুর।

—যাবে কি ফাউ? টাকা দিয়ে তবে পা বাড়াবে।

হুংকার দিয়ে ওঠেন নন্দী গিন্‌নী।

নিরুত্তর মন্নু ঠাকুর নীলমণিকে আগে কোরে নিয়ে যেতে থাকেন। বেগতিক। শিকার ফস্‌কে যায় দেখে তারাপদ ভটচাযি্য প্রতিবাদ করেন।

—ও মন্নু, বলি শোনো, শোনো। চলে যাচ্চো যে! এদের একটা ব্যবস্থা কোরে যাবে তো?

ফিরে দাঁড়ান মন্নু ঠাকুর। বলেন:

—কী বোলচেন, তারাপদ-দা? কিসের ব্যবস্থা?

হকচকিয়ে ওঠেন ভটচাযি্য মশাই, বা! কিসের ব্যবস্থা বুঝলে না! বলিহারি! নীলে বাঁশ কেটেচে না বোলে-কয়ে। তার দামটা দিয়ে যাবে তো? তার চেয়েও বড়ো কথা, গুরুদাস, বোদে, ভোলা তিনজনই নীলেকে মেরেচে। সুতরাং তিনজনকেই প্রায়শ্চিত্ত কোরতে হবে। তার খরচ-খরচাটা

দিয়ে ওকে নিয়ে যাও। কেউ আটকাবে না।

—ও। আপনি বুঝি এই লোভে-লোভে ঘুরচেন এখানে? তা বেশ তো। মাত্তর তিনজনকে দিয়ে ক্যানো? এখানে যারা এসেচে দলশুদ্ধ সবাইকে দিয়ে ওকে মারালে, মেলা ধেনু পাওনা হোতো আপনার। বিরাট রাজার মতন গোয়াল বাঁধতে পারতেন। অথবা ধেনুর বদলে মূল্য নিলেও ফেঁপে উঠতেন যে কোনো রাজার মতনই।

মনু ঠাকুরের এ-বিবৃতি বর্ণে বর্ণে সত্য। অবিশ্যি মুচি ঠ্যাঙালে স্মার্তমতে কী বিধান আছে জানি নে। তবে তারাপদ ভট্‌চায্যির মতে প্রায়শ্চিত্ত ব্যতিরেকে নান্য পন্থা। এটা জানি। তাই এ-গাঁয়ের সব চেয়ে বড়ো মুচি ঠ্যাঙাড়ে গুরুদাসবাবু এক নীলমণিকে ঠেঙিয়ে এর আগে সাত-সাতবার প্রায়শ্চিত্ত কোরেচেন। তার দরুণ হবিষ্যি খরচ থেকে স-দখ্যিণা ধেনু মূল্য পর্যন্ত আদায় হোয়েচে নীলমণির ঘাড় ভেঙে। আগেই বোলেচি, নগদ মূল্যে নয়। "জন" খাটিয়ে।

ভট্‌চায্যি মশাই প্রায়শ্চিত্ত মাহাত্ম্য কীর্তন কোরেচেন পঞ্চমুখে। ইহকাল-পরকাল দু-কালেরই পাথেয় এ-প্রায়শ্চিত্ত-ব্রত। এ-ব্রত পালনে অতি পাতক-মহাপাতক দোষ বিনাশ হয়। জন্ম নিরোধ অর্থাৎ পুনর্জন্ম হয় না। মাতৃগর্ভে এসে জঠর-যন্ত্রণা ভোগ-ও কোরতে হয় না। আরোগ্য-সুখী সংসার নিয়ে মানুষ শতায়ু হয়। ইত্যাদি ইত্যাদি। তবু কিন্তু ভট্‌চায্যি মশাই বিশ্ব কৃপণ নন্দী মশাইকে কোনোমতেই ভজাতে পারতেন না যদি নাকি খরচের বোঝা নীলমণির ঘাড় ভাঙতে না পারতো।

মনু ঠাকুরের এ-মন্তব্যে মাতব্বর হিরু বাছাড় মশাই টিপ্‌পনি কাটেন:

—দেখলেন ভট্‌চায্যি মশাই, বট্ঠাকুরের আস্‌ফলানি। অমন ধারা লাই দেওয়া কথা পেলে, মুচিরা কেন না গা বেয়ে উঠবে?

তারাপদ ভট্‌চায্যি মাথা ঝাঁকান। বলে:

—বোঝো তোমরা। আমি আর কী বোলবো?

ফোঁস কোরে ওঠে নন্দী-বৌ, ক্যানো বোলবে না? ও ঠাকুর? তুমি বামুনের ছেলে না? পেরাচিত্তির না কোরলে ওদের হাতের জল শুদ্দু হবে। মুচি ঠ্যাঙানো হাতের জল খাবে তুমি। বেশ তো খেয়ো। কাজ নেই তবে পেরাচিত্তির কোরে।

বোলেই নন্দী-বৌ তার মালসার মতন মুখখানা এক অব্যক্ত কায়দায় ঘুরিয়ে

নেয়। সাথে সাথে ক্যাটা নাকে খেজুর ছড়ী নথটা আরেকবার দুলে ওঠে। ঝিকমিকিয়ে ওঠে গালের ওপোর নথের টানাটা।

প্রমাদ গণেন ভট্টচায্যি মশাই। তাঁর সবৎস ধেনু মূল্য বুঝি ফস্‌কে যায়। কেনো না নন্দী মশাই তেমন পাত্তর নন, গাঁটের পয়সা খুলে প্রায়শ্চিত্ত কোরবেন। আগুনের মতন জ্বলজ্বলে প্রমাণ তার পেয়েচেন তারাপদ ভট্টচায্যি। মাত্তর বছর খানেক পূর্বে। নন্দী মশাই-এর লিভার ফাঙ্‌শনটা বরাবর খারাপ। নেমন্তন্নে মাংস পোলাও খেয়ে আসার পর হঠাৎ বেদনাটা বেড়ে যায়। হোমিও ডাক্তার কান্তি তরফদার ফেল মারল। তখোন আসলেন কেশবপুরের সরকারী ডাক্তার বিধুবাবু। তিনি পরীখ্যে কোরে রায় দিলেন, সিরোসিস্ অব্ দি লিভার। সারা কঠিন। সবাই সাব্যস্ত করে, এ-যাত্রা গুরুদাসবাবুর আর অব্যাহতি নেই। নন্দী মশাই-এর নিজেরো ধারণা হোলো তাই। নানান দিক দিয়ে গিন্নির ওপোর তাঁর সন্দেহ বরাবর। তাই তার অজান্তে বড়ো ছেলে বোদেকে পাশে ডাকলেন। খাতকদের কার কাছে কতো কী পাওনা তার হিসেব নিকেশ পেশ কোরলেন। লুকোনো টাকা-পয়সা, সোনাদানার ঠিক ঠিকানা দিয়ে দিলেন। সিন্দুকের ডালা যেমনি আছে, তেমনি থাকে যেনো। ঘড়ি-ঘট্টটার দরকার নেই। কোনো রকমে অন্ন-জল কোরে শেরাদ্ধটা সেরে দিতে বোললেন। গংগায় অস্থি দিতে হবে না। সে-কাজ তিনি সেরে এসেচেন। বোদে বুঝতে পারে না জ্যান্ত বাবা কী কোরে তাঁর অস্থি নিখ্যেপ কোরে এলেন গংগায়। ছেলের কৌতূহল হোয়েছিলো জানবার। গুরুদাসবাবু তখোন সিঁটকে ভুঁতি দেখিয়ে বোলেছিলেন, "এখানকার এই দাঁতটা নড়ছিলো। হাওড়ার পুলের ওপোর দাঁড়িয়ে টেনে তুলে ছুঁড়ে দিয়েছিলাম গংগাজলে।"

ভাগ্যক্রমে নন্দী মশাই সেরে ওঠেন। এবং গল্পটা ভট্টচায্যি মশাই-কে বলেন। এহেন নন্দী মশাই প্রায়শ্চিত্ত সারতে ট্যাঁক খুলে কদাপি দখ্যিণান্ত কোরবেন না। এ-উপলব্ধি তারাপদ ভট্টচায্যি মর্মে-মর্মে-ই বুঝে রেখেচেন। বাগানো শিকার ফসকে যায় দেখে তিনি তখোন ভুজংগিনী বৌ-এর পখ্যে সায় দেন :

—ঠিক কথা বোলেচো তুমি বৌমা। সোজা কথা মুচি ঠ্যাঙানো! প্রায়শ্চিত্ত না কোরলে হাতের জল শুদ্ধ হয়! শোনো মনু, তিনটে প্রায়শ্চিত্তের খরচ লাগবে। তা নীলে ব্যাটা তো গরীব মানুষ। খেতে পায় না। এক কাজ কর। ওর হোয়ে তুমিই খরচটা দিয়ে ওকে নিয়ে যাও। কেউ কোনো আপত্তি

দেবে না।

—আপত্তিকে মন্নু ঠাকুর ডরায় না; তারাপদ দা। নীলে বাঁশ চুরি কোরেচে। তার খেসারত তোমরা তুলে নিয়েচো গন্ধর্ব-মার দিয়ে। বাঁশও সে কিছু নিয়ে যায় নি। সুতরাং ওর পেরাচিত্তির হোয়ে গেছে। মুচি ঠেঙিয়েচে গুরুদাস-দা। পাপ গুরুদাস-দারই। সে পেরাচিত্তির ওই কোরবে। চল নীলে। দেখি কে তোকে আটকায়। বোলেই জনতার পানে বিস্ফারিত অগ্নিচোখ চান মন্নু ঠাকুর।

জনতা হতভম্ব। কেবলমাত্তর ভুজংগিনী-বৌ হাত-মুখ নেড়ে ফিগার দেখায়। মন্তব্য রাখে:

—ওরে আমার মুচি দরদী। বামুনের ঘরে মুচির দামড়া।

বিজয়ী মন্নু ঠাকুর নীলমণিকে নিয়ে চলে যাওয়ার পর জনতার শূন্যগর্ভ আস্ফালন আকাশ ফাটিয়ে দেয়। মাতব্বররা নানারকম মন্তব্য পেশ করেন। বাছাড় মশাই বলেন:

—দেখে নেবো মন্নু ঠাকুরকে। কতো ভাত দুধ দিয়ে খেয়েচে ঠাকুর।

তার ভাই মথুর বলে:

—বেজায় তালেবর হোয়েচে মন্নু ঠাকুর। ওর পিসীমা মরবে না? দেখে নেবো বামুনপাড়ার কোন্ ঠাকুর ফেলতে যায়? তার জল ছোঁব না আমরা। যজমানও থাকবো না।

ফুটো মাতব্বর কাঞ্চন কুণ্ডুও টিপ্পনী কাটতে ছাড়ে না। বলে:

—তবেই তো বয়ে গিয়েচে। মুচিপাড়া আসবে। বট্‌ঠাকুরের পিসী মুচি-পাড়ার কাঁধে উঠে সগ্যে পৌছবে।

বাইরে থেকে ঘর পর্যন্ত কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি চলে। শতছিদ্র ভুজংগিনীও নিষ্কলঙ্ক শৈলজার গায়ও কালি ছিটোয়।

শেষটা তারাপদ ভট্‌চাযি্য নন্দী মশাইকে ধোরে বসেন:

—তিন রাতের মধ্যেই প্রায়শ্চিত্ত কোরতে হবে কিন্তু গুরুদাস। তিনরাত উতরোলে প্রায়শ্চিত্যের মূল্য দুনো দিতে হবে।

তিন রাত উতরে যায় যায়। বারবার ভয় দেখানো সত্ত্বেও প্রায়শ্চিত্ত-ব্রত-ভংগের ফল ফললো না গুরুদাসের মনে। কিন্তু এ-প্রায়শ্চিত্ত সম্পর্কে মাতব্বরদের আগ্রহটাই যেনো এবার দেখা যায় মাত্রা ডিঙোনো। এ-দায় বুঝি তাদেরি। মাথা বেড়ে চাল পড়েচে তাদেরি ঘাড়ে। মন্নু ঠাকুর লথ্য করেন

সব। কিন্তু খুলতে পারেন না এ-রহস্যর মুখোশ।

তারাপদ ভট্‌চায্যি হাল ছাড়েন না। পাওনার তীর হাতছাড়া হয় বুঝি সত্যি-সত্যি। শেষ পর্যন্ত মনু ঠাকুরের অনুপস্থিতিতে ধোরে বসেন গিয়ে ভবানী পিসীকে। ভট্‌চায্যি মশাই জানেন, বাড়ি-ঘর হোতে পারে মনু ঠাকুরের। কিন্তু সে-ঘরের মধ্যে এখোনো ভট্‌চায্যিদের মন নির্বোধ দখল নিয়ে বোসে আছে। পিসীমা সবে মাত্তর তিলক সেবা সেরে উঠি উঠি কোরচেন। এমন সময় তারাপদ ভট্‌চায্যি হাজির।

—কিরে তারাপদ? ভালো আছিস্? আয়।

গালভরা হাসি পিসীমার।

আহ্নিকের সময়। পিসীমার মন-মেজাজ ভালো। দেখে ভট্‌চায্যিও খুশী হন। বাতাস অনুকূল। খুব ঘটা কোরে পা'য় ধুলো নেন পিসীমার। জিগ্যেস করেন:

—তুমি কেমন আছো পিসীমা?

—গোবিন্দ রেখেচেন যেমন। বোস্।

বোলতে বোলতে তাঁর আহ্নিক করার আসনখানা সরিয়ে দেন। বলেন, কি রে? তুই তো মোটে আসিস্ নে আজকাল? ক্যানো রে?

হঠাৎ ভট্‌চায্যির মুখখানা মেঘাচ্ছন্ন হোয়ে আসে।

—কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে আমি কি এখোন না খেয়ে মরবো পিসীমা?

গাছ থেকে পড়েন পিসীমা, সেকী! কী হোয়েচে রে তারাপদ?

তারাপদর চোখ ছলছল হোয়ে ওঠে। বলেন:

—মনু আমার মুখের ভাত কেড়ে নিচ্চে পিসীমা। এখোন আমি কী কোরে বাঁচি? তবু যদি ও নিজে খেতো তাতে আমার মোটেই কষ্ট ছিলো না।

কথাটা বুঝতে পারেন না ভবানী পিসী। বলেন:

—সে কী! মোনো তোর মুখের ভাত কেড়ে খাচ্চে! বোলিস্ কী! এতো ভাতের অভাব হোয়েচে হারামজাদার!

—না, না। বুঝচো না তুমি পিসীমা। মনু খেলে দুখ্যু ছিলো না। ও নিজেও খেলে না। আমাকেও খেতে দিলে না।

পিসীমার কৌতূহল বেড়ে ওঠে। বলেন:

—খুলেই না বল বাবা।

ভট্‌চায্যি মশাই তখোন বেশ ফলাও কোরে নিবেদন করেন ঘটনাটা।

শেষটায় সনির্বন্ধ অনুরোধ জানান, তিনি যেনো নীলমণির ঘাড় ভেঙে "যেন তেন প্রকারেণ" প্রায়শ্চিত্তর খরচ আদায় কোরে দেন এবং মনু ঠাকুরকে নিষেধ করেন, যেনো তিনি তাঁর মুখের ভাত না কাড়েন। অর্থাৎ গুরুদাসরা যেনো নির্বিবাদে মুচি পিটোতে পারে।

ভবানী পিসী সায় দেন, ঠিক কথা তো। মুচি মেরে পেরাচিত্তির কোরবে না! মোনো হারামজাদা, তাতে বাধা দেবে! ওর বাবা বেঁচে থাকলে হোতো মনে। তুই যা তারাপদ। টাকা দেবে না মাগুনা কথা? বাবার সুপুত্তুর হোয়ে টাকা দেবে নীলে।

—কিন্তু তিনরাত যে উতরে যায় পিসীমা। তার কী? এরপর তো—ডবল খরচ লাগবে।

—লাগে, দেবে ডবল খরচ।

—তুমি একটু মনে কোরলে তা পারবে পিসীমা। জানো তো প্রায়শ্চিত্তের ফল ভোগ করে কারা কারা?

পিসীর জানা ছিলো না। তারাপদ ভট্‌চায্যির পানে তাকান। বলেন :

—না তো। কারা কারা?

—গুরু, পুরুত, যে করায় আর যে করে। এ-ফল তোমারো পাওনা হবে পিসীমা।

খুশী হন ভবানী পিসী। স্মৃতি শাস্তর জানা না থাকলেও তাঁর শোনা প্রায়শ্চিত্তের ফল অবধারিত।

প্রাত্যহিক নিয়মমাফিক আটচালার দখ্যিণ বারান্দায় সন্ধ্যের পর গানের আসর জমকে বসেন মনু ঠাকুর। আহ্নিক সেরে পিসীমা-ও এসে দাঁড়ান সামনে। তাঁর বুড়ো আঙুলে ঝুলচে জপের মালা।

—বলি মোনো, কাণ্ড-কারখানা কী তোর?

হকচকিয়ে ওঠেন মনু ঠাকুর, কী পিসীমা?

—কী পিসীমা? সেদিন বাঁশ চুরির ব্যাপার নিয়ে কী কাণ্ড বাধিয়েচিস? তুই নাকি নীলে মুচিকে পেরাচিত্তের টাকা দিতে দিস্‌নি! সত্যি নাকি? ক্যানো রে?

—কে বোললে তোমাকে? তারাপদ-দা নিশ্চয়। তা নীলে ক্যানো টাকা দিতে যাবে পিসীমা?

পিসীমার কপালের চামড়া কুঁচড়ে যায়। চোখ ওঠে গোল গোল হোয়ে।

প্রতিবাদ করেন :

—কে দেবে তবে ?

—বাঃ। শাস্তরের পাতায় তাই বুঝি লেখা আছে ? নীলেকে ঠেঙিয়েচে গুরুদাস-দা। অপরাধ তার-ই। পেরাচিত্তির কোরতে হয়, সে-ই কোরবে। তার খরচ নীলে যোগাবে কোন্ খাতিরে ?

—সে চোর। গুরুদাসের বাঁশ চুরি কোরেচে সে।

—বাঁশ যেমন চুরি কোরেচে তার সাজাও পেয়েচে তেমনি। দেখেচো ? সেদিন কী গন্ধর্ব-মার মেরেচে ওকে গুরুদাস-দা ? পিঠ ফুলে গেছে বান মাছের মতন। চামড়া কেটে মাংস বেরিয়ে পড়েচে। মাথা ফাটিয়ে দিয়েচে। কান-নাক দিয়ে ঝোঁঝালে রক্ত পড়েচে। গাছে বেঁধে পিটিয়েচে। সে-দৃশ্য দেখেচো তুমি পিসীমা ? শুনেও এতটুকু মায়া হয় না ! এতো সাজা দেওয়ার পর-ও আবার পেরাচিত্তের টাকা ! আর তুমিও ওদের হোয়ে তার সাফাই গাইচো ! ছি !

ছলছলিয়ে ওঠে মনু ঠাকুরের দু-চোখ।

পিসীমা কিন্তু অবিচলিত। বলেন :

—শোন্ মোনো, তুই যদি এমনি কোরে আস্কারা দিস্ মুচিদের—তবে তার ফল কী হবে জানিস্ ?

—কী পিসীমা ?

হাসি হাসি মুখ মনু ঠাকুরের।

—সারা মুচিপাড়াটা চোর হোয়ে যাবে। সে-খেয়াল আছে তোর ?

—খুব আছে। চোরই বানাতে চাই ওদের আমি।

ভবানী পিসী শিউরে ওঠেন :

—ওমা আমার হবে কী ! তুই বোলিস কী মোনো !

—ঠিকই বলি। আমাদের ঝাড়ে বাঁশ শুকিয়ে নষ্ট হবে। গুরুদাসদার বাঁশবন আকাশ ঢেকে জমকে রইবে সাখ্যিগোপাল হোয়ে। আর ওরা একফালি বাঁশের অভাবে একটা ডোল কি একখানা ডালা বুনতে পারবে না। না খেয়ে শুকোবে। পোকার মতন মরবে। সেটা আর হোচ্চে না, পিসীমা। যা হোয়েচে, তা হোয়েচে। আমি ওদের চোর বানাবো। লুটেরা বানাবো। কাট-কুটো, ফল-ফুলুরি, ধান-চাল, টাকা-পয়সা সব কিছু লুঠতরাজ করিয়ে দেবো। তছনছ করিয়ে দেবো ওদের দিয়ে। বোলে দিও তোমার মাতব্বরদের।

সেতার টেনে নেন মন্টু ঠাকুর। ভবানী পিসীও আর কিছু বোলতে সাহস করেন না। লম্বা একটা নিশ্বেস ফেলে ধীরে ধীরে বাড়ীর মধ্যে ঢোকেন।

পরদিন আবার তারাপদ ভট্‌চায্যির আবির্ভাব। পিসীর মুখে সব কথা শুনে হতাশ হোয়ে পড়েন তিনি। তাঁর বাগানো শিকার ফস্‌কে গেলো তা হোলে। এদিকে পিসীমার অবস্থাও কাহিল। তাঁর মন প্রায়শ্চিত্তের ফল লোভাতুর। তিনি বলেন:

—তারাপদ, তুই এক কাজ কর। ও হারামজাদা পাজী, টাকা দিতেই দেবে না নীলেকে। টাকাটা আমিই দিচ্চি। গুরুদাসের পেরাচিত্তিরটা আজই সেরে ফ্যালগে। আর ওই সাথে আমার নামে একটা ফুল দিস কিন্তু বাবা। চন্দরায়ণ কোরে দিলি, তা ফল হোলো কই? কোমরের শাদা দাগটা তো বেড়েই চলেচে।

কইতে কইতে ভবানী পিসী ঘরের মধ্যে ঢোকেন এবং এক-আঁচোল টাকা-সিকি-আধুলি, তামার পয়সা এনে তারাপদর সামনে ঢেলে দেন।

মহা খুশী ভট্‌চায্যি মশাই। মুদ্রাগুলো কোঁচার মুড়োয় তুলে নিয়ে চলে যান তিনি। যাওয়ার সময় বোলে যান, পিসীর নামে সংকল্প কোরে ফুল দেবেন।

ঘটা কোরেই প্রায়শ্চিত্ত সারা হয় গুরুদাসবাবুর। আর মাতব্বররা অপপ্রচার চালায় শেষ পর্যন্ত মন্টু ঠাকুরকে দিয়ে নীলমণির ঘাড় ভেঙে টাকা আদায় কোরে এনেচে ওরা।

গুরুদাস নন্দীর প্রায়শ্চিত্ত শেষ হওয়ার পর পরই মুখোশ খুলে যায় এবং অর্জুনের বিশ্বরূপ দর্শনের মতন চক্রান্তের বিবরে মাতব্বরদের স্বরূপ দেখতে পান মন্টু ঠাকুর। আর অনন্ত চাঁদ-সূর্য না থাকলেও কড়া পোকার মতন ধারালো মুখওয়ালা অজস্র পোকাদের কিল্‌বিল্‌ কোরতে দেখেন সেখানে। সতীশকে ইস্‌কুলে ঢোকানোর পর-ই গেরামে এক চাপা গুন্‌গুনানি শুরু হয় এবং ঐ-গুন্‌গুন্‌ আওয়াজ ক্রমশঃ পষ্ট হোতে থাকে ইষ্টম প্রমুখ আরো মুচি ছাত্তর ঢোকার সাথে-সাথে। মুখ্য আপত্তিটা ওঠে ছোঁয়া-ছুঁয়ির ব্যাপার নিয়ে। তাই সেটাকে নিরসন কোরতেই সাঁই পণ্ডিত গাঁটের খরচায় আলাদা একটা চাল তুলে দেন। এই আলাদা চাল মুচি ছাত্তরদের ছোঁয়াচকে আলাদা কোরে রাখে। ফলে চাপা গুঞ্জন আর পাখ্‌না মেলতে পারে না। এরপর-ই হয় সতীশের অসুখ। সাঁই পণ্ডিতের প্রিয়তম ছাত্তর সে। দেখতে যান তিনি। দেখেন সতীশের অবস্থা খুবই কাহিল। ওর মা ময়না ছেলেকে নিয়ে একলা থাকে। রাতে ছেলের জ্বর বাড়ে। বিকার ঘোরে প্রলাপ বকে। পাড়ার কেউ এগোয় না। সৎ-ছেলে

পন্থ্যা ফিরেও তাকায় না একবার। ময়নার ভারি ভয় করে। তাই সতীশ সেরে ওঠা পর্যন্ত ওদের বাড়ি রাত কাটান সাঁই মশাই। এই ফাঁকে চাপা গুঞ্জন আবার ডানা মেলে উড়তে শুরু করে। যেহেতু সাঁই পণ্ডিত চিরকুমার। ময়না বিধবা। সুন্দরী যুবতী। তার ঘরে রাত কাটানো অবৈধ। এ-সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ কোথায়? কিন্তু সাঁই পণ্ডিতের চরিত্র ছিদ্রহীন। তার ওপোর ফাটল ধরানো চারটেখানেক কথা নয়। তবু সে-ছিদ্র-সন্ধান মিলল। ইস্কুলে সতীশকে মার ধোর করার পর। সাঁই মশাই মুচি ঠেঙিয়েচেন। হোক না মুচি ছাত্তর। তবু তো মুচি। এর প্রায়শ্চিত্ত কোরতেই হবে ওঁকে। মাতব্বর মহলে সবরব উঠল। এরপর সত্যিই একদিন বাছাড় মশাই দূত পাঠালেন—তারাপদ ভট্চাষ্যিকে। কিন্তু পাহাড় নড়ে। সাঁই পণ্ডিত নড়েন না। তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, কথ্খনো না। প্রাণ থাকতে প্রায়শ্চিত্ত হবে না তাঁর দ্বারা। সাঁই পণ্ডিতের ব্যক্তিত্বকে ভয় করেন মাতব্বর মহল। বিশেষ কোরে মন্থু ঠাকুর তাঁর পেছনে। তাই আপাততঃ এ-প্রসংগ চাপা পড়ল। এর অনতি পরেই ঘটল নীলমণির বাঁশ চুরির ঘটনা। তখোন মুরুব্বিদের তোড়যোড়ের অন্ত রইল না। গুরুদাসকে দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত সারানোর। কিন্তু এ-প্রায়শ্চিত্ত যে সাঁই পণ্ডিতকে প্রায়শ্চিত্তে বাধ্য করানোর নজির, তা এখোন কাঁচের মতন স্বচ্ছ হোয়ে গেলো।

পরপর দু-তিন দিন ডাকার পরও সাঁই পণ্ডিত ওজর-আপত্তি দেখিয়ে গর হাজির থাকলেন। তারপর একদিন মাতব্বররা-ই গিয়ে দাখিল দেন পণ্ডিতবাড়ি। সেদিন রোববার। সাঁই মশাই তখোন দাওয়ায় বোসে মন্থু ঠাকুরের সংগে গল্প কোরচেন।

অগ্রণী তারাপদ ভট্চাষ্যি বলেন:

—আমরা এলাম পণ্ডিত মশাই।

—বেশ তো। কী ব্যাপার? বলুন, বলুন।

তড়বড়িয়ে উত্তর চান সাঁই পণ্ডিত।

এ-সময় মন্থু ঠাকুরকে এখানে মোটেই আশা কোরতে পারেন নি ভট্চাষ্যি মশাই। তাঁকে দেখেই ঘাবড়ে গেছেন তিনি। ঘাবড়ানোর কারণ সেদিন গুরুদাস নন্দীর প্রায়শ্চিত্তর বাবদ ভবানী পিসীর কাছ থেকে তিনি যে-টাকা এনেছিলেন, তাকে একরকম চিটিংবাজিই বলা চলে এবং এ-চিটিংবাজির পরেও মাতব্বরদের প্ররোচনায় অপপ্রচার চালিয়ে ছিলেন মন্থু ঠাকুরের নামে। তিনিই নাকি নীলমণির থেকে টাকা আদায় কোরে দিয়েছিলেন নন্দী মশাই-এর

প্রায়শ্চিত্তর বাবদ। এ-ব্যাপারে মনের কাছে তিনি নিশ্চয়-ই খাটো। তাই সাঁই পণ্ডিতের উত্তরের জবাব দিতে প্রথমটা থতমত খেয়ে যান তারাপদ ভট্‌চাষ্যি ঢোক গিলে নিয়ে বলেন :

—বাছাড় মশাইরা এলেন। মানে কথা হোচ্চে কি, আপনার প্রায়শ্চিত্তটা শিগগীর শিগগীর সেরে ফেলুন। অনেক দেরী হোয়ে যাচ্চে।

চোখ কপালে ওঠে পণ্ডিতের।

—প্রায়শ্চিত্ত! তা আমার প্রায়শ্চিত্ত নিয়ে আপনাদের মাথা ঘামানোর কী হোয়েচে?

—হোয়েচে বৈকি পণ্ডিত মশাই। গুরুদাস নন্দীর মতন একজন আকাট মূর্খ লোক যদি পেরাচিত্তির করে, তবে আপনার মতন একজন পণ্ডিত মানুষের পেরাচিত্তির না করা কতো বড়ো অন্যায়। সেটা ভেবেচেন কি? বক্তব্য রাখেন বাছাড় মশাই।

—গুরুদাস-দা তো প্রায়শ্চিত্ত কোরবেই। একশোবার কোরবে আর সে-খরচটা নীলের কাছ থেকে আদায় কোরে নয়। গলায় কুড়ুল বেঁধে। সাত গেরাম মেঙে এনে কোরবে সে-প্রায়শ্চিত্ত।

—ক্যানো? প্রশ্নকর্তা বাছাড় মশাই।

—গুরুদাস-দা পাপ কোরেচে। সে নীলেকে মেরেচে। পশুর মতন গাছে বেঁধে ঠেঙিয়েচে। আর আমি প্রায়শ্চিত্ত কোরতে যাবো কোন্ হরিষে? চোখ জলতে থাকে সাঁই পণ্ডিতের।

—আপনার পাপ তার থেকে অনেক বড়ো। আপনি মুচির ছেলে ইস্কুলে ঢুকিয়েচেন। মুচি ছুঁলে চান কোরতে হয়। আপনি তা করেন নি। তুলসী-জল পর্যন্ত মাথায় দেননি। তারপর সেদিনকের কথা, মুচি পোড়োদের গো-ঠেঙান্ ঠেঙিয়েচেন। আপনার পাপ খাটো? বক্তা বাছাড় মশাই।

সাঁই পণ্ডিত জবাব দেন, সে-অধিকার আমার আছে বাছাড় মশাই। আমি শিক্ষক। তারা ছাত্তর। ছাত্তরদের শিক্ষা দিতে, মানুষ কোরতে, শিক্ষক মারতে পারে। বকতে পারে। তার লেগে প্রায়শ্চিত্ত! কখ্খনো না।

বাছাড় মশাই চটে ওঠেন, পেরাচিত্তির কোরতেই হবে আপনার। আপনার অনেক দোষ।

মনু ঠাকুর এতোখ্যান চুপচাপ ছিলেন। এবার ফেটে পড়েন তিনি :

—কী অনেক দোষ? খুব যে তড়পাচ্চো।

এবার মথুর কোমর বাঁধতে থাকে। বলে :

—জানো না কী দোষ? খুব যে ন্যাকা সাজচো ঠাকুর? ভাঙবো? হাটের মাঝে হাঁড়ি ভাঙবো।

—ভাঙো না।

—উনি পাঠশালায় মুচি ঢুকিয়েচেন। মুচি মেরেচেন। মুচির জল খেয়েচেন। বয়স্থা বিধবার সাথে মুচিপাড়ায় রাত কাটান। আমরা বুঝি কিছু বুঝি নে? ঘাস খাই? না ঠাকুর? তুমি শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে চাও?

—সাবধান। ফের ও-কথা মুখের আগায় এনো না, বোলচি মথুর।

—ওঃ! উনার ডাঙর গলারে ভয় কোরতে হবে নে। ঘরে যেয়ে মেয়ে মানুষের সাথে চোটপাট কোরো। সাবধান? কিসের সাবধান? পেরাচিত্তির উনাকে কোরতেই হবে। নইলে উনাকে আমরা ছোঁবো না। উনার জল খাবো না। ইস্কুল থেকে তাড়িয়ে দেবো।

—ওঃ! খুব তো তালেবর দেখচি। দেখা যাবে, তুমিও বা কতো ভাত দুধ দিয়ে খেয়েচো মথুর। যাও।

—যাবো ছাড়া কি থাকবো? খেতে এসেচি নাকি মুচি বাড়ি? চোট পায় বেরিয়ে যায় মথুর। মাতব্বররাও তাঁর অনুসরণ করেন।

সেদিন ময়নাদের বাড়ি থেকে সাঁই পণ্ডিত রাগ কোরে বেরিয়ে যাওয়ার পর ময়নার বুকে যে ব্যথা বেজেছিলো, সে-ব্যথার উপমা খুঁজতে হোলে, আরেক-দিনের ব্যথাতুর ঘটনাকে সামনে তুলে ধোরতে হয়। তখোন ওর স্বামী কানাই ঢুলী বেঁচে আছে। কী নিয়ে স্বামী স্ত্রীতে বচসা হয়। কানাই রাগ কোরে বাড়ি থেকে চলে যায়। ঐ পেয়ারা তলা দিয়ে। আঁধারে তলিয়ে যাওয়া ঐ-মেঠো পথ ধোরে। সে-রাতে আর ফিরে আসে না। পরদিনের পরদিন-ও না। সে-কয়েকটা রাত ময়নার কেটেছিলো ঠিক অমনি সমান্তরাল ব্যথাতুর বুক নিয়ে।

আলো ধোরে পেয়ারাতলা পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে রাতের আঁধারে ডুবে যাওয়া সাঁই পণ্ডিতের হদিস মিলল না যখোন, দুঃখে-খোভে-রাগে-তখোন তার বুকখানা তুলল তোলপাড় কোরে। তারই প্রতিক্রিয়া ফল ফলল সতীশের ওপোর। রান্না ঘরে ফিরে এসে সতীশকে মারধোর কোরল। গালি-গালাজ দিলো। সাঁই পণ্ডিত যদি চলে না যেতেন, তা হোলে অমন ধারা ভাগ্য বিপর্যয় ঘটতো

না। মানে শিকার মাংস দিয়ে সতীশের রাতের ভুরি ভোজনটা পরিতৃপ্ত হোয়ে উঠতো। ঐ-ঘটনার পর সাঁই পণ্ডিত আজো পর্যন্ত আর এ-বাড়িতে পা বাড়ান নি।

রোজ সন্ধ্যেয় পেয়ারার পাতা ঝরে। খসে পড়ে নারকেলের বালতো। শুকনো পাতার ওপোর দিয়ে হেঁটে যায় শিয়াল-কুকুর-গণ্ড গোখ্‌লোরা। শোনা যায় রাতচরা পাখির পক্ষ বিধুনন এবং প্রত্যেকটা ধ্বনি ময়না কান পেতে শোনে এবং মিথ্যে আশ্বাসে পলক মাত্তর উল্লসিত হোয়ে ওঠে ওর বুকখানা। তারপর যে আঁধার সে-আঁধার। দিক চিহ্ন লুপ্ত-অতলান্তিক আঁধার।

সতীশ রোজ ইস্‌কুলে যায়। ময়না তার কাছে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নেয় সাঁই পণ্ডিতের খবর। তিনি কেমন আছেন। এ-বাড়ীতে আসার কথা কিছু বলেন কি না। ওদের কথা জিগ্যেস করেন কি না। ইত্যাদি-ইত্যাদি।

সতীশ ইস্টম্‌দের মারধোর করার সংবাদ মুচিপাড়ায় পৌছোনোর পর দু-একদিন ঢেউ বয়েছিলো মাতব্বর মহলে। চাপা প্রতিবাদও কোরেছিলো কেউ-কেউ। ময়না কিন্তু মোটেই অসুখী হয় নি। সে জানে, সাঁই পণ্ডিত তার ছেলের একান্ত হিতৈষী। তাকে মারুক-ধরুক, গাল-গালাজ করুক, সে তার ভালোর জন্য—। তাই পাড়ায় প্রতিবাদ ময়নাকে টলাতে পারে নি।

সেদিন সতীশ ইস্‌কুল থেকে খুব সকাল সকাল বাড়ি ফিরল। একলা সতীশ না। মুচিপাড়ার সব ছাত্তররা। ময়না জিগ্যেস করে:

—কীরে? এখুনি বাড়ি এলি যে! ইস্‌কুল হোল না?

—না।

—ক্যানো!

—তা জানি নে। মাষ্টার মশাই বোললে, তোরা আর এ-ইস্‌কুলে আসিস্‌ নে।

ময়না ঠিক বুঝতে পারে না ব্যাপারটা। জানতে চায়:

—একলা শুধু তোরে বোললে?

—না। আমাদের পাড়ার সবাইকে। সতীশ উত্তর ছায়।

—ক্যানো! তোরা পড়াশুনা কোরিস্‌ নে বুঝি? তাইতে। মাথা ঝাঁকায় ময়না।

—না মা। আমরা ইস্‌কুলের দোর ধারে উঠতেই মাষ্টার মশাই বারণ কোরলে। বোললে, তোরা সব বাড়ি যা। এ-ইসকুলে আর আস্‌বি নে।

আমিও থাকবো না।

চোখ কপালে ওঠে ময়নার। বলে :

—তোদের মাষ্টার মশাইও থাকবে না।

—তাইতো বোললে। আর বুঝলে মা, মাষ্টার মশাই বোলেচে…,

ঢোক গিলতে থেমে যায় সতীশ।

উৎসুক ময়না শুধোয় :

—কী বোললে রে? মাষ্টার মশাই?

—বোললে, আজ আমাদের বাড়ি আসবে।

—কখোন?

—তা তো বলে নি।

পরিষ্কার কিছু বুঝল না ময়না। সারাদিনমান তার বুকের আকাশে চলল আলো-ছায়ার লুকোচুরি খেলা। এই সূর্য উঠল, এই ডুবল।

তবু সে অনেকদিন পরে আধময়লা কালোপেড়ে ধুতিখানা পরল। বোতল থেকে নারকেল তেল নিয়ে মুখে মাখল। চকচকে কোরল মুখখানা। সন্ধ্যের পর সাঁই মশাই এলেন। পেয়ারাতলায় পায়ের শব্দ শুনে ময়না আগেই টের পেয়েছিলো। কিন্তু টের না-পাওয়ার ভান কোরে ঘরের ভেতর বেড়ার কোণে কতকগুলো হাঁড়ি-কুঁড়ি নিয়ে খুটখাট কোরছিলো। সতীশ দৌড়ে এসে সংবাদ দিলে :

—মা, মাষ্টারমশাই এসেচে।

গোল কোরে জড়ানো খেজুর পাতার পাটি এনে ময়না দাওয়ায় বিছিয়ে ছায়।

—আবার এলাম ময়না।

বোলতে বোলতে দাওয়ায় ওঠেন সাঁই পণ্ডিত। পাটিতে বোসে পড়েন।

ময়নার মুখে কথা সরে না। সে সাঁই পণ্ডিতের পায়ের গোড়ায় এসে ঢিপ্ ঢিপ্ কোরে মাথা কোটে। ধুলো নিয়ে জিবেয় ঠেকায়। দুরুদুরু কোরে ওঠে ওর বুকখানা। ঠিক এমনি কোরেই আরেকদিন দুরুদুরু দুলে উঠেছিল ওর ওই-বুক। তিনদিন বাদে ওর প্রবাসী স্বামী ফিরে এলে পর।

—শুনেচো ময়না, সতীশরা আর ও-ইস্কুলে যাবে না। আমিও না। সাঁই পণ্ডিত বলেন।

সাঁই মশাই-এর চোখে গিয়ে ঠ্যাকে ময়নার চোখ। জিগ্যেস করে :

—ক্যানো।

—সতীশের মুখে কিছু শোনো নি?

—হুঁ, শুনেচি। সতে বোলছিলো, আপনি ওদের মানা কোরেচো ইস্কুলে যেতে। আপনিও আর যাবা না। তাও বোলেচে। ক্যানো যাবা না?

ইতস্ততঃ করেন সাঁই পণ্ডিত। সব যদি খুলে-খেলে বোলতে হয় ময়নার কাছে, তা হোলে সাঁই মশাইকে বোলতেই হবে, এ-মুচিপাড়াকে কেন্দ্র কোরে তাঁর ইস্কুল ছাড়ার সব কিছু গোলমালের জন্ম। বিশেষ কোরে এ-বাড়িটাকেই। তিনি ময়নাদের বাড়ি রাত কাটান। ময়নার হাতের চাল-জল খান। মুচি-ছাত্তর পাঠশালায় ঢোকান। মুচি মেরে প্রায়শ্চিত্ত করেন না। এর কোনটাই তো সাঁই মশাই ময়নাকে খুলে বোলতে পারেন না। তা হোলে ময়না কি কমখানি ব্যথা পাবে? তাদের ছেলেদের ইস্কুলে ঢোকার অধিকার নেই। তাদের কেউ ছোঁয় না। দৈবাৎ ছুঁয়ে স্নান কোরে প্রায়শ্চিত্ত সেরে শুচি হয়। এ-সব কথা ময়না জানে। জানলেও তার মুখের পরে বলা যায়? বলা যায়—ওই প্রায়শ্চিত্তের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেই তিনি অপাংক্তেয়? পণ্ডিতী পদ থেকে বরখাস্ত? বলা যায়? ময়না, সব থেকে বড়ো কারণ তুমি। যার জন্যে আমি আজ নিন্দিত! লাঞ্ছিত!

সাঁই পণ্ডিত হয় তো এ-সব গণ্ডগোল আপাততঃ চাপা দিতে পারতেন। ধামা চাপা। অর্থাৎ যদি মাতব্বরদের মতে রাজিনামা দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত কোরতেন। তা হোলে মুচিপাড়ার ছাত্তরদের বেরিয়ে আসতে হোতো না। তাঁকেও হোতে হোতো না ছাঁটাই। জাতিচ্যুত। কিন্তু তাতে কি মুচিদের ওপোরকার বিদ্বেষ-বৈষম্য তুলে নেয়া হোতো? না পৌঁছে দেওয়া হোতো ছুৎমার্গের নিরাপত্তায়? যে-অছুৎ সে-অছুৎ-ই থাকতো তারা। আর যুগ-যুগান্ত ধোরে ঘাড়ে নিয়ে বয়ে বেড়াতো জয়ঢাকের মতন প্রায়শ্চিত্তের মাশুল বোঝা। এ-চান না সাঁই পণ্ডিত। বৈষম্যকে জিয়ায়ে রেখে, পোশাকী মন দিয়ে মেলামেশা তাঁর অভিপ্রেত নয়। সে-ধাতু দিয়ে গড়া না সাঁই পণ্ডিত মানুষটি। তাই মাতব্বর-মহলের রায় মারফত মুচি ছাত্তরদের ইস্কুল থেকে বের কোরে দিয়ে তাঁকেও যখোন বরখাস্ত করা হোলো, তখোন মনু ঠাকুর ধোরে বোসলেন, তাঁদের চণ্ডিমণ্ডপে ইসকুল বসাতে। কিন্তু এ অনুরোধ প্রত্যাখ্যান কোরলেন সাঁই পণ্ডিত। প্রথম কারণ মনু ঠাকুরের সাথে তাঁর বনাবনি আছে। থাকবেও। কিন্তু তাঁর বাড়ির সাথে সাঁই পণ্ডিতের খাপ খাওয়ায়ে থাকা দুষ্কর। বিশেষ

কোরে তাঁর পিসীমার মন সে-সব মনের ছাঁচে গড়া যার দরুণ তাঁকে ইস্কুল ছাড়তে হোলো। প্রথম কারণটা চেপে রেখে দ্বিতীয় কারণটাই ব্যক্ত কোরলেন পণ্ডিত মশাই। অচ্ছুৎ পাড়ায় ইস্কুল গোড়বেন তিনি অচ্ছুৎদের দিয়েই। বর্ণ হিন্দুদের ঘরে আর বর্ণহীনদের ঢোকাবেন না। এমনি কোরেই কোরবেন তিনি মুচিমারার প্রায়শ্চিত্ত। এ-মন্তব্যর কোনো প্রতিবাদ করেন না মনু ঠাকুর।

আমতা আমতা কোরে সাঁই মশাই জবাব দেন:

—এমনই যাবো না, ময়না। ও-ইস্কুলে নোতুন মাস্টার আসবে।

—আর আপনি ?

—আমি ? আমি পড়াবো তোমাদের পাড়ার ছেলেদের।

ময়না যেনো খানিকটে অবাক বনে যায়। জিজ্ঞেস করে:

—ইস্কুল কোথায় বোসবে ?

মৃদু হাসতে হাসতে সাঁই মশাই বলেন:

—এ-পাড়ায়ই বোসবে। মনে কর তোমাদের বাড়িতে। আপত্তি আছে ?

ভাবনায় পড়ে যায় ময়না। বলে:

—না-আ। আমার আবার আপত্তি কী ? তা আপনি মোড়লদের বলো। তারা যা বলে।

সাঁই পণ্ডিত ধোরতে পারেন। ওর বাড়িতে ইস্কুল বসুক খুব খোলা মনে এ-রাজিনামা দিতে চায় না এবং কেনো চায় না, কোথায় তার বাধা সেটাও অজানা নয় তাঁর।

—তুমি যেনো বড্ডো ভাবনায় পড়েচো ময়না ? ভেবো না। মাতব্বরদের অমতে কিছু তোমার ঘরে ইস্কুল হোচ্চে না। তারা যেখানে ঠিক কোরবে, সেখানেই ইস্কুল করবো আমি। যাক। অনেকদিন তো তোমাদের বাড়ি আসি নি। চোলচে কী কোরে আজকাল ?

গাছ থেকে পড়ে ময়না। সাঁই মশাই ভেবেচেন বুঝি, ওর সংসার চলার চাকা ঘুরচে না মোটেই। বলে:

—ক্যানো! ধান ভানি। ধান কুড়োই। পাটি বুনে বেচি।

—ওতে আর ক' পয়সা হয় বা ? চলে ?

—খুব চলে। ও থাক। আপনি রামায়ণ পড়বে ?

আত্মকথা চাপা দিতে চায় ময়না! সাঁই পণ্ডিত বোঝেন তা। বলেন:

—রামায়ণ ? তা বেশ। আনো।

কানাই ঢুলীর ছেঁড়া ঢোলকটার ওপোর একখানা ধবধবে ন্যাকড়ায় জড়িয়ে রামায়ণখানা রাখা। অশুচির ঘরে সবচেয়ে শুচিস্থান মনে কোরেই গ্রন্থখানা ওখানে রেখে দিয়েচে ময়না। পেড়ে এনে সাঁই পণ্ডিতের সামনে একখানা তালপাতার নোতুন চাটকোলের পরে রেখে দেয়। বইখানা টেনে নিয়ে খুলতেই বেরিয়ে যায় "সীতাহরণ"। সাঁই মশাই সুর কোরে পাঠ সুরু করেন। সতীশ কোথায় ছিলো সেও ছুটে এসে মায়ের কোল ঘেঁষে বসে।

ঘর্ঘর শব্দে রাবণ রাজা চালাচ্চে তার পুষ্পক রথ। সে-শব্দতলে চাপা পড়ে গেছে পৃথিবীর সব শব্দ, সব সুর। থরথরিয়ে কাঁপচে আকাশ-বাতাস, চাঁদ-সূর্য, পঞ্চবটী বন।

রথের মধ্যে কাঁপচেন সীতা দেবী। চুল ছিঁড়চেন। মাথা ভাঙচেন। তাঁর নীলপদ্ম চোখযোড়া ভাসচে অশ্রুর গোদাবরী স্রোতে। আর্ত-করুণ সুরে বিনিয়ে বিনিয়ে কাতর মিনতি কোরচেন সীতা :

'ওগো আকাশ, ওগো বাতাস, ওগো পশু-পাখিরা, তরু-লতা-ফুল-ফলরা, তোমরা আমার প্রভুকে বোলো, একলা ঘরে পেয়ে লংকার রাবণ রাজা তোমার সীতাকে চুরি কোরে নিয়ে গেলো।

চাঁদ সূর্য দুর্লভ নিবিড় অরণ্যানী। রাম-লক্ষণ পথ হারাবেন। সীতার সন্ধান-পথ। তাই জানকী স্মারক চিহ্ন রোপণ কোরতে রথ থেকে ছুঁড়ে ফেলচেন গায়ের অলংকার। কণ্ঠহার, কেয়ুর, কর্ণিকা, মেখলা, হীরের কংকণ।

সাঁই পণ্ডিতের অতিতম সামনা সামনি বোসেচে ময়না। প্রতিমার মতন নিশ্চল, নিশ্চুপ। আর প্রতিমাসুলভ চোখে তার বয়ে চলেচে গোদাবরীর অবিরল ধারা। অন্তর রাজ্যের ময়না সীতার মতনই শোকাকুলা, আর্ত, করুণ। সতীশ চুপচাপ। শিশুসুলভ চপলতা নেই তার মধ্যে।

গোটা রামায়ণখানা সাঁই পণ্ডিতের প্রায় মুখস্থ। তিনি মুখে রামায়ণ গান কোরে চলেচেন। চোখ তাঁর মা ও ছেলের পানে নিবদ্ধ। এমন একাগ্র শ্রোতামন কোনো তথাকথিত ভদ্রঘরের মায়েদের কি শিশুদের আছে বোলে সাঁই পণ্ডিতের জানা নেই : ভালো শ্রোতা নইলে আসর জমে না। একনিষ্ঠ শ্রোতার উপস্থিতিতে তাই ক্ষুদ্র এ-আসর জমল খুব। সাঁই পণ্ডিত তাঁর সমস্ত সুর উজাড় কোরে ঢেলে দিলেন এ-রামায়ণী গানের আসরে।

দীর্ঘ মাঘের রাত পোহায়ে যায়। পেয়ারা গাছের পাতার ঝোপ থেকে

ভেসে আসে ভাত শালিকের গান।

ময়না ডাকে :

—সতে, ও সতে ওঠ্। পুবে ফর্সা দিয়েচে।

ধড়মড় কোরে জেগে ওঠে সতীশ। মুখ-হাত ধোয়। মা ময়না মেটে শান্‌কীতে কোরে মুঠো খানেক কড়ো কড়ো ভাত বেড়ে এনে ছায়। আর একটা আস্ত কাঁচা পেঁয়াজ। খাওয়ার পর দু-জনে চলে সোনামুখী বিলে ধান কুড়োতে। সতীশের কাঁধে একখানা দেঁড়ো কোদাল। আর ময়নার কাঁখে বেতের ধামা। সতীশের ইস্‌কুলে যাওয়া বন্ধ হওয়ার সংগে সংগে ময়নার ধান ভানতে যাওয়াও বন্ধ হোয়েচে। সে ছেলেকে নিয়ে রোজ যায় ধান খুঁটতে। ধান ভানার চেয়ে ধান খোঁটায় লাভ বেশি। খাটুনিও কম।

সোনামুখীর সোনা এখোন বড়ো বড়ো গোলায় গিয়ে উঠেচে। খাঁ খাঁ কোরচে সারা বিল। ধানের গোঁজায় ভরতি। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কাঁকড়া-শামুকের তীক্ষ্ণ খোলা। মরা সাপের শিরদাঁড়া। মাছের কাঁটা। শুকনো এঁটেল মাটি ধারালো ফুটিফাটা।

সতীশের নরম পায় ব্যথা লাগে। শিউরে ওঠে মাথার চুল পর্যন্ত। তাই ধানের গোঁজার ওপোর পা দিয়ে টিপে টিপে হাঁটে। ময়নার কিন্তু বাধে না মোটেই। শক্ত মাটির ছোঁয়াচে ওর পা-ও হোয়ে গেছে শক্ত, "জামড়ো।" কাঁকুড় ফাটা ফেটেচে গোড়ালি। অবিশ্যি কোন কোনোদিন চলতে চলতে হোঁচট খায়। ঘা লেগে ফাটা পা আরো ফেটে যায়। ঝোঁঝালে রক্ত ঝরে। ব্যথা হয়। আমের গাছ থেকে আটা এনে চেরা ফাটার মধ্যে পুরে ছায়। রাতের মধ্যেই টেনে যায় ব্যথা। বিনা পয়সার ওস্‌তাদ দাওয়াই।

রামায়ণের ছড়া কপ্‌চাতে কপ্‌চাতে সতীশ চলেচে বিলের মাঝখান দিয়ে। সাঁই পণ্ডিতের মুখে শোনা কালকের সেই সীতা হরণের পয়ার ছড়া। অনুসন্ধিৎসু চোখ ফালুক-ফুলুক কোরে তাকাচ্চে চারদিক। কোথাও একটা ধানের শীষ পড়ে আছে কি না। অথবা ইঁদুরের গর্ত।

যেতে যেতে ময়না বলে :

—সতে পচ্চিমের বিলে চল বাবা। এ-ধারে আর ধান নেই। সতে —পুঁটের মা-রা খুঁটে-খুঁটে সাবার কোরে ফেলেচে সব।

শুনে ভারি খুশী হয় সতীশের শিশু মন। খুশী হবার খুব সংগত কারণ আছে বৈকি। সোনামুখীর পশ্চিম ধারটায় নীচু জমি। ওই সব জমিতে অজস্র কুয়ো

কাটা আছে। একে "আপা" বলা হয়। বিলের জল যখোন শুকোতে থাকে, মাছরা এসে জমায়েৎ হয় ওই সব আপার মধ্যে। শোল, কই, মাগুর, চ্যাঙ, পুঁটি মাছরা। এ-সব বিলের মালিকের একরকম জিয়োয়ে রাখা মাছ। ধানের মতন মাছেরো ওপোর তার অটুট অধিকার। সতীশের মতন একটা কচি-কাঁচা ছেলেরও তা জানা। কেনোই বা জানবে না। জানার পথ রোদের মতনই স্বচ্ছ। প্রকাশ্য দিনের আলোয় বিলের মাছ মারা নিয়ে অনেক মাথা ফাটাফাটি হয়। অনেক মাথা পুতেও ফেলা হয় কুয়োর পাঁকে। কোর্ট, কাছারি, মামলা-মোকদ্দমা চলে। ছু-পথ্যই গা'র ঝাল জুড়োয় ঘরের টাকা উকিল-মোক্তারদের পকেট ভরে দিয়ে এসে। এ-বিসম্বাদ সীমিত। এ-গাঁয়ের, ও-গাঁয়ের, এ-পাড়ার, ও-পাড়ার, এ-বাড়ির, ও-বাড়ির মধ্যে। তাই মাছ মারার অসাধু মতলব সতীশের অবিশ্যি ছিলো না। তার খুশির দাবী কাঁকড়া ধরা। মোটা লাল কাঁকড়া।

মায়ের প্রস্তাবে চোট পায় হাঁটতে শুরু করে সতীশ। খানিকটে এগিয়ে গিয়ে পেছন ফিরে তাকায়। ছাখে অনেক পেছনে ফেলে এসেচে ওর মাকে।

—কই মা, জোরে হেঁটে আয়। তুই কী!

ময়নাও জোর পায় হাঁটে এবার। গন্তব্যস্থান পেরায় ধরো ধরো। ময়না ডাকে:

—ও সতে, ফের তো, ও সতে!

শ্রীমান্ সতীশ "আপার" কাছাকাছি পৌছে গিয়েছিলো। গর্ত্ত দেখা না গেলেও গর্ত্তর ধারেকার কাঁকড়ার মাটিগুলো বেশ দেখা যাচ্চিলো। তাই মায়ের ডাকে মুখে বিরক্তির ভাব পষ্ট হোয়ে ওঠে। ডাক শোনে, কী?

—ওরে এদিকে এগো। এখেনে মেলা ধান আছে।

ধানের চেয়ে কাঁকড়ার লোভই সতীশের অনেক বেশি। তবু ফিরে আসতে হয় তাকে।

—দেখচিস্ ইঁদুরের মাটির গাদা! ওর নীচেয় কিন্তু মেলা ধান আছে। মন্তব্য করে মা-ময়না।

কোদাল দিয়ে মাটি সরাতে সরাতে গর্ত্তর সন্ধান মেলে। তিন-চারটে গর্ত্ত। এখোন এ-গর্ত্ত বরাবর কোপাতে কোপাতে যেতে হবে। যে-পর্য্যন্ত না মেলে স্তূপীকৃত ধান শীষ। ইঁদুরের সঞ্চিত ধন।

—দে, কোদাল দে। ময়না হাত বাড়ায়।

সতীশ আপত্তি করে:

—না। আমি কোপাবো।

—আচ্ছা। কোপাস্থন। আমি তারে কোপায়ে দেই খানিকটে।

ময়না কোদাল নিতে হাত বাড়ায়। সতীশ রাজি হয় না। বলে :

—না। আমি কোপাবো।

ময়নাও শোনে না ; দে বাবা, দে। মনে নেই ?

মনে নিশ্চয়ই আছে সতীশের। এই তো মাত্তর সেদিনের কথা। ময়না একটা ইঁদুরের "চালা" কোপাতে কোপাতে মাঝামাঝি তাকাত গিয়েচে। এমন সময় একটা শামুক ভাঙা কেউটে ফোঁস কোরে ফণা ধোরে উঠল। শীতকাল। সাপটা আবার খোলশ বদলেচে। তাই রখ্যে। নইলে তেড়ে এসে কামড়াতো ময়নাকে। তাই প্রথমটা সতীশকে গর্ত কোপাতে দিতে চায় না। খানিকটে কোপায়ে নিয়ে পরথ কোরে গ্যাখে গর্তে সাপ আছে কিনা। ও জানে সাপের গর্ত তেলের মতন পালিশ। সাপের গু-ও থাকবে গর্তের ভেতর।

সতীশ জেদ ধরে :

—না। কিছুতেই কোদাল দেবো না। সাপ তো? ও আমি মোটেই কেয়ার কোরি নে। কোদালের এক কোপে দুখোন কোরে ফেলবো।

জোরে-জোরে কোদাল ওঠা-পড়া কোরতে থাকে। হাত দুই আন্দাজ বাকি গর্তর প্রান্ত সীমানায় পৌঁছতে। এমন সময় সাপ না, মস্ত দুই গেছো ইঁদুর বেরিয়ে আসে। সতীশ তোয়ের-ই ছিলো। একটার ঘাড় যেতে কোপ মেরে ঘায়েল কোরলে। কোদালের চক্‌চকে ভাগটা ইঁদুরের রক্তে লাল হোয়ে গেলো। আরেকটা ছুটে পালিয়ে অন্য গর্তে ঢোকে। খানিকখন বাদে ধান শীষ দেখা যায়। গর্তের শেষ ভাগটায় এক প্রশস্ত খোল বানানো। মুষিক রাজের শস্য-ভাণ্ডার। টাপে-টোপে বোঝাই ধানের বাইল। উল্লাসে আহরণ কোরে ধামায় রাখে সতীশ। মাকে হাত দিতে গ্যায় না। এ ওর একার গর্বের জিনিষ। রক্ত জল করা ঐশ্বর্য। বেশী বেশী আধ ধামাখানেক শীষ ধান। এবার ময়না নেয় ধামা কাঁখে। সতীশের কাঁধে কোদাল। সোনামুখীর পশ্চিম পারে চলল মায়-পোয়। গাঁয়ের থেকে বেশ খানিকটে দূর। তাই এ-ধারটায় ধান কুড়ুনীরা বড়ো কেউ আসে না। ফাগুন-চোত মাসের দিকে ছাড়া। মানে এ-ধারের ধান খোঁটা পর্ব শেষ হোলে পর।

গোরুর গাড়ির চাকার দাগ বরাবর চলেচে মা ও ছেলে ধান শীষ খুঁটে। বিল শেষের গাঁয়ে গিয়ে পৌঁছেচে ঐ-পথ রেখা। কিষাণরা এসেচিলো। গাড়ি

বোঝায় দিয়ে নিয়ে গেছে সোনামুখীর সোনা ঐ-রাস্তায়। মহাখুশীতে সতীশ রামায়ণের শোলোক পড়চে আর ধান কুড়োচ্চে। এক একটা শীষ দেখচে আর ছুটে গিয়ে লুফে নিচ্চে। আর রাখচে এনে মায়ের ধামায়। বোলচে :

—ত্থাখ মা, কতো বড়ো একটা ধানের বা'ল্।

ময়নার আগে আগে চলচে ও। মায়ের সাথে আড়ি কোরে—পাল্লা দিয়ে ধান খুঁটচে। এবার একটা চামরমণি ধানের শীষ কুড়িয়ে পায় সতীশ। ঠিক চামরের মতন। ঝিল্‌মিল্ কোরচে রেখায়িত পথ। ছুটে গিয়ে কুড়িয়ে নেয়। সোনার শীষ হাতে কোরে তুলে নিতেই শ্রুতিধর শিশুর মনে পড়ে যায় সাঁই পণ্ডিতের কওয়া সীতার অলংকার ছড়ানোর কথা।

—ত্থাখ্ মা, ত্থাখ্, কেমন একটা ধানের শীষ। মাষ্টার মশাই কাল বোলছিলো, সীতা চুরির কথা। এটা ঠিক সীতার গা'র গয়নার মতন দেখতে। না মা?

ময়না হেসে ফেলে। বলে :

—হ্যাঁ। খোঁটো মাণিক।

—মাষ্টার মশাই বলে, সোনার সীতা। রাবণ রাজা সেই সোনার সীতা চুরি কোরে নিয়ে গিয়েছিলো। যখোন ধান পাকে না মা, আমাদের সোনামুখী বিল-ও ঠিক সোনার সীতা হয়। তাই না?

আবার হাসে ময়না। বলে :

—হ্যাঁ। পাগোল ছেলে। খোঁটো, মাণিক খোঁটো।

সতীশ বোলে যায় :

—এখোন সে সোনার সীতা আর নেই। কারা চুরি কোরে নিয়ে গেলো, মা?

—কী বোলচিস্ হরবোলা?

—এই ত্থাখো মা, রথের চাকার দাগ। এই পথে ঠিক রাবণ রাজা সীতা চুরি কোরে নিয়ে গেছে। এই ত্থাখ, আরেকখানা গয়না কুড়িয়ে পেলাম। এটা সীতার গলার হার ঠিক। তাই না মা?

বোলতে বোলতে হাসুলি হারের মতন বাঁকা আরেকটা বাসমতী ধানের শীষ কুড়িয়ে নেয় সতীশ।

মা-ময়না ওর খানিকটে পেছনে পড়ে গেছে। সতীশ ছুটে গিয়ে ধান-শীষটা ধামায় থুয়ে ত্থায়। বলে :

এ-পথ ধরে চললে, আমরা ঠিক পৌঁছে যাবো লংকায়। রামের মতন রাবণ মেরে সীতাকে নিয়ে আসবো। কেমন মা ?

সতীশের রকম-সকম দেখে ময়না হাসতে থাকে। গর্বে ফুলে ওঠে ওর বুক। ভাবে, সাঁই পণ্ডিতের পাঠশালে পড়ে ছেলে ওর কতো বুদ্ধি ধোরেচে।

সন্ধ্যের পরে যোগিশ্যরদের উঠোনে ঘরোয়া বৈঠক বোসবার কথা। মজলিশের আলোচ্য বিষয় সাঁই পণ্ডিতের পাঠশালা বোসবে কোথায় ? নুরপুর, না ঘরভাঙায় ? মাতব্বর ফুলবর, ভ্যাবল এরা গোঁ ধোরে বোসেচে, ইস্কুল উঠবে ঘর ভাঙায়। তা যদি না হয়, ওরা এর মধ্যে নেই। এদিকে নুরপুরেরা কোমর বাঁধচে, ইস্কুল কোথায় উঠবে, সে-ঠাঁই নির্দেশ কোরে দেবে লাঠালাঠি-মাথা ফাটাফাটি। সেটাই আগে হোয়ে যাক। অবিশ্যি প্রধান মাতব্বর যোগিশ্যর-তারন চুপচাপ। তড়পাচ্চে ভুতো আর তার দলবল। মিটিং হওয়ার কথা ছিলো, সন্ধ্যের পর বটে। কিন্তু মনু ঠাকুর-সাঁই পণ্ডিতরা সন্ধ্যের আগেই এসে গেছেন এবং সব বাড়িগুলো একবার চক্কর দিয়ে এসে বোসেচেন যোগিশ্যরদের উঠোনে।

যোগিশ্যর কাঁধে-হুঁকো লাগিয়ে বুড়বুড় কোরে টানচে। আর জাওয়া বাঁশের বেতি দিয়ে একটা জো তুলচে ঠুঁসির। মনু ঠাকুর জিগ্যেস করেন :

—ও যোগিশ্যর, কই ? তোমার ঘরভাঙার মাতব্বররা কই ?

হুঁকো থেকে মুখ তুলে যোগিশ্যর বলে :

—কী জানি বট্ ঠাকুর ? ওদের কিতেবাদ বোঝা দায়।

—তা তোমার ফুলবররা বলে কী ?

—বোলতে চায় মনের কথা ? ঐ তো একনম্বর ত্যাঁদড়। পেটের মধ্যি-মাড়ির দাঁত।

—ভ্যাবল ?

—ভ্যাবল ? ও আর এক হারামজাদা, বট্ ঠাকুর।

—ক্যানো ?

—ও কয়, ইস্কুল ? মুচিপাড়ায় আবার ইস্কুল মারাচ্চে। মুচিরা লেখাপড়া শিখে পণ্ডিত হবে। কী কোরবে পণ্ডিত হোয়ে ? পাঠশালা বসাবে ? আর ভদ্দরলোকরা বুঝি পড়াতে আসবে ওদের পাঠশালে ? শয়তানী। সব শয়তানী।

—শয়তানী !

—ওতো কয় বট ঠাকুর।

সাঁই পণ্ডিত মুচকি মুচকি হাসতে থাকেন। মন্নু ঠাকুরের-ও হাসি হাসি মুখ। জিগ্যেস করেন :

—আর কী কয় ?

—কয়, আমরা মুচি। আমাদের আবার ইস্কুল-ফিসকুল কোন্ কম্মে লাগবে ? ধামা-পালি গড়বো। ডোল-ডালা-ঝুড়ি বানাবো। ঢাক-ঢোল বাজাবো। ইস্কুলে পাঠাবো ছাবালদের কি মরতে ? ও আমাদের সইবে না।

—সইবে না !

হেসে ওঠেন মন্নু ঠাকুর। অট্ট হাসি।

যোগ্যিশ্বর বলে :

—আপনি হাসচো, বট্ঠাকুর। আর সীতে যা বলে তা শুনলে আপনি···।

—কী বলে সীতে ?

হুঁকোয় কষে দম দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে যোগ্যিশ্বর জবাব গ্যায় :

—মুচিরা গোরু ছোলে। চামড়া সাফ্ করে। গোরুর মাংস খায়। ওরা কলম ধোরলে আঙুল খসে পড়বে। মুখে কুড়ি-কুষ্ঠি হবে। লেখাপড়া শেখানোর নামে সাঁই পণ্ডিত-বট্ঠাকুররা চায় মুচিপাড়ার ছাবালগুলো মেরে ফেলতে।

হা-হা কোরে হাসতে থাকেন মন্নু ঠাকুর। সাঁই পণ্ডিত কিন্তু যোগ দিতে পারেন না সে-হাসিতে। সীতের মন্তব্য কুসংস্কার আচ্ছন্ন ঠিক। কিন্তু ভ্যাবলের মন্তব্যকে উড়িয়ে দেওয়া সুকঠিন। সাঁই মশাই মুচিদের লেখাপড়া শিখোতে চান। চান চোখ ফুটোতে। কিন্তু এ চোখ ফুটিয়ে, এ অখ্যর পরিচয় দিয়ে, কী দিতে পারবেন তিনি এদের ? তার চেয়ে যদি তারা বাঁশ-সুরশিল্প চর্চা কোরে সত্যিকারের শিল্পী হোয়ে উঠতে পারে। চামড়ার কারবারে অর্থনৈতিক বনিয়াদ মজবুত কোরে খাড়া কোরতে পারে, তাতেই কি এ-সমাজ লাভবান হবে না ? এ-সমাজের পতিত জমিতে যদি তিনি তথাকথিত শিক্ষার বীজ বুনে এক দংগল বাবু চারা ফলিয়ে তোলেন, সে চারায় তো ধোরবে বেকার ফল। সে ফলের প্রতিশ্রুতি তো ঐ মজে যাওয়া বুড়ি ভদ্দরের দশা।

—শুনছো ? ও পণ্ডিত ? মন্নু ঠাকুর ডাকেন।

চিন্তার সুতো ছিঁড়ে যায় সাঁই পণ্ডিতের। সাড়া দেন :

—শুনচিই তো।

—তাহোলে পাত্‌তাড়ি গুটোও। গুরুগিরিতে ইস্‌তফা দিয়ে ভেঁড়ো এসে আমার দলে। তাল বেলেম বানিয়ে লই।

সাঁই পণ্ডিত এ কথার কী জবাব দিতেন, কি আদৌ দিতেন না, তা বলা যায় না। ঘর ভাঙার মাতব্বররা দলবল নিয়ে হাজির হয় যোগ্যিশ্বরের বাড়ি। হৈ হুল্লোড় কোরে। এদের কাণ্ড কারখানা দেখে মনে হয় এরা বৈঠক কোরতে আসে নি। এসেচে খ্যাম্‌টা নাচ দেখতে।

মাতব্বর বাড়ি মাতব্বর এলে তোয়াচ কোরতে হয় খুব কোরে। হন্তদন্ত হোয়ে ওঠে বুড়ো যোগ্যিশ্বর। হাতের উল্‌টো পিঠ দিয়ে বারবার হুঁকোটা মুছতে মুছতে বাড়িয়ে ধরে ফুলবরের দিকে।

—খাও ফুলবর, খাও।

যোগ্যিশ্বরের ছেলে থাকলে ফুলবরের বয়েসী হোতে পারতো সে। তবু ফুলবর মাতব্বর। মাতব্বরী খিলাত দিতেই হবে তাকে।

ফুলবর-ভ্যাবল গড় হোয়ে মনু ঠাকুর-সাঁই পণ্ডিতের পা'র গোড়ায় মাথা ঠোকে। তারপর যোগ্যিশ্বরের হাত থেকে হুঁকো নিয়ে টান ছায় ফুলবর। ওরা তখোন-ও সবাই দাঁড়িয়ে।

যোগ্যিশ্বর চেঁচিয়ে ওঠে :

—বলি, তারন আসে নি ? ও তারন, বসার পাটি-চাটি দাও নি ?

বাড়ি থেকে হৈ-হুল্লোড় শুনে তারন-শশী বোসে নেই। গোলাকারে জড়ানো দু-বোঝা খেজুরপাতার পাটি কাঁধে নিয়ে বাপ-ব্যাটায় ছুটে আসে। চটপট পেতে ছায় উঠোন জুড়ে। মাতব্বররা বোসে পড়ে। উঠোন ভরে গেছে লোকজনে। অ-মাতব্বরদের শোরগোল তেমনি চলেচে।

যোগ্যিশ্বর প্রশ্‌ন করে :

—ও ফুলবর, ও ভ্যাবল, বলি, তোমরা এতো দিরিং কোরলে ক্যানো? বট্‌ঠাকুর, পণ্ডিত মশাই এসেচে সে কি এখোনকার কথা?

ফুলবর বলে :

—ঐ যে একটা বড়ো মালের খোঁজ পেয়েছিলাম ভাই। তাই গেলাম।

বড়ো মালের নাম শুনে কান খাড়া কোরে ওঠে যোগ্যিশ্বর। বলে :

—তা হোলে তো মস্ত দাঁও মেরেচো তোমরা। কোথায় মাল ?

—গাঙ ছাড়ে। বুড়িভদ্দরের পুব বাঁকে। ধোপাঘাটার বাড়ে। ফুলবর

বোললে।

যোগ্যিশ্বর আশ্বস্ত হয়। মানে ধোপাঘাটার বাড় থেকেই ঘরভাঙার এলেকা শুরু। সুরপুরের বে-এলেকা।

—যাক্। বেশ হোয়েচে।

—বেশ না ভাই। ফুলে ঢোল হোয়েচে। তারপর শালার শকুনে ঠুক্‌রে ঠুক্‌রে চামড়াটা……।

যোগ্যিশ্বর বাধা ছায়:

—আঃ! সাট্ সুষ থাঙে। ঠারে বকরণ স্থালো। (মানে, এখানে ভদ্দর লোকরা রয়েচে। ঠারে বলো।)

এদেশে মুচি-মেথর-হাঁড়ি-ডোম-বুনো-বাগদি এমনি সব আদিবাসীদের মধ্যে ঠারে কথাবার্তা চলে। ঠার সম্পূর্ণ এক নোতুন ভাষা। যদিও এ-ভাষার কোনো অভিধান নেই। ব্যাকরণ নেই। কোনো গ্রন্থ রচনা-ও হয় নি। অনৈতিহাসিক কাল থেকে মুখে মুখেই চলে আসচে এ-ভাষা।

ফুলবর জিব কামড়ায়, শাট্সুষ। ও সোঝেনি। (মানে, বোঝে নি।)

—মুসড়ো? না হৈসে? (মানে, গোরু, না মোষ?)

—মুস্‌ড়ো।

বুড়ো যোগ্যিশ্বরের মুখ চুকিয়ে ওঠে। বলে:

ষরসা শাট কিয়ে শোড়স্তি কুরে। (মানে, দস্তর মতন পেট ভরে খাও গে মুচি)। ও তারণ, ও ভূতো, ওরে শশে-টশে কই কই? আর গোড়া তুই হুকো সেজে আন্।

উঠোনের পশ্চিম কোণায় একটা তুলাল চাপার গাছ,—রক্ষা কালিতলা। শ্রীমান্ শশী সেখানে দাঁড়িয়ে তার দল-বলদের সাথে শিকারে যাওয়ার প্লান ফাঁদছিলো। বুড়িভদ্দরে এখোন পাখির মরশুম। সরাল-আলতি-দিঘে পাখির। দাতুর ডাক শুনে ছুটে যায় সে। এবং চটপট কোরে একলাই তুটো হুকো সেজে এনে মজলিশে পরিবেশন করে।

—ও ফুলবর, ও যোগ্যিশ্বর, তা এবার তোমরা আসল কথায় মন দাও। রাত তো অনেক হোলো। তাড়া দেন মন্টুঠাকুর।

ভ্যাবল মাতব্বর রসিকতা কোরে ফুলবরকে টিপ্পনী কাটে: ও মাতব্বর, এখোন আসল কাজে মন দাও। ও-সব ঠার-ঠোর রাখো।

—ঠাট্টা হোচ্চে? না? ও শালো, আমি কি একলা মাতব্বর? ঘর-

ভাঙার তালেবর মাতব্বর তো তুই শালো।

ভ্যাবল মুখ খিস্তি কোরে ওঠে :

—সামলে কথা বোলিস্ শালো। তালেবর মাতব্বর আমি? না তোর পুটের মা?

পুটের মাকে মজলিশে টেনে আনায় ফুলবরের মেজাজ ওঠে তিরিখ্যে হোয়ে। বলে :

—আমার পুটের মা? না তোর সীতে রাঁড়? ও শালো?

বোলেই ভ্যাবলের হাত থেকে হুঁকো কেড়ে নিয়ে খুব জোরে জোরে টানতে থাকে ফুলবর।

মনু ঠাকুর-সাঁইপণ্ডিত পাশাপাশি বোসে আছে। দু-খানা ছোট্টো টুলের ওপোর। তাঁরা ধৈর্য হারান নি কেউ। এ-পরিবেশের সাথে তাঁরা নিজেদের শামিল কোরে নিতে শিখেচেন। তাঁরা জানেন, এ-পাড়ার ধরন-ছাড়ন-ই ঐ। এতে ওদের মানহানি হয় না। বা সম্মানী অভ্যাগতদের মর্যাদা হানি করা হয়, এও ওরা মনে করে না। এ-আচরণ ওদের স্বভাবগত হোয়ে দাঁড়িয়েচে। যোগিগ্যশ্বর বুড়ো কিন্তু অস্বস্তি মনে করে। বলে :

—তোমরা মুচ্‌নে ঘোটন রাখো তো। পাঠশাল কোথায় বোসবে ঠিক-ঠাক কোরে দাও।

—পাঠশাল? তা আমাদের ঘরভাঙায় বসুক। মন্তব্য রাখে ফুলবর।

—তুমি কী বলো, ভ্যাবল? যোগিগ্যশ্বর জিগ্যেস করে।

ভ্যাবল চটপট জবাব ছ্যায় :

—পাঠশাল আমাদের কোন্ পিণ্ডিতে লাগবে? পাঠশাল?

—তোমাদের পিণ্ডিতে না লাগে, আমাদের পিণ্ডিতে লাগুক বোলে ওঠে ভূতো।

তারণ সায় ছ্যায় :

—ঠিক কথা বোলেচো। রাত পোয়ালেই আমরা কালিতলায় ইস্কুল খাড়া করে দিচ্চি।

যোগিগ্যশ্বর বাধা ছ্যায় :

—ওরে রাখ্, বাপু, রাখ্। ও ফুলবর, শোনচো, ভ্যাবল তো ইস্কুল চায় না।

তারণ চায় ঘরভাঙা, মুরপুর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, হোয়ে যাক্। ওরা নিজেরাই ইস্কুল খাড়া কোরবে। যোগিগ্যশ্বর বুড়োর কিন্তু ইচ্ছেটা তা' না। ও চায়, মুরপুর-

ঘরভাঙা অবিভক্ত থাক। ঐক্যশক্তি দিয়ে পাঠশালা খাড়া করুক।

—ও শালোর কথা বাদ দাও। ও শালোর ছাবালের কোন্ কাজে লাগবে পাঠশালা? ছাবালরাও খাবে ওর মতন চামড়া ছুলে। ডোল-ডালা বানিয়ে। ফুলবর প্রতিবাদ করে।

সপ্তমে চড়ে যায় ভ্যাবলের গলা:

—খাবেই তো।

তারপর মন্থ ঠাকুরের পানে তাকিয়ে বলে:

—আচ্ছা বটঠাকুর, আপনিই না বিচার করো, আমি মুচি, আমি গোরু ছুলবো না, আমার ছাবালরা গোরু ছুলবে না তো গোরু ছুলবে কি আপনি? না আপনার ছাবালরা? কওতো বটঠাকুর?

কথা কন না মন্থ ঠাকুর। মৃদু মৃদু হাসতে থাকেন।

জবাব না পেয়ে একতরফা বোলে যায় ভ্যাবল:

ইস্কুলের কথা কইচো আপনারা বটঠাকুর, ইস্কুল কোরে কী হবে মুচিপাড়ায়? আমাদের ছাবালরা পড়াশুনো কোরে ঐ পণ্ডিত-মশাই-এর মতন গুরুগিরি কোরবে? না আপনার মতন নামাবলী গায় দিয়ে বাবুর বাড়ি যাবে পূজো কোরতে? বলো তো বটঠাকুর? তার চেয়ে আমি বলি, আমাদের ছাবালরা ডোল-ডালা-কুলো-সাজি গড়ুক। বেতের কাজ করুক। চামড়া কেটে জুতো বানাক। ইস্কুলে পড়ে বাবু হোয়ে কী কোরবে? তখোন না পারবে চাম কাটতে, না পারবে ঝাড় থেকে বাঁশ কেটে এনে ডোল-ডালা-ঝুড়ি বানাতে। ঘাড়ে কোরে হাটে নিয়ে গিয়ে বেচতে। দোহাই আপনাদের বটঠাকুর! দোহাই আপনাদের! যা আছি আমরা, তাই থাকি। আমাদের লেখাপড়া শিখিয়ে আর বাবু বানায়ো না আপনারা।

বোলতে বোলতে ফুলবরের হাতের হুঁকো নিয়ে টানতে থাকে ভ্যাবল।

ভ্যাবলের এ-মন্তব্যে সাঁই পণ্ডিতের মতন মন্থ ঠাকুরও এবার চিন্তিত হোয়ে পড়েন। এ-পাড়ার দরদী লোক তাঁরা এ-সত্যি কথা। আর সে-দরদের বশীভূত হোয়ে মুচিদের কুসংস্কার আচ্ছন্ন মনকে মুক্ত কোরবার অধিকার তাদের আছে বৈকি। কিন্তু বাবু বানিয়ে ওদের শিল্প-সাধনার রাস্তায় কাঁটা ছড়ানোর মানেই তো রুজির অন্ন মেরে ফেলা। লেখাপড়া শেখানোকে চোখ ফোটানো বলে। আর সেটাই নাকি সমাজের সব থেকে মহৎ কাজ। কিন্তু বেত-বাঁশ-শিল্প, চামড়া শিল্প, সুর-শিল্প, এগুলোই বা কম মহৎ কিসে? নোতুন কোরে

অক্ষর পরিচয়ের পথে না উঠিয়ে, শিল্পের যে-রাস্তায় ওরা এগিয়ে আছে, সে-পথের চরম সীমানায় ওদের পৌছে দেওয়া-ই কি শিল্পী-জীবনের সার্থকতায় উৎরে দেওয়া নয়? যে সহজাত প্রতিভা খাঁচার পাখীর মতন সীমিত পরিবেশের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্চে, দোর খুলে তাকে আকাশে ছেড়ে দেওয়াই তো মহৎ কাজ। বিষম মুশ্‌কিলে পড়ে যান সাঁইপণ্ডিত-মনুঠাকুর।

একাধিকবার প্রশ্নের জবাব না পেয়ে ভ্যাবল এখোন সমস্ত মন দিয়েচে হুঁকোয়। ভুতো-ফুলবর এক হুঁকোয় হাত বদলা-বদলি চালাচ্চে। কেবল বুড়ো যোগ্যিশ্বরের হুঁকোর দখলী স্বত্বকায়েমী। তার ঐ ছেদ-রহিত বুড়-বুড় ধ্বনিতে আসর গরম।

এমনি কোরে আরো খানিকখন কেটে যায়। সোনামুখী বিলে রাতের ডুব-জলে জোনাকীপুচ্ছ জ্বলে-জ্বলে উঠতে থাকে। ঠিক সামুদ্রিক ফস্‌ফরাসের মতন। "আপার" ধার থেকে ভেসে আসে কাঁকড়া মাছ-খাওয়া শেয়ালের ডাক। প্রার্থীর মতন বোসে আছেন মনুঠাকুর—সাঁইপণ্ডিত।

ভ্যাবল তেমনি তামাক টানে। আর ঘন-ঘন তাকায়।

—যাক। বটঠাকুর-পণ্ডিতমশাইরা যখোন বোলচে ইস্‌কুল বসাতে, তাই হোক। তাদের ইচ্ছে পুরুক। আমাদের ভালোর জন্যিই তো উনরা এসেচে। ও ফুলবর, লেগে যাও।

সমস্যাটা তুলেছিলো ভ্যাবল। সেই তার সমাধান কোরে দ্যায়।

—সেই তো জল খেলে। তবে ক্যানো ঘোলালে? ও শালো?

বোলেই ফুলবর ভ্যাবলের পিটে দস্তুর মতন এক থাপড় মারে।

—জল আমি ঘোলায়েচি ঠিক। কিন্তু খাইনি। খাবো-ও না।

—আচ্ছা সে খাও, না খাও, বোঝা যাবে। পরের কথা পরে। এখানে ইস্‌কুল তোমাদের বোসবে কোথায় তাই ঠিক কোরে ফ্যালো। বুঝলে ভ্যাবল? বক্তব্য রাখে যোগ্যিশ্বর বুড়ো।

—সেটা বটঠাকুর-পণ্ডিতমশাইরা ঠিক কোরে দেবে। উনরা যা বলে, তাই কোরবো আমরা। উত্তর দ্যায় ভ্যাবল।

হুঁকো থেকে মুখ তুলে যোগ্যিশ্বর বলে:

—বেশ তো। তা হোলে বটঠাকুর-পণ্ডিতমশাই, আপনারা ঠিক কোরে দাও। কোন্‌খানে ইস্‌কুল উঠবে।

ভ্যাবলের বিবৃতি গভীর রেখাপাত কোরেচে সাঁইপণ্ডিত-মনুঠাকুরের মনে।

অচ্ছুৎ উপেক্ষিত এ-শ্রেণী। এদের ছুৎমার্গের পথিকদের দলে ভিড়িয়ে দিতে হোলে ত্যাগ করাতে হবে চামড়া কাটা। নিষিদ্ধ করাতে হবে মরা গোরু খাওয়া। কিন্তু সেও কি সম্ভব? তাহোলে ওদের অর্থ নৈতিক কাঠামো তো গুঁড়ো গুঁড়ো হোয়ে যাবে একদম। তখোন কী কোরে সচল হবে এ অচলায়তন? ওদের হাতে কলম তুলে দিতে হোলে আদৌ শ্লথ-শিথিল করা চলবে না হুলস্থূল আছাড়-ওয়ালাদা। বেত-বাঁশ চরা ভোল-ডালি বানানো অন্তর। অটুট মুঠোয় আবদ্ধ থাকবে চামড়া কাটা ছুরি-চাকু। আঙুল থাকবে লীলায়িত শানাই-এর ছিদ্র জুড়ে। ঢাক-ঢোলের কাটি ধোরে। আর বর্ণ পরিচয় পড়া ছড়া মুখস্থ করা মুখে চালু থাকবে সুর-সংলাপ-রেওয়াজ। তবেই ওদের ইস্‌কুলে ঢোকানো যায়।

সোনামুখী বিল থেকে যে সর্পিল সোঁতাটা মুরপুর ঘর ভাঙার সীমারেখা হোয়ে মাঠের মধ্যে হারিয়ে গেছে, তারই দক্ষিণ পাড়ে একফালি বাচড়া জমি পড়ে আছে। এটাকে "নো ম্যানস্ ল্যাণ্ড" বলা চলে। মানে, এ-জমির স্বত্ব-স্বামীত্ব দু-পাড়াই ভোগ করে। দূরত্বও সমান। তাই সাঁইপণ্ডিত-মন্নুঠাকুরের যুক্তি অনুসারে ঐ জমিতেই ইস্‌কুল বোসে যায়। মন্নুঠাকুরের বাঁশ-খড়—কাতা-দড়ি। আর দু-পাড়ার সম্মিলিত শ্রম তিন দিনের মধ্যেই ঘর খাড়া কোরে

* * * *

ময়নাদের পেয়ারাতলায় দাঁড়িয়ে উত্তর-পশ্চিম মুখো তাকালে দেখা যায় একটা মাদার গাছ। আর ঐ-মাদারতলায় দুখানা ঘর। একখানা বাংলা ঘর উটের পিটের মতন উঁচু মটকাওয়ালা খোড়ো চাল। আরখানা দোচালা লম্বা ধাবড়া। পার্টিশন করা। এক ধারে ঢেঁকী পাতা। সেখানে খুঁটিতে বাঁধা চার পাঁচটা ছাগোল। আর ধারটা চাচের বেড়া দিয়ে কোনোরকমে ঘেরা। এটাই রান্না ঘর। এ-বাড়ির মালিক রাখাল রিশি।

বেলা গড়িয়ে গেছে। উঠোনে মাদারগাছের ছায়ায় বোসে বৌ বেদানা। পাটিবোনার খেজুর পাতা চিকোচ্চে। এমন সময় রাখাল বাড়ি আসে। তার পরণে ভিজে জবজবে কাপড়। জল পড়চে টপ-টপিয়ে।

—কাপড় কই?

চোট পায় ঘরে ঢোকে বেদানা। এবং বাঁশের আড় থেকে একখানা পাঁচ হাতী থান কাপড় এনে দেয়। রাখাল কাপড় পরে। উস্‌কো খুস্‌কো চুলগুলো

চিরুণীর অভাবে হাত দিয়েই পাট কোরে দেয়। বলে :

—ধাক্ কোরে ভাত বাড়ো।

—এতো দিরিং কোরলে যে ?

বোলতে বোলতে রান্না ঘরে ঢোকে বেদানা।

—আজ যে হাটবার। "একবেলে" হোয়ে এলাম।

হাটবারে বাড়ি এসে খেয়ে আবার কাজ কোরতে গেলে হাট করা হয় না। তাই দু-বেলার কাজ একবেলায় পুষিয়ে দিয়ে দেরীতে বাড়ি ফিরেচে রাখাল। কেবল রাখাল বোলে নয়, সব দিন-মজুররা প্রায়ই হাটবারে এ-নিয়ম মাফিক কাজ করে।

রাখাল মাটিতেই "উবো" হোয়ে বসে। বেদানা ভাতের থালা এগিয়ে ছ্যায়। থালা মানে, মেটে শান্‌কী। মাছির মাথার মতন লাল মোটা আউশ চালের ভাত। কাঁটানটে শাক সেদ্ধ। আর এড়া-মোচা ছেচ্‌কি। মোচাগুলো কাল বেদানা কেটে এনেছিলো মন্মঠাকুরদের কলাছাড় থেকে। গো-গ্রাসে গিলচে রাখাল। হাটে যাওয়ার তাড়া। দুখানা ছাগলের চামড়া আছে। দেরি হোলে ফড়েদের ধোরতে পারবে না।

—আস্তে আস্তে খাও। গলায় বেধে যাবে। আজ "জন" দিলে কোথায় ?

ঢকঢক কোরে এক বদ্‌না জল খেয়ে ফেলে রাখাল। দম নিয়ে বলে :

—বাছাড় বাড়ি।

—কী কাজ কোরলে ?

—"তেউড়ে" তুললাম।

তেউড়ে মানে খেসারি। বুড়িভদ্দরের চরে আমন কোটে অ-চষা নরম জমিতে খেসারি বোনা হয়। ধান কাটার আগেও বা কেউ কেউ বীজ ছড়ায়। ধানক্ষেতে গাছগুলো লাতিয়ে নীল ফুলে ভরে ওঠে। তারপর চ্যাপ্টা চ্যাপ্টা ফল ধরে। জাম রঙের ছিটে দেওয়া ফলের খোসার গায়। ধানের ফসল ওঠে। খেসারির ফসল পাকে। ফাল্গুনের গোড়াতেই। অজস্র ফলনশীল।

—পয়সা দেছে ? শুধোয় বেদানা বৌ।

—হাটে দেবেনে। ওঠো তাড়াতাড়ি। গোছায়ে দাও।

—আর গোড়া দুই ভাত দিই ?

—না।

—তোমার পেট ভরল না। রান্নার কিচ্ছু ছিলো না। হাটতে মাছ-তরকার এনো বেশি কোরে।

বোলেই স্বামীর চোখে পরিপূর্ণ চোখ রেখে উঠে যায় বেদানা।

রাখাল আঁচিয়ে আসে। তামাক সেজে নৈচের মাথায় চড়িয়ে দেয় কল্‌কেটা। ঘন-ঘন হুঁকো টানতে থাকে রাখাল। তামাকের "গুল্‌" ধোরে যায়। তারপর কষে দম দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে হুঁকোটা টাঙিয়ে রাখে খুঁটির কানায়।

—কই, হোলো?

খুশ্‌ খুশ্‌ করে কাশতে কাশতে রাখাল জিগ্যেস করে।

বেদানা ততোক্ষণ আড়ে টাঙানো চামড়া দুখানা পাট কোরে এনে রেখেচে হাতনের ধারে। রান্নাঘর থেকে বের কোরে এনেচে মাছ-তরকারী আনা খারাটা। আর তিনটে শিশি বোতল। নারকেল সরষে, কেরোসিন তেলের।

—ঐ তো।

জিনিসগুলো আঙুল দিয়ে দেখিয়ে ছায় বেদানা।

—কী আনতে হবেনে, বড় বৌ?

—রোজ যা এনে থাকো। মাছ-তরকারী, পান-সুপুরি, ঝাল-পেঁয়াজ। আর দুটো রসুন এনো তো। ঘরে একদম রসুন বাড়ন্ত। মাংস-টাংস যদি জোটে।

আড়াআড়ি বিল পাড়ি দিয়ে বড়ো রাস্তায় ওঠে রাখাল। বেদানা মাদার-তলায় দাঁড়িয়ে চেয়ে থাকে। যে পর্যন্ত না হাটুরের দলে ভিড়ে যায় ও।

রোদের রঙ লাল হোতে লালতর হোয়ে আসে। সে সাথে দীর্ঘতম হোয়ে ওঠে সোনামুখীর পশ্চিম পাড়ের গ্রামান্তরে গাছের ছায়ারা। এবং সাঁঝের পটভূমিকা রচনা করে ফসলরিক্ত প্রশস্ত বিল তলায়। "আপার" ধারে ঘাড় গুঁজে বসে থাকা কুঁজ বকরা উড়ে যায়। আলোর শেষ ঝলকে ঝল্‌কে ওঠে গতিশীল ডানার পালক-গুচ্ছ। সাঁঝ আসে। মনু ঠাকুরদের বাড়ি শৈলজার মুখে বেজে ওঠে শাঁখ। বেদানার ঘরে জ্বলে মেটে পিদীম। শৈলজা শাঁখ বাজালে বেদানা বোঝে, এবার ঠিক সন্ধ্যে হলো। তারো সময় হোলো আলো থরানোর। শাঁখে ফুঁ দেওয়ার।

—ও মা, খাবার দেতো। ঝক্‌ কোরে।

হাজরা আসে ছুটতে ছুটতে। ওর এক মাত্তর ছেলে হাজরা।

—কোথায় ছিলি এতোবেলা? বেদানা শুধোয়।

—খেলতে গেছিলাম। বুঝলে মা, আজ যা "বুড়িরচু" খেলেচি না? ইষটম-বোষটমদের হারায়ে দিয়েচি। আমি অনেকক্ষণ "চু" ধোরে রাখতে পারি। একবার না "চু" ধোরে ওদের সবগুলোকে ঘেরে এসেছি। কই খেতে দে।

—ঐ ছোবার মধ্যি আছে। পেড়ে নিয়ে খাও, মানিক।

—কী আছে?

—আছে একৃতা। পেড়ে এনে ছাখো।

—আজ বলো আমি হুড়ুং ভাজা খাবো না।

—নারে। আর এক নোতুন জিনিষ বানাইচি।

কইতে কইতে বেদানা কতকগুলো সরু চেরা বেত নিয়ে মেঝেয় বেদে পাটিতে বসে।

নোতুন জিনিষের নাম শুনে হাজরাও নোতুন উৎসাহে ছুটে যায়। এবং সিকের ওপোর থেকে লতা-পাতা আঁকানো মাটির ছোবাটা পেড়ে আনে। ছাখে দণ্ডকলস ফুলের মতন শাদা ছোট্টো ছোট্টো ঢ্যাপের খই এক ছোবা। সেদিন তেলীর পুকুর থেকে মায়-পোয় ঢ্যাপ তুলে এনেছিলো।

খেতে খেতে মন্তব্য করে হাজরা:

—মা, খুব তো ভালো খই। কাল তো আবার যাবি তেলীর পুকুরে? তুই কোমর জলে দাঁড়িয়ে থাকিস্। আর আমি সাঁতরে যেয়ে মাঝখানেতে ঢ্যাপ তুলে আনবো। যাবি মা?

—যাবো।

—মা, সতের জন্যি গোড়া তুই নিয়ে যাই। ওতো খায়নি কখনো।

—আচ্ছা যাও।

—তা আমার শেলেট-দপ্তর দিবি তো। মাষ্টারমশাই এসে গেছে এতো বেলা। ঝক্ কোরে দে।

সিকের মধ্যে হাঁড়ি ঝুলচে। হাঁড়ির মুখে হাজরার শ্লেট-দপ্তর রাখা। নানান রঙের সুতো দিয়ে সেলাই করা ছোটো একখানা কাঁথা। তার চারধারে আঁকানো গাছ-পালা-ফুল-লতা-পাতা-পাখি আর মাঝখানে ঢাক-ঢোল শানাই-কাঁশি বাজিয়ে চলেচে বাজনাদাররা। বেদানার নিজের হাতের কাজ এ-সূচি-শিল্প-চিত্র। হাজরার বই জড়ানো "ব্যাধন"।

শ্লেট-দপ্তর পেড়ে এনে হাজরার হাতে দিতে দিতে বেদানা বলে:

—আজকে যেনো পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়ো না ওদের বাড়ি। তোমার

ছেলে ঠ্যাঙান দেবে তা হোলে। বুঝলে তো?

ঘাড় কাৎ কোরে সায় দিয়ে হাজরা সতীশদের বাড়িমুখো ছুটে যায়। আর সুপুরিগাছের খোলা দিয়ে বানানো দোর ভেজিয়ে দিয়ে বেদানা বসে বেতে আড়ি বানাতে। সুঁচ আর বেত-শিল্পে হাত পাকিয়েচে বেদানা। ফুলের সাজি, লক্ষীর আড়ী বানানোয় এক মাত্তর ভ্যাবল বাদে আর কেউ ওর ভাইনে নেই এ-পাড়ার। সরু বেত কুচড়ে নিয়ে ফুল বানাচ্চে বেদানা। চোখ ওর বেতফুলের সাথে মিশে গেছে। বুঝি মনও।

—টক্-টক্-টক্।

দরজায় টোকা মারে কে? চোখ তুলে চায় বেদানা। ওর বুকের মধ্যে ভয়ও টোকা মারে। মানুষের ভয় না। ভয় গো-দানোর। জনশ্রুতি বলে, ঐ মাদারগাছে নাকি একজোড়া গো-দানো থাকে। রাখালের ঠাকুরদা পো-ঠাকুরদার আমল থেকে। প্রত্যক্ষ প্রমাণও পাওয়া গেছে। ভারি রাতে মরা গোরুর গন্ধে তিষ্ঠোনো দায় হয় এ বাড়ি। দিনের বেলায় গোরুর ঠ্যাঙ-শিঙ-মাথা-গাছতলায় পড়ে থাকতে দেখা যায় অনেক সময়। রাখালের ঠাকুরদা ভীম বেঁচে থাকতে গাছটা কেটে ফেলবার তোড়জোড় হয়। কোপও পড়েছিল গাছের গোড়ায়। কিন্তু তিন কোপ দিতেই নোতুন কুড়ুল ভেঙে যায়। ভামও মারা যায় রক্ত ভেদবমি হয়ে। সেই থেকে ওই গাছকে সবাই ভয় করে, ভক্তি করে। বেদানার ভয়-ভক্তিই সব থেকে গাঢ়। সূর্য ডোবার পর সে আর ওদিকে পা বাড়ায় না। হাটবারের দিন রাখালের ফিরতে রাত হয়। সে পর্যন্ত বেদানা বাইরে বেরোয় না। মা ও ছেলে ঘরেই বোসে থাকে। আজকাল হাজরা ইস্কুলে যাচ্চে। রাতেও পড়তে যায় সতীশদের বাড়ি। সাঁইমশাই পড়াতে আসেন। তাই রাখাল ফেরা পর্যন্ত বেদানাকে একলাই থাকতে হয়।

—টক্-টক্-টক্।

আবার টোকা পড়ে দরজায়।

—কে গো? একটু জোর গলায় চেঁচিয়ে ওঠে বেদানা।

এবার বাইরে থেকে দোর খুলে যায়। মানে, আগন্তুক ঠেলা দিয়ে খুলে ফেলে। বিরাট পুরুষ। লম্বা-চওড়া ফিগার। রাখালের চেয়েও আরো, এক পোঁচ কালো রঙ টেনে দেওয়া গায়। চক্ চক্ কোরচে মুখখানা। বুঝি বার্নিশ করা। গোল গোল চোখ লাল। মণি ঘোর কালো। পান-দোক্তার

রসে দাঁতগুলো দেখাচ্চে ঠিক রান্না করা চিংড়ি মাছের মতন।

—ওমা আমার কী হবে! ব্যাপারী! তা ভয় দেখাচ্চো নাকি আমাকে? বোসো।

বেদানা সরে বসে। ব্যাপারী পাটির মুড়োয় বোসে পড়ে। বলে:

—ভয় দেখাচ্চি নে। পরখ কোরচি, তোমার সাহস কেমন? বন্ধু বাড়ি না?

—ওমা! নচল্লা হোচ্চে নাকি? জানো না হাটবার?

"নচল্লাই" সত্যি। মানে, জেনেও না জানার ভান। হাটবার। রাখাল বাড়ি নেই। তাই তো সকাল-সকাল ব্যাপারির আসা।

—তোমাদের হাটবার বোলে মনে থাকে না। আমাদের হাটবার হোলে থাকতো।

বেদানা বেতের ফুল বানিয়ে চলেচে। চোখ তুলে জিগ্যেস করে:

—তোমাদের হাট কী কী বারে যেনো?

—সোম, বুধ আর শুক্কুর। বন্ধু আসতে রাত হবে, না কানাচী?

ছল ছল চোখ চায় ব্যাপারী বেদানার পানে।

—রাত তো হবেই। চামড়া বেচবে। হাট কোরবে। তবে তো—।

—ক্যানো? চলে যাবে নাকি? রাত্তিরি?

—চলে? না। চলে আর যাবানে ক্যাম্‌নে? রাত থাকতেই তো বন্ধুরে নিয়ে বেরোতে হবে। একপাল গোরু যাবে চালান্‌।

—কোন্‌ হাটে?

—মনিরামপুরের।

—কোথায় সে গোরু?

—কেশবপুরের বাজারে!

বিস্ফারিত হোয়ে পড়ে বেদানার চোখ। বলে:

—ওমা আমার হবে কী! বাজারে ফেলে আসলে গোরু?

অট্টহাসি ব্যাপারীর মুখে। বলে:

—ফেলে কি আর এসেচি "কানাচী"। আরো তিন-চারজন ব্যাপারী আছে। তারাই দেখবে। রাতে চৌকি না দিলে গোরু তো চুরি হোয়ে যাবে।

—তাই তো। আমি তো ভাবচি তাই। তা তোমার ব্যাপারীরা খাবে না রাতে?

—খাবে না! রান্না-বাড়না কোরে খাবে। হাটের মধ্যে বটগাছের ডালে দেখো কতো হাঁড়ি ঝুলচে। এ ধারের সব ব্যাপারীয় রান্না কোরে খায় ওখেনে। ওঃ! ভুলে গেছি যে! একতা এনেচি তোমার জন্যি ধরো খাও।

বোলেই ফতুয়ার পকেটে হাত ঢুকোয় ব্যাপারী। এবং পদ্ম পাতার একটা মোড়ক বের করে।

—কী ওতে?

—আছে একতা।

বোলতে বোলতে মোড়ক খুলে ফেলে। দেখা যায় কতকগুলো জিলিপি।

—ধরো, খাও। হাঁ করো।

একখানা জিলিপি তুলে নিয়ে বেদানার মুখের ধারে এগিয়ে ধরে।

—দূর! তুমি কী? জিলিপি বুঝি স্যায়না মানুষে খায়? ওতো ছেলে-পিলের খাবার।

ব্যাপারীর কাছে কথাটা খুবই আজগুবি ঠেকে। এমনি ভাব দেখায় বলে:

—ক্যানো? এমন জড়ানো-মড়ানো রস পোরা মাল, এ বুঝি স্যায়না মানুষের খেতে নেই? ধরো।

বোলতে বোলতে বেদানার মুখের কাছে মুখ নিয়ে জিলিপি সম্পর্কে এমনি এক অশ্রাব্য ছড়া শোনায় যা শুনে বেদানা কানে আঙুল দেয়। ব্যাপারীর মুখের ধার থেকে মুখ সরিয়ে আনে। বলে:

—যাও। এমন কাজানো-খাজলানো শিখোয় কে তোমার?

হাসতে হাসতে ব্যাপারী বলে:

—কে আর শিখোবে? কেশবপুরের বাজার।

—তা বেশ। থুয়ে দাও তো। হাজরা খাবেনে। ও খেলে আমার হবে।

—তা খাবে, খাবে হাজরা। ওর জন্যি না রেখে কি তোমাকে দিচ্চি?

—তা আসুক তোমার বন্ধু বাড়ি।

—তা আসুক বন্ধু। বন্ধুর জন্যিও থাকবে। এই ছাখো, চার আর চার আট। আট আর আট ষোলখান থাকলো। এই নাও খাও।

—ক্যানো? জিলিপি খাওয়ায়ে বশ কোরবে নাকি? ও ব্যাপারী!

বেদানার এ কথাটা ব্যাপারীর বুকে ঠিক যেনো ইলেকট্রিক শক্ মারে।

সে আপনাকে সামলে নেয় কোনো রকমে। বলে:

—বশ? বশ যদি কোরতে হয় তোমাকে কানাচী সন্দেশ খাওয়ায়ে কোরবো। জিলিপি ক্যানো? অতো ছোট নজর বনমালী ব্যাপারীর না। তবে বোলতে পারো কানাচী সন্দেশ না এনে জিলিপি আনলাম ক্যানো? মানে, তোমার ঐ বিষ্টু ময়রা দেখি, জিলিপি ভাজচে। সন্দেশের চেয়ে গরম-গরম জিলিপিই আমার পছন্দ। বুঝলে? নিজে আমি যা ভালোবাসি, ভালোবাসার মানুষকেও তাই দিই।

অতো সহজে বেদানাকে ভোলানো যায় না। যায় না বোঝানো। রাখালকে নিয়ে সে তিন তিনটে স্বামীর ঘর কোরলো। তবু যৌবন তার নিটুট। মন তার কাঁচা। এখনো সে পুরুষের লোভনীয় সামগ্রী। যদিও হাজরা রাখালের হাটানো ছেলে। মানে, ঔরসজাত সন্তান নয়। হেঁটেই ঘরে এসে উঠেচে। আরো একটা হাটানো ছেলে হোতে পারতো রাখালের। কিন্তু সে সাবালক। তাই পিতৃগৃহেই থেকে গেছে। প্রসঙ্গক্রমে একটা কথা বোলে রাখি এখানে। বিদ্যাসাগর মশাই বহু তর্ক-বিতর্ক—শাস্ত্রীয় নজির তুলে ধোরেও উচ্চবর্ণের মধ্যে সে বিধবা-বিবাহ চালু কোরতে নাজেহাল হোয়ে যান, সে বিবাহ কিন্তু এই অচ্ছুৎ সমাজে স্বাভাবিক ধর্মীয় বিবাহের মতনই চালু ছিলো। পণ্ডিতী বাক্-বিতণ্ডা বেদ-বেদান্তের শ্লোক না জেনে, না শুনেও।

যাহোক ব্যাপারীর অভিনয় বেদানার কাছে ঠেকল, ঠিক “ঠাকুরঘরে কে? আমি তো কলা খাইনি।” এ-প্রসঙ্গ আর ঘাঁটাতে চায় না সে। জিগ্যেস করে:

—ও ব্যাপারী, তোমার নাম বনমালী নাকি? ওমা, তা তো কোনোদিন শুনিনি। খাসা নাম তো।

হ্যাঁ। ভালো নাম বনমালী। ভদ্দর লোকরা তাই বলে ডাকে। কিন্তু শালার চাষারা বলে, বোনা। কেউ ডাকে, ব্যাপারী। কিন্তু তোমার নাম “কানাচী” থু'ল কে? এমন খাসা মালখানা। যাচ্ছেতাই নাম।

—দুর! আমার নাম বুঝি কানাচী?

—তবে? উৎসুক হোয়ে ওঠে ব্যাপারী।

—আমার নাম বেদানা। কানাচে হোয়েছিলাম। তাই ও-নাম।

বেদানা! বাঃ! আমি বনমালী। তুমি বেদানা। খাওয়াবে তোমার বেদানা? খাবা-খাবাই তো দেখচি।

—ছি! মুখ খিস্তি করো ক্যানো?

—মুখ খিস্তি! যাকগে। চাইনে তোমার বেদানা খেতে। ধরো খাও।

থাওয়ায়ে-ই আরাম।

খপ্ কোরে বেদানার গাল টিপে ধোরে মুখের মধ্যে জিলিপি পুরে দ্যায় ব্যাপারী। বলে ঃ

—খাও। গিলে ফ্যালো।

গিলে ফেলে বেদানা। বলে ঃ

—আমাকে বশ কোরতে চাও ব্যাপারী ?

—বশ ? বশ যদি তোমাকে কোরি, তবে সন্দেশ খাওয়ায়ে কোরবো।

হি-হি কোরে হেসে ওঠে বনমালী ব্যাপারী। বেদানা পষ্টই দেখতে পায় অপরাধ-তত্ত্বর এক দোয়াত কালি ব্যাপারীর চোখে-মুখে কপালে ঢেলে পড়েচে।

—জল খাওয়াও তো বেদানা। মিষ্টি খেয়ে তেষ্টা পেয়েচে।

—বাঃ ! তুমি যে বেদানা বোলেই ডাকতে লাগলে আমাকে।

—তা ডাকবো না ! অমন খাসা নাম থাকতে ? খেতে তো দিলে না বেদানা। নাম ধোরেও ডাকতে দেবে না ?

জল আনতে রান্না ঘরে ঢোকে বেদানা। এই ফাঁকে ফতুয়ার পকেট থেকে একটা কাগজের মোড়ক বের করে বনমালী। তারপর খুলে ফেলে মোড়কটা এবং মাচার ওপোর রাখা বেদানার সিঁদুরের কৌটোর মধ্যে মোড়কের গুঁড়োটা ঢেলে ছায়। তারপর চটপট কৌটোর ঢাকনি এঁটে রাখে।

বেদানা জল এনে ছায়। তেষ্টার তাগিদ ব্যাপারীর আদৌ ছিলো না। তবু হাত বাড়িয়ে জল নেয়। খেতেও হয় কিছুটা। ঘটিটা ছায় বেদানার হাতে। তারপর ফতুয়া উঁচু কোরে কোমর থেকে লম্বা একটা তোড়া বের করে। এবং মেঝেয় পাটির ওপোর ঢেলে ফেলে। পাঁচ-দশ-একশো টাকার নোট—তাড়া বাঁধা। টাকা-আধুলি-সিকি-দুয়ানি আনির কাঁড়ি। নোটগুলো খুলে-খুলে ছড়িয়ে রাখে। নোটের গাদার পাহাড় তোয়ের করে। তারপর বাছাই কোরতে থাকে টাকা-সিকি প্রভৃতি। এ সব আড়ম্বর বই আর কিছুই না। উদ্দেশ্য—টাকার বহর দেখিয়ে বেদানাকে তাক লাগিয়ে দেওয়া।

—বাব্বাঃ ! মেলা টাকা যে। এতো টাকা তোমার ব্যাপারী ! বেদানার মুখ থেকে ওই কথাটাই শুনতে চায় ব্যাপারী। বলে ঃ

—একি মেলা টাকা হোলো ! আজ তো তবিল বেজায় খাটো। তারপর আবার এগারোটা মাল খরিদ কোরেছি। জানো বেদানা ? গোরুর কারবার কোরতে গেলে শুধু টাকার দরকার। ধরো, রেখে দাও। টাকা ভরতি

তোড়াটা বাড়িয়ে ধরে ব্যাপারী।

চমকে ওঠে বেদানা, ওমা! কোথায় রাখবো অতো টাকা? আমাদের কি বাক্সো আছে?

—তা তোমরা টাকা থো কোথায়?

—টাকা? কোথায় কতো টাকা তোমার বন্ধু আনে। যত্‌কের আয়, তত্‌কের ব্যয়। জন খেটে, কোথায় একটা ছাগোলের চামড়া কি একখানা ঢোল বেচে আবার পয়সা দেড়ী করা যায়?

—এবার দেখো হবে দেড়ী। তাই তো বন্ধুকে চালানী কারবারে ঢুকোলাম।

বনমালীর হাত থেকে তোড়াটা নেয় বেদানা। তারপর মাচার ওপোর উঠে আড়ায় ঝোলানো ঝুড়ির মধ্যে রেখে দ্যায়।

এমন সময় বাইরে পায়ের শব্দ হয়। ব্যাপারী সাড়া দ্যায়।

—বন্ধু, এলে নাকি?

—হ্যাঁ ভাই। কই গো!

চোট পায় বেরিয়ে যায় বেদানা। এবং ধানের বস্তা ধোরে নামিয়ে নেয়—রাখালের মাথা থেকে। তারপর মাছ তরকারির থারাটা নিয়ে রান্না ঘরে ঢোকে।

চাঁদাড়ের ধারে মেটে বদনায় জল রাখা ছিলো। রাখাল হাত-পা ধুয়ে ঘরে ওঠে। জিজ্ঞেস করে:

—তামাক-টামাক খাওনি বন্ধু? ওগো শোনচো!

—কী গো? রান্না ঘর থেকে ডাক শোনে বেদানা।

—তা তামাক-টামাক সেজে দিতে হয়?

বোলে সে নিজেই খুঁটির কানায় ঝোলানো হুঁকো নিয়ে তামাক সেজে আনে।

—তা এতো দিরিং কোরলে যে বন্ধু? ব্যাপারী জিগ্যেস করে।

—যে ভীড় বন্ধু। লোক পাতলা না হোলে হাট করি কী কোরে?

অর্থাৎ হাটের ভীড় যখোন পাতলা হবে। চলতে গেলে গা-ঘেঁষাঘেঁষি লাগবে না। সে-ফাঁকে আপনার অশুচি ছোঁয়াচকে সাবধানে বাঁচিয়ে মুচিদের হাটে ঢুকতে হবে হাট কোরতে। চেনা-চেনির মধ্যে দৈবাৎ যদি ছোঁয়াছুঁয়ি হোয়ে যায়, তা হোলেই বেধে গেলো তুলকালাম কাণ্ড। পিটের চামড়া

থাকবে না। তার পরেও দিয়ে আসতে হবে প্রায়শ্চিত্তের খরচ-খরচা। এমন ঘটনা হাটের নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। তাই এ ঘটনা না ঘটতে দেয়ার বিপদ লোক চলাচল প্রায় বন্ধ হোলে, রাতের আঁধারে গা ঢাকা দিয়ে মুচিদের হাটে ঢুকতে হয়। আর যেহেতু তারা মুচি, তাই বেশি দাম দিয়ে কিনে আনতে হয় সবার উচ্ছিষ্ট রদ্দি জিনিষ-পত্তর। মুচি হাটার নিয়মও অনুরূপ। হাটের শেষ মুড়োয়। সবার সংস্পর্শ এড়িয়ে। তার প্রবেশ পথ ছুৎমার্গ দিয়ে নয়। ভিন্ন রাস্তায়। যদিও অশুচি হাতের ছোঁয়া দিয়ে বানানো ওদের পণ্য সামগ্রী—ডোল-ডালা-কুলো ফুলের সাজি-লক্ষ্মী পুজোর আড়ী শুচি।

বনমালী ব্যাপারী মুখে এক জাতীয় তাচ্ছিল্যসূচক শব্দ সৃষ্টি কোরে বলে:

—ওঃ! ভীড়, তাতে আমার কলা কাটা গেছে। গোঁজ-গোঁজ কোরে ঢুকে যাবো বয়ারের মতন। যে শালোর দরকার হবে সরে যাবে। আমি সরতে যাচ্ছি ক্যানো? মুচির গায় গন্ধ! খানকীর ছেলেদের 'ছেতেন' ত্যাখো। ঝাল বেটে ত্যায় গায়।

—ধরো খাও। কষে দম দিয়ে বন্ধুর দিকে হুঁকো বাড়িয়ে ধরে রাখাল! মুখে তার চাপা হাসি। যে হাসির ভাষায় সমর্থন আছে। কিন্তু বক্তব্য নেই।

ইতিপূর্বে বক্তব্য রেখে শিক্ষা পেয়েচে রাখাল। মানে, পিটের ছাল সে সাথে প্রায়শ্চিত্তের খরচা দুই-ই যোগাতে হোয়েচে। সেই থেকেই নীরব দ্রষ্টা সে।

হুঁকো টানতে টানতে ব্যাপারী এক তরফাই গেয়ে যায়:—ছোটো ভেগে কিনা তোমরা তাই! অমন ভোড়কো। কই? আমরা তো কেয়ারই কোরিনে। ঝাঁপার রায়রা একে জমিদার। আরো তাতে বামুন। আমরা তো হাটে গা ঘেঁষেই চলি তাদের। রায় বুড়িতো পিঁড়িই পেতে ত্যায়, ওদের বাড়ি গেলে। যাই বলো বন্ধু, ছোটো ভেগেদের পিরবিত্তি বেজায় খারাপ।

এমনি কোরে বড়ো ভেগে বনমালী ব্যাপারী আপনাদের কৌলিন্য মর্যাদার গানে পঞ্চমুখ হোয়ে ওঠে। এবং ছোটো ভেগে রাখালদের যাচ্ছেতাই কোরে একদম পান্‌সে কোরে দেয়।

খাওয়ার পর দু-বন্ধু বাইরে হাতনেয় শোয়। বেদানা শোয় ঘরে। ব্যাপারী উশ্‌খুশ্‌ কোরে কাটায় সারারাত। ঘুমোতে পারে না। কী জানি মশার কামড়ে? না ছারপোকার উৎপাতে?

মন্থু ঠাকুরদের বাড়ির দিককার পুব আকাশে "পইতে" তারা ওঠে।

মাদার গাছের মটকার ডালে সোনামুখী বিলের সাপ-ব্যাঙ্-মাছ খাওয়া মাছালটা ডেকে ওঠে। গ্রাম-জনতার কানে পৌঁছে দেয় সূর্য-সকালের আগমনী সংবাদ।

বনমালী ব্যাপারী ডাকে :

—ও বন্ধু, ওঠো। রাত নেই।

ধড়মড় কোরে উঠে পড়ে রাখাল। তারপর দু-বন্ধুতে লুঙি পরে। মাথায় বাঁধে ফ্যাটা। হাতে নেয় লম্বা নড়ি। কাঁধে ঝোলা। তার মধ্যে গামছা, হুঁকো-কলকে-মাখা তামাক। এরপর বেরিয়ে পড়ে মনিরামপুরের হাটের উদ্দেশে।

কেশবপুর থেকে ব্যাপারীদের দলে ভিড়ে যায় বনমালী-রাখাল। এবং গোরু খেদিয়ে নিয়ে চলে। পথে আরো গোটা চারেক গোরু সওদা করে। পালের দু-তিনটে বাদে সবগুলো পেরায় চালানী গোরু। বলদ-গাই দুই-ই আছে। সবগুলো-ই হাড়-চামড়া সার। চাষের সামর্থ্য ফুরিয়ে গেছে। ফুরিয়েছে দুধ-বাছুর দেওয়ার ক্ষমতা। তাই এখোন এরা কোলকাতার গো-খানার যাত্রী।

একটা শামলা রঙের বলদ। দুলদুলে চেহারা। কিন্তু বেজায় ভেদো। রাখাল গাধাবোটের মতন ঠেলে নিয়ে চলেচে তাকে। যেতে যেতে মন্তব্য করে :

—বন্ধু, এ গোরুটার যা চেহারা! পয়সা হোতো। কিন্তু বেজায় ভোদো। মোটে রাগ নেই ওর শরীলে।

রাখালের মন্তব্য শুনে বনমালী হাসতে থাকে। বলে : রাগ বানাতে হয় বন্ধু। রাগ কি অমনি হয়?

ফ্যাল্-ফ্যাল্ কোরে তাকায় রাখাল। জানতে চায় :

—ক্যামনে?

—চলো। দেখবে বন্ধু। আগে হাটের কাছাকাছি যেয়ে লই।

মোহনপুর গিয়ে পৌঁছয় ওরা। এখান থেকে মনিরামপুরের হাটের গোলমাল শোনা যায়।

গোরুর পাল দাঁড় করানো হয়। ব্যাপারী দলের সরদার বনমালী। সে একজন ব্যাপারীকে হুকুম করে :

—এই জটা, গোটা পাঁচ-ছয় খেজুর কাঁটা নিয়ে আয় তো। বেশ আগা হুলন্ত দেখে আনবি বলো।

খেজুর কাঁটা এসে যায়। বনমালী এক-একটা কোরে ওই কাঁটাগুলো

ভেদো বলদটার ল্যাজের নিচেয় ফুটিয়ে ভেঙে ছায়। কাঁটার আগাগুলো বিঁধে থাকে। ল্যাজের আগায় বা ল্যাজের মধ্যে আরো দুটো কাঁটা বিঁধোয়। বলে :

—এবার খেদাও তো বন্ধু, ভোদো বলদ।

রাখাল চুমকো দিয়ে মানে, দু-ঠোঁটের সাহায্যে মুখে এক জাতীয় শব্দ সৃষ্টি কোরে বার দুই বালাজ মলে, ল্যাজের গোড়ায় সুড়সুড়ি দিতে আর যায় কোথায়! ভেদো দামড়া তীর বেগে ছুটতে থাকে। রাখাল তাজ্জব বনে যায়, বন্ধু বনমালীর হিম্মত দেখে। রাগ তোয়ের করার কী কৃত্রিম উপায়ই না আবিষ্কার কোরেচে ওর বন্ধু।

যেতে যেতে বনমালী বলে :

—দেখলে বন্ধু? ভেদো গোরু এক মোস্তরে কী কোরে রাগী বানালাম? "গোড়ে" গোরু সারার দাওয়াইও জানি আমি।

বিস্ময় ফুটে ওঠে রাখালের মুখে। জিগ্যেস করে :

—সে আবার কী? "গোড়ে" গোরু কারে কয় বন্ধু?

—তাও জানো না তুমি? যে সব গোরু লাঙলে কেবল শোয়। জোয়াল ঘাড়ে নিতে চায় না।

হাঁটতে হাঁটতে বনমালী ওর বন্ধু রাখালকে শিখোয়, কী কৌশলে "গোড়ে" গোরু দিয়ে গাড়ি-লাঙল টানানো যায়। কাকে বলে "এক শুদ" কেটে যাওয়া গোরু। কাকে কয়, "ক্যানিছ্যাও" গোরু। বিশ্লেষণ কোরে বোঝায় দুধ-চোরা গাইদের কীভাবে শুধরে দেওয়া যায়। "ন-আল", "ছ-আল" গোরুদের কীর্তি কথা ব্যাখ্যা করে। শেষের দিকের কথাগুলো খুব জোর দিয়ে কয় :

—বুঝলে বন্ধু, "ন-আল" গোরু গোয়ালে পাওয়া যে-সে ভাগ্যির কথা না।

উৎসুক রাখাল জিগ্যেস করে :

—ক্যানো?

—"ন-আল" গোরু খুব লক্ষ্মীমান। ওর ন-খানা দাঁত। "ন-আল" গোরু যার ঘরে, লক্ষ্মী বাঁধা তা ঘরে। কিন্তু এবার আমরা বলো, হাটের কাছাকাছি এসে পলাম। বন্ধু, তুমি কোনো কথা কয়ো না। তুমি শুধু দেখে শেখো কীভাবে গোরু কেনা-বেচা কোরতে হয়।

নামজাদা গো-হাটা মনিরামপুরের। নানান দিক থেকে ফড়ের দল এসে জোটে এ-হাটে। ক্রেতা-বিক্রেতার অসম্ভব রকম ভীড়। গোরুরও আমদানি হয় কমচে কম দেড় দু-হাজার। এর নব্বই ভাগ গোরু রপ্তানি হবে কোলকাতায়

গো-খানায়।

ভালো দালালী কোরতে না পারলে গোরুর কারবারে পয়সা কামানো যায় না। বনমালী ওস্তাদ দালাল। তার সহকারী ব্যাপারী শুকলাল হয় গোরুর মালিক। ওদের প্রথম লক্ষ্য ভেদো 'বলদটা কাটতি করা। গোরুর চেহারা দেখে ছুটে আসে অনেক চাষী খদ্দের। দর জিগ্যেস করে। রোখালো খদ্দের দেখে শুকলাল দর হেঁকে বসে, পাঁচ শো টাকা। রাগ পরখ কোরতে খদ্দের সরে যায় গোরুর ধারে। ল্যাজে সুড়সুড়ি দ্যায়। কাঁটা-বেঁধা ল্যাজ ছুঁতেই গোরু ওঠে তেরিয়া হোয়ে। খদ্দেরের রোখ চেপে যায় দু-গুণ। বলে:

—খাটি-খাটি কী নেবে?

—কম নেই। ঝাড়া জবাব দ্যায়—শুকলাল।

খদ্দের হাত উঁচু করে। বুড়ো আঙুল গুটিয়ে খাড়া কোরে ধরে চারটে আঙুল, চার শো দেবে?

গুম্ মেরে থাকে শুকলাল। বনমালী দালাল ধারে ধারেই ঘুরছিলো। তার চোখ-কান দুই-ই ছিলো এ-দিকে। দর কষাকষি শুনে ছুটে আসে সে। সে যেনো আরো রোখালো খদ্দের। জিজ্ঞেস করে:

—গোরু বিক্রী?

—বিক্রী। জবাব দ্যায় শুকলাল।

—কতো নেবে?

—নেবে? না শুধু-শুধু দর শোনবে?

—নেবোই তো। নেবো না তো কি নক্সা কোরতে এলাম?

—পাঁচ শো। আবার দর হাঁকে শুকলাল।

এবার বনমালী ব্যাপারী গোরুর ধারে সরে আসে রাগ পরখ কোরতে। এবং দালাল সুলভরীতিতে মোচড় দ্যায় গোরুর ল্যাজে। জোর মোচড় খেয়ে গোরু আগের থেকে চারগুণ তেরিয়া হোয়ে ওঠে। চাষী খদ্দের হোয়ে ওঠে আরো রোখালো।

বনমালী দর করে:

—সাড়ে চার। দেবে?

শুকলাল কথা বলে না। নেতিবাচক ঘাড় নাড়ে।

—ষাট? সত্তর?

গুম হোয়ে আছে শুকলাল।

—যাক্। আরো পাঁচ দিচ্চি। ভ্যাও। দর ছ্যায় বনমালী।

—কতো ?

—চারশো পঁচাত্তর।

এবার চাষী খদ্দেরও গোঁ ধোরে বসে। বলে :

—গোরুটা আমিই আগে দর কোরলাম। তুমি "বাগড়া" দিচ্চো ?

—ও-ও। তুমি নিচ্চো ? তা বলো না ক্যানো ? ন্যাও ভাই। ন্যাও। ও শুকলাল ! গোরুটা ইনারে দিয়ে দাও। ন্যাও দাদা। ও তোমার গোয়ালে যাবে নেহাত্।

এমনি করে বনমালী ব্যাপারী ভেদো বলদের দর তুলে দিলে। চারশো পঁচাত্তর টাকা। চারশো পঁচাত্তর টাকা দিয়ে চাষী খদ্দের গোরু কিনে নেয়।

গোরুর কারবারে লাভজনক দাঁউ মারতে দেখে রাখাল অবাক হোয়ে যায়। ভাবে, ও গোরুর চালানী হবে। বন্ধু বনমালীর কাছে ওর শিখবার অনেক কিছু আছে। সেসব আয়ত্ত না করা পর্যন্ত ও হাট কামাই কোরবে না। গোরুর ফড়ে হওয়ার পর রাখাল আর বাছাড়বাড়ি জন খাটবে না। বাঁশ-কঞ্চি চুরি কোরে ঝুড়ি-কুলো বুনবে না। নোংরা চামড়াও ঘাঁটবে না।

মনিরামপুর থেকে বনমালী ব্যাপারী চলল ওর ঝাপার বাড়ি। আর রাখাল চলল সুরপুর। বোলে দিলে, দিন তিনেক বাদে ও সুরপুর যাবে। এবং "গামালে" বেরিয়ে সওদা কোরবে। গোটাকুড়ি টাকাও দিয়ে দিলে বনমালী ওর বন্ধুকে। বিনা পুঁজিতে এ-পাওনা দিনমজুর রাখালের পক্ষে অসামান্য।

* * *

আলতাপোলের ধোপা বুড়ি দেশ সুদ্ধু লোকের মাসী। বনমালী ব্যাপারী খুব চোটপাট কোরেই বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলো মাসীর বাড়ি। আজ আচ্ছামত শোনায়ে দেবে ধোপামাসীকে। মাসাবধিকাল হাঁটচে বনমালী মাসীবাড়ি। পয়সাও খাওয়াচ্চে। কিন্তু তার বদলে মাসী খাওয়াচ্চে ওকে হয়রানী। পয়সা দুটো খাক মাসী। আরো খাক। তাতে ব্যাপারী রাজি। কিন্তু কাজ হাসিল কোরে দিয়ে খাবে তো ? সেদিন জিলিপি পড়া আর বেলে সিঁদুর পড়া দিয়েছিলো ধোপামাসী। এক রকম হলপ কোরেই বোলেছিলো, জিলিপি খাওয়ানোর সাথে সাথেই বেদানা ওর গলা জড়িয়ে ধোরবে। এবং চুমো-ও খাবে। কিন্তু চুমো খাওয়া তো চুলোয় যাক, গলাটাও জড়িয়ে ধরেনি ! সিঁদুর পড়ার মহিমা কীর্তনও কম করেনি মাসী। ঐ সিঁদুর কৌটো খুলে কপালে টিপ

পরতেই বনমালী ব্যাপারীর কপাল খুলে যাবে। অর্থাৎ বেদানা রাখালকে ভুলে ফেলবে। আর পৃথিবী দেখবে বনমালীময়। অবিশ্যি সিঁদুরের মহিমা এখোনো এক্সপেরিমেণ্ট সাপেক্ষ। কেনো না সে-রাতে বেদানা সিঁদুর পরেনি। ঐ-সিঁদুর আহরণ কোরতে কমখানি ঝামেলা পোহাতে হয়নি ব্যাপারীকে। পুর গেরামের বাজার ঘেঁটে বের কোরতে হোয়েচে পুবদুয়ারী দোকান। দোকানদার 'বউনি' না কোরতে প্রথম খদ্দের হোয়ে এক ডাকে কিনতে হোয়েচে এক পয়সার সিঁদুর। এর আগে পান-পড়া ফেল্ হোয়েচে। এবং ধোপামাসীর ফরমাস মাফিক এ-পান কিনতেও বনমালীকে দস্তুর মতন নাজেহাল হোতে হোয়েচে। দম আটকে এক ডাকে প্রথম খদ্দের হোয়ে সওদা কোরতে হবে এ-পান। দোকানীর হাত থেকে পান না নেয়া পর্যন্ত দম ছাড়া চলবে না। কিন্তু সব চেয়ে বড়ো কথা হচ্চে ঐ-পানের বিড়ের প্রত্যেকটা বোঁটা থাকবে আ-ভাঙা। বারুইরা বউনির প্রথম পান-বিড়ে থেকে একটা পানের বোঁটা না ভেঙে কখোনো বিক্রি করবে না। কারবারে নামার দিন থেকে এ-মন্তর তার কানে দিয়ে দেওয়া। এ অসাধ্য সাধন কোরতে বনমালীকে পাঁচ-পাঁচবার ফেল্ হোতে হোয়েচে। কিন্তু এ-হেন তপস্যালব্ধ ফল যদি বিফল হয়, ধৈর্য তখোন সীমা ডিঙোতে বাধ্য। তবু বনমালী ব্যাপারী লাগাম ধোরে সে-ধৈর্যকে কোটের মধ্যেই আটকে রেখেচে। আর জিলিপি-সিঁদুর পড়া নিয়ে গিয়েচে মাসীর কাছ থেকে। কী দুরদৃষ্ট! তাতেও কোনো ফল ফলল না। তাই মাসীর সাথে আজ হবে বোঝাপড়া।

মাসীর বাড়ি পৌছয় বনমালী। তে-চালা ছোট্টো খোড়ো ঘর। কসাড় বাগান ঘেরা। বাঁশ বাগান। আম-কাঁঠাল বাগান। আগাছা বাগান। খানিকটে ইচ্ছে কোরেই বাগান দিয়ে ঘিরে মাসী বুঝি নিরিবিলি কোরে রেখেচে তার বাড়িখানা। মাসীর যা পেশা, নিরিবিলি এ-পরিবেশই তার অনুকূল।

যে-কড়া মেজাজ নিয়ে বনমালী ধোপামাসীর উদ্দেশে বেরিয়েছিলো, এখোন উঠোনে পা দিতেই সে-মেজাজ জল হোয়ে যায়। ঘরের দাওয়ায় বোসে দুজন রোগী। একজন ব্যাটাছেলে। আর একজন মেয়েছেলে। বনমালীর মন অপরাধী। সুতরাং মানুষের সামনে সে-মন কুচড়ে যাবেই। গেল-ও তাই। আর কুচড়োনো মন লোকের অ-সাখ্যেতেই খুলবে। এ-পর্যন্ত থাকতেই হবে তাকে অপেক্ষা কোরে।

ব্যাটাছেলেটার সাথেই ধোপামাসীর কথা হোচ্চে। লোকটা এসেচে পাশের

কোনো গাঁ থেকে। তাগড়া যোয়ান। বছর ছাব্বিশ-সাতাশ বয়েস হবে। ওদের আলোচ্য বিষয় হোচ্চে, পাশের বাড়ির একজন বিধবার সাথে ঐ ছেলেটার ভালোবাসা হয়। এখোন সে-ভালোবাসার গাছে ফল ফলেচে। এ-ফল অবৈধ। তাই ভ্রূণ অবস্থাতেই এ-ফল তছরূপ কোরে ফেলতে হবে। নইলে কি সমাজ আর কি সরকার দুজনেরি চোখে হোতে হবে অপরাধী। তাই জানাজানির আগেই হাসিল কোরতে হবে অনাগত এ-শিশু নিধন। এসব কাজে মোটামুটি দখিণেই নেয় মাসী। নেওয়ার যুক্তিও তার অকাট্য। সে বলে, এ কাজে নেমেই তো সে তার দু-দুটো লায়েক ছেলেকে হারিয়েচে। তারা বেঁচে থাকলে কতো টাকা রোজগার কোরতো। এখোন সে কতো টাকা তাকেই রোজগার কোরতে হবে। নইলে তার বাঁচবার রাস্তা কই? অবিশ্যি ডাক্তার ব্যতিরেকে এ-সব কাজ আঁটকুড়ো-হাড়হাবাতে ছাড়া কেউ কোরতেও সাহস করে না। কিন্তু ডাক্তারদের টাকার অংক বেজায় মোটা। তাই ধোপামাসীর চাহিদাও অফুরন্ত।

পঞ্চাশ টাকায় রফা হয় মাসীর সংগে। আঁচোল পুরে টাকা নেয় মাসী। তারপর একটা ওষুধের শেকড় বার কোরে দ্যায় থলের থেকে। বোলে দ্যায়, সওয়া পাঁচগণ্ডা গোলমরিচের সাথে ঐ শেকড়টা বেটে চারটে বড়ি বানাতে। আজকের মধ্যেই চারবার খাওয়ায়ে দিতে। এক-এক ছটাক সজনে-ছালের রসের সাথে। তাহোলে কাজও হাসিল হোয়ে যাবে আজকের মধ্যে।

—ঠিক তো? যদি না হয়? জিগ্যেস করে বনমালী ব্যাপারী।

—না যদি হয় তখোন আমাকে যেতে হবে। ওষুধ পুরে দিয়ে বোসে থেকে কাজ হাসিল কোরে দিয়ে আসবো। সে-বাবদ বলে, আর আড়াই কুড়ি টাকা লাগবে। তারপর আরো আড়াই কুড়ি দিতে পারতো "পেটপোড়া" দিয়ে আসবো। ব্যস্! এ-জনমের মতন কাম কিলিয়ার। মনের হরিষে যা খুশি তাই কোরো তখোন।

এবার খুশিতেই ভরে ওঠে প্রেমিক-মন! হাসিখুশি মুখেই চলে যায় সে।

—কী পাটনী বৌ?

—এই যে মাসী।

বোলতে বোলতে তিন-চারটে কাগজের মোড়ক বের কোরে মাসীর সামনে রাখে পাটনী বৌ।

মাসী একটা মোড়ক খোলে। কালো রঙের একটা পদার্থ দেখা যায়।

এটা কী?

পাটনী বৌ আস্তে আস্তে বলে, বুকের পিঠের ময়লা।

আরেকটা মোড়ক খোলে, এটা ?

—মাথার চুল।

—এটা ?

—কাপড়ের কোণা।

—জেঁয়াজ পোয়াতির ছেলের তো? (মানে, যে-মায়ের প্রথম সন্তান বেঁচে আছে।)

—হ্যাঁ মাসী।

এর পর আরো কতকগুলো মোড়ক খোলে ধোপামাসী। তার মধ্যে দেখা যায় বরশি, জিয়েল মাছের কাঁটা, লোহার মাদুলি আর চাকভাঙা খাঁটি মোম।

জিয়েল মাছের কাঁটা তো? কোন্ ধারের গো, পাটনী বৌ ?

—ডান ধারের।

মাছটা মরেনি তো ?

—না মাসী।

তারপর আরো কতকগুলো শেকড়-পত্তর দিয়ে মাদুলি পুরে দ্যায় মাসী। বলে :

—নিয়ে যাও পাটনী বৌ। আজ মঙ্গলবার মাদুলি পুরলাম। কাল থেকে তিনদিন পর্যন্ত ঘুগরো পোকার গর্তে পুরে রাখবে এ-তাবিচ। শনিবারে গলায় আর নয়তো বাঁ-হাতে পরবে। ঐদিন সন্ধ্যের মধ্যেই ছেলেটার জ্বর আসবে। আর রোববার না আসতেই ছেলে মরে যাবে। খবরটা জানায়ো আমায়। বুঝলে ?

—ওমা, তা জানাবো না। তা বাচক-গোচক কী? হ্যাঁ মাসী ?

—ডয়াকলা আর জিয়েল মাছ। খবরদার, বাচ্চার বয়েস আঠারো মাস না হওয়া পর্যন্ত ঐ-দুটো জিনিষের হাঁড়িতেও খেতে পারবে না।

—খাবো না মাসী। কী হবে না খেলে ?

এক টাকা সওয়া পাঁচ আনা গুরুমান্য দিয়ে পাটনী বৌ চলে যায়।

এবার বনমালীর পালা।

—কী বনমালী? খবর কী বলো ?

বনমালী ব্যাপারী কথা বলে না।

হাসি-হাসি মুখ ধোপামাসীর। জিগ্যেস করে :

—কী কয় বেদানা ?

মাসীর হাসি বনমালীর কাটা ঘায় নুন ছিটোয়। বলে :

—কয় তোমার পিণ্ডি। ফেরেপ্‌বাজির আর জায়গা পাও না ? ক্যামন মাসী ?

মাসী হাসতে থাকে।

বনমালী রুখে ওঠে :

—খুব তো হাসছো দাঁত কেলিয়ে। চালাকির আর জায়গা পাও না ? না মাসী ? চেনো বনমালী ব্যাপারীকে ? আমার পয়সা খেয়ে হজম কোরতে পারবে না বলো। তা বোলে দিচ্চি।

মাসী হেসে ওঠে। বলে :

—চোট্‌চো ক্যানো, ব্যাপারী ? বেদানাকে পেলে তো হোলো ?

এবার আগুনে জল পড়ে। গরম কেটে যায় ব্যাপারীর। বলে :

—বেশ তো মাসী। বলো, কতো টাকা চাও ? তিন দিনের মধ্যি কাজ হাসিল কোরে দেয়া চাই। বলো কতো চাও ? এক শো ? দুশো ? তিনশো ?

হাসি-হাসি মুখে মাসী বলে, না, ব্যাপারী। অতো টাকার দরকার নেই এখোন। মঙ্গলবার আছে। আসন কোরবো আজ। তুমি ব্যাপারী আসন খরচা বাবদ কিছু টাকা রেখে যাও। সাতদিন বাদে এসো। বেদানাকে জুড়ে-গেঁথে দিই আগে। তারপর দুশো-পাঁচশো যা খুশি দিয়ো তোমার মাসীকে।

"বেদানাকে ওর সাথে জুড়ে-গেঁথে দেবে" ধোপামাসীর এ-কথাটাই বনমালীর দেহ-মন চাঙ্গা কোরে তোলে। সে আর কোনো কথা কয় না। কোমরের তোড়া থেকে "ঘ্যাচ" করে পাঁচখানা দশ টাকার নোট বার করে দ্যায়।

মহা খুশি হয় ধোপামাসী। আর বেদানা সম্পর্কে মুখ খিস্তি কোরে এমনই এক শ্লোক শোনায় বনমালীকে, যাতে ওর বুকখানা ওঠে পাঁচ হাত চওড়া হোয়ে।

গুরুদাস নন্দীকে দিয়ে তড়িঘড়ি কোরে প্রায়শ্চিত্ত সারিয়ে নেওয়ার পেছনে ছিলো মাতব্বরদের কূট মতলব। সাঁইপণ্ডিতকে প্রায়শ্চিত্তে বাধ্য করানো। কিন্তু সে মতলব ধোপে টিকল না। সাঁই পণ্ডিত ইস্কুল ছাড়লেন। ছাড়িয়ে

আনলেন তাঁর মুচি ছাত্তরদের। কিন্তু মাতব্বররা ছাড়লেন না পণ্ডিতমশাইকে। বাছাড়মশাইরা তারাপদ ভট্চাষ্যিকে দিয়ে দৌত্য কার্য চালাতে থাকলেন। সাঁইপণ্ডিত যদি মুচি পাড়ায়ই ইস্কুল করেন, তবে তাঁকে এ পাড়া ছাড়তে হবে। ইস্কুলের মতন ঘরও তুলতে হবে মুচিপাড়ায় গিয়ে। তারাপদ ভট্চাষ্যি মশাই তাঁর কুল-পুরুত। তিনিও পুরুতগিরি কোরতে পণ্ডিত-বাড়ি পা বাড়াবেন না। কেননা যে-যজমান মুচিপাড়ায় গুরুগিরি করে, মুচিদের সাথে নির্বাধ মনে করে মেলা-মেশা, সে যজমান-বাড়ি পুরুতগিরি করা মানেই তো সারা মুচিপাড়াটা যজমান বানিয়ে নেয়া। কিন্তু এ-ভয় দেখানোয় বিপিন পণ্ডিত টললেন না। যেহেতু তাঁর তিনকুলে একজনও নেই। ছেলে-মেয়ের বিয়েও দিতে হবে না। বাবা-মায়ের শেরাদ্ধের বালাইও নেই। এক মাত্তর তাঁর নিজের শেরাদ্ধ ছাড়া। কিন্তু সে-ক্রিয়াকাণ্ড তাঁর নিজের গরহাজিরেও স্বচ্ছন্দে নিষ্পন্ন হোতে পারবে। সুতরাং তিনি কেন পরোয়া কোরতে যাবেন মাতব্বর ভট্চাষ্যিদের ?

কিন্তু মাতব্বররাও ছাড়িয়ে বান্দা নন। তাঁরা তখোন ঢেলা দিয়ে ঢেলা ভাঙার নীতির ওপোর ভর কোরে দাঁড়ান। মুচিপাড়ার সীতে ছিলো বাছাড় বাড়ি একচেটে ধান-ভানানী। সীতের মারফতে ওদের পাড়ার সব খবর সরবরাহ হোতো বাছাড় বাড়ি। আর সীতে ভাড়ানীও রাখতো এ-বাড়ির হাঁড়ির খবর। মুচিপাড়ায় ইস্কুল করা সম্পর্কে ভ্যাবলের ছিলো ঘোর অমত। বাছাড়মশাই তা জানতেন। আর ঐ ভ্যাবলের সাথে সীতের বেজায় ভাব। সীতে-অন্ত ভ্যাবলের জীবন। এ রহস্যও বাছাড়মশাই-এর অজানা নয়। তাই সীতেকে দিয়ে ভ্যাবলকে দলে ভজিয়ে আনার মতন দ্বিতীয় রাস্তা তাঁর নজরে পড়ল না।

ঢেঁকিশালায় সীতে ধান ভানচে। আর বাছাড়-গিন্নী দিচ্চেন "এলে"। এমন সময় আসেন বাছাড়মশাই। হাতে তাঁর হুঁকো। বলেন:

—ও বড়বৌ, মালসায় আগুন নেই। একটু আগুন দাও তো।

নোলচের মাথা থেকে কলকে তুলে নিয়ে বাছাড়-গিন্নী যান রান্নাঘরে আগুন আনতে।

বাছাড়মশাই এগিয়ে যান, সীতের ধারে। তাঁকে দেখে সীতে আঁচোল টেনে ছায় গায়। হাঁটুর ওপোর টেনে তোলা কোমরে গোঁজা কাপড় ছায় ঢিল কোরে।

—ও সীতে, বলি, তোদের ইস্কুল চোলচে ক্যামন ?

—খুব ভালো, দাদা। একেবারে হাট বোসে গেচে খাল ধ্যাড়ে।

—বোলিস কি! তা তোদের দু-পাড়া থেকেই তো ছেলেরা আসচে?

—তা আসচে দাদা। পালে-পালে ঢুকচে এসে ইস্কুলে।

মাথা ঝাঁকান বাছাড়মশাই। বলেন:

—ঐতো মরণের কল পেতেচে এবার তোদের পাড়ায়। বুঝলি রে সীতে?

সীতে ঠিক মত বুঝতে পারে না। বাছাড়মশাই-এর পানে তাকাতে থাকে। কলকেয় আগুন তুলে নিয়ে বাছাড়-গিন্নী ফুঁ দিতে দিতে আসেন। এবং নোলচের মাথায় বসিয়ে দেন কলকেটা। বাছাড়মশাই হুঁকো নিয়ে টানতে টানতে বোসে পড়েন। এবং মন্তব্য রাখেন:

—বুঝতে পারলিনে সীতে। বোলচি, তোদের ছেলেদের ইস্কুলে পড়ানো ভুল হোচ্চে।

এবার বুঝতে পারে সীতে। বলে:

—ঠিক কথা কয়েচো তুমি দাদা। মুচির ছাবালরা চাম কাটবে। ছাই-পাঁশ খাবে। বিদ্যে ওদের সয় কখোনো? আমি মানা কোরলাম দাদা। কে শোনবে আমার কথা?

উৎসাহ পান বাছাড়মশাই। বলেন:

—ঠিক বুঝেচিস তুই সীতে। আমি বলি, যে-আগুনরক্ত ছেনিস তোরা! লেখাপড়া শেখা তোদের ছেলেদের ধাতে সয় কখনো? আর দরকারই বা কী? কতো রোজগারের রাস্তা খোলা রয়েচে তোদের। বাঁশ-বেত, চামড়া, ধানকাটা-খড়কাটা, ভুঁইচষা। এতো রকম বিদ্যে থাকতে কী হবে লেখাপড়া শিখে? বাবু হোয়ে? বিপিন পণ্ডিতের খেয়ে কাজ নেই তো। মানুষ বানাবে! মানুষ বানাবে না আরো কিছু। হাতে মালসা দেবে।

—ঠিক কথা কয়েচো, তুমি দাদা।

হুঁকো টানতে টানতে জবাব দেন বাছাড়মশাই:

—বেঠিক কথা বলে না বাছাড়মশাই। শোন বলি, ওসব ইস্কুল-টিস্কুল বন্ধ করে দিতে বলগে। ভ্যাবল তো হাতের মানুষ তোর। ঘর ভাঙার মস্ত মাতব্বর। যাহোক দুটো বাচ্চা আছে ওর। তাদের ভালো-মন্দর দিকে তাকাতে বোলিস্ ওকে। তুই মনে কোরলে ফিরোতে পারবি ঠিক। হাজার হোক তোর পিরীতির লোক। বুঝলি সীতে?

—ঠিক আছে দাদা।

—শোন্, তুই বোলিস্ ভ্যাবলকে, মুচিপাড়ায় লেখাপড়া ঢুকলে, নির্ব্বংশ হোয়ে যাবে ও-পাড়া। মুচিদের লেখাপড়া সয় না।

হাত-মুখ নেড়ে সীতে বোলে যায়:

—সে তুমি কবে ক্যানো দাদা? ও আমি জানি। চামকাটা হাতে কলম ধরলে খসে পড়বে আঙুল। মাতব্বরেরও মত ছিলো না ইস্কুলে-টিস্কুলে। এখনো নেই। উনারে ভজালো—শুধু বট্‌ঠাকুর। আর ঐ পণ্ডিত। তাও আমি কি কম ছ্যাঁচা ছেঁচেচি?

—আরো ছেঁচবি। মোটকথা ফিরিয়ে আনা চাই তোর মাতব্বরকে। তা হলেই বুঝবো সীতে, তোর কেরামতি। ও বড়ো-বৌ; সীতেকে খুদ-কুঁড়োগুলো সব দিয়ে দিয়ো। আর শোন্ সীতে, এবার পুজোর সময় নোতুন কাপড় দেবো। মাতব্বরকে ফেরানো চায় বলো।

নোতুন কাপড়ের কথা শুনে আহ্লাদে আটখানা সীতে। বলে:

—ঠিক আছে দাদা।

বাছাড়মশাই হুঁকো টানতে টানতে বাইরে চলে যান।

খুব খুশি মেজাজেই বাড়ি ফিরেচে সীতে। খুশির কারণ একাধিক। কাঁধে-মাথায়-কাঁখে দু-তিনটে পুঁটলি তার। আর আজকার পুঁটলিগুলো বেশ ডাগর-ডাগর। ধান ভেনে আট সের চাল কোরে ছ্যায় সে। এক সের পায়। আজ কিন্তু বাছাড়-গিন্নী এক সেরের চাইতে কিছুটা বেশি চাল দিয়েচেন। খুদ-কুঁড়োর মাত্রাও দিয়েছেন দেড়গুণ বাড়িয়ে। আবার বাছাড়মশাই বোলেচেন, মাতব্বরকে ফেরাতে পারলে, পুজোর সময় নোতুন কাপড় বকশিষ। এ-বকশিষ সীতে নেবেই নেবে। মাতব্বর তো ওর মুঠোর মধ্যে। ওকে ফিরোতে আর কতক্ষণ? বড়ো জোর এক রাতের মামলা। একটা রাত একটু শক্ত হোলেই, মাতব্বর কচুর ডগোর মতন নরম হোয়ে আসবে।

এমনি সব পরিকল্পনা ফাঁদতে ফাঁদতে সীতে আসচে। এমন সময় পেছন থেকে ডাক আসে:

—সীতে, ও সীতে! ও তা দাঁড়া, দাঁড়া।

আচমকা পেছন ফিরে চায় সীতে। ছ্যাখে, পুটের মা। সেও ফিরচে ধান ভেনে। তারো কাঁখে দুটো পুঁটলি। কিন্তু সীতের মতন অমন ডাগর-ডোগর না।

পুটের মার নজর সীতের পুঁটলির ওপোর। বলে:

—তুই তো মেলা মাল বাগিয়েচিস্!

সীতের ঠ্যাকার দেখে কে? বলে:

—তা বাগাবো না? আমি কি তোর মতন?

—কী ওসব, তোর বোঁচকায়?

—ক্যানো? চাল-খুদ-কুঁড়ো।

—কতোটা ধান ভেনেচিস যে অতো চাল, অতো-খুদ-কুঁড়ো পেলি?

—কতোটা আবার? আট খুঁচি।

পুটের মা প্রতিবাদ করে:

—হুঁ? তাই না? আট খুঁচি ধান ভেনে বুঝি অতোটা চাল? অতো-খুদ-কুঁড়ো ছ্যায়?

মুখ নেড়ে জবাব ছ্যায় সীতে:

—তা ছ্যায়। দাম আছে আমার ধান ভানার। আট খুঁচি ধান ভানলে দেড় খুঁচি চাল, আর খুদ-কুঁড়ো তিন ভাগের দু-ভাগ। যার খুশি হয় ভানাও। না হয় ভানায়ো না।

—তুই তো বাছাড়-বাড়ি ভানিস? না সীতে?

সীতে ঘাড় নেড়ে বলে:

—হ্যাঁ।

—ওরা লোক ভালো। আমার লোকের মতন চোষোঙখোর না। পিঁপড়ের পোঁদ টিপে গুড় খায় ওরা। খুদ-কুঁড়োগুলো তাও সবদিন দিতে চায় না। বলে, আমাদের ছাগোল-গোরু আছে। তারা খাবে।

—তা তুই যাস্ ক্যানো ভানতে ওদের বাড়ি? আমার সাথে যাবি?

পুটের মাও তো বর্তে যায় তাহোলে। বলে:

—যাবো না ক্যানো? নিয়ে যাস্তো যাবো।

—তবে যাস্ কাল থেকে। চাল-খুদ-কুঁড়ো সব তা বেশি বেশি পাবি। আর পুজোর সময় একখানা নোতুন কাপড়।

পুটের মা যেনো স্বপ্ন ছাখে। বলে:

—দোহাই সাতে, সাত দোহাই তোর। কাল নিয়ে যাবি আমায় কিন্তু। এই ছাখ, একটু কাপড় বোলতে নেই। বেঁচে যাই, যদি একটু নোতুন কাপড় পাই।

বোলতে বোলতে কাঁখের পুঁটলি ছুটো পথে নামিয়ে রেখে শতছিন্ন আঁচোল-খানা মেলিয়ে ধরে পুটের মা।

—থাক, হোয়েচে। যাস্ কাল থেকে। শোন্, একটা কথা দিদি।

সোনামুখীর বিল থেকে উঠে আসা সরু সোঁতাটার ধারে ধারে এসে পৌঁচেচে ওরা। সোঁতা পার হোলে ঘরভাঙা—ওদের পাড়া।

—কী বোলচিস্? পুটের মা জিগ্যেস করে।

খাস-খুশ কোরে সীতে বলে:

—শোন্ দিদি, বাছাড় বোলেচে, মাতব্বরকে। ফিরোতে হবে। ইস্কুল-ফিস্কুল মুচিপাড়ায় ক্যানো। তা মাতব্বরেরও তো মত না বরাবর। জানিস্ তো। আমিও কি কম ছ্যাচনটা ছেঁচেচি। শুধু বট্‌ঠাকুর আর পণ্ডিতের পাল্লায় পড়ে ভজে গেছে। তা যাক্ ভজে। আজই ভজায়ে দেবানে। ইস্কুল-ফিস্কুল, ওসব কি মুচিদের ধাতে সয়? কী বোলিস্ তুই?

পুটের মাও ভিজে যায় সীতের কথায়। বলে:

—ঠিক কথা। আমারো ওসব ভাল লাগে না রে।

—ভালো যদি না লাগে তো ফিরো। তোর মাতব্বরকেও ফিরোয়ে আন। দুই মাতব্বর যদি পিছোয়ে আসে, তবেই দেখে নিস। সিকেয় উঠবে ইস্কুল। পারবি তো?

—খুব পারবো।

—শোন্ কল শিখোয়ে দিই। রাতে যখন আসবে, মোটেই ঘেঁষতে দিবিনে ধারে। কবুল করায়ে নিবি। রখ্যে কালিতলা স্মুখ করায়ে। তারপর। বুঝলি তো?

পুটের মা এমনি কায়দায় ঘাড় নাড়ে যার ইঙ্গিত বোঝায়, সীতেকে ও খুবই বুঝেচে। আর আজই পরিচয় দেবে সে কতো বড়ো বুদ্ধিমতী। খুবই খুশী হয় সীতে। এবং স্মরণ করিয়ে দ্যায় আরেকবার নোতুন কাপড়ের কথা।

ছোট্টো দো-চালা কুঁড়েঘর। তারই গা ঘেঁষে আরেকখানা চাল তোলা। সীতের রান্নাঘর! সে সবে মাত্তর ভাত চাঁড়য়ে কতকগুলো বুনো কচুর মুখী কুটতে বোসেচে। এমন সময় ভ্যাবল আসে। হুঁকো টানতে টানতে।

—কী রান্‌চিস ও-সীতে?

সীতের মুখ ভার। কথা কয় না। একখানা তালপাতার "চাটকোল" ছুঁড়ে ফেলে দ্যায় মাতব্বরকে বোসতে। এবং নিজে গিয়ে বসে বঁটির ওপোর। খুব মন দিয়ে কচুর মুখী কোটে।

ভ্যাবল হুঁকো টানে। আর মুচকে মুচকে হাসতে হাসতে টেনে টেনে বোলে

যায় ঃ

—সীতে, বলি ও সীতে, হোলো কী তোর ? বলি, নুনের ভরা ডুবলো নাকি ?

রা নেই সীতের মুখে। কচুর মুখী কুটছে তো কুটেই চলেচে। ভ্যাবল জানে সীতেকে। এ-ধরণের মান তার প্রাত্যহিক ব্যাপার পেরায়। আর এ-মানভঞ্জনের পালা সায় কোরতে অনেক ছিলিম তামাক পোড়াতে হবে ভ্যাবলের। তাই সে বুড় বুড় করে তামাক টানা শুরু করে। বঁটি নিয়ে উঠে পড়ে সীতে। কোটা কচুর মুখীর পাত্রটাও। চাঁদাড় থেকে ধুয়ে আনে। বসে এসে আকার গোড়ায়। কাঠি নিয়ে হাঁড়ি থেকে ভাত তুলে পরীখ্যে করে সেদ্ধ হোলো কিনা। এবার ঘরে ঢোকে। ঝুলন্ত ছোট্ট তক্তাটার ওপোর সাজানো মশলার কৌটো থেকে জিরে-মরিচ-পাঁচফোড়ন নিতে। হুঁকো বেড়ার গায় হেলান রেখে ভ্যাবলও অনুসরণ করে ওর। তক্তার পরে ল্যাম্পো রেখে নীচু হয়ে সীতে খুঁজতে থাকে ওর দরকারী মশলার কৌটো। ভ্যাবল পেছনের দিক থেকে যেয়ে বগলের তলা দিয়ে ওর গায় হাত দ্যায়।

হাত ধোরে ঝাড়া দ্যায় সীতে। বলে ঃ

—যাও।

রসিকতা করে ভ্যাবল শুধোয় ঃ

—কোথায় ?

বোলেই সীতের একান্ত ঘেঁষাঘেঁষির মধ্যে সরে যায় ভ্যাবল।

—ভালো হবে না, বোলচি মাতব্বর।

সীতের বিশাল একজোড়া চোখ জ্বলতে থাকে।

ভ্যাবল হেসে ফেলে। বলে ঃ

—এতো মান কিসের লেগে ? বোলবে তো, কী দিয়ে ভাঙবো রাধার মান ?

—মুগুর।

বোলেই সীতে বেরিয়ে রান্নাঘরে ঢোকে।

ভ্যাবলও বেরিয়ে আসে পেছন পেছন। বলে ঃ

—তবে মাথা পাত্। মুগুর ভাঁজি।

—ঠাট্টা হোচ্চে।

—একি ঠাট্টা হোলো। মুগুর মেরে যদি তোর মান ভাঙতে হয়, তবে মাথায় ছাড়া আর কোথায় ভাঁজবো মুগুর ?

—জানিনে। যাও। মুখঝামটা দ্যায় সীতে।

—তবে চললাম। আমারো তাড়াতাড়ি আছে।

—ক্যানো? বাঁশ কাটতে যাবে নাকি?

—বাঁশ? তা কাটতে হবে বৈকি। দেখি রাত্তিরে আবার কার ঝাড়ে ঢুকি। তুই তো দিলিনে।

—সে গুড়ে বালি। বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ভায় সীতে।

—ঠিক?

—ঠিক না তো কী?

—কপাল খারাপ। তবে যাই। এতো বেলা সব এসে গেলো।

ভ্যাবল সত্যি সত্যিই যাওয়ার উদ্যোগ করে।

—কোথায়? কারা এসে গেলো?

—মিটিং আছে। ইস্কুলের মিটিং।

চোখ বড়ো বড়ো হয়ে ওঠে সীতের। বলে:

—মিটিং? না যেতে হবে না।

—না গেলে হয়? হাসি হাসি মুখ ভ্যাবলের।

—ক্যানো? চোখের নজরে আগুন ঝোরচে সীতের।

—ঐ যে ইস্কুলের চেয়ার বেঞ্চি বানানো হবে। তাই মাতব্বররা সব আসবে।

—হুঁ! মাতব্বর না ছ্যাতা আমার। চ্যার বেঞ্চি। চ্যার বেঞ্চি মাতব্বরদের পোঁদে ঢুকোতে লাগবে! ওরে আমার ফুটো মাতব্বর। ভাতের হাঁড়ি নামাতে নামাতে মুখ নেড়ে ফিগার দেখায় সীতে।

—তার মানে?

—মানে ঘিলু। খাচ্চিলেন জোলা তাঁত বুনে, কী শাল কোরেচেন জোলা এঁড়ে গোরু কিনে। তোমার হোয়েচে তাই। মুচির আবার ইস্কুল মারানো। মুচি গোরু ছুলবে। ডোলা-ডালা চাঁচ-বুনবে।

ঢাক-ঢোলক বাজাবে। তা না, ইস্কুল মারায়ে ছাবালগুলোরে মেরে ফেলার কারবার। শোনো মাতব্বর, তোমার আর ইস্কুল মারাতে হবে না। ছেলে তুটোর পিণ্ডি চটকাতে হবে না অমন কোরে। মুচির কখোনো লেখাপড়া সয়? কলম ধোরলে আঙুলে কুড়ি-কুষ্ঠি-পখ্যঘাত হবে। বই পড়লে জিব পড়বে খসে।

সীতের তুফান মেলের মতন লেকচার শুনে ভ্যাবল হাসতে থাকে।

সীতে রুখে ওঠে :

—হাসচো যে বড়ো! তুমিই না এসব কথা বোলতে। ইস্কুলের নামে গোরুকাটা ছুরি ধোরতে উচিয়ে?

—তা সত্যি। কিন্তু আমি তখোন ভুল বুঝতাম সীতে। মন্নুঠাকুর সাঁইপণ্ডিত সে-ভুল ভেঙে দিয়েচে আমার।

বাঘিনীর মতন চোখ জ্বলে ওঠে সীতের। বলে :

—ভুল ভেঙে দিয়েচে! না পোঁদে বাঁশ দিয়েচে তোমার। শুধু তোমার না। এ-পাড়ার।

—ছি সীতে! তুই অমন ক্যানো? দেখে থাকিস্ সতেরমা'র ইস্কুলের পরে কতো ভক্তি? রোজ ইস্কুল-ঘর ঝাঁট ছ্যায়। মেটে-কলসী ভরে পোড়োদের জন্যি খাবার জল তুলে রাখে। তুই তো একদিনও কোরিস্ নে।

সীতে জ্বলে ওঠে :

—কোরতাম, আমি যদি ওর মতন বারোভাতারী খানকী হোতাম। এক রাত্তিরে সতর গণ্ডা মরদ পার করে যে। রাঙা-চোঙা মুখ দেখিয়ে মাষ্টার ব্যাটাকে ভুলিয়ে ফেলেচে। নোতুন কোরে নাঙ্ কেড়েচে।

—থাম্ থাম্।

—তা থেমেচি। বোলচি, কালকেই ইস্কুল-ঘর উপড়ে ফেলবে মাতব্বর। ওর চাল-খুঁটি দিয়ে চুলো জ্বালায়ে তবে আমার আর কাজ।

খুব চোটপাট কোরে জোরে-জোরে খেজুরের কাটি দিয়ে তরকারী খুঁটতে থাকে সীতে।

—মাতব্বর! ও মাতব্বর! আছো নাকি?

—কেটা? ফুলবর?

—বেশ! খুব মিটিন্ লাগায়েচো তো! ওদিকে যে সব হাঁ কোরে আছে তোমার জন্যি।

—তাই নাকি? এসে গেছে সব? জ্যাবল জিগ্যেস করে।

—সেকি এখেনে কার কথা? ফুলবর বলে।

—ও খুদে মাতব্বর, খুব তো মিটিন্ মারানী দেখচি। তোমাদের ঐ মিটিনের "বীচ্" না মেরে ছাড়িতো যা কচ্চি, সব মিথ্যে।

—ও বাব্বাঃ! চিলের ভয়ে বিলে এলাম সেখানেও দেখি

মাছরাঙা! কাণ্ডখানা কী! ফুলবর বলে।

বিস্ময় প্রকাশ করে ভ্যাবল:

—তাই নাকি? তুমিও কি ঢিলের পাল্লায় পড়ে গেছো নাকি!

—আর বোলো না মাতব্বর। উঠোনে পা দিতেই তো ঠোকরানো আরম্ভ। ঘেঁষতেই দিলো না ধারে।

—আমার ওই দশা। ঘাটের ধারে গেলেই চাটি মারচে। এসব গুরুমন্তর কানে ছ্যায় কারা? ভ্যাবল বলে।

সীতে মনে-মনে হাসে। ভাবে, ওষুধ ধোরেচে তা হোলে। কাল পুটের মার কানে যে ওষুধ ঢেলেচে ও। ঘর ভাঙার এ দুই মাতব্বরের মনের মোড় ঘুরোতে পারলে, ইস্কুল ডকে তুলতে পারবে।

—আমাদের কানে আবার কে ঢুকোবে গুরুমন্তর? আমাদের? গুরুমন্তর ঢুকচে তোমাদের কানে গো, তোমাদের কানে। আর সে গুরুও আমি চিনি। বুঝলে ফুটো মাতব্বর? ফুলবরকে লক্ষ্য কোরে মন্তব্য রাখে সীতে।

—কে? বলো তো জিগ্যেস করে ফুলবর।

—ওই মুখ গোল আর মুখ ছুঁচলো দুই গুরু। ক্যামন? তাই না?

মুখ "গোল" মানে মন্টুঠাকুর। আর মুখ "ছুঁচ্‌লো" সাঁই পণ্ডিত মানে মন্টুঠাকুর।

—মোটেই না। জলের মতন খোলাখুলি জবাব ছ্যায় ফুলবর।

তরকারী নামাতে নামাতে সীতে প্রতিবাদ করে:

—না-আ। তুমি রেখে দাও। এ আমি এক কলম লিখে দিতে পারি।

—ওঃ! কী লেখনদার গো! ইস্কুলের নাম কোরতে যে ঝাঁটা ধরে, তিনি আবার লিখে দিচ্চে! লজ্জাও করে না বোলতে! ও মাতব্বর! তা যাবে নাকি?

ভ্যাবল উঠে দাঁড়ায়। এবং হুঁকোটা তুলে নিয়ে ফুলবরের পেছন পেছন হাঁটে।

সীতে ওদের শোনায়ে শোনায়ে বলে:

—যা মাতব্বররা। মিটিনের "বীচ্‌" মারতে পারিতো আমার নাম সীতে। আর শুনে রেখো ফুটো মাতব্বর, হয় ইস্কুলের পথ ছাড়বে, পুটের মার বাড়ির পথ।

কানে গেলেও ফুলবর এ কথার কোনো উত্তর ছ্যায় না। সীতের বিশাল

চোখ-জোড়া অনেকক্ষণ পর্যন্ত রাস্তার পানে চেয়ে জ্বলতে থাকে।

সীতের উদ্দেশ্য ছিলো ইস্কুলে সম্পর্কচ্ছেদ সম্পর্কে ওর মাতব্বর ভ্যাবলের কাছ থেকে নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি আদায় করা। তাই এতো ঘড়িঘটা। মান করার দীর্ঘ ভূমিকা। হয়তো সীতে এ প্রতিশ্রুতি আদায়ও কোরতে পারতো যদি না ফুলবর আসতো উপসর্গর মতন। তবু কিন্তু হাল ছাড়ে না সীতে। ছাড়বার উপায়ও নেই ওর। সামান্য একজন ধান ভানানী সে। পরের বাড়ি ধান ভেনে, খুদ-কুঁড়ো মেগে যার দিন গুজরান হয়, লোভের ফাঁদে পড়া তার দিক থেকে মোটেই অন্যায় না। তার বুকে কুসংস্কারের ছাপ মেরে দেয়াও কঠিন নয় আদৌ। হোলোও তাই। মুচিপাড়ার ইস্কুল সম্পর্কে বাছাড়মশাই ওদের ভবিষ্যতের গায় এমনি এক বিভীষিকা রচনা করেন, যার প্রতিক্রিয়া সীতে পুটের মাকে তোলে বেপরোয়া কোরে। সীতের সুপারিশে পুটের মাও ঠাঁই পেয়েচে বাছাড় বাড়ি। মজুরিও বেড়ে গেছে দুজনের। মানে আট সের চাল কোরে দিয়ে এক সেরের বদলে পাঁচ পোয়া পায়। খুদ-কুঁড়োর পরিমাণও বাড়ন্ত। তারপর পুজোর সময় নোতুন কাপড তো আছেই। যে-নোতুন কাপড় তাদের কাছে আকাশের চাঁদের মতনই দুর্লভ। সুতরাং এ লোভ না সামলাতে পারাই তো স্বাভাবিক।

ভ্যাবল-ফুলবর দুই মাতব্বরেরই হোয়েচে বেজায় মুশকিল। কেনো না কি সীতে কি পুটের মা দুজনই চালাচ্চে বে-মেয়াদী ধর্মঘট। কিছুতেই ছোঁয়া খাওয়া দেয় না। সর্ত তাদের একটা মাত্তর। হয় ইস্কুলের নয় পিরীতির এক পথ ধোরতে হবে। মাতব্বরী বুদ্ধি হালে পানি পায় না। শেষ পর্যন্ত মহাদেবের মন টলে। পার্বতীর হয় জয়।

একদিন। দুদিন। তিনদিন যায়। মাতব্বর দুজন হাজির হয় না মিটিঙে। হাট-মাঠ, বিয়ে বাজানোর অজুহাতে আরো কিছুদিন চলে। কিন্তু কমিটির মিটিঙে মেম্বরদের গর হাজিরেরো তো একটা সীমা আছে? সে সীমা উৎরে যায়। তখোন তারণ এসে একদিন বোলে বসে:

—বলি, ব্যাপার কী গো ভ্যাবল? ফুলবরও তার পাশে বোসে টানচে হুঁকো। ব্যাপারটা বুঝতে পারে ভ্যাবল। বলে:

—কী কোরি মাতব্বর? মরার ফুরসুৎ নেই।

—তা বোললে তো হয় না। ইস্কুলটা কি একলা আমার?

ফুলবর শেষবারের মতন কষে দম দিয়ে হুঁকো বাড়িয়ে ধরে। বলে:

—খাও গো। আর ইস্কুল। ও ফ্যাদা হবেও না। রবেও না। খালি-খালি গ্যাজাগেজি। বাদ ছাও। বাদ দ্যাও।

তিরিখ্যে হোয়ে ওঠে তারণের মেজাজ। প্রতিবাদ করে :

—তার মানে? বাদ দিতে হবে? কিসের জন্যি? বাদ?

ভ্যাবলও রুখে ওঠে :

—বড্ডো যে মেজাজ দেখাচ্চো মাতব্বর? অতো চোখ রাঙানীর ধার ধারিনে তোমার। আমার পোষাল না। গেলাম না।

—পোষাল না? গেলাম না? ইয়ারকি? শালা রাঁড়খোর। মাগীর বিচমন্তর কানে পড়েচে? ক্যামন? ওরে তোদের মতন মাতব্বর আঙুল দিয়ে জন্ম দিতে পারে তারণ। এখোনো পারে। বুড়ো হোয়েচি তা কী? বোলেই তর্জনী উঁচু কোরে দেখায় ফুলবর ভ্যাবলদের।

—কি! এতো বড়ো আসফলানীর কথা! খাল খেঁচে দেবো শালোর মাতব্বর। বোলতে বোলতে একখানা ঝুড়ি উঁচিয়ে ধরে ফুলবর।

ঝুড়ি-কুলো-ডালা দিয়ে মারা এমন কি মারতে যাওয়া সব চেয়ে বড়ো অপমান করা। এতে মাতব্বর মহলের মর্যাদা হানি হয়। লাঠি-সোটা দিয়ে মারামারি করা কি দা-কুড়ুল দিয়ে কাটাকাটি করা পৌরুষের লক্ষণ। মানহানি হয় না এতে।

তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠে তারণ :

—কি! ঝুড়ি! এতোদূর আস্পর্ধা শালো! ঝুড়ি দিয়ে মারবি আমাকে! কুলো-পেটা কোরে ছাড়বো তোকে। তবে আমি বাপের জন্মিত্।

ফালুক-ফুলুক কোরে চারদিকে কুলোর সন্ধান কোরতে থাকে তারণ।

কুলোর মার খাওয়া কান কেটে নেয়ার শামিল। এতে মাতব্বরী থাকে না। কচি ছেলেরাও তাকে আর কেয়ার করে না মাতব্বর বোলে।

সীতে ছুটে ঘর থেকে বেরোয় একখানা কুলো নিয়ে। এবং দমাদম পিটতে থাকে তারণ-মাতব্বরকে।

কুলোর বাড়ি খেয়ে তারণ আর দাঁড়ায় না। বাড়ি মুখো ছুটে পালায়। সীতেও পিটতে পিটতে সোঁতার ধার অবধি মানে ঘরভাঙার এলেকা পর্যন্ত এগিয়ে যায়। আর বলে :

—বেরো, ঝাঁটা-কুলো মুখে কোরে। শালোর মাতব্বর। তোর মাতব্বরগিরি ভেঙে দিই। গলায় বাঁশ দিয়ে চেঁচাতে থাকে সীতে। জাঁকিয়ে

তোলে এ-পাড়া, ও-পাড়া।

দৌড়তে দৌড়তে তারণ এসে ওঠে ময়নাদের বাড়ি। এবং চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করে তোলে। ময়না ঘরে গোবর দিচ্চিলো। ছুটে বেরিয়ে আসে। দেখে তারণের পিট বেয়ে গড়িয়ে পড়চে রক্তের বন্নধারা। অজস্র কুলোর খোঁচার দাগে পিটখানা জরো জরো। ময়না তাড়াতাড়ি কোরে জল আনে। ধুয়ে, আঁচোল দিয়ে মুছে সরষের তেল মালিশ কোরে ছায়।

ছুটে আসে মুরপুর মুচিপাড়ার মাতব্বর-অমাতব্বররা। দেখতে দেখতে হাটের লোক জমায়েৎ হয় ময়নাদের উঠোনে। শশী ছোটে ঠাকুরবাড়ি। মনুঠাকুরকে ডাকতে।

ভূতো কোমর বাঁধতে থাকে। আর ঘাড় ফুলোয়ঃ

—মাতব্বরের গায় হাত! ক্যানো? মুরপুরেরা কি মরেচে? সুম্মুন্দীর ছেলে ভ্যাবল! ফুলবর শালো। পাবো না তোদের? গোরু ছোলা ছোল্‌বো।

পাড়ার মধ্যে সবচেয়ে ষণ্ডা-গোণ্ডা ছোটো কানাই। ছলন্ত আছাড়ওয়ালা চওড়া-দা নিয়ে ছুটে আসে সে। তার চোটপাট যোগ্যিশ্বর কাকার ওপোরঃ

—কাকা! হুকুম দ্যাও। সীতে মাগীর ঠ্যাং ধোরে চিরে ফেলি। দেখি ওর কোন্ নাঙ ঠ্যাকায়। ছিনাল মাগী।

তারণ উঠোনের মাঝখানে বোসেচিলো। সে কাঁদো কাঁদো হোয়ে বলেঃ

—কী কবো একলা। নইলে একটারেও থুয়ে আসতাম না।

—একলা তাই কী? আমরা কি মরেচি? হুকুম দ্যাও দিনি। দেখি কার ঘাড়ে কটা মাথা।

অধৈর্য ছোটো কানাই হুকুমের অপেক্ষায় ঘন ঘন তাকাতে থাকে যোগ্যি-কাকার পানে।

—রাখ্ বাপু রাখ্। অতো ক্ষ্যাপ্ত হোলে হয়? বটঠাকুর আসুক তারে। পণ্ডিতমশাই-ই বা কী বলে। শোনা যাক আগে।

নিশ্‌পিশ্ কোরতে থাকে ছোটো কানাই। কিন্তু উপায় কী? মাতব্বরের বিনা হুকুমে এক পা-ও নড়বার জো নেই তার। তবু সে প্রতিবাদ না কোরে পারে নাঃ

—ঝোঁকের মাথায় হোলো তো হোলো। নইলে কি আর মারা যায় কাকা?

অমাতব্বর রাখাল মন্তব্য রাখে :

—বুড়ো হোলে আর পদাথ থাকে না। কাকার এখোন রক্ত হোয়ে গেচে ঠাণ্ডা।

—আরে থাম্ থাম্ রাখালে। তুই বড্ডো বেশি বুঝ্‌ই মোড়ল দেখচি।

যোগ্যিশ্বর হুঁকোয় মন দ্যায়।

এমন সময় আসেন মন্টুঠাকুর। আর তার পর-পরই সাঁইপণ্ডিত। ওদের দেখে তারণ কেঁদে ওঠে। এবার বুড়ো যোগ্যিশ্বরেরও চাঁই দেখা যায় বেশ খানিকটে। বলে :

—বট্‌ঠাকুর, ভ্যাবল-ফুলবরদের কীত্তি দ্যাখো। তারণকে কী ঠ্যাঙান ঠেঙিয়েচে!

—কে ঠ্যাঙালে? ভ্যাবল? না ফুলবর? প্রশ্ন কর্তা মন্টুঠাকুর।

—তা হোলে তো হোতো। মাতব্বরে-মাতব্বরে ঠ্যাঙা-ঠেঙি পরিচয় দেয়া যেতো বট্‌ঠাকুর।

—তবে? মারলেটা কে?

—ঐ যে ভ্যাবলের রাঁড়। সীতে শালী। ঠ্যাং ধোরে ফাল কোরে দেবো শালীকে আমি। দেখি ওর ভ্যাবল নাঙ্ ক্যামনে ঠ্যাকায়।

—তাও লাঠি-ঠ্যাঙা না। ঝুড়ি-কুলো দিয়ে। বুঝলে বট্‌ঠাকুর। বোল্‌লে ছোটো কানাই।

ঝুড়ি-কুলো দিয়ে মারার ওপোর গুরুত্ব আরোপ করেন না মন্টুঠাকুর। বরং লাঠি-সোটার চেয়ে ভালো। কম জখম হোয়েচে। কিন্তু ভ্যাবল-ফুলবরের মনের চাকা আদৌ ঘুরল কী কোরে? অবিশ্যি গোড়ার দিকে ফুলবরের অমত ছিলো, মুচিপাড়ায় ইস্কুল খাড়া করা। হয়তো বা ভ্যাবলেরো ছিলো কিছুটা। এক পাড়ার মাতব্বর বোলে। কিন্তু সে অমত মনের মোড় তো ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন মন্টুঠাকুর-সাঁইপণ্ডিতরা। যার ফলে ইস্কুল সম্পর্কীয় সাড়া ভ্যাবল-ফুলবরের মধ্যে হোয়েছিলো অগ্রণী। এখোন ঐ-জাগরণী মনের গতি পরিবর্তন স্বাভাবিক না। অস্বাভাবিক চাপ সৃষ্টির ফলশ্রুতি-এ। কিন্তু সে-রহস্যের প্যাঁচ মন্টুঠাকুর খুলতে পারেন না। খুলবার মতন মাল-মশলাও সংগ্রহ ছিলো না তাঁর। ছিলো সাঁইপণ্ডিতের। তাই তিনিই তন্ন তন্ন কোরে খুলে ফেলেন মন্টুঠাকুরের সামনে। বরাদ্দ চাল-খুদ-কুঁড়োর বাড়তি পরিমাণ এবং সে-সাথে নোতুন কাপড়ের লোভই এর মূল উৎস। আর এ-উৎস বয়ে আসচে মাতব্বর

মহল থেকে। নীলমণির ঘাড় ভেঙে দখিন্যে আদায় কোরে গুরুদাস নন্দীকে দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত সারানোর তাড়া এসেছিলো যে-ঠাঁই হোতে। সে-সময়কার দূত ছিলো দখিন্যে লোভাতুর তারাপদ ভট্চাযি্য। আর এবারকার দূত সীতে। ষড়যন্ত্রের ঘোলাজল একই খাতে বয়ে চলেচে। ঠিক একই গতি-ধর্ম নিয়ে। মোটেই বিস্মিত হন না সাঁইপণ্ডিত। এবং মন্থঠাকুরেরও বিস্ময় এখোন সম্পূর্ণ মুছে যায়।

সাঁইপণ্ডিত ভুল ভেঙে দেন ওদের:

—দোষ ভ্যাবল—ফুলবরেরও না। সীতেরও না। বুঝলে যোগিশ্বর?

যোগিশ্বর জবাব দেয়ার আগেই ভুতো বোলে ওঠে:

—ও আপনি কী কও পণ্ডিতমশাই? ভ্যাবলা মিটিনে হাজির হয় না। নানান ছুতো দ্যাখায়। সে তো আপনি জানো না। তাই আমাদের মাতব্বর গেছিলো। আর সীতে শালী কিনা ঝুড়ি-কুলো দিয়ে ওকে মারল! ওই মাগীর-ই তো দোষ ঐ শালী বিচমন্তর দিয়েই তো ভ্যাব্‌লা-ফুলবরকে পাটিয়েচে। আপনি জানো পণ্ডিতমশাই? ঠ্যাং ধোরে ফেড়ে ফেলবো আমি ও-শালীকে।

ছোটো কানাই তেতে ওঠে:

বেতের শেকল ঢুকোবো ও খানকীর…

যোগিশ্বর তাড়া দ্যায়:

—এই শূয়োর!

অমাতব্বর রাখালও সমালোচনা কোরতে ছাড়ে না:

—ওতে কী হবে ও হারামজাদী ছিনালের? ওর চায় মাদারের কচা।

কথাটা অবিশ্যি ছোট কানাই-এর সাথে আস্তে আস্তে কয় রাখাল। কারণ ব্যাপারটা মাতব্বরকে মারা নিয়ে। এবং এ-পাড়ার জাঁদরেল মাতব্বররা সব এখানে। আর মন্থঠাকুর সাঁইপণ্ডিতরা এদের সামনে। এক্ষেত্রে অমাতব্বর রাখাল মাতব্বরী চাল চালতে পারে না।

সাঁইপণ্ডিত বলেন:

—তারণকে মেরেচে ওরা। সত্যিই এটা ওদের খুব অন্যায়। তার জন্য তোমরা রোখারুখি কোরচো। ধরো ঐ মারের বদলে মারলেও তোমরা। কিন্তু তাতে কি কাজ হাসিল হবে তোমাদের? না গণ্ডগোল মিটবে? ও যোগিশ্বর?

—মোটেই না। যোগিশ্বর জবাব দ্যায়।

—তবে? তার চেয়ে এর গোড়া কোথায় সেইটে বের করো খুঁজে। তখোন শেকড়টা উপড়ে ফেললেই ব্যস্। গণ্ডগোলও মিটে যাবে। কাজও হাসিল হবে।

—নিচ্চয় কথা। নিচ্চয় কথা পণ্ডিতমশাই। বটুঠাকুর তো মোটেই কথা কচ্চ না! আপনি! ক্যানো?

—আমি কিছুই বুঝতে পারিনি আগে যোগিশ্বর। তোমাদের পণ্ডিত-মশাই-ই সোনালতার শেকড় দেখিয়ে দিয়েচে। বুঝলে?

মাতব্বর-অমাতব্বররা সবাই ফ্যালফ্যাল কোরে তাকায়। ওদের চাহনি দেখেই মনুঠাকুর ধোরে ফেলেন তাঁর কথা ওরা বুঝতে পারে নি। কথাটা সোজা কোরে বোঝাতে চেষ্টা করেন। বলেন:

—সোনালতা চেনো ঠিক যোগিশ্বর। গাছের ওপর গড়িয়ে বেড়ায়?

যোগিশ্বর সায় দেয়, খুব চিনি বটুঠাকুর।

—ওরা মাটি ছোঁয় না। খায় কিন্তু মাটির রস। গাছ কষ্ট কোরে মাটি থেকে রস টানে নিজে বাঁচবে বোলে। আর ওরা গাছের গায় শেকড় বিঁধিয়ে দিব্যি আরামসে রস খেয়ে ডাগর হয়। গাছকে মারে। তেমনি তোমাদের কাছ থেকে একজাতের লোকেরা সুখ-সুবিধে আদায় কোরচে। তোমাদের মেহনৎ চুরি কোরচে। মানে, তোমাদের কাঁটাল তোমাদের মাথায় থুয়ে কোষ ভেঙে খাচ্চে। ইস্কুল হলে তোমাদের চোখ ফুটবে। তাই তারা চাইবে তোমাদের ছাড়াছাড়ি রেখে ইস্কুল ভেঙে দিতে। তোমরা তাদের চেনো। রাগ করো তাদের ওপর। ভ্যাবলদের ওপর না, বুঝলে?

মাতব্বর-অমাতব্বর সবাই ইতিবোধক ঘাড় নাড়ে। কিন্তু ভ্যাবল-ফুলবরদের ওপরকার আক্রোশ তুলে নেয় না। এমনকি মেয়েমানুষ বোলে সীতেকেও রেহাই দেবে না! যেহেতু সে মাতব্বরকে ঝুড়ি-কুলো দিয়ে মেরেচে। এমনি স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ার মধ্যে দিন কাটতে থাকে। ইস্কুল সম্পর্কীয় উৎসাহে সুরপুরদের ভাঁটা পড়ে না। কিন্তু ভ্যাবলদের জব্দ কোরবার প্রতি-হিংসার জোয়ার দিনকে দিন ফাঁপতেই থাকে। হাটে-মাঠে-ঘাটে দাঁও খুঁজে বেড়ায়। কিন্তু সে দাঁও না আসতে অন্য পক্ষরা আবার দাঁও পেয়ে যায়। নিত্য-নৈমিত্তিক নিয়মমাফিক সেদিন সকালবেলা ময়না গেছে ইস্কুল ঘর ঝাঁট দিতে। ছেলেদের খাওয়ার জল তুলে রাখতে। সঙ্গে কোরে নিয়ে গেছে বেদানাকে। বেদানার সাথে আজকাল ময়নার ভাব খুব। যেমন

পুটের মা'র সাথে সীতের। বেদানাই গরজ কোরে এসে এ-ভাব জমিয়েছে।' এখানে স্বার্থর একটু খাতির আছে। হাজরাকে মানুষ করা। ময়নাদের বাড়ী রোজ সন্ধ্যেয় সাঁইমশাই সতীশকে পড়াতে আসেন। সে সাথে হাজরাকেও পড়ান। এটা কম স্থবিধে নয়। যা হোক ময়না-বেদানা ইস্কুল ঘরে ঢুকে ঝাঁট দিচ্চে আপন মনে। সহসা বাঘিনীর মতন এসে ওদের ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে সীতে পুটের মা। অতর্কিত এ হামলার জন্ম ওরা মোটেই প্রস্তুত ছিল না। তারপর আকার-প্রকার সামর্থ্যর দিক থেকে এরা দুজন সীতে পুটের মা'র চেয়ে অনেক খাটো। স্থতরাং পারবে কেন? চুল ছিঁড়ে নাক-মুখ-খামচে ক্ষত-বিক্ষত কোরে দিলে। দুজনের ঝাঁটা কেড়ে নিয়ে ঝেঁটিয়েও দিলে দস্তুর মতন।

ঝাঁটার শলা গায় বিঁধে দরদর কোরে রক্ত পড়তে লাগল। কিন্তু সীতে-পুটের মা'ও অনাহত রইল না। ময়না-বেদানাকে চিৎ কোরে ফেলে ওদের বুকের ওপর চেপে বোসলে। দুরভিসন্ধি ছিলো গলা চেপে মারবার। বুঝতে পেরেই সীতে-পুঁটের মা'র লম্বা স্তনের বোঁটা এমনি জোরে কামড়ে ধরলে ওরা যে ওদের উঠে পড়া ছাড়া আর পথ রইল না।

সীতে চেঁচিয়ে ওঠে, তাড়কা রাক্ষুসী! কামড়ে খেয়েচে!

ময়নাকে লক্ষ্য কোরে বললে সীতে, কিন্তু উত্তর দিলে বেদানা, আমরা রাক্ষুসী? তোরা যে বাঘিনী। ঝাঁপিয়ে পড়েচিস ঘাড়ে।

—মুখ সামলে কথা কবি। বারো-ভাতারী ছিনাল।

—পোকা পড়ুক তোদের মুখে। বেদানা বলে।

—আমাদের মুখে? আর তোদের ইসিতে পোকা পড়ুক। কড়া পোকায় কুরে খাক।

ময়না চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। পুটের মা রক্তঝরা স্তনটা ধোরে ফুঁ দিচ্চে। কথা কাটাকাটি হোচ্চে সীতে বেদানায়।

—থাক তোদের। বেদানা বলে।

—আমরা কি তোদের মতন পেশাদার ছিনাল!

—ওরে আমার সাবিত্তির রে! দীনো ভাতারী। বীরে ভাতারী, ভ্যাবলা ভাতারী আর ক' গণ্ডা নিবি রে?

—আর তুই? তুই যে কুণ্ডই ভাতারী, তিনকড়ে ভাতারী, পদা ভাতারী। রাখালে ভাতারী আবার বোনা ভাতারী হোতে যাচ্চিস? তলের ভাত ফুন

দিয়ে খাস্? আর ঐ যে দাঁড়িয়ে আছে আর এক সাবিত্তির। ভাঙবো উনার হাঁড়ি! ময়নাকে ইশারা কোরে বলে নীতে।

এবার ময়না কথা কয়, কী বোলবি রে? কী বোলবি?

—এই খামারে নাঁড়! ডুব দিয়ে জল খাস্। আমরা বুঝি টের পাইনে? ওই পুন্ন্যি ভাতারী, আমরা জানিনে কিছু? ইস্কুল ঘর ঝাঁট মারাস্ ক্যানো? ঝাঁটার কাটি ঢুকোবো তোর ইসির মধ্যি। মাষ্টার ভাতারী। ছাবালের ইস্কুল মারানো হোচ্চে কী জন্যি আমরা বুঝিনে? চুলোয় দেবো তোদের ঐ ইস্কুল ঘর। খামারী!

এমনি অশ্লীল অশ্রাব্য গাল-গালাজের ঢেউ বয়ে চলল। সে তোড়ের সামনে ময়না-বেদানা দাঁড়াতে পারে না।

ঐ ঘটনার পর দুমাস চলে গেছে। মাঘের শেষাশেষি যে বর্ষণ হয় সে-বর্ষণে শুরু হয় বিলতলায় চাষ। এবং চোত মাসেই বীজ বোনন আরম্ভ। বড়ান ধানের বীজ। বাঁকুই, কারশাল। দশ-পোনের হাত জলের ওপর টেক্কা মেরে টিঁকে থাকে যারা। সোনামুখীর অতলা এখোন সবুজ সবুজ হয়ে উঠচে। এই সবুজ ক্রমশঃ গাঢ় হোয়ে এগিয়ে আসতে থাকবে। আর আষাঢ় মাস নাগাদ পৌছুবে এসে অচ্ছুৎ পাড়ার ছোঁয়াছুঁয়ি ঘেঁষে। কিন্তু এই ঘেঁষাঘেঁষির মধ্যেই গড়ে উঠবে সম্পর্কচ্ছেদ মস্ত ব্যবধান। মানে, মুচিদের একটা ছাগোল-গোরু পর্যন্ত নামতে পারবে না এ বিলে। পাখনা গুটিয়ে স্বল্প পরিসর সীমানার মধ্যে থাকতে হবে। এদের খাটো হোয়ে। যে পর্যন্ত না ধান পেকে উঠে এবং পাকা ফসল পৌছয় গিয়ে মালিকের খামারে। ফসল শূন্য হবে বিল। সোনাহারা হবে সোনামুখী। খাঁ-খাঁ কোরবে বুকখানা। নেমে আসবে অবাধ আলো-হাওয়া। বির্বাধ আকাশ। সে-সাথে আসবে ঐ অচ্ছুৎ পাড়ার স্বত্ব-সামীত্ব। ওদের ছাগোল-গোরু বিলে চোরবে। ছেলে-মেয়েরা ধান কুড়োবে। শাক তুলবে। কাঁকড়া-কুঁচে ধরবে। নাড়া কেটে আনবে, ঘর ছাইতে। জ্বালানী বানাতে। এমনি কোরে সোনামুখীর সাথে এদের পুরুষানুক্রমিক যোগসূত্র গাঁথা। এর মাটিকে ভালোবাসে এরা। যদিও এ মাটিতে এদের মালিকানা স্বত্ব নেই। এর ফসল এদের চোখ জুড়োয়। যদিও সে ফসল ওদের গোলায় ওঠে না। পেট জুড়োয় না। যেদিন সোনামুখীর জমিতে লাঙল চষে ওরা সেই চষা মাটির গন্ধে মন ওদের আহ্লাদে আটখানা। হোক না সে-জমি পরের। কিন্তু জমির সৌরভ তার একান্ত আপন। এমনি এক খুশি

মন নিয়ে রাখাল খুব সকালে উঠে। এবং বেদানাকে ডেকে বলে :—

—বড় বৌ কাজে চোললাম।

—কোথায় যাবা কাজে?

—বাছাড় বাড়ি। নিকটেই থাকবানে। ওদের ওই "ধান ছিরির" ভুঁইতে লাঙল জুড়বো।

'ধান ছিরি'র ভুঁই সোনামুখীর দক্ষিণ পারে। রাখালদের বাড়ী থেকে দেখা যায়। এ-বিলের মাটির গন্ধ আর বেদানার মুখ পরের ক্ষেতে কাজ করলেও রাখাল আজ এ দুটোই উপভোগ কোরতে পারে। তবে বেদানার সাথে ওর কথা কওয়া হবে না, কেননা কথা কওয়ার মতন নাগালের বাইরে থাকবে ও, তবু পাকে পাকে যখনই উত্তরমুখো ফিরবে রাখাল তখনই চোখোচোখি হবে। না হোক দেখাদেখি হবে ঠিক। খুশি মনে রাখাল চোলে যায়। বোলে যায় হাটের আগে ফিরবে ও। সকালে-দুপোরে ওখানেই খাওয়া পাবে।

'ধানছিরি'র ভুঁইয়ে লাঙল চোষবে রাখাল। কাজের ফাঁকে ফাঁকে বেদানা মাদারতলায় এসে দাঁড়িয়ে দেখচে, তিনজন মুনিশ। আগে ওর স্বামী মাথায় গামছা জড়ানো। ডান হাতে পাচুনি। শক্ত মুঠোয় ধোরেচে লাঙলের তাড়া। ঝুঁকে পোড়েচে সামনের দিকে। এবার উত্তরমুখো মুখ কোরে এগিয়ে আসচে এদিকের আল পর্যন্ত। চোখোচোখি হয়। বেদানা হাসে। হয়তো হাসে রাখালও। কিন্তু কেউ দেখতে পায় না। কেননা দেখার মতন নাগালের মধ্যে নেই যে ওদের হাসি। তবু বেদানা হেসে খুশি। খুব ভালো লাগে ওর হাসতে। ওর হাসি দেখলে রাখালের মেহনৎ গায় লাগবে না। ঐ এবার ঘুরলো। দক্ষিণমুখো মুখ কোরে চোলল। আগে রাখাল, মাঝখানে ছোটো কানাই। পেছনে পুন্নু। বেদানা ঘরের কাজে চলে যায়। ওরা আবার না ঘোরা পর্যন্ত বেদানাও ঘুরবে না।

বেলা মাথার ওপোর আসে। কাজ ছাড়ার সময় হয়। রাখালরা লাঙল কাঁধে নিয়ে চুমকো দিয়ে গোরু খেদিয়ে বাছাড় বাড়িমুখো চোলে যায়। বেদানা রান্না ঘরে ঢোকে ভাত নেমে গেছে। এখন চড়াবে কচুশাক। তারপরে রাঁধবে মাংস। বড়ো মাল নয়। ছোটো মাল। মানে দিন চারেক আগে নুরপুরের কাঁহার পাড়ায় একটা ডাগর পাঁটার "ছাঁট" দিয়েছিলো তারণ। পাঁটাটার "ছাঁট" দেয়ার বয়েস অনেক আগে উৎরে গিয়েছিলো। বোধহয় সে কারণেই মরে গিয়ে থাকবে। যা হোক পাঁটাটা তারণ বাগিয়ে এনেচে।

তার থেকে একটু মাংস দিয়ে গেছে ওদের। সবশেষে ঐটে রাঁধবে। এবং রেখে দেবে। ওবেলা দুজন মিলে খাবে।

বেদানা মাংস ক'ষে নিয়ে সবে মাত্তর জল ঢেলে দিয়েছে। এমন সময় জোর কান্নার শব্দ কানে আসে ওর। পুরুষমানুষের গলা। বেদানা বাইরে আসে। দেখে ছোটো কানাই মাঠ ভেঙে ছুটে আসচে। চিৎকার ছেড়ে কাঁদতে কাঁদতে। কাঠ হয়ে যায় বেদানা। তার বুকের মধ্যে জোর ঢেঁকির পাঁড় পোড়তে থাকে। ব্যাপার কী? এই মোত্তর তো লাঙল ছেড়ে দিয়ে সব বাছাড়বাড়ী গেল। কী ঘটল এর মধ্যে? বেদানার সাহসে কুলোয় না জিগ্যেসা করে, কী ব্যাপার? কার কী হোল?

ছোটো কানাই কাঁদতে কাঁদতে বলে:

—সব্বনাশ হয়েছে খুড়ী।

—কী হোয়েচে? ওরে কী হেয়েচে?

—কাকা গাছুতে পড়ে গেছে। বোলতে বোলতে ছোটো কানাই ছুটে যায় তারণ-ভূতোদের খবর দিতে।

—ওরে আমার কী হোল রে! আছাড় খেয়ে মাটিতে পড়ে বেদানা।

ছোটো কানাই যে-ভাবে এসে খবর দিয়েছিলো, তাতে বেদানা মনে কোরেছিলো রাখাল বেঁচে নেই। ঘটনাস্থলে সবাই ছুটে যায়। দেখে আঘাত গুরুতর অবিশ্যি। কিন্তু জীবনের ভয় নেই রাখালের। কোমরেই বেশীরকম লেগেছে। আর ডান পায়। বোধহয় পা-টা ফ্রাকচারড হয়ে থাকবে। বুড়ি ভদ্দরের ঘাটের ধারে যে-ছাতরানো জাম গাছটা আছে রাখাল উঠেছিলো ঐ গাছে জাম খেতে। একটা পোকড়া ডালে পা দিতেই মড়াৎ কোরে ডালটা ভেঙে যায়। এবং ডালের সাথে দড়াম্ কোরে রাখালও এসে তলায় পড়ে। কুড়ি-পঁচিশ হাত উঁচু থেকে পোড়েচে সে। হাঁটবার যো নেই তার। তাই একখানা তক্তার ওপর শোয়ায়ে সাঙ কোরে নিয়ে যায় সব। তারপর ছোটো কানাই ফকিরবাড়ি ছোটে। হাড় ভাঙার ডাল, ভাজা বালি, জীবনের পাতা দিয়ে প্রলেপ দেয়ার ব্যবস্থা দেয় ফকির। বলে, সারতে লাগবে মাসখানেক।

* * * *

দু-মাসের বেশী হোতে চলে বনমালী ব্যাপারী তেমনি নাজেহাল হোচ্চে ধোপামাসীর কাছে। নাকে দড়ি পরানো ভালুকের মতন নাচাচ্চে ওকে মাসী। প্রতি শনি-মঙ্গলবারে আসন কোরে বসে ধোপামাসী। আর বনমালী তারপর

দিন যায়। শুধোয়, খবর কী মাসী ?

মাসী বলে, খবর ভালো, বোনো। কথা হয়, হবে ঠিক। তবে···মাসী থেমে যায়।

বনমালী জিগ্যেস করে :

—তবে কী ? অমন চিবিয়ে কথা বলচো কেন ? খুলে-মেলে বল না মাসী ? এবার ঢোক গিলে নিয়ে খাশ খুশ কোরে মাসী কয় :

—হবে ঠিক বোনো। এখোন হোচ্চে, রাখালও বেদানাকে এনেছিলো গুণ্ কোরে। ঐ গুণ্ না কাটতে পারলে ও বশ হবে না। বনমালী চাপ দেয়, তা কাটচো না কেন গুণ্ ? কেটে দেও। মাসী জবাব দেয় :

—খুব শক্ত কোরে গুণ্ কোরেছে বোনো। তাল গাছে পেরেক মেরেছে। ঐ পেরেক তুলতে হবে। তবে তো ! সেটাই পেরে ওঠা যাচ্চে না। ওস্তাদ গুণীন তো। গুণীনের ওপরে গুণ খাটাতে হবে। কে ঐ গুণীনটা চিনতে পারলে সুবিধে হোতো। বুঝলে বোনো। তুমি এক কাজ করো, আসচে শনিবারে একখানা কপাটী আয়না, পাঁচ পয়সার খাঁটি সরষের তেল আর একজন তুলো রাশির লোক নিয়ে এসো। আয়না ভারন করে দেখলেই, গুণীনটা কে ধরা পোড়বে। তুলো রাশি লোক জানা আছে তো ?

বনমালী বলে,—হ্যাঁ মাসী আছে। ঝাঁপার জটিরাম কাবরা তুলো রাশি। ওর হাত চলে। ধোপামাসী হেসে বলে, হাত চলার দরকার হবে না, আয়না দেখবার জন্যি। তুলো রাশি ছাড়া হাতও যেমন চলে না তেমনি আয়নার মধ্যে দেখতেও পায় না আর কেউ। যাও। আসচে শনিবার অবিশ্যি আসবে।

সেই শনিবার আজ। তাই বনমালী ব্যাপারী কপাটি আয়না, সরষের তেল ঝাঁপার বাজার থেকে কিনে নিয়ে জটিরাম কাবরাকে সাথে কোরে ধোপা মাসীর বাড়ী পৌছয়।

ধোপা মাসীর বয়েসী হবে একজন প্রৌঢ়া মহিলা এসেছে তার ছেলেকে সাথে কোরে। মাসী ছেলেটাকে 'ওতোল' কোরবে; মানে ছেলের শাশুড়ি ওকে ওষুধ খাওয়ায়েচে। উদ্দেশ্য জামাই বশ কোরবার। তাহোলে মেয়েকে সুনজোরে দেখবে। আর রোজগারের টাকা তুলে দেবে শাশুড়ির আঁচলে। জামাই বশ হোয়েচে কিনা বলা যায় না। কিন্তু শরীর ওর দিনকে দিন খারাপের দিকে যাচ্ছে। চোখ হলদে হোচ্চে। পেট ফুলচে, রঙ হোয়ে আসচে ফ্যাকাশে।

কী একটা পাতার রস এক ঝিনুক খাওয়ানোর পর ধোপামাসী রোগীকে শোয়ায়ে দেয় দাওয়ার ওপর। তারপর মন্তর আর শেকড়ের বলে ওর নাভিদেশ ফাঁক কোরে পেট থেকে ওষুধ বের কোরে আনে—একটা চুল, একটা নখ, দু'টুকরো সোনালতা আর আধখানা পুলিপিঠে। মানে ওই পিঠের মধ্যে ওইগুলো পুরে জামাইকে খাওয়ায়ে ছিলো। দুমাস আগে। আশ্চর্য! চুল-নখ-শেকড় নয় বাদই দিলাম কিন্তু পিঠে আধখানাও হজম হোতে জানেনি। মনে হোচ্চে জামাইবাবু এই মোক্তর শাশুড়ির দেওয়া পিঠে খেয়ে মাসীর বাড়ী বেড়াতে এলেন।

দই—মিছরির সরবৎ আর পান্তা ভাত খাওয়ার ব্যবস্থা দিয়ে রোগীকে ছেড়ে দেয় ধোপামাসী। দক্ষিণে পায় দশটাকা সোয়া পাঁচ আনা।

এবার বনমালীর পানে চোখ ফিরোন ধোপামাসী।

—কই বোনো? এই নাকি তোমার তুলো রাশি? ইনি?

—হ্যাঁ মাসী।

লম্বা বাবরী চুলওয়ালা মুখে চাপ দাড়ি আর গলায় মোটা দানা কাঠের মালা জটিরাম কাবরাকে লক্ষ্য কোরে মাসী জিগ্যেস করে।

—তোমার নাম?

—জোটিরাম গো।

—আচ্ছা, জটিরাম শোনত এসো। বোসো বোনো। আমি ওনাকে একটা মন্তর শিখোয়ে আনি। মোনে মোনে মন্তরটা পড়বে উনি আর আয়না দেখবে।

ঘরের কানাচের দিকে জটিরামকে নিয়ে যায় মাসী। এবং কানে কানে মন্তর শিখোয়। মিনিট দশেক পরে ফিরে আসে।

—কই বোনো, তোমার কপাটি আয়না, সরষের তেল কই?

ফতুয়ার পকেট থেকে আয়না ও তেলের শিশি বের কোরে দেয় বনমালী ব্যাপারী। মাসী আয়নার কপাট খোলে। কাচের গায় ফুঁ দিয়ে তেল মাখিয়ে মন্তর পড়ে জটিরামের হাতে দেয়। বলে, মন্তর জপো মোনে মোনে আর আয়না ত্মাখো।

জটিরাম দু ঠোঁট নাড়ায় আর পলক না ফেলা চোখ চেয়ে থাকে আয়নার ওপর।

—কী? দেখচো কিছু জটিরাম। মাসী জিগ্যেস করে।

হাসি হাসি মুখ জটিরাম ঘাড় কাৎ করে।

—কী দেখচো?

—একখানা পাঁচচালা ঘর। দাওয়ায় বোসে এক সাধু ফকির। মাথায় লম্বা চুল, ধবধবে সাদা। এক গাল লম্বা দাড়ি। শোনের ফেশোর মতন। কপালে মোটা সিঁদুরের ফোঁটা।

—গলায়? ধোপামাসীর প্রশ্ন।

—লম্বা মোটা দানা মালা।

—ক্যামন মোটা? তোমার মালার মতন?

—না গো মাসী। অনেক মোটা। আমড়ার আঁটির মতন।

—গায়ের রঙ?

—বুটের ডালের মতন।

—দেখতে ক্যামন?

—দোহারা। না মোটা, না রোগা।

—বয়েস?

—অনেক। মুখের চামড়া কুঁচড়ে গেছে, মাসী।

—সাধুবাবা একলা বোসে? না আর কেউ আছে?

—অনেক লোক ছিলো মাসী। মাগীমানুষ। ব্যাটামানুষ। বাচ্চাও। এক এক কোরে সব চলে যায়। এবার আরেকটা লোক এসে বোসলো। কালো। বেশ ষণ্ডা-ষণ্ডা। লোকটা সাধুবাবার চেলাই মনে হোচ্চে। হেসে হেসে কথাবাত্তা কইচে দুইজন। এবার লোকটা পকেট থেকে পদ্ম পাতায় মোড়া কী একটা জিনিষ বের কোরে সাধুবাবার হাতে দিলে। বাবাজী সেটা খুলচে। যাঃ! সন্দেশ যে মাসী!

হেসে ফেলে ধোপামাসী, তারপর?

—সন্দেশের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় কোরে মন্তর পড়চে বাবাজী। ঐ ফুঁ দিচ্চে এবার। তিনটে ফুঁ। এবার সাধুবাবা সন্দেশটা দিয়ে দিচ্চে লোকটার হাতে। লোকটা পকেটে হাত ঢুকোয়। একগাদা নোট টেনে বের করে। ঐ যে সাধুবাবার হাতে দিয়ে দিলে। আর কী যেন বোলচে। মনে হয় ফল পেলে আরো দেবে। এবার—লোকটা চলে যাচ্চে। উ-ই, উ-ই চলে গেল। আমবাগানের রাস্তা ধোরে।

—থাক। আয়না বন্ধ করো এবার জটিরাম। নির্দেশ দেয় ধোপামাসী।

জটিরাম আয়নার কপাট বন্ধ করে। আর ভাব দেখায় সে বুঝি একবিঘে জমি কোদাল মেরে এলো এই মাত্তর। এমনি ক্লান্ত।

খানিক সময় চুপচাপ থেকে মন্তব্য রাখে ধোপামাসী :

—ঠিক চিনতে পারা গেলো না সাধুবাবাকে। তবে সন্দেশ পড়া খাওয়ায়েই গুণ খাটিয়েচে। তাই সন্দেশ পড়া দিয়েই গুণ কাটতে হবে, বোনো। তুমি শনিবার আমাবস্তে মাথায় এক ডাকে সন্দেশ কিনে আনবে। দোকানঘর যেনো পুবদুয়ারী হয়।

—আমাবস্তে কবে মাসী? বনমালী জিগ্যেস করে।

—আমাবস্তে হোলে তো হবে না। শনি অথবা মঙ্গলবার হওয়া চায়। সেটা তুমি জেনে নিয়ো। যাও। এবার নিরঘাত। এখোন বাড়ি যাবে তো?

—না মাসী। মুরপুর যেতে হবে।

—জটিরাম, তুমিও কি যাবে ওর সাথে?

—না মাসী। আমি বাড়িই ফেরবো।

—তা হোলে তুমি এসোগে বোনো। আমি জটিরাম বাবার সাথে একটু গল্প করি।

বনমালী উঠে দাঁড়ায়। এবং ফতুয়ার চোরা পকেট থেকে দশ টাকার পাঁচখানা নোট বের কোরে আসন খরচার বাবদ ধোপামাসীর হাতে ছায়।

—তা বাবাজীর সাথে মিটমাট কোরেচো তো বোনো?

—না।

—তা দিয়ে দাও। এসব কাজ বাকি-যুকি রাখতে নেই।

—কতো কী দেবো? জটিরামদা?

—ছাও। তোমার সাথে আবার দর কষাকষি কী? এক গাঁয় বাড়ি। পাড়া-পেরতিবেশী।

আর কথা কয় না বনমালী ব্যাপারী। দশ টাকার একখানা নোট বের কোরে জটিরামের হাতে দেয়।

—মাসী আসিগে।

—আচ্ছা। এসোগে।

বনমালী চলে যায়।

খাস্‌খুশ কোরে ধোপামাসী বলে :

—ভালো বাবা জটিরাম। এতো গুণ তোমার পেটে! ঠিক হোয়েচে। তোমার মতন একজন মানুষ আমি খুঁজচি। তুমি মাঝে মাঝে এসো। খদ্দের-পত্তর জুটিয়ে দেবো। শুদ্ধু চালাকি বাবা। এসব কাজে শুদ্ধু চালাকি। যাক। সামান্য সময় তোমার কানে মন্তর দিয়ে খুব কাজ পেয়েচি। ধরো বাবা। খোপামাসী আঁচোলের মুড়ো থেকে দুটো টাকা বের কোরে জটিরামের হাতে দেন। মহাখুশী হোয়ে চলে যায় জটিরাম গুণীন।

পথে যেতে যেতে বনমালী ব্যাপারী মনে মনে ভাবে, আজ আর জিলিপি না। সন্দেশ নিয়ে যাবে বেদানার জন্য। সেদিন বোলেচে, বশ কোরতে হয়তো তোমাকে বেদানা, সন্দেশ খাওয়ায়ে। জিলিপি না। অবিশ্যি আজকার এ-সন্দেশ বশ কোরতে পারে না। কারণ এ পড়া সন্দেশ না। তাই এ না-পড়া সন্দেশ খেয়ে বেদানা জেনে রাখুক, গুণ কোরে বশ করার ইচ্ছে বনমালী ব্যাপারীর নেই। এরপর পড়া-সন্দেশ খাওয়াতে ওর আর মোটেই বাধবে না।

কেশবপুর বিষ্টু ময়রার দোকানে পৌছয় বনমালী। ছ্যাখে, বিষ্টু ভিয়েন কোরচে।

—ভালো সন্দেশ আছে নাকি, ও বিষ্টুদা?

তাড়ু ঘোঁটা থামিয়ে বিষ্টু বলে:

—খুব ভালো সন্দেশ। গরম গরম। কড়াপাক। এই এখুনি নামবে খোলা।

বনমালী দোকান ধারে দাঁড়িয়ে থাকে। ভেতরে ঢোকবার অধিকার নেই ওর। জিবে গজা, চৌকো গজার দাম জিগ্যেস করে। চার পয়সার জিবে গজা কিনে খায়।

জল খেতে চাইলে বিষ্টু ময়রার ছোকরা কর্মচারী এক মগ জল নিয়ে বাইরে আসে। এবং বনমালীর হাতের কোশায় ঢেলে দেয়। সন্দেশের কড়াই নামে। মুখ স্ঁচলো বিষ্টু জিগ্যেস করে:

—কতখানি দেবো?

—ছাও সের খানেক।

—মো-ট্-টে! টেনে-টেনে বলে বিষ্টু। এবং রঙ-চঙ করা একটা মেটে হাঁড়িতে একসের সন্দেশ মেপে দিয়ে দাম নিয়ে নেয়।

ঘুরতে ঘুরতে মেছো হাটায় ঢোকে বনমালী! ছাখে, বোয়াল মাছ উঠেচে।

বুড়ি ভদ্দরের জ্যান্ত বোয়াল। সের দুয়েকের মতন একটা কেনে। বোঁ-কোরে মেছোবাজারের উত্তর মুড়োয় চলে যায়। ছোট্ট একখানা দো-চালা টালির ঘর —তাড়িখানা। তারই ধারে পাতা খান দুই বেঞ্চি। বনমালী জানে এ বেঞ্চি সবার আসন। একখানায় বোসে পড়ে। তারপর এক মগ মাল টেনে নেয়। পান কেনে। মস্ত এক বিড়ে ঝাড়া পান। কেনে সুপুরি। তারপর সুরপুরের বড়ো রাস্তা ধরে। সরকারী ডাক্তারখানার ধারে ধারে পৌঁছতেই ছোটো-কানাই পড়ে যায় সামনাসামনি।

—কী? কাকা ভালো তো?

রাখালের বন্ধু বনমালী। সে-সুবাদে ছোটোকানাই ওকেও কাকা বলে ডাকে।

—হ্যাঁ ভালো। তোমরা সব ভালো তো গো?

—না গো। কাকা গাছতে পড়ে গেছে। খুব বলবৎ।

মালটানার পর বনমালীর কালো মুখ আরো কালো, আরো চকচকে হোয়ে উঠেচে। ভাঁটার মতন গোল-গোল চোখ জোড়া আরো জ্বলজ্বল্ কোরচে। এবং ব্যাঙের চোখের মতন ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইচে বাইরের দিকে।

—কে? বন্ধু! গাছতে পড়ে গেছে! কবে? কবে গো?

বনমালীর আমড়া-আটিপানা চোখ জোড়া ঠ্যাকে গিয়ে ছোটোকানাই-এর কপালে।

—তা আজ পাঁচ সাত দিন হোলো।

—পাঁচ সাত দিন! তা আমারে খবর দ্যাওনি ক্যানো গো?—কী গাছতে পলো?

—জাম গাছতে।

—খুব লেগেচে?

—তা লেগেচে গো। হাটুর হাড় ভেঙে গেছে। মাজা মচ্‌কে গেছে।

—উঠতে পারে?

—না গো। শুয়েই আছে।

—তা দেখচে কে গো?

—নেহাল ফকির।

—তা তুমি যাচ্চো কোথায় গো? হ্যাগা?

—ঐ যে মুচকন্দ ফুল, মুসব্বর আর মাদারের আটা আনতে। ফকুরে ব্যবস্থা।

—চলো।

ছোটোকানাই আগে আগে চলে। কাছাকাছি দোকান। মুসব্বর, মুচকুন্দ ফুল, মাদারের আটা কেনে কানাই। পয়সাটা বনমালী দিয়ে দেয়।

বন্ধুর গলা জড়িয়ে ধোরে ভেউ ভেউ কোরে কাঁদতে থাকে রাখাল। বলে :

—ও বন্ধু, আমি মরেচি। আমি আর বাঁচবো না। আমার উপায় কী হবে? ছাবাল-বৌ কী খেয়ে বাঁচবে? আমি কি সেরে উঠবো বন্ধু? আর কি হাঁটতে পারবো?

বনমালীও কাঁদতে থাকে। অভয় ছায় :

—ভয় কী বন্ধু? সেরে উঠবে তুমি। আবার হাটতে পারবে। কী হোয়েচে তোমার? সামান্য একটু ভেঙেচে বইতো না। আরো যদি গদার পা ভাঙা দেখতে বন্ধু। কুচি কুচি হোয়ে গেছিলো দুই উরুতের হাড়। সন্না দিয়ে খুটে-খুটে তুলতে হোয়েছিলো। তাই ভালো হোয়ে গেলো।

রাখালের শিয়রে বোসে বেদানা কাঁদে। তার বিশাল চোখের দুপাতা প্লাবিয়ে গণ্ডে ধারা নেমেচে। অঝোর ধারা। ভরসা এক মাত্তর রাখাল। সেই যদি পা ভেঙে পড়ে থাকে, কে বাঁচাবে ওদের? একদিনের খাবার মজুত নেই ঘরে। দিন আনা। দিন খাওয়া। বনমালী বুঝতে পারে বেদানার সিক্ত চোখের ভাষা শরণার্থী। ওই যদি বাঁচায় তবে এ পরিবার বাঁচতে পারে এ-যাত্রা। বেদানার চোখের জল ব্যথিয়ে তোলে বনমালীকে। মেয়েমানুষের মতন ঝর ঝর কোরে কেঁদে ফেলে সে। এবং বন্ধুকে উদ্দেশ কোরে বলে :

—ভয় কী বন্ধু। আমি বেঁচে থাকতে তোমাদের কোনো ভয় নেই। মোটেই আটকাবে না। বন্ধুকে একটু মিষ্টি খেতে দ্যাওতো। আর ভালো কোরে মাছ রান্না কর।

বোলতে বোলতে পদ্ম পাতায় বাঁধা সন্দেশের পুটলিটা এগিয়ে দেয় বেদানার হাতে। রাখাল আশ্বস্ত হয়।

বেদানারও বুকের একখানা ভারী পাথর নেমে যায়।

বনমালী গোরুর ব্যাপারী। পয়সাওয়ালা। ওর অনুকম্পায় এ-দুর্দিনে ওরা বেঁচে যেতে পারবে। স্বচ্ছন্দে সে চালিয়ে দিতে পারবে এ-সংসারটা স্বামী সেরে ওঠা পর্য্যন্ত।

মাস খানেক চলে গেছে। রাখাল এখোনো সেরে উঠতে পারেনি। ফকির

বোলচে, এখোনো মাস দেড়েকের কম হাঁটতে পারবে না। কচি হাড় হোলে তাড়াতাড়ি জুড়তো। পাকা হাড়। জুড়তে দেরী হবে।

বনমালী ব্যাপারী ঝাঁপার বাড়ি এক রকম ছেড়েই দিয়েচে। এখানে থেকেই হাটে যায়। গোরু কেনা-বেচা করে। বাড়ি থেকে ওর ছোটো ভাই মাঝে মাঝে আসে। খবর ছায়, বৌদির অসুখ। বাড়ি যেতে হবে। বনমালী বলে, বন্ধু না সেরে উঠলে, যাবার জো নেই।

বাড়ির ওপোর বরাবর বনমালী উদাসীন। বরাবর অর্থাৎ বিয়ের পর থেকে। এর কারণও আছে বৈকি। আর পাঁচজন ব্যাপারী মানুষের মতন বনমালী বরাবর একটু নেশা করে। এই সুযোগ নিয়ে মেয়েপক্ষের ঘটক ওকে মদ খাওয়ায়ে মোটা রকম টাকা খেয়ে এক কালো মেয়ে গতিয়ে দেয়। শুধু কালো না। বেতের মতন লিকলিকে শরীর তার। আর সে-শরীরে দেশের রাজ্যির রোগের বাতান। বনমালীর স্বাস্থ্য আছে, পয়সা আছে। সে কী কোরে এ-দাম্পত্য জীবন মেনে নেবে? তাই বাড়ির ঘেঁষাঘেষি থেকে সরে থাকে। হাটে-বাজারে গোরু কেনা-বেচা করে। হাটে-বাজারের মেয়েমানুষদের নিয়ে ফুরতি চালায়। দুধের লোভ ঘোলে মিটোয়। হঠাৎ রাখালের সাথে ওর বন্ধুত্ব হয়। বড়-বৌ বেদানাকে ছাখে। অনন্যা রূপসী এই বেদানা। তার রূপ বনমালীকে পোড়ায়। পোড়ায় পতঙ্গর মতন কোরে। তাই ধোপামাসীর শরণাপন্ন হয় সে। যদি এ-পোড় থেকে আপনাকে বাঁচাতে পারে। সরাসরি টোপ ফেলবার সাহস হয় না। ধোপামাসীকে দিয়ে গুণ করিয়ে নিয়ে প্রস্তাবটা বেদানার দিক থেকেই আনবার চেষ্টায় থাকে।

আগের চেয়ে সংসার ভালোই চোলচে রাখালের। এক থাকতে আর জোগায় বনমালী। বেদানাকে কোনোরকম তাপ পোহাতে দেয় না। যদিও নিজে সে খুব তাপিত। যে-বেদানার তাপ জুড়োতে সব সময় বনমালী হুঁশিয়ার, সেই বেদানাই তাকে তাপ দিয়ে পোড়াচ্চে বেশি কোরে।

সেদিন বনমালী গেছে মণিরামপুরের হাটে। গোরুও নিয়ে গেছে এক পাল। অনেক রাত হয়। তবু ফেরে না। রাখাল ব্যস্ত হোয়ে ওঠে। ব্যাপার কী? কোনো বিপদ ঘটল না তো? গোরুর ব্যাপারী। মেলা টাকা-পয়সা থাকে কাছে। গো-হাটা তো গুণ্ডা-পকেটমারের হাট। তারপর আছে দুরন্ত গোরু-মোষ। শিং দিয়ে গুঁতিয়ে দিতেও পারে। এমন ঘটনা তো হামেশাই ঘটে থাকে।

বেদানার মনেও ঠিক ঐ একই চিন্তার প্রতিফলন পড়ে। সে থেকে থেকে

মাদার তলায় যায়। যতোদূর চোখ চলে পথপানে তাকায়। কেউই আসে না। কেনো আসে না? এতো রাত কোনোদিন করে না তো। কী কোরচে এতো সময়? কোন্ সকালে নাকে-মুখে গুঁজে গেছে এক মুঠো পান্তা। এতো বড়ো একটা দিন চলে গেলো। চান নেই। খাওয়া নেই। এক পাল গোরু নিয়ে গেছে হাটে। গোরুতে ঢুঁসিয়ে মারলো না তো! পকেটমারে টাকা-পয়সা মেরে নিলো না তো! রাতে পথের মাঝখানে গুণ্ডায় ছুরি মেরে বোসলো না তো! মা রখ্যে কালি, রখ্যে কোরো মা!

রখ্যে কালিতলার দিকে চেয়ে দু'হাত জুড়ে মাথায় ঠেকায় বেদানা। ঐ লোকটাই তো এখোন এক মাত্তর ভরসা। টাকা দিয়ে, পয়সা দিয়ে, গতর দিয়ে সাহায্য কোরচে। কিন্তু কেনো? কোন্ লাভে? এতো যে দিচ্চে, কী পাচ্চে তার বিনিময়ে?

এমনি সব চিন্তায় পাথর হোয়ে আসে বেদানার বুকখানা। চোখ ছাপিয়ে যায় জলে। সে ঘরের মধ্যে গিয়ে শুয়ে পড়ে কাতরাতে থাকে।

—কী হোয়েচে বৌ? কাতরাচ্চো ক্যানো? অসুখ কোরেচে না কি? রাখাল জিগ্যেস করে।

—না। মাথা ধোরেচে। ভারী গলার স্বর লুকিয়ে উত্তর দিতে চেষ্টা করে বেদানা।

এরা জানে, কেবল জ্বর হোলেই অসুখ হয়। রাখাল আশ্বস্ত হয়।

—বন্ধু! ও বন্ধু!

—এসেচো বন্ধু, ওঃ! কী ভাবনায় ফেলেচো ভাই। এতো রাত কোরলে যে?

—যে রদ্দি মাল ভাই। আরো তাতে চালানী ব্যাপারী আসেনি। মানে, বনমালীর গোরু ছিলো পেরায় বুড়ো। হাড়-চামড়া সার। কোলকাতার ফড়ে না এলে, এ-সব মাল কাটতি হয় না।

—হাজরা কই? বনমালী জিগ্যেস করে।

—সে সতেদ্দের বাড়ি গেছে পড়তে।

—এখোনো ফেরেনি? এতো রাত পড়চে।

—না। ঘুমিয়ে পড়েচে।

—তার মা?

—ঘরে শুয়ে আছে। মাথা ধোরেচে।

ঘরের কোণায় মিট মিট কোরে মেটে টেমি জ্বলচে। বনমালী ঘরে ঢোকে।

বেদানার শিথেনে বোসে মাথায় হাত দেয়। জিগ্যেস করে :

—কী? মাথা ধোরেচে নাকি? ছাড়েনি?

বোলতে বোলতে মাথায় হাত দিয়ে ত্ব'পাশের রোয়াক টিপে ধরে। বেদানা বনমালীর হাতখানা টেনে নিয়ে চেপে ধরে ওর বুকের পরে।

দিন দশেক পরের কথা। ত্বপোর রাতে হঠাৎ রাখালের ঘুম ভেঙে যায়। বনমালী শোয় ওর শিয়রে। মানে, ত্ব-বন্ধু বাইরে দাওয়ায় থাকে। আর বেদানা ঘরে। হাজরা প্রায় রাত কাটায় ময়নাদের বাড়ি। ঘরের ভেতর থেকে ফিস্‌ফিসে কথাবার্তা শোনা যায়। রাখাল নিঃশব্দে ঘাড় উঁচু কোরে দেখে বনমালী বিছানায় নেই। পাথর হোয়ে যায় তার সর্বশরীর। নিঃসাড়ে আড়ষ্ট হোয়ে শুয়ে থাকে। আরো কিছুক্ষণ কাটে। খুট্ কোরে দরজায় শব্দ হয়। বনমালী বেরিয়ে আসে। বিছানায় বসে। হাই তোলে। কাশে। খচ্‌কোরে দিয়াশলাই জ্বেলে বিড়ি ধরায়।

—ও বন্ধু! ঘুমোচ্চো? রাখালকে ডাকে।

রাখাল আড়মোড়া দেয়। ঘুম থেকে ওঠার ভান করে। বলে, হুঁ।

—কী ঘুম তোমার! সারারাত আর মোটেই সাড়া ত্যাও না। হাজরার মা কি কম কাতরান্ কাতরাচ্ছিলো? মাথাধরা বেড়ে গেছে বেজায়। মাচান থেকে কুমড়োর পাতা তুলে এনে রস কোরে মাথায় দিয়ে দিলাম। খবর রাখো?

রাখালের বুক থেকে অনেকদিন ফুটে থাকা একটা পেরেক উঠে যায়। হালকা ঠেকে বুকখানা। বন্ধুর ওপোর ভুল ধারণার অপরাধে আপনাকে বারবার ধিক্কার ত্যায়।

রাখাল বলে, কই নাতো।

—বেশ মানুষ।

দিনের পর দিন গড়িয়ে চলে। রাখালও ভালোর দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। এখোন লাঠি ভর দিয়ে ত্ব-দশ পা হেঁটে বেড়ায়। তবে মনে হয় পা-খানা তার জন্মের মতো খুঁত হোয়ে যাবে। ভাঙা হাড় ঠিক মতন খাপে-খাপে লাগেনি। একখানা হাড়ের ওপোর আরেকখানা উঠে যায়। আর নোতুন মাংস সেটাকে জোড়াতালি দিয়ে দেয়। যার ফলে পা খানা খাটো হয়ে গেছে। লেঙ্‌চে-লেঙ্‌চে হাঁটতে হবে। রাখাল ভালোর দিকে যাওয়ার সাথে-সাথে বনমালী বেদানার মেলা-মেশার বাঁধন আলে উদার হোয়ে। রাখালের সামনেই হয়তো বনমালী বেদানার গায় ঠেস দিয়ে বোসলে। বেদানাও সে-ঘেঁষাঘেষিকে দিব্যি মেনে

নিলে। একটু সরে বসার চেষ্টাও কোরলে না। রাখালের পা-ভেঙে যাওয়ার পর বেদানা ওকে ভাত দিয়ে যায় ঘরের দাওয়ায়। আর বনমালীকে খেতে ছায় রান্নাঘরে। খেতে বোসে হাসি-ঠাট্টা। ভিট্-ভিট্ কোরে কথা কওয়া-কওয়ি। সে-কথা আর ফুরোয় না। কী যে এতো অফুরন্ত কথা ওদের রাখাল তা খুঁজে পায় না। বুঝে পায় না। খাওয়ার পর বনমালী আঁচাতে যায় চাদাড়ে। বেদানা পেছন পেছন যায়। সেখানে দাঁড়িয়ে আর এক দফা খাস্‌খুস্ কথা হয়। বেদানা ঘরে পান সাজে। বনমালী ঘরে ঢোকে। পাশে বসে। আবার শুরু হয় দুজনে মন্তর পড়া। পান চিবিয়ে মুখ লাল কোরে বনমালী বাইরে আসে। ও-ই এনে দেয় রাখালের পানটা। রাখাল এতে কিছু মনে করে না।

ঠিক তা নয়। মনে করে। মনের কোথায় কোন্ নিভৃত কোণে ধারালো একটা কাঁটা খচ্‌খচ্ কোরতে থাকে। তবু মনকে বোঝায় সে। বন্ধু বৌ-এর সাথে এ-টুকুন মেলা-মেশা সীমানা ডিঙোনো নয়।

বনমালী গেরামে গিয়েছিলো গোরুর খোঁজে। সেখান থেকে যখন ফিরল, বেলা তখোন দুটো বাজে-বাজে। দেখে দাওয়ায় রাখাল খেতে বোসেচে। তার সারা গায় ছাই উড়চে। চুলগুলো উশ্‌কো খুশ্‌কো। মুখখানা কেমন যেনো বিমর্ষ-করুণ। হঠাৎ তার পানে তাকিয়ে চমকে ওঠে বনমালী। কেমন যেনো বুড়িয়ে গেছে রাখাল। চিনে ওঠা দায়।

বনমালী জিগ্যেস করে ঃ

—অমন শুক্‌নো-মুক্‌নো দেখচি ক্যানো তোমায়? চান করোনি বন্ধু?

—না বন্ধু।

—ক্যানো?

—জল ছিলো না তাই।

তেলীর পুকুর ওদের বাড়ি থেকে কম্‌চে কম দশ মিনিটের রাস্তা। পা ভাঙার পর রাখাল আর ওখানে চান কোরতে যায় না।

বেদানা জল তুলে এনে ছায়।

চোটপাট কোরে ওঠে বনমালী, জল ছিলো না, তা হাজরার মা কী কোরছিলো? সে একটু জল এনে দিতে পারেনি? আশ্চর্য!

এই জল আনা নিয়ে রাখালের সাথে বেশ একটু বচসাও হোয়ে গেছে বেদানার। এই মোত্তর খানেক আগে। হয়তো বেদানার শরীরটে ভালো নেই। ঠিক বলা যায় না। যা হোক সে বোলেছিলো আজ আর পেরে উঠচিনে

জল আনতে! লাঠি ভর দিয়ে আস্তে আস্তে চ্যান্ কোরে এসো গে পুকুরতে। প্রত্যুত্তরে জবাব দিয়ে ছিলো রাখাল, কিন্তু ফকির যে মানা কোরেচে বৌ, এখোনো মাসখানেক না হাটতে। বেদানা বোলেছিলো, তবে চ্যান্ করা থাক। রাখাল আর কথা কাটাকাটি করেনি। কেবল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিলো মাত্তর।

স্বামী-স্ত্রীর এ বচসা রাখাল চেপে যায়। ওর বন্ধুকে বলে :

—শরীরটে বে-জুত ছিলো। তাই আনতে পারেনি। যাক্‌গে।

বনমালী রুখে ওঠে, বে-জুত ছিলো? কিসের বে-জুত? দশটা দশটা কুমুরে খেয়ে ফুরোতে পারে না যার গতর? হাজরার মা, বলি, কারে কামাচ্চিলে? এক কলসী জল আনার সময় হয়নি?

রাখাল দেখতে পায় না ঠিক এমন জায়গায় দাঁড়িয়ে বেদানা বনমালীর পানে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বলে :

—পেরে না উঠলে তো হয় না। ঝি রাখতে হয়।

তেতে ওঠে বনমালী, কী আস্‌ফলানির কথা! আমার মেয়েমানুষ হোলে এতো বেলা ছাগোল কেলান্ কেলিয়ে ফেলতাম।

বোলেই সে বন্ধুর পানে তাকায়। ছাখে রাখালের চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়চে। সে-জল ব্যথা দেয়। বনমালী বলে :

—অতো দাঁত ক্যালানো ভাল লাগে না সব সময়। দূর হও সামনে থেকে।

এবার বেদানার মুখে সত্যি-সত্যিই কালি ঢেলে পড়ে। এতো বেলা সে ভাবছিলো, বনমালী রসিকতা কোরচে ওর সাথে। কিন্তু এখোন তার ভুল ভাঙল। এ-রসিকতা রস অনুত্তীর্ণ রসিকতা। সে বনমালীর সামনে থেকে সরে যায়।

ঘরে ঢোকে বনমালী। পট্‌পট্ কোরে ফতুয়ার বোতাম খুলে সেটা আড়ে টাঙিয়ে রাখে। বেড়ার গায় ঝুলিয়ে রাখা বোতল থেকে তেল নিয়ে মাথায় ঘস্‌তে ঘস্‌তে গামছাটা কাঁধে ফেলে চোট পায় গাঙমুখো চলে যায়। যখোন বাড়ি ফেরে সন্ধ্যে উৎরে গেছে।

মাদার গাছের মাথায় চলেচে জোনাকী দলের বহ্যুৎসব।

উঠোনে পা দিয়ে শোনে ঘরের মধ্যে থেকে বেদানার অস্ফুট একঘেয়ে কাতরানির শব্দ।

—বন্ধু নাকি? রাখাল জিগ্যেস করে।

—হুঁ।

—কোথায় ছিলে এতোখান ?

—বাজারে।

—তা তুপোরবেলা খেলে না।

—তা না খেয়ে আছি নাকি ? কাতরায় কে ঘরে ?

—আর কে ? হাজরার মা।

—ক্যানো ? মাথা ধোরেচে। কোন্‌দেশী মাথা ধরা এ ?

কইতে কইতে ভেজানো দোর ঠেলে ঘরে ঢোকে বনমালী ! ক্যাচ্‌ কুচ্‌ শব্দ কোরে দোরটা আপনা আপনিই বন্ধ হোয়ে যায়।

শিথেনে বসে বনমালী। মাথা টিপে দেয় বেদানার। বেদানা বনমালীর হাতখানা টেনে নিয়ে তার উঁচু বুকের ওপোর রাখে। আজ আর কাপড়ের পরে নয়। কাপড়ের নীচেয়। আঙুলগুলো টাটিয়ে ওঠে বনমালীর। শক্ত-জোর মুঠোয় এঁটে ধরে বেদানার উঁচু বুক। এবং নিঃশব্দ চুমোয় জরো-জরো কোরে দেয় ওর গাল তুটো।

পরদিন। বেদানাকে কিছু না বোলেই তেল মেখে, লাঠি ভর দিয়ে ল্যাঙ্‌চাতে ল্যাঙ্‌চাতে রাখাল চান কোরতে যায় তেলীর পুকুরে। এটেল মাটির ঘাট। ওপোরে উঠতে পা পিছলে পড়ে যায় সে। ভাঙা পা খানায়ই জোর চোট লাগে। কোনোরকমে খোঁড়াতে খোঁড়াতে বাড়ি এসে শুয়ে পড়ে রাখাল। আবার নোতুন কোরে যাতনা বেড়ে যায়। ফকির বলে, মাস তুয়েকের মতন একদম চলা-ফেরা নিষেধ। বিছেনায় শুয়ে থাকতে হবে।

হাট থেকে বাড়ি এসে বনমালী সব শুনে বন্ধুকে খুব বকাবকি করে। বেদানাকেও গালি-গালাজ করে অশ্লীল-অশ্রাব্য ভাষায়। বারবার কোরে সাবধান কোরে দেয়, রাখালের পরিচর্যার যেনো কোনোরকম ত্রুটি না হয়। তা হোলে বেদানার কপালে বিস্তর তুঃখ আছে।

* * *

সাঁইপণ্ডিতকে ইস্কুল থেকে তাড়ানোর পর শুরু হয় বাড়ি থেকে তাড়ানোর পর্ব। এ-কাজে তারাপদ ভট্‌চাযিয় অগ্রণী নয়। ঘরভাঙার মাতব্বর জ্যাবল-ফুলবরন্না। যেহেতু ভট্‌চাযিয়মশাইকে দিয়ে অতোদূর নোংরা ঘাঁটানো যায় না।

সতীশকে পড়িয়ে রাত কোরেই রোজ বাড়ি ফেরেন সাঁইমশাই। তারপর খুপরীপানা রান্নাঘরে ঢোকেন। ও-বেলার রান্না করা ভাত তরকারী বেড়ে নিয়ে

খেয়ে নেন। তারপর দাওয়ায় এসে খাটে পাতা বিছেনায় শুয়ে পড়েন। সেদিন কেবল মাত্তর ভাত বেড়ে নিয়ে খেতে বোসেচেন সাঁইমশাই, এমনি সময় একটা মেটে ভাঁড় পাতকাটির বেড়ার ফাঁক দিয়ে দড়াম কোরে এসে পড়ে তার সামনে। ভাঁড়টা ভেঙে ছত্রখান হোয়ে যায়। ভাঁড় ভরত্তি ময়লা। ছিটকে পড়ে তাঁর পাতে —গায়। খাওয়া হয় না। পরদিনের ঘটনা। নিয়মমাফিক সময় বাড়ি ফেরেন সাঁইপণ্ডিত। দেখেন দোর গোড়ায় রাশিকৃত গোরুর চামড়া-নাড়ি-ভুঁড়ি পড়ে আছে। দিন দুই বাদে দেখেন বিছেনার পরে একটা গোরুর মাথা গড়াগড়ি যাচ্চে। কাঁচা রক্ত মাখা। দিনের পর দিন এমনি সব নোংরা ঘটনা ঘটতে থাকে। অতিষ্ঠ হোয়ে ওঠেন সাঁইপণ্ডিত। মন্নুঠাকুরকে জানান। ঠাকুরমশাই এসে দেখেন। বোঝেনও সবকিছু। কিন্তু প্রতিকারের রাস্তা কই? বলেন, তাঁর চণ্ডীমণ্ডপে বিস্তীর্ণ জায়গা পড়ে রয়েছে। অমন দশজন সাঁইপণ্ডিত স্বচ্ছন্দে থাকতে পারেন। তিনি ওখানে গিয়ে উঠুন। কিন্তু সাঁইমশাই আপত্তি করেন, যে-পাড়া গোরুর মাংস-চামড়া-নাড়ি-ভুঁড়ি-মাথা তাঁর বাড়ি আমদানী কোরচে, সরাসরি তিনি সে-পাড়ায়ই গিয়ে উঠবেন। ইস্কুল ঘরের পাশে আরেকখানা অতিরিক্ত চাল তোলা হয়। এবং তার তলায় গিয়ে মাথা গোঁজেন তিনি। কিন্তু এতেও ঘরভাঙারা চুপচাপ থাকে না। নানান রকম আঁচা-পাঁচা শুরু করে।

সীতে-পুটের মা রোজ সকালে ধান ভানতে যায় বাছাড়বাড়ি। যাওয়ার সময় সাঁইপণ্ডিতকে শোনায়ে শোনায়ে বলে :

—ভারি মজা হোলো এবার ময়না ছিনালের। কী বোলিস্ পুটের মা?

—মজা বোলতে। একেবারে দোর গোড়ায় এসে উঠলো নাঙ্। রাতদিন জোড়া দিয়ে পড়ে থাকবে।

—যা বোলেচিস্ তুই। তা নাঙ্ করে অনেকে। কিন্তু এমন কারেও দেখিনি। লজ্জা নেই। সরম নেই। একেবারে বাজারে ছিনাল।

পুটের মা টিপ্পনী কাটে :

—না রে। তাদের সরম আছে। অমন কোরে ধোরে খায় না তারা।

ফেরার পথে ইস্কুল ধারে এসে আবার শুরু করে :

—ইস্কুল করা না তো ব্যাটার। লুচ্চুমি করা। ঘরে মাগ নেই। ঢেমনী কেড়েচে মুচি পাড়ায় এসে। সুরপুরের শালোরা কি কানা? চোখে দেখতে পায় না! সাধে কয়, মুচির বুদ্ধি ক্যাদা।

পুটের মা উত্তর ত্যায় :

—তা পুষ্যি শালা দেখতে পায় না? ওর তো মা। চোখের গোড়ায় কীর্তি-কেলেংকারি করে?

সব কথা সাঁইপণ্ডিতের কানে আসে। বোঝেনও তিনি সব। চেনেনও ঐ সব বাজিকরদের। যারা যবনিকার আড়ালে থেকে ঐসব কাঠের পুতুলদের নাচাচ্চে। এদের শক্তি সামর্থর বহরও জানেন তিনি। তবু শায়েস্তা কোরবার জো নেই। তাঁর দশা আজ দানব ভয়ে পাতালে লুকোনো ইন্দ্ররাজের।

সীতে-পুটের মা-রাও ঢেঁকিশালে ধান ভানে। বাছাড়মশাই পায় পায় আসেন। সামনা সামনি বোসে পড়েন। বুড়বুড় কোরে হুঁকো টানেন। আর সংগ্রহ করেন খবর। সাঁইপণ্ডিত কোথায় থাকেন। কোথায় খান। ইস্কুল চলে কেমন। সুরপুরদের উৎসাহ দিন-দিন কমচে তো।

সীতে-পুটের মা-রাও বেশ ফলাও কোরে বাছাড়মশাই-এর সাথে বলে। অনেক সময় বাছাড়ের পছন্দসই জবাব দেয় সীতেরা। সত্যি-মিথ্যের দিকে খেয়াল না রেখে।

সেদিন পুটের মা ধান ভানচে। আর সীতে দিচ্চে "এলে"। এমন সময় হুঁকো টানতে টানতে আসেন বাছাড়মশাই।

জিগ্যেস করেন:

—কী সীতে, নোতুন খবর-টবর বল?

সীতে আঁচোল দিয়ে মুখের ঘাম মুছতে মুছতে বলে:

—মেলা খবর দাদা। মাষ্টের ব্যাটা হাঁড়ি-কাঠি কেড়েচে সত্যি। কিন্তু হাঁড়ি তো ঝুলোনো থাকে ইস্কুল ঘরের চালে। ব্যাটা খায় বলো ময়নার হাঁড়িতে।

—আর শোয় কোথায় সীতে?

সীতের থেকে উত্তর আসবার আগেই উত্তর ছায় পুটের মা:

—শোয় ময়নার কাছে।

বাছাড়মশাই-এর তামাকটানা থেমে যায়। বলেন:

—সত্যি নাকি সীতে?

সীতের চোখ আমড়ার আঁটির মতন হোয়ে ওঠে। বলে:

—মাইরি দাদা। পুটের মা, আমি দুজন আমরা চৌকি দিয়ে ধোরেচি। এ-রাতে ইস্কুলে শোয়। ভারি রাতে উঠে যায় ব্যাটা। ময়নামাগী আবার এসে ডেকে নিয়ে যায় কোনোদিন।

—তা তারণ-ভূতো মাতব্বররা কিছু কয় না? জিগ্যেস করেন, বাছাড়মশাই।

—কবে নে। মাতব্বর না তো। ওরা সব ভ্যাড়ার পাল, দাদা।

—তা পুন্যি? ওর তো মা। ও সয় কী কোরে?

—পুন্যি? ও-শালাও মাগীখোর কম নাকি? সৎমা-রে নিয়ে কম কীর্তি কেলেঙ্কা কোরেচে ও? দু-দুবার পেট ফেলেচে।

গাছ থেকে পড়েন বাছাড়মশাই।

—সে কী! ময়না এমন! আমি তো ভালো বোলেই জানতাম ওকে।

—ও মা—আ। ওর পেটের মধ্যি মাড়ির দাঁত। ছুঁলে মাছি কাটে। ওর জোড়া খানকী সুরপুরে আর আছে নাকি?

এক পাল্টা দেওয়া ধান ঝেড়ে লোটের মধ্যে রাখতে রাখতে সীতে বলে।

আস্তে আস্তে হুঁকো টানতে টানতে বাছাড়মশাই বলেন:

—বলি, ইস্কুলের কী তোদের? কেমন চোলচে?

সীতের ধান ঝাড়া থেমে যায়। বলে:

—ইস্কুল সিকেয় দাদা। ভূতো মাতব্বর, তারণ মাতব্বরদের রস কুড়িয়ে এসেচে।

ময়না-সাঁইপণ্ডিতে যে ছোঁয়া-খাওয়া গড়ে ওঠার সংবাদ সরবরাহ করে সীতে-পুটের মা, বাছাড়মশাই, তারাপদ ভট্চায্যি প্রমুখ মুরুব্বিদের মনে তা গভীর রেখাপাত করে। যেহেতু ছোঁয়া-ছুঁয়ির বাচ-বিচারের গালে ঠাস্ কোরে চড় মেরে, কান মলে ছেড়ে দিয়েচে যে লোকটা, তার চোখে ময়নার মতন সুন্দরী অছুৎ নারীকে ভালোবাসার রাস্তা রাজপথের মতনই খোলসা, সুন্দর, প্রশস্ত।

সীতে পুটের মা-রা যেমন বাছাড়বাড়ির ঢেঁকিশালে ধান-ভানার কাজে পাকাপাকি বহাল তেমনি পাকাপোক্ত নিয়োগপত্র পেয়েচে বাছাড়মশাই-এর খেতের কাজে ওদের পিরীতের মানুষরা—ভ্যাবল-ফুলবর।

সোনামুখীর বিলতলায় বাঁকুই-কারশাল ধানগাছরা এরই মধ্যে বেশ লম্বা এবং ডাগর গুছিওয়ালা হোয়ে উঠেচে। এ ধানের মার নেই আর। সতেরো-আঠারো হাত জল কাটিয়ে উঠতে পারবে এরা। এখোন চায় ঝরা ধানগাছগুলো এর মাঝে থেকে নিড়োয়ে দেয়া। সেদিন টোকা মাথায় দিয়ে বোসে তাই-ই কোরচে ওরা দুজন। আর বাছাড়মশাই ছাতা-মুড়ি দিয়ে আলের পরে বোসে গল্প করেন। আর মাঝে মাঝে হুঁশিয়ার কোরে দেন ভ্যাবলদের, লালডাঁটা-ওয়ালা ঝরা ধানগাছগুলো আর ঐ পায়রা-কাঁটা ঘাস যেনো মোটেই না এড়ায়।

ভ্যাবল মাতব্বরী চালে বলে :

—সে তোমায় বোলতে হবে না বড়দা। পায়রাকাঁটার মতন ছ্যাচড়া ঘাস আর নেই। ধানের ইজ্জৎ মারা ঘাস ওরা।

মাতব্বরের ওপোর মাতব্বরী করে ফুলবর :

—তুমি ছাড়ান্ দিতে পারো মাতব্বর। ছ্যাচড়া ঘাস থাকে তো "বাঘঝামা"। বাঘের মতন হামাগুড়ি দিয়ে ছাতা মেলে ভুঁই ঢেকে ফেলে একদম। ধানের কাটি হোতে দ্যায় না।

মেজাজ তেরিয়া হোয়ে ওঠে ভ্যাবলের। বলে :

—তা না দিক। কিন্তু ধানের খেতি কী কোরবে ওরা? বাঘঝামা তো উচো ঘাস না। গড়িয়ে চলে। ধানের ভুঁয়ে চার-ছ' আঙুল জল বাধলেই ব্যস্। মরে সাফ। আর পায়রাকাঁটা? ওতো ধানের সাথে পাল্লা দিয়ে বেড়ে ওঠে।

ভ্যাবলের মনে আবেগ ছিলো আরো। কিন্তু বাছাড়মাশাই বাধা দেন :

—ভুল হোচ্ছে তোমাদের। বুঝলে ভ্যাবল-ফুলবর? ঝরাধানের চেয়ে ছ্যাচড়া কেউ না। জাতের শত্তুর জাত। ঝরা ধানের ছোঁয়ায় ধানরা বাড়তে পায় না। নিজেদের চিনতে দেয় না। চাষীদের দিয়ে ধানকে মেরে আপনারা বাঁচে। বুঝলে? হাসতে থাকেন বাছাড়মশাই।

নিংড়িন উঁচু কোরে ধোরে ভ্যাবল-ফুলবর তাকায় বাছাড়ের পানে। বলে :

—ঠিক কয়েচো বড়দা।

মাথা ঝাঁকাতে থাকেন বাছাড়মাশাই। তারপর অন্য প্রসঙ্গে চলে যান :

—বলি, ও ভ্যাবল, তোমরা "ক্যাঙ্গাল" জিইয়ে রাখচো ক্যানো? যা হয় একটা ফয়সালা কোরে ফ্যালো।

ঠিক ধোরতে পারে না বাছাড়মশাই-এর কথা কি ভ্যাবল কি ফুলবর। ভ্যাবল বলে :

—ইস্কুল বড়দা? তা ও আর আমরা……

বাছাড়মশাই বাধা দেন :

—না, না। ইস্কুল না। ও ঠিক হোচ্ছে। আমি বোলচি হোতে পারো তোমরা মুচি। তোমাদের আমরা ছুঁইনে। দৈবাৎ ছুঁলে চান কোরি। তাই বোলে মান-মর্যেদা সবার আছে। হোক না উচো জাত। তাই বোলে তোমার ঘরের একটা মেয়েমানুষ নিয়ে অমন কেল্লা কোরবে! আর তোমরা তাই

বোসে-বোসে দেখবে! ছি! ছি!

—তা আমরা কী কোরবো, বড়দা? ভ্যাবল বলে।

চটে ওঠেন বাছাড়মশাই, আমরা কী কোরবো? মাতব্বর না তোমরা? না আলাদা পাড়া? আরে এক হনুমানের মুখ পুড়লে সব হনুমানের মুখ পোড়ে। যাও, তারণ-ভূতো-যোগিন্দ্রেশ্বরদের চেপে ধরো গে। সাঁইপণ্ডিতের সাথে ময়নার বিয়ে দিক। ল্যাটা চুকে যাক।

বাছাড়ের এ মন্তব্যে কি ভ্যাবল কি ফুলবর দুজনেরি অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে। কেননা ময়না সম্পর্কে সীতে পুটের মারা সাঁইপণ্ডিতের গায় যে কালি ছিটোচ্চে তা স্রেফ্ নির্জলা অপপ্রচার। এর ওপোর ভিৎ গেড়ে একটা হৈ-হট্টগোল করা ভ্যাবল কি ফুলবরের বিবেক বাধচে। তবু ওরা বাছাড়ের অনুগৃহীত। পিরীতির মানুষ সীতে-পুটের মার বরাদ্দ চাল-খুদকুঁড়োর পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়েছেন বাছাড়মশাই। ওদেরো আগাম মজুরি দিয়ে ঠেকাচ্চেন। সুতরাং মতের বৈপরীত্য থাকলেও বিবেককে বিক্রি কোরতে হয় ওদের। মানে ওরাও সায় দেয় বাছাড়ের মন্তব্যে।

এরপর একদিন কেশবপুরের হাটে যেতে যেতে বাছাড়ের সাথে তারণ-ভূতোদের দেখা। ভূতোর মাথায় চামড়ার বস্তা। আর তারণ নিয়ে চলেচে ঝুড়ি। হাটে বেচবে। চোট পায় চলেচে তাই। বাছাড়মশাই বলেন:

—ওরে, ও তারণ, শোনো তো। একটু আস্তে হাঁটো ভূতো।

—দেরি হোয়ে গেছে বড়দা। এরপর ফড়ে ধোরতে পারবো না। ভূতো বলে।

—আচ্ছা ধোরোখন। একটা কথা শোনো। বলি, ইস্কুল কোরচো ভালো কথা। তাই বোলে মেয়েমানুষের ইজ্জোত বিলোতে হবে! এ ক্যামন কথা? মুচি বোলে একেবারে পচে গিয়েচো তোমরা!

অবাক বনে যায় তারণ-ভূতো।

—ক্যানো বড়দা? তারণ জিগ্যেস করে।

—ক্যানো বড়দা? একেবারে আকাশ থেকে পড়লে দেখচি। বোঝোনা কিছু? তোমরা কি ধানের ভাত খাও না! বলি, ময়নাকে নিয়ে মাস্টারের অতো কিলিকিচি ক্যানো? নিকে দিয়ে দাও। চুকে যাক ঝামেলা। তোমাদের খাবে। থাকবে তোমাদের পাড়ায়। আর শোবে তোমাদের মেয়েমানুষ নিয়ে! হোক উঁচো জাত। কিন্তু মুচিপাড়ার মেয়েমানুষরা কি বাজারে বেশ্যে? উঁচো

জাত হোলেই দোর খুলে দেবে!

বাছাড়মশাই-এর এ মন্তব্যে পায়ের নখ থেকে মাথার চুল অবধি রি-রি কোরে জলে ওঠে ভূতোর। তবু সে সামলে নেয় আপনাকে। বলে :

—ও-সব হাটে-ঘাটের কথা না বড়দা। হাঁটি। আমার দেরি হোয়ে যাচ্চে।

চোট পায় চলে যায় ভূতো-তারণরা। ক্ষুব্ধ হন বাছাড়মশাই।

দিন তুই বাদে একদিন সন্ধ্যের পর পুন্ন্যদের বাড়ি হৈ-চৈ শোনা যায়। মনে হয় ডাকাত পড়েচে বুঝি। হাটের লোক ছুটে আসে। যোগিশ্বর-তারণ-ভূতোরাও হাজির। ঘরভাঙার লোকজনও কিছু কিছু। তার মধ্যে তুই মোড়ল ভ্যাবল-ফুলবরও আছে। কিন্তু ব্যাপার কী? উঠোনের মাঝখানে ময়না বোসে। ফোঁপায়ে ফোঁপায়ে কাঁদচে। গা-ভরা তার ধুলো। এলোমেলো উশকো-খুশকো চুল। তু-গালে থামচানির দাগ। ছেঁড়া-ছুটো কাপড়। মনে হয় রীতিমতো অত্যেচার হোয়েচে ওর ওপোর।

যোগিশ্বর-তারণদের দেখে পুন্ন্য শাসাতে থাকে :

—ও-সব মোড়ল-মাতব্বর কেয়ার কোরি নে। তোর মতন সৎ-মা ঠ্যাঙালে কী হয়? শালী! ঠ্যাঙ্ ধোরে চিরে ফেলবো তোর। স্লুনি মাটো কোরে দেবো।

পুন্ন্য রুখে উঠে মারতে যায়। ময়না চমকে ওঠে।

ভ্যাবল উঠে গিয়ে ঠেকায়, থাক, থাক। এই পুন্ন্য।

ময়না ককিয়ে কেঁদে ওঠে এবার, ওরে আমারে মেরে ফেলুক, ওরে আমারে মেরে ফেলুক। খেয়ে ফেলুক আমারে। ভারি দরদ দেখাচ্চো এখোন। তুমিই তো মার খাওয়ালে মাতব্বর। ভ্যাবলকে লক্ষ্য কোরে ময়না বোলতে থাকে।

কি যোগিশ্বর কি তারণ-ভূতো একদম কাট হোয়ে গেছে। এ ঘটনার বিন্দু বিসর্গ কিছুই জানে না এরা। কী দোষ ময়নার। পুন্ন্য তাকে কেনই বা মেরেচে। ঘরভাঙার মাতব্বররাই বা পুন্ন্যর বাড়ি কেনো এসেচে। এসবই যেনো স্বপ্ন দেখার মতন ঠেকচে ওদের কাছে।

কিন্তু যখোনি শোনে ময়না কেঁদে-কেঁদে বোলচে, তুমিই তো মার খাওয়ালে মাতব্বর। তখোনি ব্যাপারটা একদম জল হোয়ে যায়। বোঝে, ভ্যাবলই এক মাত্তর কারণ পুন্ন্যকে দিয়ে ওকে মার খাওয়ানোর। আর এ ইন্ধনই বা কে

যোগালে ভ্যাবলদের? সেদিন হাটের পথে সাঁইপণ্ডিত ময়না সম্পর্কে যে-অশ্লীল মন্তব্য কোরেছিলেন বাছাড়মশাই, এ তারি প্রতিক্রিয়া।

শশীর মুখে সংবাদ পেয়ে মনুঠাকুর একরকম ছুটেই আসেন। আর মনুঠাকুরকে দেখতে পেয়ে পায়-পায় সাঁইপণ্ডিতও এগিয়ে আসেন পুন্ন্যদের বাড়ি। তিনি সতীশকে পড়াতে এসেছিলেন। পুন্ন্য যখোন ময়নাকে মারতে মারতে হিচ্‌ড়াটানা কোরে দাওয়া থেকে নামিয়ে নিয়ে যায়, তখোন তিনি সতীশকে অঙ্ক কষাচ্চেন। পারুন না পারুন অন্ততঃ ঠেকাবার চেষ্টাও কোরতে পারতেন তিনি। তিনি কিন্তু অনড়ই রইলেন। ঠিক পাঞ্চালীর ওপোর বলাৎকার চালানো কৌরবসভায় পঞ্চপাণ্ডবের মতনই অনড়। পুন্ন্যর হিংস্র মূর্তি সত্যিই তাঁকে ভড়কে দিয়েছিলো। মায়ের ওপোর যে এমন অত্যেচার চালাতে পারে, সে যে সাঁই-পণ্ডিতকে টুকরো টুকরো কোরে ছিঁড়ে ফেলবে না তার প্রমাণ কোথায়? উঠোনের মাঝখানে বোসে ময়না তখোনো ফোঁপায়ে ফোঁপায়ে কাঁদচে। তার ক্ষত-বিক্ষত গালের দু-পাশ বেয়ে ঝির ঝির কোরে রক্ত ঝরচে। ছেঁড়া কাপড়ের ফাঁক দিয়ে উঁকি মারচে আপত্তিকর দেহাবয়ব।

এক উঠোন লোকের সামনে একটা মেয়েছেলেকে এভাবে দেখে ধৈর্য হারান মনুঠাকুর। চটে ওঠেন:

—এসব কাণ্ড-কারখানা কী?

—কী জানি বট্‌ঠাকুর? ভ্যাবল উত্তর দ্যায়।

—না, তুমি কিছু জানো না। পুন্ন্যর কানে মন্তর দিয়ে তুমিই তো মার খাওয়ালে আমাকে। আর তুমি কিছু জানো না। বুক ছেড়ে কেঁদে উঠে বলে ময়না।

ছোটোকানাই কেশবপুর গিয়েছিলো। এই মোত্তর সে এসে দাঁড়িয়েচে মনুঠাকুরের ধারে। এ ব্যাপারের আনুপূর্বিক খেই সে খুঁজে পায়নি এ পর্যন্ত। এখোন ময়নার মুখে শুনে চোঁ কোরে রক্ত মাথায় ওঠে তার। সে বাঘের মতন ঝাঁপিয়ে গিয়ে পড়ে ভ্যাবল মাতব্বরের ঘাড়ে। তার লম্বা চুল ধোরে হিড় হিড় কোরে নামিয়ে আনে উঠোনে। তারপর দমাদম কিল আর ঘুষি। বেগতিক দেখে ফুলবর ছুটে আসে একখান জিউলির ডাল ভেঙে নিয়ে। এবং বাগিয়ে ধরে ছোটোকানাই-এর মাথার ওপোর। তিড়িং কোরে লাফিয়ে উঠে ছোটোকানাই বাজ-মুঠোয় এটে ধরে ফুলবরের কব্জী। হ্যাচ্‌কা টান দিয়ে কেড়ে নেয় তার হাতের লাঠি। হুংকার দিয়ে ওঠে:

—শালো! তোর লাঠিতে তোকেই নিকেষ কোরবো।

দমাদম ফুলবরের পিঠে লাঠি পড়তে থাকে। এদিকে ছাড়া পেয়ে ভ্যাবল মাতব্বর তো পগার পার! ফুলবরকে ঠ্যাঙাতে-ঠ্যাঙাতে সোঁতার ধার পর্যন্ত খেদিয়ে দিয়ে ফিরে আসে ছোটোকানাই। এ-ফাঁকে ঘরভাঙারা একপাল বুনো শিয়েলের মতন এদিক-ওদিক ছুটে পালায়।

এবার পুন্ন্যর পালা। কাণ্ড-কারখানা দেখে পুন্ন্য আগের ভাগেই ঘরের মধ্যে ঢুকে গিয়েছিলো। এক ঠেলা দিয়ে ঝাঁপের দোর উল্টে ফেলে ছোটোকানাই। ঠ্যাঙ্ ধোরে উঠোনে টেনে আনে পুন্ন্যকে। যেমন কোরে ময়নাকে এনেছিলো ও।

—শালো, তুই না একদিন আমার খুড়ীর জাত মারতে গিয়েছিলি। আজ আবার তার গায় হাত তুলিস্! লাথি মেরে যমের বাড়ি ঠেলে দেবো তোরে।

সাথে-সাথে দম্ কোরে লাঠি পড়ে যায় পুন্ন্যর পিটে। উপুড় হোয়ে শুয়ে পড়ে পুন্ন্য। হুঙ্কার দিয়ে ওঠে কানাই :

—জ্যান্ত গোরু ছোলা ছুল্‌বো তোরে। কই? আমার হোগোল পাত ছুরি কই? জবাফুলের মতন লাল চোখ। ফালুক-ফুলুক কোরে তাকাতে থাকে ছোটোকানাই। সত্যিই ওর ঘাড়ে খুন চেপে বোসেচে। ভূতো-তারণ কেউই সাহস কোরচে না ওর ধারে যেতে।

মহুঠাকুর এগিয়ে যান। হাত চেপে ধরেন ওর।

—এই ছোটোকানাই, ঠাণ্ডা হ। জল আনাতো এক ঘটি।

বেদানা দাঁড়িয়ে ছিলো ময়নার ধারে ধারে। তাড়াতাড়ি জল আনে। ছোটো-কানাই-এর চোখে-মুখে-মাথায় ঝাপ্‌টা দিয়ে দেয়।

—ওঠো খুড়ী। ময়নার হাত ধোরে বাড়ি নিয়ে যায় ছোটোকানাই।

আশ্চর্য হিম্মত ছোটোকানাই-এর। সেদিন এক উঠোন লোকদের একদম পুতুল বানিয়ে দিয়ে কী কাণ্ডটা-ই না কোরে বোসলে ও! একটা টু শব্দ পর্যন্ত কোরতে পারলে না মোড়ল-মাতব্বররা। কিন্তু এখানেই কি দাঁড়ি পড়ল এ ঘটনার! না। মোটেই না। কেনো না ভ্যাবল-ফুলবর মাতব্বরদের মারা মানেই তো বাছাড়মশাইদের মারা। এ-গণ্ডগোলের উৎস বয়ে আসচে যে-মহল থেকে।

ভ্যাবল-ফুলবররা বাছাড়বাড়ি গিয়ে ঘটনাটা খুব ফলাও কোরে শোনায়। তারণ-ভূতো-মাতব্বররা ঠিক সক্রিয় অংশগ্রহণ না কোরলেও ছোটোকানাই এবং

ঐ-কচ্ছমের কতকগুলো ষণ্ডা-গোণ্ডা লেলিয়ে দিয়েই ঠেঙিয়েচে ওদের। এমনকি শিশুরাও রেহাই পায়নি।

তারাপদ ভট্‌চায্যিও তখোন হাজির ছিলেন বাছাড়বাড়ি। তিনি টিপ্পনী কাটেন:

—তোমরা নাকি মাতব্বর! দুর্বোঘাসে গলায় দড়ি দিয়ে মরগে। ছোটো-কানাই-এর হাতে মার খেলে শেষটা! ও হিরু, শুনচো?

—শুনচি তো ভট্‌চায্যিমশাই। তা ওরা যে গোরু। যতো বেলা চুঁসোচুঁসি, ততো বেলা রাগ। তারপর চাটাচাটি। বোললাম, দশটাকা নজর দিয়ে বাবুর বাড়ি নালিশ কোরে আয়। পেয়াদা দিয়ে বেঁধে নিয়ে যেয়ে উত্তম-মধ্যম প্যাদানি দিক। ধুলো-ধুলো হোয়ে যাক মাতব্বরের দল। তা আজ তিন-চারটে দিনের মধ্যে—আর জুটলোই না দশটা টাকা।

ভ্যাবল বলে, তা আপনি দিয়ে দ্যাও বড়দা। খেটে-খুটে শোধ কোরে দেবো আমরা।

—তোমার দেনা আমরা রাখবো না বড়দা। ফুলবরও সুর মিলোয় ভ্যাবলের সুরে।

কথা হোচ্চিলো উত্তরের ঘরের দাওয়ায় বোসে। আর ভ্যাবল-ফুলবররা নীচেয় দাঁড়িয়েছিলো দাওয়া ঘেঁষে। এমন সময় বাছাড়-মশাই-এর শালী আসেন। এক-পিট চুল দুলিয়ে তার হাতে এক প্লেট আম আর জল এক গেলাশ।

হঠাৎ থেমে যায় তার গতি, বলি ভ্যাব্‌লা, কী বে-আক্কেল তোদের! রোজ-রোজ বোলতে হবে ক্যানো?

বাছাড়মশাই বাধা দেন, থাক, থাক। এই যে ভ্যাবল, ফুলবর, একটু সরে দাঁড়াও চালের তলা থেকে। ভট্‌চায্যিমশাই-এর জলখাবার।

সন্ত্রস্ত ভ্যাবল-ফুলবররা সরে দাঁড়ায় উঠোনের মাঝখানে।

—যতো মুচি-হাড়ি নিয়ে হোয়েচে তোমার কারবার। ক্যানো? চণ্ডীমণ্ডপ রয়েছে। ওখানে যেতে কী হয়? খান্ ভট্‌চায্যিমশাই। ফুরোনো আম। সেবা করুন। আমের প্লেট-গেলাশ এগিয়ে দেন ভট্‌চায্যির দিকে।

ভ্যাবল-ফুলবর আর এ-ধারে এগিয়ে আসে না। উঠোনের মাঝখানেই বোসে পড়ে।

—ও ভ্যাবল, টাকা নাও তা হোলে। বলি, আমার কি যেতে হবে? না তোমরা পারবে?

—আপনি একটু চলো, বড়দা। আমরা কি……।

বাছাড়মশাইও তাই চান। জামা গায় দিয়ে ভ্যাবল-ফুলবরদের সাথে কোরে সরকারবাড়ি যাত্রা করেন। সরকারমশাই গাঁতিদার। বাঁশ চেয়ে কঞ্চি টন্‌কো। তেমনি তাঁর নায়েব ক্ষুদিরাম বোস মশাই। বোসমশায়ের সাথে বাছাড়মশায়ের দহরম-মহরম খুব। তিনি গিয়ে বেশ দস্তুর মতন পাম্প দিয়ে আসেন। যেনো মাতব্বরগুলো শিকলি গাঁথা গেঁথে কাছারি আনান তিনি। এবং পেয়াদা দিয়ে খাল তুলে নেন। যে-কথা সেই কাজ। হনুমন্ত সিং, লছমন তেওয়ারি দলবল নিয়ে ছোটে মুচিপাড়ায়। এবং মাতব্বর-অমাতব্বরদের চালানী গোরুর মতন দাওন গাঁথা গেঁথে আনে গাঁতিদার বাড়ি। আহ্নিক সেরে, গীতা পাঠ অন্তে প্রাতরাশ ভোজন। তারপর সদর কাছারি আসেন নায়েবমশাই। এবং তেওয়ারিকে হুকুম দেন, লাগাও হরদম।

বাঘের মতন ঝাঁপিয়ে পড়ে হনুমান-লছমন সদল বলে। বুড়ো যোগিশ্বরও রেহাই পায় না। ছোটোকানাইকে তো একদম ধুলোয় শোয়ায়ে দেওয়া হয়। মাতব্বররা গা'র ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে বাড়ি যায় সব। ছোটোকানাইকে ঘাড়ে কোরে বাড়ি রেখে আসে বরকন্দাজরা। নায়েব কড়া হুকুম দিয়ে দেন, তিন দিনের মধ্যে প্রত্যেকে একশো কোরে টাকা যেন জরিমানা দিয়ে যায় কাছারি এসে। অন্যথায় মার-জরিমানা দুয়েরি মাত্রা যাবে বেড়ে।

এককালীন একশো টাকা যোগাড় করা মুচিপাড়ার কারো সংগতি নেই। কি মাতব্বর কি অমাতব্বর। ছাগোল-গোরু মায় সামান্য যা-ই কিছু ঘটি-বাটি ছিলো বিকোতে হয়। তবু সংকুলন হয় না টাকার। মন্নুঠাকুর ভরসা। কোনো রকমে টাকাটা গুছিয়ে দেন তিনি। এতে সত্যিই তাঁর বুকে মাটি ঠেকে যায়।

সর্বস্বান্ত হোয়ে বেজায় মুসড়ে পড়ে এ-পাড়া। কি যোগিশ্বর কি ভুতো-তারণ সবাই দেখে ইস্কুলই ওদের কাল। ওদের ছেলেদের চোখ ফুটোতে গিয়ে অন্ধ হোয়ে পড়ল ওরা।

ইস্কুল সম্পর্কীয় উৎসাহ-অনুপ্রেরণা হারিয়ে ফেলে। কুসংস্কারের বশবর্তীতা মাথা চাড়া দিয়ে উঁকি মারতে থাকে। লেখাপড়া ওদের বংশে সইবে না। ওরা নোংরা ঘাঁটে। নোংরা খায়। এই অছিলা মা সরস্বতীর ঘাড়ে তুলে দেয় অকৃপণ দোষের বোঝা। ভুলে ফেলে, কানাই ঢুলি, তুষ্টু ঢাকীর কথা। শানাইয়া পূর্ব-পুরুষদের কীর্তিকাহিনী। যাদের সাধনায় সুর-শিল্পের অজস্র আশীষ ধারা উজোড় কোরে কণ্ঠে ঢেলে দিয়েছিলেন ভারতী।

ছিরু বাছাড়-তারাপদ ভট্টাচায্যি আহ্লাদে আটখানা। ক্ষেতের ধারে বোসে বাছাড়মশাই বলেন :

—বুঝলে ভ্যাবল, শিরদাড়া ভেঙে দিয়েচি তোমার সুরপুরের মাতব্বরদের। আর উঠতে হবে না এ-জন্মে। বলি, তারণ-ভূতোরা কী বলে?

—কথা কয় না। দেখলে, ঘাড়-গুঁজে গোঁজ-গোঁজ কোরে চলে যায়। আর আড়চোখে তাকায়। ভ্যাবল বলে।

—আর ছোটোকানাই?

—সে তো রক্ত হেগে মরচে। বিছেন ধরা হোয়ে গেছে, বড়দা। শালোর যা "ত্যালানি" হোয়ে ছিলো না!

—এখন বাকি সাঁইপণ্ডিত। দেখা যাক্। বাছাড়মশাই বলেন।

সেদিনকের মারধোরের পর থেকে সাঁইপণ্ডিত আর ময়নাদের বাড়ি যান না। সতীশ রাতে ইস্কুল ঘরে এসে পড়ে যায়। সারাদিন খাটা-খাটনির পর এ-পাড়ার মাতব্বর-অমাতব্বররা সবাই এসে সাঁইপণ্ডিতকে ঘিরে বোসতো। দেশ-বিদেশের খবর শুনতো। শুনতো রামায়ণ-মহাভারতের কথা-কাহিনী। কোনো কোনো দিন বা সাঁইমশাইও শ্রোতা হোতেন। মুচিদের সামাজিক আচার-ব্যবহারের কথা। বড়ো ভেগেদের সাথে ছোটো ভেগেদের চিরচলিত দ্বন্দ্ব-রেষারেষির কথা। ছোটো ভেগেদের সাথে বড়ো ভেগেদের বৈবাহিক আত্মীয়তা তো নেই-ই। এমনকি সামাজিকভাবে খানা-পিনাও নিষিদ্ধ। যোগিন্দ্র বুড়োই ছিলো প্রধান কথক। সাঁইপণ্ডিত লক্ষ্য করতেন, ছোটো ভেগে হোলেও যোগিন্দ্র সব সময় আপন সমাজের আভিজাত্য বজায় রেখে কথা বোলতো। এবং কৌলিন্যর দিক থেকে এদেরি দাবী অগ্রণী। আর ওরা গায়ের জোরে ব[illegible]"এইটেই প্রমাণ করতে চায়তো সাঁইপণ্ডিতের কাছে। তিনি প্রতিবাদ করতেন না। কেনো না তাঁর জানা আছে মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। আপনার বংশ-মর্যাদাকে উঁচুতে তুলে ধরা। যদিও এ উঁচু-নীচু সম্পর্কে তাঁর ব্যক্তিগত মত ছিলো ভিত্তিহীন। যাহোক পূর্বোক্ত ঘটনার পর মাতব্বর কি অ-মাতব্বর কেউই বড়ো একটা আসে না। ইস্কুল সম্পর্কেও সবাই দিয়েচে ঢিলটান। সাঁইপণ্ডিত নিরুপায়। এখন কী আর করবেন তিনি? ইস্কুল টিম্-টিম্ করে চলতে থাকে।

কিন্তু এর ফাঁকে এমনই এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটে যায় যার ফলে মুচিপাড়ার "রেনেসাঁসের" ঘটে অপমৃত্যু অনেক দিনের মতন। সেদিন হাটবার। বেচা-কেনা করে ফিরতে বেশ রাত হোয়েচে। খেয়ে-দেয়ে শুতে আরো রাত।

প্রত্যেক হাটবারেই অবিশ্যি এমনটা হয়। গভীর রাত। সারা মুচিপাড়াটা গাঢ় ঘুমে অচেতন। এক মাত্তর হেঁপো রোগী যোগিশ্বর ছাড়া। সে বুকে বালিশ চেপে চোখ বুজিয়ে হাঁপ টানচে। সহসা তার চোখে পড়ে তীব্র আলোর শিখা। আকাশে গিয়ে ঠেকেচে তার জ্যোতি। উঠোনে নেমে আসে যোগিশ্বর। ছাখে, ইস্কুল ঘরে আগুন লেগেচে। চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটে যায় সে ভুতোদের বাড়ি। হৈ-হুল্লোড়ে পাড়া জেগে ওঠে। ছুটে যায় ইস্কুলমুখো। মট্‌কা ধরে জ্বলন্ত চাল খসে পড়চে। বাঁশের বেড়া ভস্মীভূত। কিন্তু সাঁইপণ্ডিত কোথায়? বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করা। এ-দরজাটা সাঁইমশাই-ই বাড়ি থেকে খুলে এনে ইস্কুল ঘরে লাগিয়ে দেন।

—পণ্ডিতমশাই! পণ্ডিতমশাই! পরিত্রাহি ডাকতে থাকে তারণ। কিন্তু সে ডাকে আগুনের হুস হুস শব্দ ছাড়া আর কেউ উত্তর দেয় না। ভুতো ছুটে গিয়ে একটা ভিজে বস্তা গায় জড়িয়ে আসে। এবং ঘরে ঢুকে সংজ্ঞাশূন্য সাঁইপণ্ডিতকে বার করে আনে। তাঁর সারা গা ঝলসে সেদ্ধ হয়ে গেছে। ছিটকে বেরিয়ে গেছে ডান চোখের মণিটা। নাক-মুখের মাংস খসে খসে ঝুলে পড়েচে। সুন্দর মুখখানার পানে তাকানো যায় না! কে সনাক্ত করবে ইনিই সেই সাঁইপণ্ডিত?

পরদিন বারোটার সময় শববাহক তারণ-ভুতো-ছোটোকানাইরা শহীদ সাঁইপণ্ডিতকে নিয়ে চলে। নিয়ে চলে মুচিদের শ্মশানে। উচুবর্ণের শ্মশানমাটি স্পর্শ করবার অধিকার নেই অছুৎদের। মেটে কলসি-সরা নিয়ে শবানুগমন করেন মনুঠাকুর।

নুরপুরের সারা মুচি পাড়াটার কেমন এক থমথমে ভাব। ক্ষীয়মান মন। এ-ভাবের ঢেউ ও-পাড়ার অন্তরও স্পর্শ কোরেচে। কোনো পাড়ারই অ-হিতৈষী ছিলেন না সাঁইপণ্ডিত। তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। একথা ভ্যাবল বুঝেছিলো। তাই বাছাড়মশাইদের প্রস্তাবে ইস্কুল ঘরে আগুন দিতে সে রাজি হয়নি। মাত্তর এক বস্তা ধান ঘুষ খেয়ে ফুলবর আগুন দিয়েছিলো। বিবেক তাকে দংশন করেছিল ঠিকই। কিন্তু ঠেকাতে পারেনি।

জীবনের রুদ্ধ স্রোত আবার বইতে শুরু করে। শোকের টোপাগুাওলা মৃদু-মন্দ গতিতে ভেসে যেতে থাকে। এবং জমা হতে থাকে মাত্তর একখানা বাঁকে। সে বাঁক ময়নার মন। সেখানে আরেক বার নোতুন করে কানাই ঢুলির শোক বেজে ওঠে। বেজে ওঠে শানাইয়ের করুণ সুরের মতন বিসর্জনের বাজনা।

*   *   *   *

সামান্য কয়েকদিন মাত্তর রাখাল উঠে হেঁটে বেড়াচ্ছে। তবু বনমালী তাকে বার বার করে নিষেধ করে দিয়েচে, সে যেন এখনো বেশ কিছুদিন হাট করতে না যায়। মানে দূরপাল্লার রাস্তায় না চলা-ফেরা করে।

বেদানার সাথে বনমালীর পিরীত জমে ওঠার সাথে সাথে বন্ধুত্বর চুড়ো বরফ-চুড়োর মতনই গলে পড়বার কথা। এখানকার ব্যাপারটা কিন্তু দেখা যায় ঠিক তার উল্‌টো। রাখাল পা ভেঙে পড়ে আজ চার-পাঁচ মাস যাবত। এ-দীর্ঘ দিন বনমালী অকাতরে সংসার চালাচ্চে। এবং চালানোর মতনই চালাচ্চে। রাখালের খাওয়ার বন্দোবস্ত আলাদা। তার শুশ্রূষার তদারকি! সবকিছু নিখুঁত। ত্রুটি-বিচ্যুতি বিহীন। যদি কখনো কোথাও এতোটুকুন মাত্তর ছিদ্র চোখে পড়ে বনমালীর, তা হোলে আর খাতির নেই। চড়াও হোয়ে ওঠে বেদানার ওপোর। অশ্রাব্য গালি-গালাজ, ধমকানিতে জরো-জরো কোরে তোলে ওকে। ভালোবাসার মানুষের ওপোর এমন আচরণ কেউ করে না। করে বিবাহিত স্ত্রীর ওপোর। বনমালী সে-স্বত্বটুকুনই দেখি ছিনিয়ে নিয়েচে রাখালের কাছ থেকে। বন্ধুত্বকে জমাট কোরে তুলে। বনমালীর ব্যবহার মাঝে-মাঝে ব্যথিয়ে তোলে বেদানাকে। ভাবে, এ-প্রণয়ের ভবিষ্যৎ ফলশ্রুতি কী হবে? স্বামীর ওপোরকার ভালোবাসার গায় চিড় খেতে শুরু হোয়েচে। রাখালের সাথে এখোন সে তেমন দিল্‌দরাজ হাসি হেসে কথা কয় না। স্বামী সেবা এখোন ওর গলগণ্ডর মতনই। খানিকটে বাড়তি মাংসর গলগ্রহ। সেদিন বনমালী হাটে গেছে। রাখাল উঠোনে একখানা খুরসি পিঁড়ি পেতে বোসে, খোঁড়া পা-খানা ছড়িয়ে দিয়ে একটা ঠুঙি বুনচে। এমন সময় বেদানা তেলীর পুকুর থেকে জল নিয়ে আসে। কাঁখে ভরা মেটে কলসী। হাতে ভরা মেটে ভাঁড়। আশ্চর্য হবার কিছু নেই এতে। একটা কলসীর পরে আর একটা কলসী চাপিয়ে আরো এক ভাঁড় জল হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে বেদানা অনায়াসেই তেলীর পুকুর থেকে কেন—বুড়ি ভদ্দর থেকেই আসে। আজ মাসখানেক যাবৎ সে-সামর্থ নেই আর ওর। ঐ একটা কলসী আর ভাঁড়টা নিয়ে হাঁস-ফাঁস কোরচে। মনে হয় মাজা ভেঙে গেল বুঝি। হার্টফেল কোরলো।

উঠোনে পা দিতেই রাখাল বলে :

—পারবে না, তবু ছাড়বে না। ক্যানো একটা নিয়ে গেলে কী হয়?

বেদানা মুখ ঝামটা দ্যায় :

—সারাদিন জলই আনি। আর কোনো কাজ নেই আমার।

রাখাল হেসে ওঠে। বলে:

—কাজ তো আছে। কিন্তু হাত-পা মচ্‌কে আমার মতন যদি পড়ে থাকো? তখোন?

—তখোনকার কথা তখোন হবে। থিয়ে থাকতে কে কোরচে আমার কন্না?

—রাগ করো বৌ? তোমার ভালোর জন্যিই বলি। পারো না, হাঁস-ফাঁস করো। দেখে আমার……

কথার পরে কথা বোলে ওঠে বেদানা:

—থাক। হোয়েচে। আর মায়া দেখাতে হবে না।

রাখাল যতোই নরম কাটে, বেদানা ততোই ওঠে তেতে। রকম-সকম দেখে রাখাল ঠুঙি বোনায় মন দেয়। দেয় সত্যি কিন্তু তার মনের মধ্যে অনেক কথা জমা ছিলো। ভেবেছিলো, আজকের এ-ফাঁকে ঐ জমা কথা খরচ কোরে ফেলবে। কিন্তু এখোন ঐ জমা কথাগুলো ঠুঙি বোনা বাঁশের শলা হোয়ে ওর বুকের মধ্যে বিঁধতে থাকে।

সন্ধ্যে উৎরে যায়। বেদানা রাঁধতে বসে। বনমালী হাটে গেছে কোন্ সকালে। ফিরবে আগুন জ্বলা পেট নিয়ে। তাই সকাল সকাল এ-রান্নার আয়োজন। রাখাল হুঁকো-কল্‌কে নিয়ে দোরগোড়ায় গিয়ে বসে। বলে:

—এট্টু আগুন ছ্যাও তো বৌ।

জ্বলন্ত কাঠের চলা তুলে নিয়ে ভেঙে ছ্যায় বেদানা। কল্‌কের আগুন তুলে নিয়ে টানতে-টানতে রাখাল জিগ্যেস করে:

—কী রাঁধবে বৌ?

আকার জ্বাল সরাতে-সরাতে বেদানা উত্তর করে:

—কচুর মুখীর ডাল্‌না। আর মাছ চচ্চড়ি।

—মাছ!

—হ্যাঁ। ও বেলার গজাল মাছ। খানকতক আছে।

—তা চচ্চড়ি ক্যানো? ঝোল করো।

বেদানা আপত্তি করে:

—ব্যাপারী ঝোল খেতে পারে না।

—ও।

খানিকখন চুপচাপ কেটে যায়। রাখাল হুঁকো টানে। বেদানা আকায় কাট ছায়। বাটনা বাটে। খুন্তী দিয়ে হাঁড়ি থেকে ভাত তুলে নিয়ে টিপে পরখ করে। সেদ্ধ হোলো কিনা।

রাখালই প্রথম কথা কয়:

—বৌ!

—কী?

—তোমার কি কোনো অসুখ কোরেচে?

—না। নত চোখেই উত্তর ছায় বেদানা।

—তবে অমন ধারা দুব্বল হোচ্চো ক্যানো? রাত দিন কেবল হাঁপাও। ক্যানো?

—জানি?

হুঁকোয় আস্তে আস্তে টান দিতে দিতে রাখাল জিগ্যেস করে:

—মুখ হাঁসা-হাঁসা হোয়ে যাচ্ছে। ক্যানো?

—জানি? ঘাড় গুঁজে উত্তর ছায় বেদানা।

—ভাত খেতে পারো না মোটেই। রাতদিন বমি-বমি করো। ক্যানো বৌ?

—জানি?

—জানো না! কিন্তু আমি যে দেখেচি।

এবার ডাগর-ডাগর চোখ চায় বেদানা। বলে:

—কী দেখেচো?

চ্যান কোরে এসে তুমি যখোন কাপড় ছাড়ছিলে, দেখলাম তোমার পেট খুচিপানা হোয়ে উঠেচে।

—যাও। জানিনে। মুখ ঝামটা ছায় বেদানা।

—তুমি জানো না কিন্তু আমি জানি। পাঁচ মাস হোলো আজ তোমার কাছে যাইনি আমি। জানো না?

—না।

—ঠিক কথা কও বৌ। তোমার পেট হোয়েচে কিনা।

অনেক সাধাসাধি করে রাখাল। বেদানা কিন্তু মুখ খোলে না। আপন মনে রান্না কোরে যায়। ফোঁস কোরে লম্বা এক নিশ্বাস ফেলে এক বুক বিস্বাদ মন নিয়ে উঠে যায় রাখাল। ঐ মনের গায় খোঁচাতে থাকে ঠুঁডি বোনা সূচাগ্র বাঁশের শলা।

অনেকদিন বাদে রাখাল হাট কোরতে যায়। পিট-পিট বনমালীও গাঁ থেকে গোরু কিনে নিয়ে বাড়ি ফেরে। বেদানা দাওয়ায় বোসে উরুতের ওপোর ন্যাকড়া রেখে ল্যাম্পের সল্‌তে পাকাচ্চে।

ঘাড় উঁচু কোরে চোখ চায়। বলে :

—ব্যাপারী এলে? কই? আমার জিনিস এনেচো?

—ক্ষেপেছো নাকি তুমি? হাজরার মা?

—ক্ষেপেইচি তো। বলো, তুমি এনে দেবে কিনা! নইলে আমি আর কাউকে দিয়ে আনিয়ে নেবো।

—পারবে খেতে?

—খুব পারবো।

—কিন্তু ক্যানো? ক্যানো তুমি ও কোরবে?

—উপায় কী? পাড়াময় হোয়ে গেছে আমার এ-কেলেঙ্কারি। কী কোরে মুখ দেখাবো?

—ক্যানো? আর মেয়েমানুষরা দেখায় কী কোরে?

—তারা তো এমন কেলেঙ্কারি করে না। লোকে বলাবলি কোরচে, তোমার দ্বারা আমার পেট হোয়েচে।

—লোকে বোললেই হবে? তোমার জলজ্যান্ত স্বামী বোসে।

—কিন্তু......

বেদানা থেমে যায়।

—কিন্তু কী? বলো। চাপচো ক্যানো?

—তোমার বন্ধু তো টের পেয়েচে।

—বন্ধু! কে বোল্‌লে?

—তোমার বন্ধুই বোল্‌লে। সে সন্দ কোরচে। বলে, তোমার পেট মোটা ক্যানো? পাঁচ মাস যাবত তোমার কাছে যাইনি আমি।

বনমালীর কালো মুখ বেগুনে হোয়ে যায়। জিগ্যেস করে :

—বন্ধু বোলেচে না কি তাই?

—হুঁ।

—কবে?

—সেদিন।

—কিন্তু বাচ্চার উপায়? তোমার পেটে যে-বাচ্চা এসেচে।

—তা আর কী হবে ? আমার যে-পথ, তারো তাই।

বনমালী একটা বিড়ি ধরায়। টানতে টানতে বলে :

—শোনো হাজরার মা, বরাবর আমার ভারি সখ একটা ছেলের। বৌতো চিররুগ্নী। বাচ্চা হোলো না। হবে, সে-আশাও নেই। তাই তোমার পেটে আমার জন্মিত্, একটা ছেলে হোলে ভারি সুখী হবো আমি। তাই আমার দ্বারা হবে না। পারবো না আমি এনে দিতে।

বেদানা অনেকক্ষণ পর্যন্ত কী ভাবলে। বোললে :

—থাক। কাজ নেই পেরে। যাক। কাল তোমার হাটবার। পরশু দিন মাংস এনো কিন্তু। ভারি লোভ হোয়েচে মাংসের ওপোর।

খুব খুশী হয় শুনে বনমালী ব্যাপারী। বলে :

—বেশ তো। আনবো। খাসি তো ? চরবিওলা ? তা আর কী খেতে লোভ হয় ? সন্দেশ ? রসোগোল্লা ?

—এনো যা তোমার খুশী।

পর-পরদিন খুব ঘটা কোরে আয়োজন করে বনমালী ব্যাপারী। মাছ-মাংস, সন্দেশ-রসোগোল্লা-দই। এমন কি নোতন শাড়ি পর্যন্ত। মানে, "সাধ" দেওয়ার মতনই আয়োজন।

খুব সাজ-গোজ করে বেদানা। নোতুন শাড়ি পরে। পাতা কেটে ফুলিয়ে চুল বাঁধে। উজ্জ্বল সরু সিঁদুর রেখা টানে সিঁথির ওপোর। কপাল ভরাও গোল সিঁদুর ফোঁটা। আলতায় ওগ মগিয়ে তোলে পা-দুখানা। তারপর ঘটা কোরে যায় রাঁধতে। ধীরে-সুস্থে মনের মতন কোরে রান্না করে।

দু'বন্ধু খেতে বসে। পরিবেশনে আজ দেখা যায় বেদানার পক্ষপাতিত্ব। বেশি কোরে মাছ-মাছের মুড়ো, বেছে-বেছে ভালো মাংস-মেটুলিগুলো ছায় রাখালের পাতে। এমন সুষ্ঠু খোলা মনে স্বামীকে ও আর কোনোদিন খাওয়ায় নি জীবনে। বেদানার এ আচরণ খুব খুশী করে বনমালীকে। রাখাল বরাবর খাওয়ার পরে জল খায়। ঢক্-ঢক্ কোরে এক ঘটি জল খেয়ে উঠে আসে।

কিন্তু বেদানার আর খাওয়া হয় না। আঁচিয়ে আসতে আসতে রাখালের পেটের মধ্যে জ্বালা কোরে ওঠে। সাথে সাথে বমি। রাখালের সারা গায় একশো কাঁকড়া বিছে কামড়ে দিয়েচে। সারা উঠোন গড়িয়ে বেড়ায় সে। কাটা কবুতরের মতন ছটফট কোরতে থাকে। বলে :

—ও বৌ, তুমি আমায় কী খাওয়ালে! বন্ধু, জল ঢালো আমার গায়। জলে মলাম। জলে মলান আমি। ও বন্ধু!

দেখতে দেখতে দ্রুত পরিবর্তন এসে যায়। রাখালের মুখ দিয়ে ফেনা উঠতে থাকে। কথা জড়িয়ে আসে। চোখে জাল পড়ে যায়। দু'গালে জলের ধারা নামে। কাতর নজর চায় বেদানার পানে। নির্বাক জলঝরা চোখ বন্ধুর মুখ চেয়ে জানায় বাঁচানোর আকুল আবেদন।

ছোটো কানাই ফকির বাড়ি ছোটে। ছুটে আসে যোগিশ্বর-তারণ-ভূতো। হৈ-চৈ পড়ে যায় মুচিপাড়ায়। কেউই ধোরতে পারে না। ব্যাপার কী? ভালো মানুষ রাখাল। ভাত খেয়ে উঠতে উঠতে হঠাৎ তার কী হোলো? কিন্তু তার মুখ দিয়ে গেজ্‌লা উঠতে দেখে সবাই মন্তব্য প্রকাশ করে ওর শেঁখো বিষ খাওয়া পড়েচে। বিদ্যুৎবেগে দেশময় রাষ্ট্র হোয়ে যায় বনমালী-বেদানার যোগসাজস-এ অঘটন ঘটানোর জন্য দায়ী। বেদানা গর্ভবতী। এবং বনমালীর দ্বারাই। বেশ কিছুদিন গেরামে এ নিয়ে টালবাহনা হোচ্চিলো। এখোন এ টালবাহনা আর চাপা থাকে না। মন্তুঠাকুর ছুটে আসেন! পায় পায় আসেন বাছাড়মশাইও। তিনি খোলাখুলি মন্তব্য রাখেন, এতো পষ্টই দেখা যাচ্চে শেঁখো বিষ খাওয়ানো। বনমালী বিষ এনে দিয়েছে। আর খাওয়াচে বেদানা। রাখালের অবস্থা দেখে বনমালী কিন্তু কেঁদে আকুল। বেদানা চুপচাপ। চোখে তার নীরব জলের ধারা। ফকিরের দাওয়াই নিয়ে যখোন ছোটো কানাই ফিরে আসে তখোন সব শেষ।

রাখালের শবদেহ সরাসরি শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয় না। কেনো না গ্রামময় সব রব হোয়ে গেছে, ওকে বিষ খাওয়ায়ে মেরে ফেলা হোয়েচে। এ ক্ষেত্রে পুলিশে খবর না দিয়ে লাশ পুড়িয়ে ফেললে ভবিষ্যতে পুলিশের খোঁচার ভয় সাংঘাতিক রকম।

খবর পেয়ে দারোগাবাবু সবান্ধবে আসেন। বনমালীকে দু-চার ঘা মারেনও আর পুলিশী ভাষায় বেদানাকে ধমকান। ভয় দেখান, দু'জনকে গোরুর দড়ি দিয়ে বেঁধে চালান দেবেন। বেদানা কাঁদতে থাকে। বনমালীরও চোখে জল।

দারোগাবাবুর সাথে বাছাড়মশাইও এসেচেন। অনাহুত ভাবেই। এবং টিপেও দিয়েছেন, বনমালী গোরুর ব্যাপারী, বেশ স'াসালো পার্টি। রস আছে। এখোন তিনি নিংড়ে বের কোরে নিতে পারলেই হয়।

দারোগাবাবু প্রশ্ন করেন :

—এই ব্যাপারী, তুমি কিসের ব্যাপার করো ?

—আঁগ্যে হুজুর, গোরুর।

—গোরুর ! ওঃ ! তাহোলে তো তুমি খুব জুত ধরা লোক। তা এ তোমার কী হোতো ?

রাখালকে লক্ষ্য কোরেই দারোগাবাবুর এ প্রশ্ন।

—আঁগ্যে বন্ধু।

—বন্ধু ! তা বেশ তো। বন্ধুর বৌকে নিয়ে মজা লুটচিলে। লুটচিলে, তা মেরে ফেললে ক্যানো ?

—না হুজুর, আমি মারিনি।

—তবে ? ওকি আপনি মরলো ?

—তা জানিনে হুজুর।

—জানবে ওষুধ দিই আগে। তা তুমি গোরুর ব্যাপারী, গোরু চালান দেবে। এখানে পড়ে থাকো কেনো ? বাড়ি-ঘর নেই ?

—আছে হুজুর।

—বৌ আছে ?

—আছে।

—কালো ? না ফরসা ?

বনমালী চুপচাপ থাকে।

—বলো, বলো। ব্যাটনের গুঁতো মারেন দারোগাবাবু।

বনমালী কেঁদে ওঠে। বলে :

—কালো হুজুর।

—রোগা ? না মোটা-সোটা ?

—রোগা, হুজুর।

রসিকতা কোরে হাসতে হাসতে দারোগাবাবু বলেন :

—ও-ও। তাই বুঝি রাঙা-চোঙা, মোটা-সোটা বন্ধু-বৌকে নিয়ে ফুরতি লোটো ?

চুপচাপ থাকে বনমালী। আবার ব্যাটনের গুঁতো পড়ে। কঁকিয়ে কেঁদে ওঠে সে।

—এই পাজি, শালা গোরু-চোর ! এখানে থাকিস ক্যানো ?

চোখ মুছতে বনমালী জবাব দেয় :

—আঁগ্যে হুজুর, বন্ধুর পা ভেঙে যায়। তাই আমি দেখাশোনা কোরি। ওর সংসার চালাই।

—আর ওর বউ নিয়ে শুস্? ক্যামন? বল্ শালা, ও মাগীর পেট কোরলে কে? তুই?

বনমালী কথা কয় না।

বাছাড়মশাই জুত দেন :

—ও ছাড়া কি আর গাঁর লোক এসেচে, হুজুর?

এবার বেদানার ওপর আক্রমণ।

—এই ছিনাল মাগী বল্, কে তোর পেট কোরেচে?

পুলিশ দেখে আগের থেকেই বেদানার প্রাণ উড়ে গেছে। এবার দারোগার ধমকানিতে কেঁদে ওঠে।

দারোগাবাবু আবার ধমক দেন :

—এই চৌকিদার, শালির কাপড় খুলে জল-বিচুটি লাগাও। স্‌লুনি মাটো হোক। ভাতার পড়ে আছে ঠ্যাঙ ভেঙে। আর উনি নাঙ্ নিয়ে কামড় ভাঙচেন। বল্, বিষ খাওয়ালি ক্যানো?

বাছাড়মশাই বোলে ওঠেন :

—ভাতার তো কোথায় কতো। ও তো বিয়ে করা মাগ না, হুজুর। ও রাখালের নিকের মাগ।

—ও-ও। তাই নাকি! হাসতে থাকেন দারোগাবাবু।

—তাই না তো কী হুজুর? ও মাগী কি যাই-তাই হারামজাদী? আরো তিন-তিনবার নিকে পুষেচে ও। এক খলিল নগরেই তো পর-পর দু'বার নিকে কোরেচে। আগে বড়ো ভাইকে। তাকে বিষ দিয়ে মেরে তার ছোটো ভাইকে। ওকি কম খামারী, হুজুর?

বেত নাচাতে নাচাতে হুজুর হুকুম করেন :

—এই দফাদার, মাগীকে খুঁটির সাথে বেঁধে ফ্যালো তো। চৌকিদার, তুমি ন্যাংটা কোরে বিচুটি লাগাও। লাগাও বোলচি।

ঠিক এমনই সময় মন্টুঠাকুর এক রকম ছুটতে ছুটতে এসে হাজির হন। ছ্যাখেন, পাড়ার মাতব্বর মহল তো দূরের কথা, একটা কচি ছেলেও এ-বাড়ি আসেনি। পুলিশের ভয়ে যার ঘরে ঢুকে পড়েচে। বাছাড়মশাইকে নিয়ে

দারোগাবাবু পরিষদদের সাথে তুমুল তোলপাড় শুরু কোরেচেন। আদি রসাত্মক কথার ফোঁয়ারা ছুটোচ্চেন। দেখে মন্টুঠাকুরের গায় ঝাল বেটে ছায়। বলেন :

—আর বিচুটি লাগাতে হবে না দারোগাবাবু। আমি এসেই সব ব্যবস্থা কোরছি। জানি, চিল পড়লে অন্ততঃ কুটো গাছটাও না নিয়ে ওড়ে না।

বোলতে বোলতে তিনি তারণদের বাড়িমুখো চোট পায় চলে যান। এবং দেখেন, তারণ মন্থরা-শশীদের নিয়ে মাচার তলায় ঢুকে বোসে আছে। ভূতোদের অবস্থাও তথৈবচ। আর বুড়ো মাতব্বর যোগিন্দ্রশ্বর একটা তলা ছেঁড়া ঢোল উপুড় কোরে তার নিচেয় সেঁধিয়ে কাটা-পাঁটার মতন থর থর কোরে কাঁপচে। মন্টুঠাকুর এক এক কোরে সবাইকে টেনে বার করেন। ভর্ৎসনাও করেন খুব :—তোমরা নাকি মাতব্বর! ক্যানো? পুলিশ কি বাঘ? আর হোলোই বা বাঘ। পাড়ায় বাঘ পড়লে, তোমরা বুঝি মাচার তলায় ঢুকবে? ঢোলের খোলে লুকোবে গিয়ে? রাখাল তো মরেইচে। আর সে সাথে তোমরাও মরেচো দেখচি, বেশি কোরে। তোমাদের পাড়ার বৌ বেদানা। পুলিশ তাকে জল-বিচুটি লাগাচ্চে। বনমালীকে পিটোচ্চে। বলিহারি। চলো সব।

তেমনি চোট পায় মাতব্বরদের নিয়ে অকুস্থানে হাজির হন মন্টুঠাকুর। শোনেন, তেমনি অশালীন চোটপাট চলেচে দারোগাবাবুর। এরি মধ্যে আরো দু'চার ঘা পড়ে গেছে বনমালীর পিঠে। মন্টুঠাকুরদের দেখে সে কুঁক ছেড়ে কেঁদে ওঠে। বেদানারও চোখে নামে জোর ধারা।

মন্টুঠাকুর বলেন :

—দেখুন দারোগাবাবু, এ জন্যই পুলিশদের গায় থু-থু ছ্যায় লোকে। এ জন্যেই পুলিশদের বদনাম।

দারোগাবাবু যেনো আকাশ থেকে পড়েন। প্রশ্ন করেন :

—ক্যানো?

—ক্যানো? একটা ঘরের বৌ, তাকে ন্যাংটা কোরে, আপনি হুকুম দিচ্ছেন, জল-বিচুটি লাগাতে! ছি! আপনাদের মুখের কথা, মনুষ্যত্বের নাক-কান কাটে। আর পায়ের বুট ঐ মনুষ্যত্বকেই মারে লাথি। বুকে বন্দুকের বুলেট।

—কিন্তু আপনি ঘরের বৌ বোলচেন কাকে? ওতো খানকী মাগী। বক্তব্য দারোগাবাবুর।

—খানকী! আচ্ছা, মানি আপনার কথা। ও খানকী। ও দেহ বেচে

খায়। তাই বোলে ওর দেহ কিনে নিয়ে আপনি এই উঠোনের মধ্যে ওকে সম্ভোগ কোরতে পারেন না। যখোন ঘরে লোক ঢুকোয়, তখোনি ও খানকী। বাইরে এলে, তখোন ও মায়ের জাতি। ওর মরা স্বামী এখোন উঠোনে। এরি মধ্যেই আপনি ওকে বলাৎকারের মতনই অপমান কোরচেন। ওর ঐ ঠ্যাঙ ভাঙা স্বামী বেঁচে থাকলে এতোটা সইতো না। পারুক, না পারুক, খোঁড়াতে খোঁড়াতে এসে আপনার ঠ্যাঙ ভাঙতে চেষ্টা কোরতো অন্ততঃ।

দারোগাবাবু চটে ওঠেন :

—কে বোললে ও ওর স্বামী? খোয়াব দেখছেন নাকি আপনি? ও মাগী তো নিকে করা বৌ। এর আগেও তো আরো দু'তিনটে নিকে পুষেচে। খবর রাখেন?

—সে খবরে আমার গরজ? ওটা আপনারাই রাখুন। ও গরজ আপনাদেরি।

কিন্তু দারোগাবাবু বিয়ে করা হোক আর নিকে করা হোক, বৌ তো বটেই। ওর দায়-দায়িত্ব সবকিছুই তো ঘাড়ে বয়ে নিয়ে ছিলো রাখাল। ওর পেটে ছেলে হোলে, লোকে বোলবে তো রাখালেরই ছেলে। নাকি? সুতরাং নিকের বৌ, এতে চণ্ডী অশুদ্ধ হোচ্ছে কিসে?

দারোগাবাবুর মুখে সহসা কথা যোগায় না। উত্তর দেন বাছাড়মশাই :

—বিয়ের বৌ আর নিকের বৌ! বলিহারি বটঠাকুর!

বিস্মিত হন মন্টুঠাকুর, ক্যানো?

—ক্যানো? জিগ্যেস করো তোমার ঐ মাতব্বরদের। ঐ যোগিশ্বর-তারণ-ভূতোদের। কোন্ কম্মে লাগে ও বৌ? ওর হাতের জল-পিণ্ডি পিতৃপুরুষে পৌঁছয়? ও ঠাকুর?

—কার হাতের জল-পিণ্ডি পিতৃপুরুষরা খান, আর কার হাতের খান না, সে কথা আমিও জানিনে, তুমিও জানো না হিরুদা। তা নিয়ে এতো জল বেড়োবেড়ি ক্যানো? তবে নিকে প্রথা ওদের সমাজে বরাবর চালু। নিকের বৌ-এর ছেলেরা বিয়ের বৌ-এর ছেলেদের মতনই বাবার সবকিছুর অধিকার পায়। এই তো যথেষ্ট।

দারোগাবাবু অধৈর্য হোয়ে ওঠেন। তাড়া দেন :

—বাছাড়মশাই, আর দেরি করা যায় না।

—কী কোরতে চান এখোন? মন্টুঠাকুর প্রশ্ন করেন দারোগাবাবুকে।

—ওদের চালান দিতে চাই। এই চৌকিদার, শালা-শালীকে বাঁধো। পোঁদে জল-বিচুটি লাগাও।

মন্টুঠাকুর বাধা দেন :

—রাখুন দারোগাবাবু। আইন-মাফিক কাজ করুন।

—গর আইন দেখচেন কোন্‌টা আপনি ?

মন্টুঠাকুর চটে ওঠেন :

—গর আইন না ? বনমালী বা রাখালের বৌকে চালান দেবেন, দিন, ভালো কথা। তারপর যদি ওরা দোষী সাব্যস্ত হয়, সাজা হবে। তার জন্য এ-খিস্তি-খেউড় ক্যানো ? এতো মারধোর ? গালিগালাজ ? আছে নাকি আপনাদের সরকারের এমন ফতোয়া ?

—রেখে দেন মশাই, ফতোয়া আপনার। আমাদের এ-লাইনের নিয়মই এটা। যে যতো কাজাতে-খাজলাতে পারবে, সেই পারবে ততো নাম কোরতে। যে মত পিটোতে পারবে, সেই পারবে উন্নতি দেখাতে।

—ও। তাই বুঝি এতো দাপট আপনাদের। জানতাম না।

—তবে কী ?

—যাক। বনমালী এবং রাখালের বৌকে আপনি চালান দিলেন। কিন্তু প্রমাণ কোরবেন কী কোরে বনমালী দোষী ? রাখালের দ্বারা তার বৌ গর্ভবতী হয়নি ?

মরাচাঁদের হাসি ফুটে ওঠে দারোগাবাবুর মুখে। বলেন :

—রাখাল তো পাঁচ-ছমাস শয্যাশায়ী ছিলো মশাই।

—শয্যাশায়ী ছিলো পা ভেঙে। কিন্তু ধ্বজভঙ্গ হয়নি তো তার। জননশক্তিও তার অটুট ছিলো দারোগাবাবু।

আমড়ার আটির মতন চোখ পাকিয়ে তাকান দারোগাবাবু। বক্তব্য রাখেন :

—কিন্তু জানেন মশাই, রাখালের মরণের রহস্যটা ? বনমালী বিষ এনে ছায়। আর রাখালের বৌ সেই বিষ খাওয়ায়ে ওকে মেরেচে। জানেন মশাই ?

বিস্ময়ে বিস্ফারিত হোয়ে ওঠে মন্টুঠাকুরের চোখ মুখ। বলেন :

—কই ? না তো। প্রমাণ কোথায় ?

—প্রমাণ যোগাড় কোরবে জল-বিচুটি। আর এই বেত। বুঝলেন তো এখোন, পুলিশ ক্যানো মুখ খিস্তি করে ? আর ধোলাই ছায় ?

—কিন্তু ধোপে টিকবে শেষ পর্যন্ত ? আসামীরা কোর্টে দাঁড়িয়ে বোলবে,

মায়ের চোটে মিথ্যে বোলেছিলাম, হুজুর। আমরা দোষী না। তবে হ্যাঁ, বিষের দ্বারা রাখাল মরেচে এ-প্রমাণটা যোগাড় করা কঠিন হবে না আপনার। তার জন্য পোষ্টমর্টার্ণ আছে। কিন্তু সে-বিষ যে বনমালী এনে দিয়েচে আর রাখালের বৌ খাওয়ায়েচে, এ-প্রমাণ সরবরাহ কোরবে কে? দেবে এ-পাড়ার কেউ সাখ্যি? বোলতে পারবে মাতব্বররা হলপ কোরে? পারবে না। কেনো না আসল খবর জানে এরাই।

চিন্তিত দেখা যায় দারোগাবাবুকে এবার। প্রশ্ন করেন:

—কী সেটা?

—তা বোলবো ক্যানো? মামলা আগে কোর্টে উঠুক।

হাসি হাসি মুখ মনুঠাকুরের।

—তবু? দারোগাবাবুরও মুখ হাসি হাসি।

—ওর মরণের আসল রহস্যটা আমাদের হাতে।

—কী সেটা?

লেবু আর কচলাতে চান না মনুঠাকুর। বলেন:

—ওতো নিজেই বিষ খেয়ে মরেচে। কে না জানে ও শূলরোগী? পনোরো-ষোলো বছর ব্যথায় ভুগচে? এর আগেও আরো দু-তিন কিতে গলায় দড়ি দিয়ে মরবার চেষ্টা কোরেচে। কিন্তু ওর বরাতে রয়েচে বিষ।

—তাই নাকি!

কপালের চামড়া কুচকে যায় দারোগাবাবুর।

—না তো কী? সুতরাং ওদের চালান দিয়ে এগোবে না কিছু আপনার। তাই বোলছিলাম, চিল পড়েচেন, কুটো নিয়ে উড়ে যান। বোলেই অট্টহাসিতে মজলিশ ভরে তোলেন মনুঠাকুর।

দারোগাবাবু নরম কেটে যান এবার। বাছাড়মশাইও চুপচাপ। তিনিও চান, চিল পড়েচে, কুটোনো, মাছ পেলেই উড়ে যাবে। গাঙ নিয়ে তার কী গরজ?

—যাক। হিরুদা, তাহলে ঠিক-ঠাক্ কোরে ফ্যালো। এ-নোংরা পাড়ায় দারোগাবাবুকে আর কতো সময় আটকে রাখবে? আর মড়াই বা উঠোনে পচবে কতখন?

এর পরও খানিক সময় জল ঘোলানো হয়। সে অবিশ্যি উড়ে-পড়া চিলের ভাগর মাছের ব্যাপার নিয়ে। শেষটা রফা হয় তিনশো টাকায়। বনমালী

ব্যাপারী। গোরুর ব্যাপারী। তিনশো টাকার করকরে নোট তোড়া থেকে বের কোরে দিতে তাই বেগ পেতে হয় না। পকেট গরম হওয়ায় দারোগাবাবুর মেজাজ ঠাণ্ডা হোয়ে যায়। লোক-দেখানো লেখা লিখে নিয়ে যান তিনি, রাখাল ছিলো শূলরোগী। ব্যথার জ্বালায় আত্মহত্যা কোরেচে সে। সে-সাথে হুকুমও দিয়ে যান, চটপট লাশ পুড়িয়ে ফেলার। চটপট কোরেই পুড়িয়ে ফেলা হয় রাখালকে। মন্থঠাকুর শবানুগমন করেন।

এর পরের ইতিহাস চিন্তা কোরতে খুব বেশি মাথা ঘামাতে হয় না। মানে, কিছুদিন বাদে বনমালীর সাথে বেদানার নিকে হোয়ে যায়। অবিশ্যি মাতব্বরদের রাজিনামা ক্রমে। বনমালী খাসি মেরে এমন কি দই-মিষ্টি পর্যন্ত দিয়ে ভুরিভোজন দেয় গোটা পাড়াকে। ওর বুকের গোড়া থেকে শেষ অবধি একটা লম্বা পেরেক ঠোকা ছিলো। সেদিন বেদানা তুলে দিয়েচে সে-পেরেকটা। সে অকপটে স্বীকার কোরেচে বনমালীর কাছে। ও-ই স্বামীকে বিষ প্রয়োগ কোরেছিলো। শেঁখো বিষ। কেনো কোরেছিলো, এ-জিগ্যেসাও কোরেছিলো বনমালী। তার জবাবে বেদানা বোলেচে, ওকে খুশী কোরতে। একদিন ব্যাপারী বোলেছিলো, ওর খুব শখ একটা সন্তানের। নিজের বৌ-এর সে সম্ভাবনা নেই। তাই বেদানার গর্ভে ওর সন্তান দেখবে। আরো একটা স্বীকৃতি দিয়েচে বেদানা, বনমালীকে দিয়ে চারজন পুরুষ স্পর্শ কোরেচে ও। তার মধ্যে ব্যাপারীই এক মাত্তর দিতে পেরেচে ওকে পিপাসার পরিতৃপ্ত জল।

যে তেলীর পুকুরের নাম একাধিকবার উল্লেখ করা হোয়েচে, তার মালিক ছিলো ঘনেশ্যাম কুণ্ডু। জনশ্রুতি বলে, এ-পুকুর নাকি কোনো মানুষের কাটা না। দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা এক রাতে এর খনন কাজ সমাধা করেন। যা হোক মানুষেই কাটুক আর বিশ্বকর্মাই কাটুন, এ পুকুরের বয়েস যে এক-দেড়শো বছরের কম না; তার উজ্জ্বল নজির মেলে। এতো বড়ো একটা বিশাল দির্ঘীকা খুঁড়ে তোলা যে অজস্র মাটি পাহাড় উঁচু পাড় তোয়ের কোরেছিলো, এখোন তা প্রায় অবলুপ্ত। পুকুরের মাটি পুকুরকেই ভরাট কোরে তুলেচে। তাই এখোন এ দীঘি নির্বিবাদে শামিল হোয়ে গেছে এঁদো পুকুরে। জলের-সত্তা আচ্ছন্ন হোয়েচে পুরুদাম-দলে। আর হেলেঞ্চা-কলমী-ব্রাহ্মী শাকের অবিরল দীর্ঘ লতায়। কেবল মাত্তর মাঝে মাঝে মাছমারা ছোটো ছোটো "ফুট" বানানো। আয়নার মতন ঝিকমিক কোরচে সেগুলো আর ঐ আয়নায় মুখ দেখচে টুকরো আকাশরা। এছাড়া

উত্তর-দখ্যিন পাড়ে দুটো ঘাট। বেশ খানিকটে কোয়ে চওড়া। উত্তর ধারের ঘাটটা মুচিপাড়ার। আর দখ্যিন ধারে ঘাটে আসে তেলীপাড়ারা। আর দূরত্বর দিক থেকে এ দু'পাড়ার সমান হোলেও মন্নুঠাকুরদের এ পুকুরের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। মানচিত্র সামনে ধোরে যদি ঠিক সূক্ষ্ম দিক্‌নির্ণয় করা যায় তা হোলো মুচিপাড়া থেকে তেলীর পুকুর পাড় পুব-দখ্যিন কোণে। উত্তর পাড়ে ছিদ্রলুপ্ত বয়ড়া বন। আর পুব পাড়ে দীর্ঘায়তন মাদার গাছরা রোদ নিয়ন্ত্রণ ছায়া রচনা কোরে দাঁড়িয়ে আছে। অন্য দু'পাড় আগলে পাহারা দিচ্চে ডুমুর-পিত্তিরাজ-ষাঁড়া গাছের আকাশ প্রতিরোধক জঙ্গল। এ জঙ্গলে প্রত্যখ্য-অপ্রত্যখ্য, শরীরী-অশরীরী অনেকেই আছে। বাঘ না থাকলেও বাঘধাড়া। আছে দাঁতাল শূয়োর-সজারু-ভাম-গণ্ড-গোখলো-খেড়েয়া। আছে মাছাল-মাছরাঙা-ডাক-ঝুটকুলি-ভাতশালিক-গো-শালিক। আর মুণ্ডুকাটা সেপাই-বেহ্মদোত্যি-শাঁকচুন্নী-গোদানো এবং আগুলফ কটাকেশী দীর্ঘস্তনী পেতনীর দল। তাই সূর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের গতাগম্যিও ডুবে যায় এ তল্লাটে। তখোন ঐ সব জীব-জানোয়ার আর কাল্পনিক বিদেহীদের অবাধ বিচরণ আর রকমারি ব্যাঙের, ঝিঁঝির, অনামী জলীয় পোকামাকড়ের অবিরত সুর-সংলাপ আসর জমায়। শ্রোতা নেই। দর্শক নেই। তবু এ নীরব শিল্পীরা নিষ্ঠা দিয়ে সাধনা কোরে যায়।

আয়না স্বচ্ছ ঐ-সব "ফুটে"র কাছাকাছি "তে-কাঠা" পোতা। তিন টুকরো বাঁশ দিয়ে বানানো এ "তে-কাঠা"। একজন লোক কোনোরকমে এর ওপোর বোসে মাছ মারতে পারে। মালীর বাগ, বুড়ি ভদ্দর দলমাদল করা শশী শিকারী গুলতি-ধনুক রেখে ছিপ নিয়ে এসেচে তেলীর পুকুরে। আজ আর হোরেল ঘুঘু, কুকো পাখি, কুঁজ বক কি গুই ঘড়েল নয়, মাছ শিকার কোরতে। যোল, কই, চ্যাঙ, জিয়েল, মাগুর মাছ। "তে-কাঠা"র পরে বোসে চুপচাপ শশী শিকারী। পলক নিচল চোখ তার শাদা শোলার ফাৎনার পানে। কখোন মাছে ঠোক মারবে। দু'চার বার ফাৎনা উঠবে দুলে। পরখ্যনে পেছনের ভাগটা আকাশমুখো হোয়ে চোঁ কোরে তলিয়ে যেতে থাকবে। ক্ষিপ্র হাতে শশী শিকারী টান দেবে ছিপে। শিকারী সুলভ কায়দা—কছরত দিয়ে। আর উঠে আসবে একটা ডাগর যোল্ কই কি জিয়েল-মাগুর মাছ। ডাগরই বটে। পচা শ্যাওলা "বোদ" খাওয়া মাছ তো। মোত্তর খানেক আগে সে মস্ত একটা "ভেতো চ্যাঙ" টেনে তুলেচে। আর বঁড়শি থেকে ছাড়িয়ে সেটাকে রেখে দিয়েচে খারার ভেতর। ছাঁচিকেচোর

টোপ গেঁথে আবার ছিপ রেখে ভায় যথাস্থানে। পচা গোবর ছড়িয়ে দেয় "ফুটে"র মধ্যে। মাগুর-শিঙি মাছ লাগানোর অদ্বিতীয় চার। তারপর তার চোখ গিয়ে ঠেকে শাদা ফাৎনার গায়। কিন্তু ফাৎনার গা-থেকে অচিরেই তার চোখ চলে যায় ঘাটে। জলে নামার শব্দ শুনে। ভাখে, নীতের মেয়ে সুখো। উরুৎ জল অবধি নেমে এসেচে। এখোন ঘাটের চোখ ঠেকে গিয়ে চোখে। মানে, চোখাচোখি হয়। সুখোর মেটে কলসী জলে ভাসে। সে এসেচে চান কোরতে না জল নিতে। এক রকম জল ফেলেই জল নিতে। উরুতের প্রায় প্রান্ত সীমানা অবধি কাপড় তুলে দাঁড়িয়ে আছে সুখো। দেখে শশী শিকারীর মন চঞ্চল হোয়ে ওঠে। ঠিক ছাচি কেচোর টোপ লোভী জিয়েল মাছের মতনই চঞ্চল। দোলা লাগে বুকে। ফাৎনার মতন দোলা। ঠোক দেয় সে, কী সুখো যে?

—হ্যাঁ, তুমি এলে মাছ মারতে, তাই দেখতে এলাম। মাছ পেয়েচো? ও শিকারী?

—হুঁ-উ। মাছ আবার পাবো না! আমাকে দেখলে মাছ ছুটে আসে বঁড়শি গিলতে।

—কী মাছ?

—চ্যাঙ্।

—কী চ্যাঙ—উল্‌কো না ভেতো?

—ভেতো রে।

—মাইরি? বড়ো?

—বড়ো। এই এমন ধারা।

বোলে বাঁহাতের বুড়ো আঙুলের সাথে মাঝের আঙুল দিয়ে বৃত্ত রচনা কোরে মাছের পরিধি দেখায় শশী।

—হুঁ? তাই না? মিছে কথা।

মুখ নেড়ে সুখো বলে।

—মাইরি। এই, আরেকটু ওপোরে তোল্ কাপড়। ভিজে গেলো।

—তাই না? তাহোলে তো তুমি পারো।

—কী কোরে? আমি কোথায়? আর তুই কোথায়?

—আসতে কতকখন?

বোলতে-বোলতে আরো খানিকটে কাপড় উঁচু কোরে জল ভরতে থাকে সুখো। ইশেরায় আমন্ত্রণ বুঝতে পারে এটা শশী শিকারী। ভুল হোয়ে যাচ্ছ

তার মাছ মারা। "তে-কাঠা" থেকে নেমে ডাঙায় ওঠে সে। বলে

—এই সুখো ডাবুর বুড়িয়ে থুয়ে উঠে আয়।

ঘাটের পাশে কলসী ডুবিয়ে রেখে ডাঙায় উঠতে উঠতে সুখো কয় :

—কেউ ঘাটে আসবে না তো? যদি দেখে ফেলে?

—নারে। কেউ আসবে না। চল্।

—কোথায়? বয়ড়া বনে?

ফিসফিসিয়ে জিগ্যেস করে সুখো।

—না। ওখান থেকে দেখা যায়। আর জানিস্ নে? ও জায়গাটা ইষ্‌টম্-পাতাসীর? ওরা যদি এসে পড়ে?

ভালোই জানে সুখো। ও-জায়গাটা ইষ্‌টম্-পাতাসীর মৌরসী করা। একদিন বেয়াকুবও হোয়েচে। ডাহা বেয়াকুব। কেবল মাত্তর গামছা পেতে দিয়েচে শশী। আর ও শুয়ে পড়েচে তার ওপোর। এমন সময় ইষ্‌টম্-পাতাসীর অভিসার। সুখো ছুটে পালায়। শশীও গামছাখান কুড়িয়ে নিয়ে ঘাড়গুঁজে হন্ হন্ কোরে ওর পেছন-পেছন চলে যায়। শশীর বন্ধু ইষ্‌টম্। তাই রখ্যে। কেনোনা ওদের এ—বন-বিহারের গুপ্ত রহস্য পরস্পরের অজানা নয়।

—তবে কোথায়? সুখো জিগ্যেস করে।

—ঐ মাদার গাছতলায়। আমি দেখে রেখেচি। ঘরের মেঝের মতন পরিষ্কার।

কিন্তু সুখো আপত্তি করে :

—ওখেনে ভূতের ভয়। সলি আর তার বর থাকে ঐ গাছে।

—দূর! দিনমানে ভূত কোথায়? চল্। এরপর লোক এসে পড়বে।

শশীর অনুসরণ করে সুখো। আর চকিত ভীরু চোখ চায় পেছনে। গুঁড়ি মেরে চলেচে দুজন। কুমারিকা লতার কাঁটারা চুল ধোরে টানচে সুখোর। মামা নাড়ুর ফুলেরা খসে-খসে পড়চে ওর খোপার চুলের ওপোর। ঢোল কলমী ফুল-মুকুলের গুঁড়ো ঝরে পড়েচে কপালে মুখে। নাগরের সংকেতে অভিসারে চলেচে নাগরী—বন-সুন্দরী। সখীরা তাই সাজিয়ে দিচ্চে ফুল দিয়ে। ফুল-ধূলির প্রসাধন দিয়ে। লতাবন পাড়ি দিয়ে মাদারতলার কাছাকাছি পৌঁছে গেছে শশী। সুখো এখোনো ওর অনেক পেছনে।

—কে রে তুই মাদারতলায়। শশী চেঁচিয়ে ওঠে।

ধড়ফড়িয়ে ওঠে সুখোর বুকখানা। লতা-ঝোপের মধ্যে বোসে পড়ে সে।

—আমি স্যাপ্‌লা।

—স্যাপ্‌লা! কী কোরচিস্?

—লতা তুলচি।

শশী জানে "দোড়ে লতা" তুলতে এ কসাড় বনে স্যাপ্‌লা পেরায়ই আসে। মুচিপাড়ার অদ্বিতীয় শিল্পী সে। মাছ মারা বস্তর-চারো-দোয়াড়-আটাল-ঘুন্‌শী-পাটা বানানোয় ওর জুড়ী আর কেউই নেই। আর এসব জিনিস তোয়ের কোরতে ঐ লতার দরকার অপরিহার্য। তবু এমন সময় ও আসবে এ আশাই কোরতে পারেনি শশী। ভীষণ রেগে যায় সে। যদি কপিল মুনি হোতো, সগর রাজার সন্তানদের মতন ভস্ম কোরে ফেলতো সে স্যাপ্‌লাকে।

—লতা তুল্‌ছিস্! এই বাগানে!

—বাগানে না তো লতা কি ঘরের মধ্যি হয়? তা তুই ক্যানো এখেনে?

চালাক ছেলে শশী শিকারী। হোরেল ঘুঘু শিকার করে সে। তবু থতমত খেয়ে যায়। বলে:

—আমি? আমি পাখি মারতে এলাম। দিনকানা পাখি।

হোরেল ঘুঘু নয়। কুকো পাখিও নয়। দিনকানা পাখির নাম কোরে শশী শিকারী স্যাপ্‌লার মনে বিশ্বাসের গভীর রেখাপাত কোরতে চায়। ম্যানে, দিনকানা পাখিরা এমনি আধো-আলো, আধো আঁধারে থাকে। এখানে মানুষের গতাগম্যি কম। আর আত্মরক্ষার ভরসাও বেশি। কিন্তু স্যাপ্‌লাও কম সেয়ানা ঘুঘু না। সে শশীর ঐ মায়াফাঁদে পা দেয় না। বিশেষ কোরে সে শশী-সুখোর খাসখুস কথাবার্তাও কানে শুনেচে। সে জানে, তেলীর পুকুরপাড়ের ঐ গহন অরণ্য নাগর-নাগরীর সংকেত স্থান। এখানে প্রত্যহই দিবসের অভিসার ঘটে। তাই লতা তুলতে তুলতে দাঁড়িয়ে গিয়েছে স্যাপ্‌লা। মনে খট্‌কা লেগেছে বোলেই।

স্যাপ্‌লা প্রতিবাদ করে:

—পাখি মারবি, তা ধনুক কই তোর?

—ধনুক? ঐ তো ঝোপের মধ্যে। আনি গে।

বোলেই আর সে দাঁড়ায় না। কসাড় লতাঝোপের মধ্যে গুঁড়ি মেরে ঢুকে যায়। পুকুরে নেমে এসে ভাখে, সুখো গা ধুয়ে ভরা কলসী কাঁখে নিয়ে ডাঙায় উঠচে।

—হোলো না! সখেদ অভিব্যক্তি শশী শিকারীর।

—আমার কথা শুনলে না যেমন।

ছোট্টো এ কথাটার নির্মম খোঁচা মেরে সুখো চলে যায়। হতভম্বর মতন দাঁড়িয়ে থাকে শশী শিকারী। সে ভেবেছিলো বয়ড়া বন রাস্তার ধারের দিকে। লোকচক্ষুর নির্বিঘ্নিত অগোচর নয়। এবং ইয়্‌টম্‌-পাতাসীর নির্ণীত সংকেত স্থান। তাই বাধা-বিপত্তি এড়ানোর দরুণই শশী ধার্য কোরেছিলো পুবপাড়ের শিমুল গাছতলা। নিরাপদ অন্তরাল। যৌনলীলার প্রশস্তক্ষেত্র। নির্বাধ খুশি দিয়ে সম্ভোগ-পিপাসা মিটোবে ওরা। দু'খানা বুক কানায় কানায় ভোরে উঠবে রতিরসে। শশীর সর্বাংগে—শিরায় শিরায় তখোনো কামনার বহ্ন্যুৎসব ক্ষান্ত হয়নি। জীবনের সবচেয়ে মহার্ঘ শিকার ফসকে যায় তার ব্যর্থতম আঘাত দিয়ে। কিন্তু সুখোর আঘাত? সুখোর কামনা? সেকথা ভাবল কি শশী শিকারীর মন? হয়ত সে আঘাত আরো তীব্র। সে কামনা আরো আগুন। আরো নীল শিখায়মান।

ধীরে ধীরে "তে-কাঠা"র পরে উঠে গিয়ে বসে শশী। ছিপ টেনে তোলে, ছাখে টোপ নেই। কখোন খেয়ে গেছে মাছে। ফের টোপ গাঁথে। ছিপ ফেলে। কিন্তু চোখ তার ফাৎনার গায় আটকে থাকতে চায় না। মাছ শিকার এখোন তার চোখে গৌণ। সে চোখ চলে যায় ঘাটে—ঘাটের জলে। যে-ঘাটে সুখো নেমে ছিলো। যে জলে দাঁড়িয়ে নগ্ন উরুতের লাবণ্য দেখিয়ে হিল্লোল তুলেছিলো ওর হৃদয়মনে। কিন্তু মন যেখানে গরহাজির সেখানে মাছ তো মাছ, কোনো শিকারেই মন জমে না। না হোরেল, না কুকো পাখি, না গুই ঘড়েল ভাম। এমন কি দাঁতাল শূয়োর, বাঘ ভাল্লুকও।

সুখো ঘরভাঙার মেয়ে। আর শশী সুরপুরের ছেলে। এ দু গাঁয়ের সাথে ইদানিং তাল-তেঁতুল সুবাদ। তবু বিসম্বাদের গণ্ডি পেরিয়ে ভালোবাসা যে ঠাঁই এদের পোঁচে দিয়েছিলো; সে নির্বিবাদ মিলনরাজ্য। সাম্প্রদায়িকতা, সমাজ-সামাজিকতার অনেক উর্ধ্বে। তাই যে তেলীর পুকুরের জল নিয়ে বিবাদ নেই। ছোঁয়াছুঁয়ির বাচ-বিচার নেই। সেই জলের ধর্মে এরা দুজন ধর্মান্তরিত। ছয় থেকে বড় জোর নয়। এরই মধ্যে এদের ঘরের মেয়েরা পাত্রস্থ হয়। তবু পঞ্চদশী সুখো আজো কেনো পিতৃগৃহে? ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। আট বছরেই ওকে ঠিক গৌরীদান করা হয়। সুখোর বাবা মনছপ তখোন বেঁচে। এবং রক্তপিত্তি রোগে শয্যাশায়ী। তাই মোটামুটি পণ পেয়ে মেয়েকে এক বুড়োর হাতে ধোরে ছায়। বছর না ঘুরতে স্বাভাবিক নিয়মে যা হওয়ার তাই ঘটে

সুখোর কপালে। সুখো বাড়ি চলে আসে। আর মাসখানেক বাদে ওর বাবাও বাড়ি চলে যায়। শীতে বিলে ধান কুড়োয়। ধান ভানে পাটি বুনে বেচে। দিন চলে না। সুখোর মামার বাড়ি সাদিপুর। মামী এসে নিয়ে যায় ওকে। মাস চারেক আগে সেখান থেকে বাড়ি এসেচে। আবার বিয়ে দেওয়া হবে সুখোর। এ বয়েসের মেয়ে বেশ দরেই কাটতি হবে। সে দর কষাকষিই চোলচে এখোন।

হাট ফেরার পথে ন্যাপ্‌লার মারফতে সে-দিনকের ব্যাপারটা তারণের কানে আসে। শুনে তারণ তো চটে লাল।

—ছাগলের বেজায় রস হোয়েচে। পাঁঠার পাঁঠা! তা তুই কিছু বোল্‌লি নে!

—বোল্‌লে আমারে থুতো? সাবাড় কোরে দিতো একদম।

—দাঁড়াও, বাড়ি যাই আগে। চোটপায় হাঁটতে থাকে তারণ।

বাড়ি পৌঁছয়। উঠোনে ঠ্যাঙ্‌ ছড়িয়ে পাটি বোনে মন্থরা। হাট বেসাতিগুলো একদম ছুঁড়ে ফেলেই খপ করে বোসে পড়ে তারণ মন্থরার সামনে। এমনিতে তারণ খুব ঠাণ্ডা মানুষ। কিন্তু রেগে গেলে চোঁ কোরে রক্ত উঠে যায় ওর মাথায়। আবার চোঁ কোরে নেমেও আসে অবিশ্যি সে রক্ত।

—শালী! আমি না বোলে ছিলাম ঘানে জুড়ে দ্যাও ছাগোলকে। বুঝুক টেনে। তখোন যে বড়ো আমার কথা শোনা হোলো না! এখোন?

গাছ থেকে পড়ে মন্থরা। বিশাল চোখ তার হোয়ে ওঠে বিশালতর। শুধোয়:

—ক্যানো? কী হোয়েচে?

—হোয়েচে তোমার বাবার মাথা। ছাগোলের রস হোয়েচে। আর কী হবে? রাঁড়খোর হোচ্চে পাঁঠার পাঁঠা।

—বোললে কী তুমি?

—আমি বোলেচি শালী! শুনে দেখিস্‌ ন্যাপ্‌লার কাছে। রাঁড় নিয়ে রস মাটো কোত্তি শিখেচে। বাগান ধোরেচে পাঁঠা। কই সে গুয়েটার ছেলে? গোরুছোলা ছুলবো ওকে।

ক্ষিপ্ত হোয়ে ওঠে তারণ।

—থামো দিনি। কার কাছে যায়?

—হ্যাপ্‌লার কাছে শুনিস্‌ শালী। যায় ঐ সীতে ছিনালের মেয়ের কাছে। যেমন মা ছিনাল তেমনি তার মেয়ে। ছিনালের আওলাত।

স্তম্ভিত হোয়ে যায় মন্থরা। তবু তারণকে শান্ত করা এখোন তার প্রথম কাজ হোয়ে দাঁড়ায়।

সে জানে, এরপর তারণ তাঁতাল খাঁ হোয়ে উঠবে। তখোন তাকে ঠেকানো দায় হবে। হোগল পাত ছুরি নিয়ে হয়তো বা ছুটবে ঘরভাঙা মুখো। বিষম কাণ্ড বাধাবে। সে জোর পায় ছুটে যায়। এবং তামাক সেজে আনে। বলে :

—খাও।

তারণের রাগের ওষুধ তামাক। এ ওষুধ মন্থরার জানা। যতো বড়ো রাগ হোক, হুঁকো টানতেই জল। তারণ হুঁকো টানে। মন্থরা তার গায় হাত বুলোতে বুলোতে কয় :

—থির হও। কাদায় যতো বাড়ি মারবে, ছিট্‌কে লাগবে গায়। আর আমি অমত কোরবো না। এবার ওর বিয়ে দিয়ে ছ্যাও। ছোটো দেখে একটা মেয়ে···

তারণ চটে ওঠে :

—ছোটো? তোমার মুণ্ডু। গলা-ষাঁতা মাগী দেবো ওর ঘাড়ে চাপিয়ে। ষোলো চুঙোর রস কুড়িয়ে এক চুড়োয় আসে যাতে। শুয়োটার ছেলে।

মন্থরাও স্বামীর মতে মত ছ্যায় :

—তাই দিয়ো। চেঁচিয়ো না। কাকে-বকে টের না পায় যেনো। তা হোলে কেউ কি আর মেয়ে দেবে ওকে?

—না ছ্যায়, ঐ ষাঁড় নিয়ে আসবো টেনে। নিকে দেবো শালার ছেলের।

মন্থরা আর কোনো কথা কাটাকাটি করে না। বলে :

—দিয়ো। কী মাছ আনলে হাটতে?

তারণের কানের মধ্যে সুড়সুড়ি দিতে দিতে মন্থরা জিগ্যেস করে।

—গজাল মাছ আর পচা পুঁটি। পেঁয়াজের কলিও এনেচি। তাই দিয়ে পুঁটিমাছ চচ্চড়ি কোরবি। আর ঝাল-সরষে বাটনা দিয়ে রাঁধবি গজাল মাছ। ঝোল বেশি কোরিস নে যেনো। বুঝলি—বৌ?

—বুঝেচি।

লক্ষ্মী-বৌ-এর মতন সায় দেয় মন্থরা। এরপর ওর ঘাম ভেজা ঠাণ্ডা গা তারণের গায় ঠেকিয়ে দিয়ে হাট-বেসাতির থারাটা নিয়ে চলে যায় রান্না ঘরে।

তারণ এবার সত্যি সত্যিই ঠাণ্ডা হয়।

তবু মন মানে না মন্থরার। তাই রাতে তারণকে কাছে নিয়ে শোয়। কী জানি? যদি হোগলপাত ছুরি বের কোরে নেয় সে! এবং চুপিসারে উঠে গিয়ে সাঁতে-সুখোকে খুন কোরে আসে! তখোন জল অনেক দূর গড়াবে। আর ও তা কোরেও বোসতে পারে। বেজায় বদমেজাজী লোক তারণ। তবু মনে জোর আছে মন্থরার। কাছে থাকলে সুরপুরের এ মাতব্বর ওর মুঠোর বশে। এক ঘুম রাতের পর জেগে ওঠে মন্থরা। তারণকে কোলের মধ্যে টেনে নেয়। বলে:

—শোনচো?

ঘুম ঘোরে উ-উ কোরে ওঠে তারণ। মন্থরা জড়িয়ে ধোরে জোরে চাপ দিতে দিতে ডাকে।

—শোনচো? ঘুমোচ্চো নাকি?

—হুঁ!

—ঘুমোচ্চো? জোরে ঝাকানি ছায়।

এবার ঘুমের আবিলতা কেটে যায় তারণের। বলে:

—কী বোলচো?

—বোলচি, শশের কথা। সত্যি নাকি? ও সুখোর কাছে যায়?

—সত্যি না কি মিথ্যে? শুনে দেখো ন্যাপ্‌লার কাছে।

চাপা নিঃশ্বেস ফেলে মন্থরা। বলে:

—কিন্তু যে ঢেপ্‌সি মাগী ও, ওর কাছে গেলে কদ্দিন বাঁচবে ও রোগা ছেলে?

—যেতে দিয়ো না।

—ওমা, আমার কী হবে! কী কোরে আটকাবো?

—ধরো। চৌকি ছাও।

—কী যে বলো তুমি! চৌকি দিয়ে বুঝি ধরা যায় ওসব? গাইগয়লা রাজি, কী কোরবে কাজি? তুমি বুঝি বোঝো না কিছু? কচি খোকা গো!

তারণের গালে চুমো খায় মন্থরা। তারণ যাতে তেঁতে না ওঠে ফের। মন্থরার লক্ষ্য সেখানটাই।

—বোলচি, একখানা কাজ দেখে ফ্যালো। ঘুমোচ্চো নাকি? বোলেই আবার গা ঝাকানি ছায় মন্থরা।

—কই না।

—বোলচি, রায়পটোলের ঐ মেয়েটা হোলে ক্যামন হয়?

—কার মেয়ে?

—ক্যানো, ঝোড়োর।

—ও, মাদারী?

—হ্যাঁ। খাসা মেয়ে। বেশ ডাগর-ডোগর। গড়ন-পিটনও ভালো।

—তা মন্দ হয় না। ঝোড়ো বেহাই হোলে তোমার খুব মজা হবে।

—ক্যানো!

—মানে, আমি তো বুড়ো হোয়ে গেছি। ও আমার চেয়ে অনেক ডাঁটো আছে। তুমিও ডাঁটো। ডাঁটো বেহাই বেয়ানে রঙ-তামাশা দুই-ই চলবে।

—যাও। তারণের গাল টিপে ছ্যায় মন্থরা।

—যাও না, আমি ঠিক কথা বলি বৌ। ঝোড়ো বেয়াই হোলে, তোমার অনেক দিনের সাধ-আহ্লাদ পুরবে।

তারণের এ উক্তি মন্থরার বুকে লুকোনো কোনো এক দুর্বল মনের গায় একটুকরো পাটকেলের মতন আঘাত দেয়। সে বোঝে, কোথাকার ঢিল কোথায় চেলেছে তারণ। বলে:

—তুমি কি আজো সন্দ কর আমাকে? ছিঃ!

তারণ জবাব ছ্যায়, সন্দ না বৌ। মনে মনে ভেবে ছাখো তুমি।

এ-কথা অনেকদিন হোয়েচে। আর মন্থরা ভেবেও দেখেচে অনেকদিন। তারণের ধারণা বর্ণে বর্ণে সত্যি। কিন্তু মন্থরার দুর্বল মন মুখোষ পরা থেকে গেছে। আজো তেমনি রয়ে যায়। ফোঁস কোরে নিঃশ্বেস ফেলে সে। তারণ অন্ধকারে হাত বুলোয় মন্থরার গোল গালে। টের পায়, জলের ধারায় তার গাল ভিজে স্যাৎসেঁতে।

—তোমার চোখে জল ক্যান? কাঁদছ নাকি ও বৌ? তারণ জিগ্যেস করে।

—না, ভারি গলায় মন্থরা উত্তর ছ্যায়।

মন্থরাকে পাঁজা কোরে জড়িয়ে ধরে তারণ। চোখের জল মোছাতে মোছাতে বলে:

—তুমি রঙ-তামাশাও বোঝোনা বৌ! কিসের সন্দ তোমার ওপোর আমার? ঝোড়োর সাথে তোমার কিছু ভালোবাসা হয়নি। বিয়ের সম্বন্ধ হোয়েছিলো। তখোন তোমার বয়েস আর কত? পাঁচ কি ছয়। আর ওর

বয়েস পনরো কি ষোল। সে কি ভালোবাসা করার বয়েস? যে আমি সন্দ কোরবো তোমারে?

তারণের এ উক্তি খানিকটে সত্যি। বিয়ের সব ঠিকঠাক হোয়ে গিয়েছিলো ওদের। এমন কি পাকা দেখা পর্যন্ত। হঠাৎ একদিন মন্থরার মা গেল বেরিয়ে। কেঁচে গেলো পাকা সম্বন্ধ। কিন্তু তার দরুণ আঘাত পেলো না কেউ। এ ঘটনার অনেকদিন পর, তার আগেই অবিশ্যি মন্থরার বিয়ে হোয়ে গেছে, তারণ শুনলো ঝোড়োর সাথে ওর বিয়ের কথা হোয়েছিলো। আর সে সম্বন্ধ গড়িয়েও ছিল কতোদূর। মন্থরা তখোন ভরা যুবতী। পছন্দসই চোখ পেয়েছে তখোন ও। সে চোখ দিয়ে ঝোড়োকে দেখলো। দেখল দিব্যি তাড়গা যোয়ান পুরুষ। তারণের মতন পেট মোটা, হাত পা নড়নড়ি না। স্বাস্থ্যবতী মন্থরার ও-স্বামী হোলে মানান হোতো খুব। এমনি একটু আবছা কামনা ওর মনের কোণায় লুকোনো ছিলো। এর বেশি আর কিছুই না। মন্থরার বাপের বাড়ি সাদিপুর। ঝোড়োদের বাড়ীর পাশেই। প্রসঙ্গক্রমে বাপের বাড়ির গল্প এসে পড়লে ঝোড়োর কথা কোনো না কোনো অজুহাতে তুলতো মন্থরা।

ওর বলিষ্ঠ স্বাস্থ্যর কথা। যেমনি গাছুড়ে তেমনি মাছুড়েও ছিল ঝোড়ো। দেড়ো-দেড়ো খেজুর-নারকেল গাছ বাইতে ওর জুড়ি কেউ ছিল না পাড়ায়। ছিলো না ওস্তাদ মাছ শিকারীও। মন্থরার সাথে ঝোড়োর বিয়ের পাকা সম্বন্ধর ব্যাপারটা একদিন তারণের কানে আসে। সেই থেকেই তারণের মনে একটা সন্দেহ কাঁটার মতন খোঁচাতে থাকে। সে খোঁচার বদলে তারণও মাঝে মাঝে মন্থরাকে খোঁচা দিতে ছাড়ে না।

ফোঁস করে নিঃশ্বেস ফেলে মন্থরা। বলে:

—সন্দ তুমি কর ঠিক। তা করো গে। আমার মনে পাপ নেই।

—তবে আর কী? তবে তুমি কাঁদো ক্যানো? শশের বিয়ে মাদারীর সাথে দেবোই দেবো। কিন্তু অগ্রাণ মাস না এলে হয় কী কোরে?

বিস্ফারিত হোয়ে ওঠে মন্থরার ডাগর চোখ। বলে:

—ক্যান?

—হাতে-গাঁটে পয়সা কই এখোন? "ভাস্না" কেটে আসি দখ্যিণ তে।

—তবে সম্বন্ধ ঠিক করে রাখো।

—তাই হবে। কালকে হাটবার। পরশু যাবো। তুমি একটু তামাক সেজে আনো বৌ।

বালিশের তলা থেকে দিয়াশালাই বের কোরে জ্বেলে মেটে টেমি ধরায় মন্থরা। ওঠে। চুঙো থেকে তামাক এনে সাজে। মালসায় রাখা ঘুঁটের আগুন তোলে কলকেয়। ফুঁ দিয়ে তামাক ধরায়। তারপর কলকেটা নোলচের ওপোর চড়িয়ে তারণের হাতে এনে ছায়। উপুড় হোয়ে শুয়ে হুঁকো টানে তারণ? সোনামুখীর পশ্চিম পারে গ্রামান্তের খেজুর বনে শেয়াল ডাকে— বিজ্ঞপ্তি জানায় রাতের শেষের।

হাটবারের পরদিন সকালে উঠে তারণ, ভুতো আর ছোটোকানাইকে ডাকে:

—ওরে ভুতো, ঝক্ কোরে তোরা সব গুছিয়ে নে। এখনি যেতে হবে বাবা।

গতকাল অবিশ্যি বলা ছিলো ওদের। তাই কলার বাসনার খার দিয়ে কাপড় গামছাগুলো কেচে রেখেছিলো ওরা। ধোপা কাচানো কাপড় এরা কোনদিন পরতে পায় না। তেমন ভালো কাপড় এদের কোনোদিন নেই। আর থাকলেও ওদের কাপড় ধোপারা কাচবে না। হাট আলাদা। ঘাট আলাদা, এমনকি শ্মশান আলাদা যাদের, ধোপা তাদের কাপড় কাচবে না, নাপিত কামাবে না। এতো সোজা কথা। পুজো, বিয়ে কি অন্নপ্রাশনের বিদেয় বাজনা বাজিয়ে দু একখানা ভালো পুরণো কাপড় বখশিশ্ পায় বটে ওরা কিন্তু সেগুলো বাড়ি কাচিয়েই পরতে হয়।

তেলার পুকুর থেকে ঝুপঝাপ কোরে ডুব দিয়ে আসে ছোটোকানাই-ভুতো। আর তারণ উঠোনে দাঁড়িয়েই চান সেরে নেয়, এক ভাঁড় জল ঢেলে মাথায়। অনেকদিন পরে তারণের হাঁটুর নিচেয় কাপড় নেমেচে। মানে, আট হাতী একখানা ইঞ্চি পেড়ে ধুতি পরেছে সে। ধুতিটা কেনা না। সুশান্তর বাদ দেওয়া, শৈলজা দিয়েছেন ওকে। গায়ে পরেছে ফতুয়া। মন্নুঠাকুরের কাছ থেকে পাওয়া। খড় কেটে গাদি দিয়ে আসার দিন। ফতুয়ার ওপোর জড়িয়েছে গামছাখানা। ভুতো-ছোটোকানাই বরাবর একটু সৌখীন। ওরা পরে নেয় সরু পেড়ে দুখানা মিহি ধুতি। কাঁধে ফেলে ছায় একটা কালো কোট আর একটা নীল রঙের কামিজ। দুজনার হাতে দুজোড়া লাল মোজা জুতো। রঙ চটা। কস্মিনকালে কালি দেওয়া হয়নি। এ পোষাক— সবগুলোই কেশবপুর সাহা বাড়ীর পাওয়া। বিয়ে বাজানোর বখশিশ্। তারণ চলে খালি পায়। জীবনে জুতো পরেনি ও কোনোদিন। একলা তারণ বোলে নয়, এ পাড়ার পৌনে ষোলো আনা লোক ওর দলের।

—আসি গে আমরা বৌ।

—আজকে ফেরবে তো ? মন্থরা জিজ্ঞেস করে।

—বোলতে পারছিনে। জানতো মুচনে ঘোটন।

—যেতে যেতে ফিরে দাঁড়ায় তারণ। বলে :

—হ্যাদে, শোনচো, গণ্ডা দুচার পয়সা দ্যাও বৌ। বিড়ি-টিড়ি কিনতে হবেনে। আর দেশলুই।

আঁচলের মুড়ো খুলে চার আনা পয়সা দ্যায় মন্থরা।

কেশবপুর বাজার! তারণ বিড়ি, দিয়াশলায় কেনে। ভূতো-ছোটো-কানাইকে দ্যায়। খচ্ করে একটা কাঠি জ্বালে। তিন বাপ-ব্যেটা বিড়ি ধরায় এবং টানতে টানতে আলতাপোলের রাস্তা ধরে।

ভূতো জিগ্যেস করে :

—কোন পথে যাবে কাকা ?

তারণ বলে :

—ডুমুরে সেজেড়ার মধ্যি দিয়ে চুকনগর বাঁয় ফেলে সিধে গিয়ে উঠবো।

ছোটোকানাই প্রতিবাদ করে :

—ও-পথ বড্ডো বেড় হবে কাকা।

ভূতো চটে ওঠে :

—তবে ঠ্যাকো হবে কোন্ পথ ?

—ক্যানো, ডুমুরে—সেজেরা যাবো কি কোত্তি ? আলতা পোল ছাড়িয়ে বাঁয়ে ভাঙবো। কলাটুপির বিল আড়াআড়ি পাড়ি দেবো। সামনেই রায়-পটল। মরতে যাব ডুমুরে সেজেড়ায় ?

অতঃপর ছোটোকানাই-এর নির্দেশ মাফিক পথ ধরেই চলে।

রায়পটলের বাওর কানায় মুচিপাড়া। দূর থেকেই দ্যাখা যায়। ছোটো ছোটো কুঁড়েঘরগুলো উটের পিঠের মতন ভামর দেওয়া মটকা। পাত কাঠির বেড়া। ভাঙাচুরো ফাটা দেওয়াল। ধোসে পড়া নিচু বারান্দার কালি। শাদা কালো-রাঙা ছাগোলের পাল। হাঁস-মুরগীর ঝাঁক। ডাল-কুত্তোর দল।

কুটুমবাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে ভূতো-কানাই জামা গায় দেয়। বাওড়ের ঘাটে নেমে পা ধুয়ে জুতো পরে। চিরুনির অভাবে ভিজে আঙুল দিয়ে উশকো-খুশকো চুল ঠিক করে নেয়।

উঠোনের দখিন কোণায় ছাতরানো একটা ভ্যাপল গাছ। তারি তলায় বোসে ঝোড়ো ভোল বুনচে। আর সতরো আঠারো বছরের ছেলে বুদো তলতা বাঁশ চিরে বানাচ্চে শলা। অচেনা আগন্তুকদের দেখে তিন চারটে খেকী কুকুর ঘেউ-ঘেউ কোরে ডাকতে ডাকতে ছুটে আসে। বুদো লাঠি উঁচিয়ে ধোরে তাড়িয়ে ছায় তাদের।

—বড়দা! এসো, এসো। তবু ভালো। পুবের সুয্যি পচ্চিমে উঠলো। ভালো তো দাদা? বাড়ির সব ভাল আছে? ঝোড়ো জিজ্ঞেস করে।

—হাঁ্যা, ভাল। তোমরা সব ভালো তো? তারণ বলে।

—বেঁচে আছি কোনোরকমে বড়দা। ওরে বুদো, বসার জায়গা নিয়ে আয়।

বুদো খেজুর পাতার পাটি পেতে ছায় উঠোনে।

—দাঁড়িয়ে আছিস? পা ধোয়ার জল নিয়ে আয় তাড়াতাড়ি। তামাক সাজ। ঝোড়ো ধমক ছায়।

—হোচ্চে, হোচ্চে। এতো ব্যস্ত কিসের? তারণ বলে।

—ভূতো, বাবা ভাল আছো তো? এ খোকা কে? ছোটোকানাইকে লক্ষ্য কোরে জিজ্ঞেস করে ঝোড়ো।

তারণ উত্তর ছায়:

—চিনলে না! ও হরি! ওর ভাই কানাই।

—কানাই। আরে মরণ। ওতো বেশ বড়োসড়ো হয়ে গেছে! ওরে দেখে এসেছিলাম এক ফুটখানেক। গোঁফ দাড়ি উঠে গেছে এর মধ্যে।

—তা উঠবে না? তুমি গেছিলে সেকি আজগের কথা, শশে যেবার হয়।

মেটে বদনায় কোরে পা ধোয়ার জল এনে দেয় বুদো। তামাক সেজে আনে।

তারণ পা ধুয়ে পাটির ওপোর বোসে তামাক টানতে থাকে এমন সময় মাদারি আর তার মা চান করে ফেরে। মা ও মেয়ের কাঁখে সমান ভারী মেটে কলসী। যার ভারে ছোট্ট সরু মাজা ভেঙে পড়চে বালিকার। ন-দশ বছর বয়েস হবে। চাপা রঙ্। একপিঠ চুল। গোলগাল চেহারা। তারণ ভূতোরা চেয়ে চেয়ে দেখতে থাকল। বুঝলো এই ঝোড়োর মেয়ে মাদারি। হয়তো বা শশীর ভাবি বৌ।

দু-তিনজন কুটুম। ঘরে অনেক কিছু অযোগাড়। বিশেষ কোরে আজ হাটবার। হাটের দিন সবকিছু বাড়ন্ত। রাতে হাট কোরে ফিরলে তখন

আবার খানিকটা স্বচ্ছলতা ফিরবে।

কুটুমদের কাছ থেকে ঝোড়ো উঠে গিয়ে চুপিসারে বৌকে জিজ্ঞেস করে :

—রান্না হবে কী গো? চাল-টাল আছে?

বৌ চাঁপা ঘাড় নীচু করে বলে :

—অল্প চাট্টে আছে। খুচিখানেকের মতন।

—মোটে! ওতে কী হবেনে?

ওতে যে হবে না. সেকি চাঁপা জানে না? জানে। সে আরো জানে, ও চালে ওদের চারজনেরি তাই হওয়া টানাটানি। তার ওপোর আরো বাড়তি তিনজন। তবে? ও ভেবে রেখেছিলো, পাতলা পাতলা ফ্যানে ভাত রেঁধে কোনো রকমে দুপোরটা চালিয়ে দেবে। তারপর হাট কোরে চাল-ডাল মাছ তরকারি এনে পেটভরে সব খাবে তখোন।

—তাই কি হয়?

—তাহলে?

—দেখি, রুপোমাসির কাছে যদি হাওলত পাই।

খানিকটে আশ্বস্ত হয় ঝোড়ো। বলে :

—তাই যাও। দেখে এসো গে। বোলো কাল দিয়ে দেবো।

বিধবা রুপোমাসী। ওদের ঘরের পেছনে তার ঘর। ছেলেমেয়ে নেই মাসীর। হয়ওনি কোনদিন। একলা মাত্তর সে। শক্তি আছে, সামর্থ আছে। রোজ ধান ভানে। যে চাল পায় খেয়ে-দেয়ে কিছু উদ্বৃত্ত থাকে। কাপড়ের মধ্যে খুঁচিটা লুকিয়ে নিয়ে চাঁপা গিয়ে ধরে রুপোমাসীকে। আজ বোলে নয়। এমন ধরা প্রায়ই ধরে থাকে। কোনোদিন মাসী ফেরায় না। আজও ফেরালো না।

আঁচোলের মুড়োয় চাল নিয়ে বাড়ি ফেরে চাঁপা-বৌ। ঝোড়ো শুধোয় :

—পেয়েচো?

ইতিবোধক ঘাড় নাড়ে চাঁপা।

—দোকানে যেতে হবে তো? কি আনতে হবে?

—কিছুই তো নেই। তেল, নুন, ঝাল। বলে চাঁপা-বৌ।

—আছে কিছু তোমার কাছে?

ঘাড় নীচু করে চাঁপা।

—এক কাজ কর, পিতলের বাটিটে এনে ভ্যাও। দোকানে রেখে জিনিষ-পত্তর নিয়ে আসি এখোন। তারপর ছাড়িয়ে আনা যাবে।

চাঁপা-বৌ বাটিটা এনে দেয়। কোঁচার মুড়োয় জড়িয়ে তলপেটে গুঁজে নেয় সেটা, ঝোড়ো বলে :

—কই বোতল-টোতল ভ্যাও।

যেতে যেতে ফিরে আসে ঝোড়ো। জিজ্ঞেস করে :

—ডাল-টাল আনব তো?

—এনো গে।

রায়পটোল গেরামখানা অজ পাড়াগাঁ। একখানা মাত্তর ছোট্টো মুদির দোকান। মালিক ভক্ত দাস সাধু। এই ছোট্টো দোকানে দোকানদারী কোরেই ভক্ত দাস ভুঁড়ি বাগিয়েচে। নাদুস-নুদুস কান্তি। ছোট ছোট কোরে চুল ছাঁটা। গলায় তিন পেঁচী তুলসীর মালা। ভক্ত দাসের ডাক নাম সাধু। চওড়া একখানা চৌকির ওপোর গ্যাঁট হয়ে বসে বেচা-কেনা করে ভক্ত দাস। আর খদ্দেরদের সাথে রাতদিন অনর্গল তড়পায়। তার বক্তৃতার প্রতিপাদ্য বিষয় হোচ্চে জিনিষ-পত্তরের দর-দাম সম্পর্কীয়। এ-চালানে তেলের দর সেরে চার আনা বেড়ে গেছে। সামনের চালানে তেলের বাজারে আগুন লাগবে। সরষে মিলচে না। নুনের জাহাজ আটকে গেছে। টাকা-টাকা নুনের সের হোলো বলে। কেশবপুরের মোকামে নারকেল তেলের বাজার দশ টাকায় উঠে গেছে। আগের চালান নরম দরে কেনা ছিল। তাই সাড়ে ন'টাকায় দিতে পারছি। আর পারব না। বস্তুতঃ ভক্ত দাসের দোকানে সব মালের দর আগুন। গেঁয়ো খদ্দেররা জলের মতন ঠাণ্ডা। বিনা প্রতিবাদে এ অগ্নিমূল্য তারা মেনে নেয়।

এ হেন ভক্ত দাসের দোকানে পৌঁছয় ঝোড়ো। তলপেটের নীচেয় লুকানো পিতলের বাটি বের করে। বলে :

—সাধুদা, বাট্‌টে রাখ। আর কিছু মাল-পত্তর ভ্যাও। বলতে বলতে চালের বাইরে দাঁড়িয়ে বাটিটা সাধুর সামনে রেখে ভ্যায় ঝোড়ো। সাধু সন্দর্শনে এ-বাটি পেরাই আসা-যাওয়া করে। তাই এ-বাটির মুখ চেনা ভক্ত দাসের।

আবার ঝামেলা বাধালি ঝোড়ো। কেটে পড় বাবা, কেটে পড়। নিত্যি নিত্যি এক পিতলের বাটি রেখে কে মাল ভ্যায় তোকে? আর কেই বা হিসেব-কিতেব মনে করে রাখে?

—না দিলে হচ্ছে না সাধুদা। বাড়ি কুটুম এয়েচে। তোমায় খাতার কোণে একটু খোঁচা দিয়ে থো। হাটতে ফেরার বেলায় দিয়ে যাবো।

ঝোড়োর মুখের পানে চেয়ে ভক্ত দাসের দয়া হয়। বিশেষ কোরে সে জানে, ঝোড়ো কথা-কাজে বেঠিক না। তাই তার প্রার্থনা মঞ্জুর হয়। তবু ভক্ত দাস মুদী খোঁচা দিতে ছাড়ে না। বলে :

—মাল দিলাম। কিন্তু দাম ওবেলা দিয়ে যাবি। বুঝলি ঝোড়ো? গাঙ পার হোয়ে কুমুরকে যেন কলা দেখাস নে।

—সের'ম বাবায় জন্ম দেয়নি আমাকে সাধুদা।

তেল নুন আর মুসুর ডাল সওদা করে বাড়ি ফেরে ঝোড়ো। মাচা থেকে পুঁই শাক কেটে ছায়। আর একটা চালকুমড়োর জালি। ডাল, শাক-চচ্চড়ি আর কুমড়ো ছেচকি রান্না হয়। একটা লঙ্কা পোড়া কি একটা কাঁচা পেঁয়াজ দিয়ে পেরায় দুপোর খাওয়া হয়ে যায়। সেখানে আজ তিন তিন ভাগ। কম কথা নয়। কি গেরস্থ কি কুটুম দু' পথ্যেরই পরিতৃপ্ত ভোজন হয়।

খাওয়া-দাওয়ার পর তারণের হোয়ে ভূতোই কথা পাড়ে। অবিশ্যি তারণের সম্মতি মাফিক। যেহেতু তারণ মাতব্বর মানুষ। নিজের ছেলের জন্য সে কথা পাড়তে পারে না। তাতে মাতব্বরি মান খর্ব হয়।

—আমরা এখন চলে যাব কাকা। তারপর···

ঝোড়ো বাধা ছায় :

—ক্ষেপেছ নাকি বাপু? এখোনি চলে যাবে।

—তা হোক। আবার আসা হবে বড়দা। তারণ উত্তর ছায়।

—এসেচো আর আসবে।

—তা বলা যায়? ভগবান যদি করেন। তাহলে রাস্তা পড়ে যাবে তোমার বাড়ি বড়দা।

—বেশ তো। তা সকালে যেও। কখেনো আস না। যদি বা এলে, তা খাওয়া-লওয়া হোলো না।

বিস্ময় প্রকাশ করে তারণ :

—বল কী বড়দা! দু-তিন ভাগে দিয়ে খেলাম। আরো বলো খাওয়া-লওয়া হল না! বাড়ি আমরা কী খাই?

—অতোশতো শুনতে চাচ্চিনে ভাই। হাটবার। হাট করে আসি গে। রাতটুকু চোখ-কান বুজে থাক। সকালে যেও বড়দা।

—কিন্তু যে জন্যি এলাম, তার কোন…

ঝোড়োর বিস্মিত চোখ ফালুক-ফালুক করে। ভূতো তারণের পানে তাকায়। তারপর অস্ফুট গলায় জিগ্যেস করে :

—কী বড়দা ?

উত্তর দ্যায় ভূতো :

—আমরা এসেচি কাকা, শশের একখান কাজের জন্যি। তোমার মেয়েটা যদি দ্যাও তো থাকবে ভাল। খাওয়া-পরার কষ্ট পাবে না। মুখবন্ধটা করে দেয় ভূতো।

—ও-ও। এই কথা ? তা সে তো আমার সৌভাগ্যি। বড়দা মাতব্বর মানুষ। উনার ঘরে যদি আমার মেয়ে যায়, সে তো ভাগ্যির জোর বাবা ভূতো। তা বেশ। হাটতে আসিগে তারপর কথাবার্তা হবে নে।

—চলো, আমাদের হাট দেখে আসো বড়দা।

ডোল বেচে হাট কোরে আর-আর দিনের চেয়ে একটু সকালেই ফেরে আজ ঝোড়ো। হাটবেসাতি প্রকাণ্ড এক গজাল মাছ। আর ও-বেলা কুটুমদের জলখাবার দিতে পারেনি। তাই ছোট্ট এক হাঁড়ি জিবে গজা-জিলিপি নিয়ে আসে। তখন মাদারির বিয়ে সম্পর্কে কোনো কথা বলার অবকাশ পায়নি ঝোড়ো চাঁপার সাথে। কুটুমদের জল খাবার দিয়ে এসে রান্নাঘরে বসে এখোন কথা পাড়ে সে :

—দ্যাখো, যদি মত কর বৌ, তবে মাতব্বরদের ডেকে আনি। ছেলে দেখেচো তো ?

—দেখেচি। আর বছর তো এসেছিলো ওর মার সাথে।

—মত হয় ?

—তোমার যদি মত হয় তবে আমার আর অমত কিসে ?

মন্থরা এপাড়ার মেয়ে। এক সময় ঝোড়োর সাথে ওর বিয়ের পাকাপাকি ঠিকঠাক হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কেঁচে যায় সে-পাকা দ্যাখা। তবু মনের কোথাও একটা গিট থেকে যায়। সেটা আর খুলল না। ঐ টনটনে বাঁধনটাই মন্থরাকে পেয়ারই টেনে আনতো রায়পটল। এখোনো আনে। এ ক্ষেত্রে এ-বিয়েতে ঝোড়ো প্রতিকূল রায় দিতে পারে না। বলে :

—ভাল ঘর। খাসা ছেলে। তাহলে মাতব্বরদের ডেকে আনি বৌ ?

—আনো গে। মাছ কুটতে কুটতে জবাব দ্যায় চাঁপা।

ঝোড়ো রান্নাঘর থেকে উঠে আসে। হাতনেয় পাটির ওপোর বসে আছে তারণরা। বুদো ঘন ঘন তামাক সরবরাহ করচে। ঝোড়ো বলে :

—বড়দা অনুমতি চাচ্চি।

—কী?

—দু-একজন মাতব্বর ডেকে আনি তা হলে?

—তা বেশ তো। আনো গে।

পনেরো-কুড়িঘর লোক নিয়ে রায়পটলের মুচিপাড়া। এ পাড়ার মাতব্বর চরণদাস আর সরণদাস। দুজনেরি বয়েস ষাটের ওপোর। ঝোড়োর ডাকে মাতব্বররা হুকো টানতে টানতে এসে হাজির হয়। তারণ ওদের সমাজের এক ডাকে চেনা মাতব্বর। আরো এ গাঁয়ের জামাই। চরণ-সরণরা অতোটা তালেবর না হোলেও খাটো না একেবারে। তাই প্রথমপর্ব কাটে মাতব্বরে-মাতব্বরে কোলাকুলিতে। তারপর কুশলবার্তা জিগ্যেসা। এ-পর্বেও খানিক সময় কেটে যায়। এরপর ঝোড়ো মজলিসের সামনে গড় হোয়ে মাথা ঠেকায়। এবং মাতব্বরদের উদ্দেশে হাত জোড় করে জানায় :

—বড়দা, উনারা এসেছে মাদারিকে দেখতে। উনার ঘরে নিয়ে যেতে চান। আমি ছেলেমানুষ। বুঝিনে-সুঝিনে। যাতে যা ভালো হয় তোমরা কোরে-কম্মে দ্যাও।

বার দু-তিন কেশে নিয়ে চরণদাস জিগ্যেস করে :

—তা বিয়ে কবে হচ্চে মাতব্বর? এ মাসে তো?

—না, এ মাসে হচ্চে কী করে? হতে আর অগ্রাণ মাস "ভাসনা" কেটে আসবো। তারপর শশের জন্যি জোড়া পাঁঠা দিয়ে কালিপুজো মানসা রয়েছে। তা শোধ দেব। তবে তো!

—তা বেশ। সম্বন্ধ করে রাখো। বলি দেনা-পাওনা ঠিকঠাক হয়ে গেছে? ও ঝোড়ো—।

ঝোড়োর হয়ে উত্তর দ্যায় তারণ :

—দেনা-পাওনা ঠিক করবে বড়দা! তবে আর তোমাদের ডেকেচে ক্যানো? ওকি মাতব্বর?

—তা বেশ বলো কী দিবা? তুমি মাতব্বর। তোমার সাথে আবার দরাদরি কী? বলো, কতো পণ দিবা?

—তুমিই বলো না, কী চাও?

—এখোন ঝোড়োর তো আর ছেলেমেয়ে না। ঐ একমাত্তর। ওর বিয়েটা একটু ঘটা কোরে দিতে চায়। শ'চারেক টাকা দিও।

বিস্ফারিত হোয়ে ওঠে তারণের চোখ।

চারশ'! বলো কী মাতব্বর!

—বাঃ, তা দেবে না! মাদারি তো স্যায়না মেয়ে। ডাগর-ডোগরও ভালো। চারশ' টাকা দিয়ে কে না নেবে ওরে? ভীমচাঁদের মেয়ে সে তো হাঁড়ির তলা। পেঁতি জিয়েলপানা। মাংস বলতে নেই গায়। পাত ফড়িঙ। তাই এক কথায় চারশ' টাকা দিয়ে নিয়ে গেল। মাতব্বর-চরণদাস-সরণদাসদের সাথে সাথে অ-মাতব্বররাও অনেকে এসেচে পাড়া থেকে। মেয়েমহলও বাদ যায়নি। একজন অ-মাতব্বর জিজ্ঞেস করে:

ছেলেরা গেওনা দেবে কী? কী?

সরণদাস চটে ওঠে:

—থাম্. থাম্। তুই বেজায় তালেবর হোয়েচিস্ সেবক।

তারণ প্রতিবাদ করে:

—না, না। থামবে ক্যানো? ঠিক বোলেচে ও। আচ্ছা, ওর কথাটার জবাব দিই আগে। সিঁথে পাটি দেবো। কানের মাছি মাকড়ী। গলায় আমড়া আটি মাদুলি। হাতের বাজু আর আটগাছা চুড়ি। কাঁকালের বিছে। দু-গাছা কোরে চারগাছা জলতরঙ্গ মল। আর সোনার মধ্যি নাকের নাকচাবি।

গয়নার ফিরিস্তি পেয়ে মজলিশে কোনো প্রতিবাদ ওঠে না। কেনো না পুত্রবধূর সারা গা গয়না দিয়ে মুড়ে দিতে চাইচে তারণ।

উল্লসিত হোয়ে ওঠে চরণ মাতব্বর। বলে:

—বাঃ! এই তো। মাতব্বর মানুষের সাথে আবার মেলা কথা কইতে হবে কিসের লেগে? বুঝদার মানুষ তুমি। এবার পণের টাকাটা ফয়সালা কোরে ফ্যালো।

তারণ এক বাগা মানুষ। রোখভরে বোলে ওঠে:

—টাকা দেবো সাড়ে তিনশ'। এরপরে যদি কেউ অনুরোধ করো এক ঘষা পয়সাও দিতে পারবো না।

তারণের মন্তব্যে চরণ মাতব্বর বার দুই ঢোক গিলে নিয়ে ঝোড়োর দিকে চোখ চেয়ে বলে:

—শুনলে তো ঝোড়ো? এখোন তোমার কি মত? বোলে ফ্যালো। হাজার হোক তোমার মেয়ে।

আপনাকে ছেলেমানুষ বোলে পরিচয় দিলেও ঝোড়োর বয়েস পঞ্চাশের ওপোর। মাতব্বর না হোলেও মাতব্বরী বুদ্ধি থেকে তাকে খারিচ করা যায় না। তাই মাতব্বরদের ওপোর বরাত না দিয়ে সিধে বোলে ফেলে:

—লেবু কচলে আর লাভ কী? রাত পোয়ালে উনি যখন কুটুম হবে?

—এই তো হোয়ে গ্যালো।

বোলেই উল্লাসে লাফিয়ে ওঠে চরণ মাতব্বর। উল্লাসিত মাতব্বরমহল।

তারণ বলে:

—একটা কথা আছে আমার মাতব্বরদের কাছে।

চরণ জিগ্যেস করে:

—কী গো?

—বিয়ের দিন-খ্যান দেখা হবে কিন্তু আমাদের ওখেনে গিয়ে। আমাদের ওখেনে ঠাকুর আছে। তিনিই পাঁজি দেখে বোলে দেবে। তা বোলে মুচনে বিয়ে আমি দেবো না ছেলের। গোটা মজলিশ হেসে ওঠে তারণের এ মন্তব্যে।

মুচনে বিয়ের মানে, হাটবারের পরদিন বিয়ে। বার, মাস, তিথি, লগ্ন, কি মৃতহি বুক যোগের ধার না ধেরে। মনুঠাকুরের গাঁয়ের মানুষ তারণ। এ ধরণের বিয়ের ওপোর হাড়ে চটা।

মুচিপাড়া মন থেকে সাঁইপণ্ডিতকে একরকম মুছেই ফেলেচে। পারেনি একমাত্তর ময়না। অবসর অনবসরে এমন দিন নেই, ওর স্মৃতিপটে ভেসে ওঠে না সে মানুষটি। যখোনই সোতার ধারে যায় ইস্কুলের ভিটেয় দাঁড়িয়ে নীরবে চোখের জল ফেলে সেই অগ্নিদগ্ধ পুরুষের উদ্দেশে। ঝলসে ওঠে ময়নার বুকখানা তার শোচনীয় মৃত্যু কথা স্মরণ কোরে। বুড়িভদ্দরে গেলে শ্মশানের দিক না ঘুরে বাড়ি ফেরে না ময়না। লুকিয়ে লুকিয়ে চিতের ধারে যায়। কাঠ কুড়োনোর ছল করে। চোখের জলে ভিজোয় চিতের বুক। যে চিতেয় সাঁইপণ্ডিতের মরদেহ ভস্মীভূত করা হোয়েছিলো। যেদিন সাঁইপণ্ডিত মারা গেলেন, ওর বুকে আর একবার নোতুন কোরে বাজল কানাই ঢুলির শোক। সে আগুন আর নিবলো না, তার শিখা মন্দোদরীর মতন বুঝি হোয়ে থাকলো ওর আয়তি চিহ্ন। যে সময় কানাই ঢুলি মারা যায় নেহাৎ কাঁচা বয়েস তখোন ওর। খুব ছোট

খেয়েছিল তাই। খাবেই তো। ভরা যৌবনের সাথী হারানোর চোট তো। তবু সতীশের মুখের পানে চেয়ে সে ধাক্কা খানিকটে সামলে নিয়েছিলো ও। বেঁচে থাকার তাগিদকে তুচ্ছতা দিয়ে ফিরোতে পারেনি সেদিন, কিন্তু আজ এ কী? বুকের মধ্যে যে প্রাণশক্তিটুকুন বেঁচে আছে, সে একান্ত সীমিত। দেহকে নাড়া-চাড়া কোরে নিয়ে বেড়ানোর মতন শুধু। তাতে মদ নেই, মধু নেই, নেই কল-কল্লোল। কে বুঝবে ময়নার এ-ব্যথাতুর জীবনকে? বোঝাবেই বা কাকে? কোথাও যায় না ও। ওর কাছেও কেউ আসে না। সাঁইপণ্ডিতকে জড়িয়ে ওর সম্পর্কে যে কথাটা পাড়ায় রটে গিয়েছিলো, অল্পবিস্তর সবারই মনে তা ছায়াপাত করেচে। এমন কি সাঁইপণ্ডিত যে শহীদ হোলেন তার মোটা কারণ ময়না। এমন মন্তব্যও কোরেচে অনেকে। কিন্তু কেন এ অসুন্দর মন্তব্য? সাঁইপণ্ডিতের কতোটুকুন সাহচর্যে গিয়েছিলো সে? যেটুকু গিয়েছিলো সে তো পবিত্রতায় ভাস্বর। রামায়ণী কথার আলোকসম্পাতে ঝলমল। কে না বলবে এ পাড়ায় তাঁর অবদান অনস্বীকার্য? ন্যায়ের তুলাদণ্ড হাতে ধরে কেউ পারবে না বোলতে।

কিন্তু মানুষের প্রকৃতি তো বিপরীতধর্মী। গুণ-ধর্মকে তুলে ফেলে সে। আয়াস স্বীকার কোরে দোষ-ত্রুটি খুঁচড়ে বের কোরে অনেক সময় বা গোড়ে-পিটে নিয়ে ফলাও কোরে বিজ্ঞাপন দেয়। ময়না কিন্তু তা পারেনি। পারেনি আর একজন, সে বেদানা। বেদানাও সাঁইপণ্ডিতের কাছে ঋণী। তার ছেলে হাজরার দিক থেকে। কিন্তু এ দুই নারীই তো এ পাড়ায় উপেখ্যিতা। কেউ এদের আমল দেয় না। যদিও রাখাল মরে যাওয়ার পর সম্মিলিত মাতব্বরদের সম্মতি বনমালী ব্যাপারীর সাথে ওর বিয়ে দিয়েছিলো। যদিও অনুমোদনক্রমে বিয়ের আসরে বেদানা মাতব্বরদের পা ধোয়াতে পেরেছিলো। পান-সুপারি বিলি কোরতেও পেরেছিলো। আর ভোজসভায় ওর হাতের বৌ-ভাতও খেয়েছিলো সকলে। কিন্তু পরদিন এ হেউ-ঢেউ ভাব আর রইলো না। সাঁইপণ্ডিত মারা যাওয়ার পর ময়নার দশার খাতে মিলল এসে বেদানার দশা রাখাল মরে যাওয়ার পর। নষ্ট মেয়ে মানুষ এরা দুজনেই। তাই মেয়েমহলই 'এক ঘরে' করলে এদের আগে। কিন্তু জীবমাত্রই সামাজিক। তাই এই দুই 'এক ঘরে' এক হোয়ে পাড়ার এক কোণে গণ্ডিবদ্ধ সামাজিক জীবন গড়ে তুললো। আর ঐ সোনামুখী বিল থেকে উঠে আসা শীর্ণ সোঁতার মতনই বোয়ে চললো ওদের জীবনধারা। এরা কেউ পাড়ায় কারো বাড়ী যায় না।

যাওয়ার সময়ও হয় না ওদের। রোজ সকালে সুরপুর কপালীপাড়ায় যায় ধান ভানতে। কোনো কোনোদিন ফিরতে সন্ধ্যে হয়। যেদিন বেলা থাকে মাঠে ঘুঁটে কুড়োয়। বাগানে কাঠ ভাঙে। অবশিষ্ট সময় বাড়ি বোসে সিকে বটে। পাটি বোনে কি কাঁথা সেলাই করে। সে সময় পেরাই বেদানা এসে ওর ধারে বসে। দুজনের অবজ্ঞাত জীবনের ছোট ছোট কাহিনী দিয়ে মালা গাঁথে। সে-মালা ইতিহাস গলায় পরে না। তার সুরভি পৌছয় না মানুষের ঘরে। তবু ওরা খুশির তাগিদে গেঁথে চলে। ছিঁড়ে ফেলে। পরদিন আবার বসে গাঁথতে। সেদিন ময়না একখানা কাঁথায় নক্‌শা তুলছে তাজমহলের ছবি। ছবিখানার মডেল সংগ্রহ কোরেচে সতীশের একখানা পুরনো বই থেকে। বইখানা ঘরের কোণায় পড়েছিল। সতীশের শেলেট. বই-দপ্তর ঘরের কোণায় গড়াগড়ি যাচ্চে এখোন। উই পোকায় কাটচে। ধুলোয় দাগ ধরাচ্চে। সতীশ আজকাল রেওয়াজ কোরচে ঢোলক বাজনার। তার পোন বাবার মতন ওস্তাদ ঢুলী হবে ও। অগ্রাণ মাসে শশীর বিয়ের আসরে ঢোল বাজিয়ে কানাই ঢুলীর কৃতিত্ব অর্জন কোরবে। ভারতীর যে করুণা ওর কলমের মুখে ঝরল না, ঢোলকের কাটির মুখে সে করুণা রস ঝরাবে সতীশ। এই ওর জীবন-মরণ পণ। ময়নার সোনামুখী ছুঁচে সুতো ফুরিয়ে গিয়েছিলো। সে ফেটি থেকে একটা নীল সুতো নিয়ে ছুঁচের পুঁটেয় পরানোর জন্যে আঙুলে ঘসে সরু কোরে নিচ্ছিল। সহসা তার চোখ পড়লো সামনে দাঁড়িয়ে বেদানা।

—ও মা! তুই কখোন এসেছিস? বোস।

—বারান্দায় পা ঝুলিয়ে বেদানা ওর ধারে বোসে পড়ে। বলে:

—ওটা কী তুলচো দিদি? মন্দির? না?

মন্দির সম্পর্কে ওদের দুজনেরই ধারণা ঠেকেচে গিয়ে একঠাই। যেমন বাবুদের বাড়ীর গোবিন্দদেবের মন্দির। তারাপদ ভট্‌চায্যির কালী মন্দির।

ময়না উত্তর দেয়:

—না রে, এর নাম তাজম'ল।

—সে আবার কী?

একদিন সতীশকে পড়ানোর সময় সাঁইপণ্ডিতের মুখে তাজমহলের ইতিকথা শুনেছিলো ময়না। বলে:

—এক মোছলমান বাদশার কীর্তি রে। তার বৌয়ের নাম ছিল মমতাজ।

বেজায় ভালবাসতো তাকে বাদশা। হঠাৎ মমতাজ মারা গেল। রাজা তো পাগল। তার নাম রাখবার জন্যি তিনি তার কবোরের পরে এই বাড়ি বানায়েছিলো।

বেজায় আশ্চর্য ঠেকে বেদানার কাছে। বিস্ফারিত হোয়ে ওঠে তার পটল-চেরা চোখ। জিজ্ঞেস করে:

—ক্যান রে?

—ক্যান রে! তুই কী বোকা! দুনিয়া শুদ্ধ লোক জানবে বাদশার ভালবাসার কথা। যাবৎ চাঁদ, সূর্য থাকবে, নাম থাকবে মমতাজের। কতো বড়ো নামের কাজ।

বেদানা বুঝতে পারে না কিছুই। নাম থাকা না থাকার মধ্যে লাভ-লোকসান কতখানি। সে মন্তব্য রাখে:

—মরে গেলে নাম থাকলো, না থাকলো বয়ে গেছে।

দাঁত দিয়ে সুতো কাটতে কাটতে হেসে ফেলে ময়না। বলে:

—দুর। তুই তা বুঝবি নে। এ-তাজম'ল নিয়ে কতো কথা শুনেচি পণ্ডিতের মুখে। তুই তা শুনলে অবাক হয়ে যাবি।

—তাই নাকি! বল না দু-একটা গল্প দিদি। গল্প শুনতে খুব ভালো লাগে আমার।

হাতে কাজ কোরতে কোরতে মুখে বলে যায় ময়না:

—হেন দেশ নেই দুনিয়ায় যেখান থেকে লোক আসেনি এ তাজম'ল দেখতে। আর দেখে অবাক হয়নি। তুই তো বললি, মরে গেলে নাম থাকলো আর না থাকলো বয়ে গ্যাচে। কিন্তু একজন মেয়েলোক তার সোয়ামীর সাথে তাজম'ল দেখতে এসে কী বলেছিলো জানিস্?

—না। কী দিদি?

—বলেছিলো, আমি এখোনি মরতে রাজি আছি, যদি তুমি আমার কবরের ওপোর এমনধারা একটা বাড়ি তোয়ের কোরে ছাও। শুনলি?

—শুনলাম তো। কিন্তু বুঝলাম না কিছু দিদি।

—ক্যান রে? ময়না জিগ্যেস করে।

—এ দুনে-দারিতে কত লোক এলো গেলো। ক'জনেরই বা নাম আছে? আঙুল গুণতি। তারা কি তবে মিছেমিছি জন্মেছিলো?

—কারা?

—যারা জোনাকপোকার মতন জলল। আর মরার সাথে সাথে একদম নিবে গেল?

ময়না এ কথার জবাব দিতে পারে না। বলে:

—তুই তা বুঝবি নে বেদানা।

—বুঝেও কাজ নেই আমার দিদি। আমি বুঝি, যে ক'দিন বাঁচলাম জোনাকপোকার মতন উড়ে বেড়ালাম। দপ্ দপ্ কোরে জললাম। কী হবে মিছেমিছি বাঁচবার জন্যি পাথরের থুম্বো খাড়া কোরে। ওকে কি বেঁচে থাকা বলে দিদি?

—ক্যান রে?

বেদানা বলে যায়:

—এখন বেঁচে থেকে যেমন হাসচি-খেলচি, খাচ্চি-দাচ্চি, ভালোবাসা কোরচি, ওই পাথরের থুম্বোর মধ্যি থেকে জীবন কী তা কোরতে পারবে? না বুঝতে পারবে দুনে-দারির সুখ?

বেদানার কথাগুলো ধাক্কা দেয় ময়নার মনে। হেসে উড়িয়ে দিতে চায় সে। বলে:

—তুই যে বেজায় পণ্ডিত হোয়েছিস্ দেখচি। তবে ঐ সব লোকেরা কি বোকা?

—হয়তো বোকা। আর নয়তো পাগোল। জলের মতন বোলে যায় বেদানা।

বিস্ময় প্রকাশ করে ময়না:

—পাগোল! তুই বললি কী কোরে! এই যে লাল-নীল-চৌকো পাথরগুলো দেখচিস্, বলতো এগুলো কী?

—তা তো জানিনে। কী দিদি।

—দামী-দামী পাথর। এর এক একখানার দাম যা, আমাদের নুরপুর গেরাম বেচলেও তা হয় না।

—তা হয়তো হতে পারে। কিন্তু ঐ পাথরগুলো বাড়ীর গায় আটকে রেখে কী ফল হোয়েচে! মমতাজকে আটকে রাখতে পেরেচে কি রাজা? যে মমতাজ রাজাকে সুখ দিত, ভালোবাসা দিত, নিজেও রাণীর সুখ ভোগ কোরত, সে মমতাজ কোথায়? আমি যদি রাজা হোতাম তবে কী কোরতাম জানো দিদি?

বেদানার এ মন্তব্যে ব্যথাতুর হোয়ে ওঠে ময়নার বুক। বিষণ্ণ হাসি হেসে জিগ্যেস করে :

—কী কোরতিস্?

—আর একটা নোতুন মমতাজ কাড়তাম। আর ঐ জ্যান্ত মমতাজের লেগে দামী পাথরগুলো দিয়ে গয়না গড়িয়ে দিতাম। শুধু মাত্তর নামের খাতিরে মরা মমতাজের গায় অমনধারা দামী জিনিসগুলো আটকে রাখতাম না। বলতে বলতে খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে বেদানা।

বেদানার এ হাস্যকর উক্তি ময়নার মনকে মস্ত এক আঘাত হানে। সে আঘাত চুরমার করে দেয় তার এক সুখী স্বপ্নসৌধ। স্মৃতিমন্দির রচনা কোরবার সাধ্য নেই তার। তবু ময়নার বাসনা, তার একান্ত সূচি-শিল্প-তপস্যা দিয়ে রচনা কোরবে কল্কা আঁকানো কাপড় ঢাকা কানাই ঢুলির ঢোলকের নকশা। আর শহীদ সাঁইপণ্ডিতের ইস্কুল ঘরের ছবি। ঢোলের গায় পূর্ণিমার চাঁদ আর ইস্কুলের মটকায় জ্বলবে সূর্য। একটা বেতের চুবড়ির মধ্যে ভাঁজ কোরে রেখে দেবে ঐ কাঁথাখানা। চুবড়িটা জড়ানো থাকবে তাজমহল আঁকানো এই কাঁথাখানা দিয়ে। চাঁদ-সূর্য-তাজমহলের সত্তা নিয়ে রইবে কানাই ঢুলি সাঁইপণ্ডিতের কীর্তি। কিন্তু বেদানার ভাষায় নামের মধ্যে বেঁচে থাকা যদি কিছুই না হয়, তবে মিছেমিছি এ সাধ-সাধনা কেনো? আর তা হলে, সাঁইপণ্ডিতের কথাও কি শুধু মাত্তর ভাঁওতাবাজি! রামায়ণ-মহাভারত পাঠের সময় ব্যাস-বাল্মীকির নামগানে তিনি যে পঞ্চমুখ হোয়ে উঠতেন। ধারা নামতো দুচোখ বেয়ে। সে কি তবে লোক-দেখানো চালাকি! কিন্তু কি কোরে চালাকি বলবে ময়না? কী কোরে বলবে কীর্তির মধ্যে সৃষ্টির মধ্যে জীবনের অনুভূতি নেই? নেই বেঁচে থাকার স্বাদ-সৌন্দর্য? সাঁইপণ্ডিতের রামায়ণ গানের সুরে সে যে মহাকবি বাল্মীকির বীণাবাদন শুনেচে। কানে এসেছে তার তমসার কুলুকুলু ধ্বনি। সীতার চোখের নীলপদ্ম ফুটতে দেখেচে তমসার জলে। রাবণের পুষ্পক রথের গতিবেগ দেখেচে। কেঁপেচে তার ঘর্ঘর শব্দে। আবার অশোক গাছের তলায় বোসে সীতার সাথে অঝোরে কেঁদেছে। এতো মিথ্যে না। কল্পনা না। এতো জীবন শক্তির চলমান প্রবাহ। বেঁচে থাকায় চিরন্তন সাধ-সৌন্দর্য।

—মা, আমি বাজারে যাচ্চি। পয়সা দে।

হন্‌হন্ কোরে ছুটতে ছুটতে এসে সতীশ ডাকে। ময়নার চিন্তার সুতো

ছিঁড়ে যায়। বলে:

—কী কোরবি পয়সা?

—বোলচি না কদ্দিন ধরে, আমি কল্কা আঁকানো কাপড় কিনবো। ঢোলকে জড়াতে। মনে থাকে না? এক সময় সতীশের তাগিদ ছিল মায়ের কাছ থেকে বই বাঁধবার ফুল-পাতা আঁকানো 'ব্যাটন' বানিয়ে নেয়ার। ছাত্রজীবন ফুরিয়ে যাওয়ার পর সে তাগিদ এসে ঠেকেছে ঢোলক জড়ানোর কাপড় কেনায়। বই দপ্তরের মমতা পড়েছে আজকাল ঢোলকের ওপর। তাই ঢোলক ঝুলছে ওপোরে আড়ায়। আর বই-দপ্তর গড়াগড়ি যাচ্চে নিচেয় ধুলোর মেঝেয়।

—মনে তো থাকে বাবা। পয়সা পাচ্চি কোথায়?

—আর বেশি দিন দিতে হবে না তোকে পয়সা। এবার ঢোলক বাজিয়ে পয়সা কামিয়ে আনবো আমি—দেখব কত পয়সা নিতে পারিস তুই। কই দে।

হাসতে হাসতে আঁচলের মুড়ো খুলে পয়সা বের কোরে ছেলের হাতে দেয় ময়না। এক একটা কোরে পয়সা গুণে নেয় সতীশ। বলে:

—এ যে মোটে চার আনা! খাবার খাওয়ার পয়সা কই? আর দুটো পয়সা দে। আমি আর—হাজরা গজা কিনে খাবো। বাহাদুর বোষ্টম যা জিবে গজা বানায় না মা, এই হাতের তেলোর মতো চ্যাপ্‌টা। দু-পয়সায় এতগুলো না কোরে দেয়।

—মোটে এই কটা পয়সা আছে। আর দিলে তেল-নুন কিনবো কি দিয়ে। কইতে কইতে ময়না আর দুটো পয়সা দেয় সতীশের হাতে।

এমন সময় হাজরা আপত্তি রাখে:

—জেঠী, ও জেঠী, সতে বলো গজা কিনবে না। কইয়ে দেব?

—এই ছাগোল, চড়ায়ে গাল ভেঙে দেবো বলো। গজা কেনবো না তো কী কেনবো রে?

মাথা ঝাঁকিয়ে হাজরা বলে:

—হুঁ, তাই না?

ময়না চেপে ধরে:

—কী রে হাজরা? বলতো বাবা, কী কেনবে ও? বল তোরে একটা পয়সা দেবানে।

সতীশের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে ভয়ে ভয়ে হাজরা বলে যায়:

—সতে বিড়ি খায় জেঠী। সেদিন বাজারতে পোড়া বিড়ি কুড়িয়ে খাচ্চিল।

ওর গাটে দেশলাই গোঁজা আছে। ও বলছিল, মার কাছ থেকে গজা খাওয়ার নাম কোরে পয়সা নিয়ে বিড়ি কিনবানে।

গাছ থেকে পড়ে ময়না। আগুন হোয়ে ওঠে :

—সতে! হারামজাদা ছেলে, তুমি বিড়ি খেতে শিখেচো? চাক চাক কোরে কেটে ফেলবো একেবারে।

ময়নার হুমকিতে কেঁদে ফেলে সতীশ। চোখ ফেটে জল আসে ময়নারও। আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে বলে :

—তুই ধান ভানানীর ছেলে। তোর মা পরের বাড়ী ধান ভেনে পয়সা রোজগার কোরে আনে। আর তুই সেই পয়সা বিড়ি খেয়ে উড়িয়ে দিস! ঘেন্না করে না! তোর পণ্ডিতমশাই মানা কোরে গেছে না বিড়ি খেতে নেই। বিড়ি খেলে ফুলকো পচে যায়। যাও, লক্ষ্মী বাবা আমার, আর কোনদিন বিড়ি কিনে খেয়ো না। গজা খেয়ো, হাজরাকে দিও। বলতে বলতে হাজরার হাতে একটা পয়সা দেয়।

তারপর সতীশকে সাবধান কোরে দেয় :

—হাজরাকে কিছু বলিস নে যেনো। চোখ মুছতে মুছতে সতীশ চলে যায়।

ফোঁস করে নিশ্বেস ফেলে ময়না। বেদানা হাসতে হাসতে বলে :

—আমাদের পাড়ার ছেলেরা মুখে দুধের গন্ধ থাকতেই বিড়ি ধরে, তাড়ি খায়। ঠাকুরবাড়ির স্বশান্তকে দেখচ দিদি? সে তো হাজরা-সতেদের চেয়ে অনেক বড়। বিড়ি ছুঁতে দেখচ তাকে?

—ছোঁবে কেন? ওরা এক জাত। আর আমরা এক জাত।

—ঠিক বলেছ দিদি। এ মুচনে ঢক। এ ঢক কি বদলায়। ফোঁস কোরে আবার নিশ্বেস ফ্যালে ময়না। বলে যায় :

—বদলাতো বেদানা, বদলানোর পথে উঠেও ছিলো কিন্তু তা হ'ল না। পণ্ডিত বাঁচতো যদি তবে দেখতিস্ এ পাড়ার চোখ ফুটে যেত। হাজরা-সতে বিড়িও ধরতো না। তাড়িও খেত না। মাতব্বররা বুঝলো না কেউ। কী কোরে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মারলে তাকে। আমি তাকে একটুখানি চিনে ছিলাম তাই লোকে আমাকে রটালে ছিনাল বলে। কিন্তু এই ছিনালের কথা মনে পড়বে একদিন। ময়নার চোখ বেয়ে মোটা মোটা জলের ফোঁটা গড়িয়ে আসে। বিষণ্ণ হোয়ে যায় বেদানার মুখখানাও। বলে :

—ঠিক। ছিনালের কথা একদিন কাজে লাগবে।

ঢোক গিলে নিয়ে ময়না বলে :

—পণ্ডিত আমাকে যা দিয়ে গেছে বেদানা, সতের বাবাও তা দিয়ে যেতে পারে নি আমাকে। তাই উনি যেদিন মরলো আমার বুকে আর একবার বাজলো ঢুলীকে হারানোর ব্যথা।

লোকান্তরিত সাঁইপণ্ডিত সম্পর্কে ময়নার মনের কথা একমাত্তর বেদানার কাছেই আজ প্রকাশ কোরে বলতে পারল। এ কথা এতোদিন ভেসুভেয়সের অন্তরের বদ্ধ লাভাস্রোতের মতন গুমরে মরছিল ওর বুকে। এখোন আগ্নেয়গিরি ফাটল। স্বস্তির নিশ্বেস ফেলল ভেসুভেয়সের খালি বুক! মানবসমাজে সংস্কৃতির যদি কোন মূল্য থেকে থাকে তবে এ পাড়ায় তার আলোকসম্পাত সাঁইপণ্ডিতই করেছিলেন। অন্ধকারের অতিকায় জীব এ পাড়ার চোখে সে আলো ধরা পড়েনি। একমাত্তর ময়না ছাড়া। বলা যায় না, কী করে ওর নিরক্ষর চোখ উদ্ভাসিত হোয়েছিলো ঐ জ্যোতির্ময় ধারায়। তাই সাঁইপণ্ডিতের লোকান্তর তারই বুকে বাজলো বেশী কোরে। রইল চিরন্তন হোয়ে।

ময়নাকে ছিনাল এই বিশেষণে বিশেষিত কোরে ছিল ঘরভাঙার মাতব্বররা। সীতে আর পুঁটের মার মারফতে। এবার সেই ছিনালের ভবিষ্যত কথা মর্মে মর্মে অনুভব করবার দিন শুরু হয়। মাতব্বর বাছাড়মশাইদের মূল মন্তর ছিলো, অবিচ্ছিন্ন নুরপুর ঘরভাঙার মধ্যে একটা ফাটল সৃষ্টি করা। যদিও সোনামুখি বিল থেকে উঠে আসা শীর্ণ সোঁতাটা দু-পাড়ার মধ্যে একটা লাইন অব ডিমার্কেশন টেনে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু মনের ওপোর সে রেখাপাত করতে পারে নি। তাই ঘটাতে পারে নি মনান্তর। সে কারণেই অসমাপ্ত সে ভার ঘাড়ে নিতে হয় বাছাড়মশাই প্রমুখ মাতব্বরদের। তারা মুখোশপরা সুখ-সুবিধের মুখ দেখিয়ে হাত করেন সীতে-পুঁটের মাকে। তাদের মাধ্যমে দখল করলেন ভ্যাবল-ফুলবরকে। তাদের দিয়ে মার খাওয়ালেন তারণকে। ময়না-বেদানা লাঞ্ছিত হোলো। দাউ-দাউ কোরে জ্বলে উঠল রেষারেষির আগুন। সে আগুনে পুড়লো ইস্কুল ঘর। শহীদ হলেন সাঁইপণ্ডিত। মুলচ্ছেদ হ'ল এ পাড়ার আশা-ভরসা। জয় হোলো বুর্জোয়াধর্মী পলিসির।

এবার পালা আসে সুখ-সুবিধের মুখোশ খুলে ফেলার। সীতে-পুঁটের মা এখনো ধান ভেনে চলেচে বাছাড়বাড়ি। আজ ক'দিন থেকে ওদের সাথে বিনোদিনীর মানে, বাছাড়মশায়ের বিধবা শালীর খটখটি হচ্ছে খুব। সীতের চাল কাড়ানো ভাল হয় না আজকাল। চালে ধান থাকে। ঝাড়া চাল থেকে

তুষ ছাড়ায় না। কাল বিনোদিনী স্থর গেয়েচে, সীতে, খুদ-কুড়ো তো অনেকদিন ধরে নিলি। কাল থেকে আর নিবি নে কিন্তু। আমাদের গাই বিয়োয়েচে। কুঁড়ো, খুদ সেদ্ধ না খাওয়ালে দুধ হয় না। খবরদার নিবিনে। বুঝলি তো?

ইতিবাচক ঘাড় নেড়েছিলো সীতে আর জিগ্যেসও কোরেছিলো, আমরা ধান ভানানী। ভানানীর খুদ বন্ধ কোরবে দিদি। বিনোদিনী জবাব দিয়েছিলো, করবো। তাই বলে আমার গরু উপোস করবে! বিয়োন্ত গরু? সীতে আর উচ্চবাচ্য করেনি বিনোদিনীর এ উত্তরে। খোলাচুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে আজ আবার ঢেঁকিশালে হাজির হন তিনি, বলেন:

—ও সীতে, গতরে আজড় লাগাস্ একটু। জোরে পাড় দে তো। চাল মোটেই কাড়ানো হয় না তোর। ও পুঁটের মা, খুব তো ঝাড়নদার হোয়েছিস্। চালে তুষ থাকে ক্যানো?

—ওরে, তোর ও-ন্যাকড়ার মুড়োয় কী রে?

—কিচ্ছু না দিদি, পুঁটের মা বলে।

—কিচ্ছু না তো কী? ঐ যে দেখি।

—মুটোখানেক খুদ দিদি।

—খুদ! দেখি। আমি যে কাল বারণ কোরেছি খুদ নিস্ নে। দেখি, ক্যামন খুদ। চোটপাট কোরে ওঠেন বিনোদিনী! ন্যাকড়ার পুঁটলিটা খুলে ফ্যালে পুঁটের মা।

—এই বুঝি খুদ! ও সীতে, ছাখ তো নেমে এসে। সীতে ঢেঁকির ওপোর ছিল। নেমে আসে লোটের ধারে।

—ছাখতো একবার। এ কি খুদ? আদ্দেকের বেশী তো চাল এতে। এমনি কোরে চাল চুরি করিস রোজ রোজ! ওরে, ইল্লত যায় ধুলে, আর খাজলত যায় মলে। ইতর ছোটোলোক সাধে কয়। মুচি কি আধারে লুকোয়? সাধে মুচি ছুঁলে চান কোরতে হয়? ছোটো মন তোদের। এত দিচ্ছি, এত খাচ্ছিস, তবু কাঙালের হাই ডোলে ধরে না।' হাত-মুখ ঘুরিয়ে জোর লেকচার দিতে থাকেন বিনোদিনী। সে তোড়ের মুখে ঢেউয়ের ওপোর মোচার খোলার মতন ভাসতে থাকে সীতে পুঁটের মা! বিনোদিনীর পাশ করা মুখ সবাই চেনে এ-গাঁয়ের। সীতে পুঁটের মা'র মতন ঝগড়াটে মেয়ে মানুষদেরও হার মানতে হয়।

তালগাছের মতন লম্বা মোটাসোটা মেয়ে মানুষ বিনোদিনী। সীতেরা তাই

ওকে 'মোটাদি' বলে ডাকে। নীচু গলায় সীতে বলে :

—কই চাল কই মোটাদি ? এতো নিভাজ খুদ। একটা চালও নেই। চোটপাট কোরে ওঠেন বিনোদিনী :

—নাই বা থাকলো চাল। খুদই বা নিবি ক্যানো ? মানা কোরে দিয়েছি না ? সীতে খুদ নিসনে। আমাদের দোয়া গাই খাবে।

—তা ধান ভানানীর খুদ কেউ মারে 'মোটাদি' ?

তেতে ওঠেন বিনোদিনী :

—আমরা মারি। আমাদের দুধের গরুটা কী খাবে ? শোন সীতে, এ-বাড়ি আর আসবিনে ধান ভানতে। বোলে দিলাম। আর যত জানে ঐ মানুষটা। মুচি না হলে ওনার পিরীতে আটা হয় না। শেষের কথাগুলো বাছাড়মশাইকে উদ্দেশ্য কোরেই প্রয়োগ করেন।

পরদিন থেকে বাছাড়বাড়ির পথ বন্ধ হয় সীতে-পুঁটের মা'র। শুধু ওদের না। ভ্যাবল ফুলবরদেরও। নুরপুর থেকে ঘরভাঙার সম্পর্ক ছেদ হওয়া পর্যন্ত বাছাড়মশাই আগাম আগাম টাকা দিয়ে আসছিলেন ওদের। যেমনই কাটাকাটি কোরে দেয়া কাজটা হাসিল হোয়ে যায়, অমনি শুরু হয় ওদের সরিয়ে দেওয়ার অছিলা খোঁজা।

সেদিন হাটবার। ভ্যাবল বলে :

—বড়দা, আজ আমাদের দুজনকে দুটো কোরে টাকা বেশী দিতে হবেনে। জোন খেটে যা পাই, হাটভোর হয় না তাতে।

—আগাম টাকা ! মুচি পাড়ায় ? আর ? রাঙা থলি সেলাই করে এনো ভ্যাবল।

ভ্যাবল গাছ থেকে পড়ে। বলে :

—ক্যানো বড়দা ! তাহলে তো মরেচি।

—তা কী কোরবো ? আগাম টাকা মুচিপাড়ায় আর দেবো না। মুচি জোনও আর নেবো না।

—ক্যানো বড়দা, বিস্মিত ভ্যাবল জিগ্যেস করে।

—তোমরা সব চোর। কি মাগি, কি মদ্দ সব জোচ্চোর। ফেরেববাজ। বলতে বলতে বাছাড়মশাই বাড়ির মধ্যে ঢুকে যান।

বাছাড়মশাইদের স্বরূপ এতোদিন পরে আয়নার মতন স্বচ্ছ হোয়ে যায় ভ্যাবল ফুলবরদের চোখে। এতদিন পরে সাঁইপণ্ডিতকে জঘন্য হত্যার শোক

বাজল ওদের বুকে।

ঘরভাঙার মুচিপাড়াকে কেন্দ্র কোরে মাতব্বর মহলের আক্রোশ ছড়িয়ে পড়ে মুরপুরের মুচিপাড়ায়ও। যার ফলশ্রুতি মুচি মজুর খাটানো বন্ধ কোরে ত্যায় এ-গেরামে। অবিশ্যি অমাতব্বর মহল অচ্ছুৎপাড়ার ওপোর চটা ছিল না কিন্তু বাধ্যতামূলক ভাব দিয়ে তাদের চটানো হয়। বাছাড়মশাইরা মাতব্বর এবং গাঁতিদার। মুরপুরের চাষীরা বেশীর ভাগই তার প্রজা। সুতরাং মহলে প্রতিপত্তিও তাদের একচেটে। আর ঐ একচেটে প্রতিপত্তিই একঘোরে কোরে ত্যায় মুচিপাড়াকে। ক্ষেতের কাজে মজুরের দরকার অপরিহার্য। কিন্তু এ দরকার মিটোনোর বিকল্প রাস্তাও ছিল হাতের কাছেই। মানে, মুরপুরে প্রায় পঞ্চাশ-ষাট ঘর কাহার-এর বাস। এরা মোছলমান বেহারা। পুরুষানুক্রমিক পাল্কী বওয়া ছিল এদের পেশা। বিয়ের বর-বধূ, অন্নপ্রাশনের নবজাতক, ডাক্তার কবিরাজরা এমন কি অভিজাত সম্প্রদায়ের জমিদার মহাজনদের সেরা যানবাহন ছিল তখোন পাল্কী। কিন্তু প্রগতির সাথে জোর ধাপে ধাপ মিলিয়ে চলতে না পেরে খোঁড়া হোয়ে রইল এ-সব যানবাহন। তাই কেশবপুরের রাস্তায় চলা পথিকরা অনেকদিন যাবৎ দেখেচেন সৌখিন লক্ষ্মণ ডাক্তারের আয়না বসানো আট বেহারার পাল্কীখানা উঠোনের কোণে পড়ে মাটির সাথে মিশে যেতে। কেননা, সৌখিন ডাক্তারবাবু তখন র‍্যালে সাইকেল গাড়ী কিনে ফেলেছেন। এবং সাহা পাড়ার জমিদার-গাঁতিদার ব্যবসায়ী মহল গঞ্জের রাস্তায় হাকাচ্চেন ট্যাক্সি-মোটর সাইকেল। তাই কাহারদের অন্নমারা যেতে বসেচে। তারা পাল্কী বওয়া ছেড়ে শক্ত মুঠোয় কাস্তে-কোদাল ধরে লেগে গেছে পরের ক্ষেতের কাজে। অবিশ্যি মুরপুর ঘরভাঙার লাগোয়া গেরাম আছে অনেক। সেগুলোও চাষী পল্লী সত্যি। সেখানেও তো মুচিরা মজতুর খাটতে পারে। কিন্তু পুরনো মজতুর-মাহিন্দার বরখাস্ত কোরে নোতুন লোক রাখবে কেন তারা? তাই মুচিপাড়াদের বেকার হোতে হয়। বাঁশ-শিল্প, বেত-শিল্প মরশুমী কারবার। এ-ধরনের শিল্প-সামগ্রীর চাহিদা ফসল খামারে এলে। সুর-শিল্পর বেলায়ও ঐ একই সত্য। ঢাক-ঢোলক সানাই বাজে বিয়ে-পৈতে-অন্নপ্রাশনে, পুজো-পার্বণে। কিন্তু এ সবের চাহিদাও বারো মেসে নয়। সময় সাপেক্ষ। আর শিল্পীও আঙুল গুণতি। তাই বেশীর ভাগ লোকের অন্ন রোজগারের রাস্তা মুনিশ-খাটা।

রোজ দু-বেলা মনুঠাকুর এ-পাড়ায় আসেন। মুচিদের দুঃখ-দুর্দশা দেখেন, চার-পাঁচ দিন না খাওয়া ছোট্টো ছোট্টো বাচ্চারা উঠোনে ধুলোয় পড়ে গড়াচ্ছে।

কাঁদবার শক্তিটুকুন নেই। চিঁ-চিঁ করচে। হাত-পার নলা সরু সরু। জিল্-জিলে চামড়ায় ঢাকা হাড়সার শরীর। সেতারের গায় পেতলের রিবের মতন বুকের দু-পাশের পাঁজরার কটি ভেসে উঠেচে। বোঝা দায় এ-গুলো ছাগল, কুকুর, না মানুষের ছা!—কী কোরবেন মনুঠাকুর? চোখে ছ্যাখা ছাড়া? গোলা-ভরা ধান নেই তার যে ষাট-সত্তরটা পরিবারের ক্ষুধাতুর পেটের জ্বালা জুড়োবেন। তবু সাধ্যমত পয়সা-কড়ি দিচ্ছেন তিনি। রোজ তার বাড়ী থেকে ভাত-ফ্যান নিয়ে আসচে পাড়ার মেয়ে-ছেলেরা। কিন্তু সে তো যৎকিঞ্চিৎ। সমুদ্দুরে পাদ্য-অর্ঘ। শিয়রে ওদের সোনামুখী বিল। অজস্র সোনার ভাণ্ডার। কিন্তু সে সোনার স্বত্ব-স্বামিত্ব নেই ওদের। বরং রক্তজল করা গতর দিয়ে ঐ সোনা পরের ঘরে তুলে দেওয়ার অধিকার পেয়েছে ওরা। বিলের আপাভরা অজস্র মাছ। কিন্তু ফসল-ক্ষেতে সোনার ঢেউ দেখার মতনই ক্ষোভ মিটোতে হয় মাছের 'ঝিম' দেখেই। মাছের ফসল ঘরে গেলে তখোনই কেবল আপার ধারে যাওয়ার ছাড়পত্র পায় ওরা। আর আপার ধারের গর্ত থেকে কুঁচো কাঁকড়া মারবার। মুচিপাড়ার এ-কৃত্রিম আকালের দিন তাইই কোরচে ছেলে বুড়োরা। আর মেয়েরা সেদ্ধ কোরচে সোনামুখীর দেয়া ঝুড়ি ঝুড়ি কলমী-শুশনী শাক। কিন্তু এভাবে আর ক'দিন চলবে? ক'দিন যোগাবে সোনামুখী আর কাঁকড়া-কুঁচে শুশনী-কলমী? সামনে বর্ষা। সোনামুখীতে নামবে আকাশ বন্যা। তখন ছুৎমার্গ ডুবিয়ে দিয়ে এ-বিল কোলাকুলি কোরবে এ-অছুৎপাড়াকে। তোয়ের কোরবে কাজকর্মের অচল অবস্থা, তখোন তো দাঁড়িয়ে মরণ এ পাড়ার। কিন্তু টাকা-পয়সা, ধান-চাল দিয়ে একটা পাড়া তো দূরের কথা, একটা মানুষকে পর্যন্ত চিরকালের মতন বাঁচানো যায় না। বাঁচানো যায় কাজ দিয়ে। তারই পথ আবিষ্কার কোরতে থাকেন মনুঠাকুর। আর তা মিলেও যায় শিগ্‌গির শিগ্‌গির।

বুড়িভদ্দরের আগাড়ে মনুঠাকুরের আট-দশ বিঘে জমি পড়ে আছে চেঁচো ঘাসের বন হোয়ে। তা ছাড়া বাড়িটাও এক প্লটে পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বিঘের মতন। এর দশ পনর বিঘে জমি মাত্তর আওলাতী। বাঁশ, খড়, আম, নারকেল, সুপুরী।

বাদবাকীটা আগাছায় ভরা। দেবদারু, পিত্তিরাজ, ভাটি, আচ্ছোট। মনু-ঠাকুর একদিন ঘরভাঙা-সুরপুরের মাতব্বরদের ডাকান। দু-পথ্যেরই মাতব্বর মহল হাজির হয় ঠাকুরবাড়ী। এরই মধ্যে নির্বিষ হোয়ে গেছে বিদ্বেষ-বিসম্বাদের

বিষ। এবং তারাপদ ভট্চাষ্যি-বাছাড়মশাই প্রমুখ মুরুব্বিরা একদিন যে কূট পরামর্শের শলা ভ্যাবল-ফুলবরদের হাতে তুলে দিয়ে ওদেরই বুকে বিষাক্ত ছিদ্র তৈরী করিয়ে ছিলেন, আজ সেই মুরুব্বিদেরই বানানো মুচিপাড়ার আকাল বুজিয়ে দেয় সে-ছিদ্রপথ। ওরা চিনে ফ্যালে বাছাড়মশাইদের মুখোশ-পরা স্বরূপ। এমনি কোরে বুর্জোয়া পলিশি পর্যুদস্ত হয়।

মনুঠাকুর বলেন:

—চিনলে তো ভ্যাবল, বাছাড়মশাইদের?

—খুব চিনলাম বট্ঠাকুর। জবাবটা আসে ফুলবরের তরফ থেকে।

—ওরা তো তোমাদের একঘরে করেচে ফুলবর। ক্ষেতের কাজে কাহারদের লাগিয়েছে। সামনে অভদ্রা বর্ষা। এখোন তোমরা বাঁচবে কি কোরে?

ঘাড় গুঁজে বসে থাকে মাতব্বররা।

মনুঠাকুর বলে যান:

—শোনো, বুড়িভদ্দরের চরে আমার বিঘে দশেক জমি পড়ে রয়েছে। বাড়ির মধ্যেও বাগান হোয়ে আছে পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বিঘের মতন। ঐ জমিগুলো উঠিৎ কোরতে যে খরচা হবে তাই পেলে বর্ষাকালটা কোনো রকমে চালিয়ে নিতে পারবে তোমরা—কী বল ফুলবর?

—তা পারা যাবে। কিন্তু হালের গোরু নইলে কী দিয়ে চাষ কোরবো বট্ঠাকুর?

—হাল-গোরু আমি কোরে দেবো। ফসলের ভাগও নেবো না। তোমরা শুধু ফসল আজ্জানোর খরচা আর গোরুর দামটা আমাকে দিয়ে দেবে। কেমন ফুলবর, যোগিন্দির কী বলো?

মাতব্বর একযোগে রাজিনামা দেয়। কাজ শুরু হোয়ে যায় পরদিনই। মনুঠাকুরদের বহু পূর্বপুরুষদের আমল থেকে যে অফলা বনস্পতিরা আস্কারা পেয়ে আগ্‌লে ছিল ভূমি-লক্ষ্মীর উর্বরাশক্তি, চালাচ্ছিল অবাধ শোষণ, এখোন তারা আকাশ-ফাটানো হাহাকার ধ্বনি কোরে উপকথার দানবদের মতন হোতে থাকলো ভূপতিত। আর বন্ধ্যাভূমি হোতে চললো সন্তানবতী। দেখতে চলল চাঁদ-সূর্য আকাশের মুখ। শুরু হোলো ফলৈশ্বর্য দানের শুভযাত্রা।

স্রেফ, পুঁজি যাদের জোন খাটা তারাই বেশীখানি সক্রিয় অংশ নেয় এ-কাজে। আর মাঝে মাঝে যোগ দেয় এসে বেত-বাঁশ শিল্পীরা, ঢুলী-ঢাকি সানাইয়ারা। অভিসম্পাত কেটে যাওয়ার মতন কসাড় বন সাফ হোয়ে যায়।

আর খাণ্ডববন পুড়ে যাওয়ার সময় যক্ষ-রক্ষ-কিন্নর গন্ধর্বদের মতন কারোকে পালিয়ে যেতে দেখা না গেলেও পালে পালে দাতাল শুয়োর, কেদো, ভাম, বাঘধারা, বরাচিতে সাপদের ছুটে পালাতে দেখা যায়। কতো রকমের গাছ-গাছালি, কতো কতো লতা-গুল্ম-বনৌষধির গন্ধের সাথে কালো মাটির গন্ধ মিশে মুনিশদের অবসন্ন জীবন সজীব কোরে তোলে। সংকেত আনে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের।

যোগিশ্বর বলে :

—বট্‌ঠাকুর বাগান তো কাটা হোলো। এবার দেড়ো কোদাল চাই।

—কেনো যোগিশ্বর ? একেবারে লাঙল দিয়ে চষে ফেললে হয় না ?

—না বট্‌ঠাকুর, পেল্লাই মেনে বড় বড় মুড়ো রয়েছে। লাঙলের ফালে ঠেকলে একদম ভেঙে যাবে। এখোন দেড়ো কোদাল চালাতে হবে। সমস্ত জমি কোপায়ে মুড়োগুলো তুলে ফেলতে হবে আগে। তারপর চাষ।

বেশ, তাই করো।

যে কথা সেই কাজ। হেয়ো হেয়ো চলতে থাকে দেড়ো কোদাল। ভুতো, ছোটোকানাই, ফুলবর, নিরো, বিপনেদের রক্ত জল হোয়ে, স্রোত হোয়ে ভিজোয় বন্ধ্যামাটির জরায়ু।

একদিন মনুঠাকুর বলেন :

—যোগিশ্বর, বিপ্‌নে-নিরো এ-পাড়ায় খুব গরীব। অথচ খাটিয়ে খুব দু-ভাই। ওদের মাইনে কোরে রাখলে কেমন হয় ?

মাঠে জনেরা কোদাল মারচে। আর বুড়ো যোগিশ্বর একটা মোটা দেবদারু গাছের গুঁড়ির ওপোর বসে তামাক টানচে। আর তদারক কোরচে ওদের কাজের। যোগিশ্বর বহাল হোয়েচে দলের সর্দার রূপে। সে বলে :

—খুব ভাল হয় তা হলে বট্‌ঠাকুর। অমন দুজন জাব্দা মাহিনদার হোলেই কাজ খুব ভালোই চলবে। আর ওরাও তিন বেলা তিন মুঠো খেয়ে বাঁচবে।

—আমিও তাই মনে কোরেচি।

কাশতে কাশতে যোগিশ্বর জবাব দেয় :

—তাই করো আপনি। আর দুদিন বাদে গোরু কিনতে হবে। গোরু পালতে হোলে মাহিনদার নইলে হয় না বট্‌ঠাকুর। ঘাস-বিচিলি কাটা। রাতের বেলায় দুটো কোরে জাব দেওয়া। গোরুর গা ধোয়া। গোরু হোয়ে তবে গোরু পুষতে হয়, বট্‌ঠাকুর। আরো তোমার দামড়া গোরু। তা গোরু কেনার কী কোরচো বট্‌ঠাকুর ?

—গোরু ? দেখি সামনের হাটবার লাগাত কেনবো মনে কোরেচি। বনমালীকে বলা আছে। ও বলেচে, দেখে-শুনে কিনে দেবে।

—ওরে ভূতো, হুঁকো খাবি তো আয়। হাত দিয়ে কপালের ঘাম কেঁখে ফেলতে ফেলতে ভূতো এগিয়ে এসে হুঁকো নেয়। বার দুই ঢোক গিলে নিয়ে যোগ্যিশ্বর বলে যায় :

— শোনো বট্ঠাকুর, আপনাকে পরামর্শ দেই। মেলা টাকা দিয়ে বড় গোরু কিনো না। চার দাঁত বাছুর দেখে কিনো। টাকা উঠবে বই পড়বে না। হেসে-খেলে আট-দশ মাটি চাষ কোরে নিতে পারবে। আরেক কাজ করতে পার বট্ঠাকুর ?

—কী ? মনুঠাকুর জিগ্যেস করেন।

—খুব সুবিধে হয় তাহলে। এঁড়ে গরু কিনতে পারো ?

—দুর। হেসে ওঠেন মনুঠাকুর।

—ক্যান ? আমি 'ছাট্' দিয়ে দেবো।

—পাগোল আছো যোগ্যিশ্বর। তাহোলে আমার মাথা বাঁচবে ? না এ গাঁয়ে তিষ্ঠোতে পারবো ? এমনি তো মাতব্বররা বলা শুরু কোরচে, মনুঠাকুর মুচিদের নিয়ে লাঙল কোরচে। বামুনের ঘরে শুঁড়ির দামড়। আরো যদি একে কিনে এনে 'ছাট' দেই যোগ্যিশ্বর, তাহোলে পরদিন তো গাঁ ছাড়তে হবে। আর ছোটো পিসীমা তো জলস্পর্শ কোরবেন না এ-বাড়ি।

বেয়াকুব বনে যায় যোগ্যিশ্বর বুড়ো। এঁড়ের চেয়ে দামড়া গরু দরে বিক্রি হয়। তাই যোগ্যিশ্বরের মতলব, বট্ঠাকুরকে পয়সার সাশ্রয় কোরে দেয়া। কিন্তু তার জানা ছিল না বামুনদের যেমন নিজের হাতে লাঙল চষা নিষিদ্ধ তারও চেয়ে আরো নিষিদ্ধ এঁড়ে গরু কিনে বলদ বানিয়ে নেয়া।

হাটবারের দিন অনেক রাতে মনুঠাকুর, বনমালি, নিরো আর বিপ্‌নেকে নিয়ে গোরু কিনে বাড়ি ফেরেন। দু-জোড়া দামড়া গোরু। কেননা পঞ্চাশ বিঘের মতন জমি। দু-খানা লাঙলের কম শাসন করা সম্ভব নয়। বিশেষ কোরে বাচ্চা গোরু দিয়ে।

আজ দিন চারেক হোলো বিপ্‌নে-নিরো ঠাকুর বাড়ির মাহিন্দার রূপে বহাল হোয়েচে। এরই মধ্যে উত্তর দখ্যিন লম্বা ধাবড়া একখানা গোয়ালঘর হোয়ে গেছে। আর ঐ গোয়ালঘরে নিরো-বিপ্‌নেরা তক্তা দিয়ে চওড়া এক মাচা বানিয়ে নিয়েচে। ওদের রাতে শোবার ঘর। এতে ভবানী পিসিও অখুশী নন।

কেননা নিরো-বিপ্‌নে অচ্ছুৎ হোলেও গোয়াল ঘরকে অশুচি কোরবার হিম্মৎ নেই ওদের। গোয়াল যে কাশীতুল্য পবিত্র ধাম।

মন্টুঠাকুরের গোরু কেনার সংবাদ বিদ্যুৎ বেগে গ্রামময় রাষ্ট্র হোয়ে পড়েচে। নিরো-বিপ্‌নের মারফতে। পরদিন মুচিপাড়া ভেঙে লোক আসে বট্‌ঠাকুরের গোরু দেখতে। বুড়ো যোগিঃশ্বর তো আহ্লাদে আটখানা। বলে :

—খাসা গোরু হোয়েচে বট্‌ঠাকুর। ল্যাজ চোমরা। কপাল চিতে।

ভুতো এগিয়ে এসে হা কোরিয়ে গোরুদের বয়েস পরীখ্যে করে। মানে গোরুর বয়েস পরীখ্যে হয় দাঁতে। সে মন্তব্য রাখেঃ

—বট্‌ঠাকুর আপনার গোরুগুলোর সব বাছুর বয়েস। ঐ শলা শিং ধলা দামড়াটা আর ঘাড় কালোটা পেল্লায় মেনে গোরু হবে। ঘাড় কালোটা মোটে দু-দাঁত।

—আর শলা শিংটা? প্রশ্ন করে যোগিঃশ্বর।

—ওটা আজো দাঁতে নি, কাকা। 'অবরে' ছাটানো।

মুখে এক ধরনের শব্দ কোরে যোগিঃশ্বর বক্তব্য রাখে :

—'অবরে' ক্যানো যে ছাট দেয় শালোরা বুঝে পাইনে।

—সে কী যোগিঃশ্বর? প্রশ্নকর্তা মন্টুঠাকুর।

—মানে বুঝলে বট্‌ঠাকুর, না দাঁততে ছাট দেয়া। তারে কয় অবরে ছাট।

—ও-ও। তাতে কী হয়?

—গোরু বাড়ে না, বট্‌ঠাকুর। আর কী হবে? ওরে, ও ভুতো, গোরুর রাগ-বাগ কেমন আছে দেখলি নে?

ভুতো আবার এগিয়ে যায়। এবং চুণ্ডকুড়ি দিয়ে ল্যাজ মলে। ছাটানো অণ্ডকোষে সুড়সুড়ি দেয়। অমনি গোরু ওঠে তেরিয়া হোয়ে।

বাঃ! বেশ রাগ তো। খুব তেজী গোরু হবে আপনার বট্‌ঠাকুর।

—আর গোরু চারটে খুব সুলক্ষণে হবে। তাই না কাকা? ভুতো জিগ্যেস করে। কিন্তু যোগিঃশ্বরের থেকে উত্তর আসবার আগেই মন্টুঠাকুর বলেন :

—কী রকম?

—ঐ যে বোললাম বট্‌ঠাকুর, ল্যাজ চোমরা। কপাল চিতে। দ্যাখচো না আপনি লম্বা বালাজ খুরের ওপোর এসে পড়েচে ঝুলে। ঘাড় লম্বা। সোজা ল্যাজ।

—ঐ সব নাকি ভালো গোরুর লক্ষণ? প্রশ্ন করেন মন্টুঠাকুর।

—হ্যাঁ বট্‌ঠাকুর। ঘাড় খাটো ল্যাজ বাঁয়, সে-গোরু কিনোনা ভাই। ঘাড় খাটো আর বাঁ-ধারের দিকে ল্যাজ ঘুরোনো গোরু অলখ্যুনে। তাই কিনতে মানা।

এরপর একদিন নোতুন বছর নিয়ে আসে নোতুন জল। অহল্যা মাটির সন্তানবতী হওয়ার উজ্জ্বল সম্ভাবনা। নোতুন মেঘের গলায় গলা মিলিয়ে কামারশালে গোঙায়ে ওঠে বিশাল যাঁতা। তেঁতুল কাঠের গন্‌গনে আগুনে ঘেমে লাল হয় চন্দর কামারের মুখ। তার বাজ মুঠোয় ধরা হাতুড়ি গেরাম মুখর কোরে তোলে। নেহায়ের ওপোর রাখা লাঙলের ফলা বানানোর লাল দগ্‌দগে লোহা পিটিয়ে। বাবলা কাঠের 'গাধা' আর তাল কাঠের 'ইশ' ঘাড়ে বিপ্‌নে নিরো চন্দরের দোকানে ছোটে লাঙল বানাতে। যোগিশ্বর মাতব্বর বলে :

—বট্‌ঠাকুর, খানকতক লাঙল ব্যাগার নিলে ভাল হয়। এক পাকে-জোকে সবগুলো জমি চষে নেওয়া যায়। গাঙচরের ভুঁইগুলো তো বাচড়া। একদিনে ও-গুলোও ভেঙে নেয়া চলে।

—তা বেশ তো। নাও ব্যাগার। তা কতোগুলো লাঙল লাগবে?

—কম পথ্যে খান পঞ্চাশ-ষাটতো। যোগিশ্বর বক্তব্য রাখে।

—তা অত লাঙল নুরপুরে মিলবে।

—না—আ। শুধু নুরপুরে হবে না। বায়সা, ভালুক ঘর থেকে আনাতে হবে। আমি কালই ইদুগাজিকে বলে দেব বট্‌ঠাকুর। ও-ই যোগাড় কোরে আনবে।

—তা তুমি পারবে। তোমার তো ও-সব মহলে আধিপত্য খুব। নিঃশব্দে হাসি ফুটে ওঠে যোগিশ্বরের মুখে। বলে :

—তা বট্‌ঠাকুর আপনার আশীর্বাদে।

যোগিশ্বর সম্পর্কে মনুঠাকুরের মন্তব্য আদৌ মাত্রা ডিঙোনো না। এ-তলাটে পাঁচ সাতখানা গেরামের মধ্যে যোগিশ্বর এক ডাকে চেনা। নাম ওর গোরুর কবিরাজ হিসেবে। পাকা হাত ওর ছাগোল গোরু ছাটানোয়। অবিসম্বাদী ওস্তাদ ঘরামীও ও।

যোগিশ্বরের ডাকে অপূর্ব সাড়া মেলে! নুরপুর, বাইসা, ভালুক ঘরের মোছলমান চাষীরা দল বেঁধে আসে মনুঠাকুরের ক্ষেতে বেগার দিতে।

ষাটখানের জায়গায় আশিখানা লাঙল। বেগার খাটিয়েদের শ্রমের মজুরি দিতে হয় না। দিতে হয় ভালোমত দুটো খাওয়া। চার-পাঁচটা খাসী মেরে

মাংস-ভাত ভূরিভোজনে ব্যাগার খাটিয়েদের আপ্যায়িত করেন মনুঠাকুর। এরপর একদিন পাঁজী দেখে হল কর্ষণের দিন ঠিক হয়। এবং গৃহস্বামীর লাঙল গরু নিয়ে চাষ শুরু কোরে দেয় বিপ্‌নে, নিরো। মাঠে যাওয়ার আগে শৈলজা সিঁদুর-চন্দন পরিয়ে দেন বলদ চারটের কপালে। তেল হলুদ মাখিয়ে দেন শিঙে। মাংগলিক চিহ্ন এঁকে দেন হালে-জোয়ালে।

একদিন যোগ্যিশ্বর জিগ্যেস করে:

—বট্‌ঠাকুর, ভুঁইতে কী বুনবে? ধান? না পাট?

চটপট জবাব দেন মনুঠাকুর:

—ধান। পাট না যোগ্যিশ্বর। ভাতের দরকার। খেয়ে বাঁচবে সব।

যোগ্যিশ্বর কী চিন্তা কোরছিলো। বলে:

—তাই তো বট্‌ঠাকুর, বাগানমারা জমি আপনার। ধান বুনলে 'হুড়িয়ে' যাবে! গাছে হবে। ফলনে হবে না। তবে এক কাজ কোরতে পার বট্‌ঠাকুর।

—কী কাজ?

—ব্যানাঝুপি ধান জোগাড় কোরে দিতে পার যদি বট্‌ঠাকুর। কিন্তু মেলা বীজ-ধানের দরকার। সেকি আপনি······

যোগ্যিশ্বরের মুখের কথা কেড়ে আনেন মনুঠাকুর:

—সে আমি খুব পারবো যোগ্যিশ্বর। ব্যানাঝুপি ধান হোলে ভাল হয় বলচ তুমি?

—হ্যাঁ, বট্‌ঠাকুর। মানে, ব্যানাঝুপি ধান ব্যানার মতন ঝাড়ালো হয়ে ওঠে। গাছও লম্বা হয় না। যতো তেজী জমি হোক না, গাছ হাপ্‌সে উঠে পড়ে যায় না। আউশ ধান পড়ে গেলে তাতে আর শস্য হয় না বট্‌ঠাকুর।

—কিন্তু দিরিং কোরলে আর হবে না। এবার বিষ্টি হোলেই বলো, বুনোন শুরু হবে বট্‌ঠাকুর।

—ঠিক আছে। তুমি কালই টাকা নিয়ে লোক পাঠাও যোগ্যিশ্বর।

ময়নার শরীরটা ভালো নেই। তাই আজ আর ধান ভানতে যায় নি। রুক্ষ চুলের ঝাঁটি পিটের ওপার ছেড়ে দেওয়া। দাওয়ায় বসে পা ছড়িয়ে দিয়ে কাঁথা সেলাই কোরচে। মানে, সূক্ষ্ম সূচ-শিল্প সাধনা দিয়ে কোরচে তাজমহল রচনা। বিশ হাজার শ্রমিক বাইশ বছর অক্লান্ত শ্রম দিয়ে যে-কীর্তি সৌধ নির্মাণ কোরেছিলো, ময়না সেই কাজে হাত দিয়েচে একলা স্বল্প সীমিত কাঁথার

পটভূমিকায়। বেদানা পাশে বসে। পলক না ফেলা চোখ চেয়ে ছিল। এবার জিগ্যেস করে:

—দিদি অতো লাল সুতো দিয়ে ঐ যে নকশা তুলচো ওটা কী?

কী জানি, কেন বলা যায় না চাপা দীর্ঘনিঃশ্বেস ফেলে ময়না বলে:

—এটা হচ্চে বাদশা আর তার বেগমের কবর। লালপাথর দিয়ে গাঁথা। এ-পাথরগুলো খুব দামী জানিস্ বেদানা?

বেদানা উত্তর করে:

—আমি জানবো কেমনে দিদি? তোমারে যে পণ্ডিত বোলেচে তাই। আমারে কে বোলবে?

ময়না হেসে ফেলে। বলে:

—আমি আছি কী জন্যে?

—তবে বলো আর কিছু।

ময়না বলে যায়:

এই যে নীল সুতোগুলো টেনেচি, আঁকিয়ে বাঁকিয়ে, জানিস এগুলো কী? যমুনার নীল ঢেউ। তাজমহল যমুনা নদীর পাড়ে। এমনি ঠাঁইটা না কি বেছে নিয়ে ছিলো বাদশা। জোছনা রাতে তাজমহল দেখতে নাকি বড্ড সুন্দর। যমুনার জলে ছায়া পড়ে ঝিকমিক কোরতো। বাদশা তাই বসে দেখতো। কুলকুল কোরে গাঙের জল বয়ে যেতো। বাদশার মনে হোতো, বেগম মমতাজ তার পাশে বোসে কথা কইচে।

এবার জোর প্রতিবাদ করে বেদানা।

—তুমি থামো দিদি। যতো সব চাটাম। আশমানী গল্প।

ময়নার বিশাল চোখ কপালে ওঠে। বলে:

—চাটাম ক্যানরে?

—দুধের স্বাদ ঘোলে মেটে দিদি? বাদশার বৌ মরে গেল। অমনি তার নামে বাড়ি উঠলো যমুনার পাড়ে। জোছনা রাতে তাজমহলের ছায়া পড়ল যমুনার জলে। ঢেউরা কুলকুল কোরে বইতে থাকলো। বাদশা সেই তাজমহল দেখে আর ঢেউয়ের গান শুনে মনে ভাবলে, তার বৌ পাশে বোসে গান কোরচে। এ সব গ্যাঁজা দিদি, গ্যাঁজা।

টস্‌টস্ কোরে ময়নার চোখের জল গড়িয়ে পড়ে কাঁথার ওপোর। ভিজিয়ে দ্যায় তার নব নির্মিয়মান তাজমহল। ধরা গলায় বলে:

—না রে। তুই ও বুঝবিনে বেদানা।

—বুঝিয়ে স্থাও না দিদি। জোছনা রাতে বাবুদের পুকুরের শান বাঁধানো ঘাটে দাঁড়িয়ে দেখেচ দিদি, ওপারের শিবমন্দিরের ছায়া জলে পড়ে কী সুন্দর দেখায়? পোঠের গায় ঢেউরা মাথা কুটে গান গায়। কাল পুণ্যিমে আছে। একবার যেয়ে বসে শুনে এসোতো, ঢুলী বেঁচে থাকতে তোমায় পাশে বোসে গান গাইলে যেমন লাগতো তেমনি লাগে কিনা। অথবা এই হাৎনেয় বসে পণ্ডিতের গল্প শুনে যেমন খুশী হোতে তেমনি হও কিনা।

—তা হবো। আরো হোতাম, যদি ঐ মন্দির ঢুলী বা পণ্ডিতের নামে বানানো হোতো। ময়না বলে।

—নাই বা হোলো? ঢেউয়ের গান যদি বাদশা তার বৌয়ের গান মনে কোরে খুশী হোতে পারে, তবে তুমি ক্যানো শিবমন্দিরকে ঢুলী বা পণ্ডিতের মন্দির মনে কোরতে পারবে না? ও হয় না দিদি। জোর আপত্তি রাখে ময়না:

—হয়। হয়।

—হয় না। হয় না। তাহলে আমি কি হাজরার বাবাকে বিষ খাওয়াই? ওকেই তো ব্যাপারী মনে কোরে নিতে পারতাম। সে চেষ্টাও কোরেছিলাম। কিন্তু যখন সে-সুখ পেলাম না তখোন হাজরার বাবাকে সরিয়ে দিলাম।

বেদানার এ মন্তব্যের উত্তরও দিতে পারে না ময়না। পারে না তেমনি মেনেও নিতে। ওর মন কেবলি বলতে থাকে, বেদানার বক্তব্য ভুল। কিন্তু সে ভুল ধরে দিতে না পারায় ময়নার মন খাঁচার পাখীর মতন ছটফট কোরতে থাকে।

—কি ঢুলী আর কি পণ্ডিত দুজনই তোমার পিরীতের মানুষ। বুঝি, দিদি। তাই আশার খড়কুটো দিয়ে পিরীতের যে বাসা তুমি গোড়েচো সে আর ভাঙতে আসবো না কোনোদিন—বলতে বলতে বেদানা তার ব্যালনের মতন বাহু দুটো উঁচু কোরে হাই তোলে।

—ও কি, উঠচিস্ যে! বোস।

—না। মাসীকে খেতে দেবো। মাসী বোধহয় এ পুণ্যিমে কাটাবে না—দিদি।

—তাই নাকি! ক্যানো? কাল দেখে এলাম তো বেশ ঝরঝরে।

—আজ তো স্থাখোনি।

—না, দাঁড়া তবে। আমিও যাবো।

বেদানাদের বাড়ির উত্তর-পশ্চিম কোণের মাদার গাছটার কথা অনেকবার বলা হোয়েচে। ঐ মাদার গাছের কাছাকাছি একফালি জমি। ঐ জমির আওলাত এক ঝাড় বাঁশ আর ছাতরে পড়া একটা পেঁপে গাছ। একসময় এখানে ছিলো সন্ন্যেসী ঋষির বাড়ি। তেচালা বাংলা ঘর একখানা। এখোন সে ঘরখানা এসে দাঁড়িয়েচে একচালায়। সুতরাং একে আর ঘর না বলাই ভাল। তিনটে খুঁটির ওপোর একখানা ছেঁড়া চাল খাড়া করা। গলে পড়া মাটির পোতাটা আগলে বসেচে আমরুলি শাক আর গৌরীবালার লতারা। কেবল চালের তলায় খানিকটে জায়গা এখনো দখল কোরচে একফালি ছেঁড়া মাদুর, তেলচিটেপড়া চট, আর পুঁজ রক্তের দাগ লাগানো রোঁয়া ওঠা একখানা কাঁথা। কাঁথাখানার দশা অবিশ্যি এতো কাহিল ছিলো না সেদিন, যেদিন মনুঠাকুর মুক্তোকে এটা দিয়ে যান। সে আজ পেরায় দু'বছর ঘুরতে চলল। সেদিন মুক্তো এতোটা শয্যাশায়িনী হয়নি। লাঠি ভর দিয়ে চলাফেরা কোরত। সুরপুর গাঁ ঘুরে ভিখ্যে কোরেও আনতে পারতো; কিন্তু আজ আট-ন' মাস সে একদম অচল। এ অচল অবস্থা আসবার কিছুদিন আগে মনুঠাকুর ভূষণ কবিরাজকে ডেকে এনে দেখান। কবিরাজ দেখে বলে যায়, রোগীর শরীরে রক্ত নেই, হাত-পা চোখ-মুখ ফোলা আরম্ভ হয়েছে। জলও দেখা দিয়েছে পেটে। কবিরাজী ভাষায় একে বলা হয় জলোদরী। তা জানো মনু, উদরী, বাতুরী, যক্ষা; এ তিন রোগে নেই রক্ষা, তবু আমি প্রাণপণ চেষ্টা করবো মনু। বেশ কিছুদিন চিকিচ্চে চলল। ভূষণ কবিরাজ ব্যবস্থা দিলে, মান মণ্ড, কুলপে শাকের ঝোল, ফলুই মাছ। রোগ কিন্তু বেড়েই চলল। তখন বাইসার নামকরা হোমিওপ্যাথ রমানাথ ডাক্তার বরাহুত হোয়েই ঘাড়ে নিলেন মুক্তোর চিকিচ্চের ভার। সাতদিন অন্তর এক ফোঁটা অসুখ দেন তিনি কিন্তু হালে আর পানি পাচ্চে না কারো। না রমানাথ ডাক্তারের দাওয়াইয়ের। না মুক্তোর পরমায়ুর। সন্নিসি মারা গেচে সেও আজ বছর চারেকের কথা। তার মরণটাও ছিল কিছু আজগুবি ধরণের। কেশবপুরের হাট থেকে একদিন সে ফিরল হাসতে হাসতে। সে কী হাসি! পরদিন একদম জবুথবু হয়ে গেল সে কিন্তু হাসি গেল না। রাতদিন খিলখিলিয়ে হাসে, খায় না, যায় না। ফকির, ফাকার, গুণিন্, ওঝা অনেকে দেখলে। কেউ বলে ভূতে পেয়েচে, কেউ বলে পেত্নীতে। কেউ মন্তব্য রাখে, জেন্‌পরী চেপেচে ওর ঘাড়ে। কেউবা কবরের

বাতাস গায় লেগেচে রায় দেয় ; কিন্তু যে-ই লাগুন আর যে-ই চাপুন ওর ঘাড়ে, একদিন সকালে দেখা যায় বিছেনায় শুয়ে আসে সন্ন্যেসী। আর ওর ঘাড়ে চেপে বসে আছে মরণ।

সন্ন্যেসী মরে গেল, আর মুক্তোকে দিয়ে গেল বছর চারেক বয়সের এক ছেলে। এক নুলো ছেলে। সে না পারে বসতে, না পারে হাঁটতে ; কিন্তু কি বিচ্ছিরি চেহারা। মুক্তো অনেকদিন তার লেগে নেহালউদ্দিন ফকিরের থানে হাঁটলো। শুয়োরের চর্বি, কামোটশোষকের তেল মাখালো। কিন্তু কিছুতে কিছু হোলো না। শেষ পর্যন্ত বাচ্চাটা খাওয়া ছাড়ল। তার স্বাস্থ্যছিরি ভেঙে পড়ল। শুকোতে শুকোতে কাঠ হোয়ে মারা গেল একদিন।

রূপ না থাকলেও গতর ছিল মুক্তোর। বয়েসও কাঁচা। এই একমাত্তর ছেলের মা ; সুতরাং এ বয়েসে কাটুতি হওয়ার রাস্তা খুবই সিধে তার। সবরবও শোনা গেল তেমনি। কিন্তু স্বামী হারানোর ধাক্কা সামলে গেলেও মুক্তো ছেলে হারানোর ধাক্কা সামলে নিতে পারলে না। হঠাৎ একদিন আক্রান্ত হোলো সে মাথাঘুর্ণি রোগে। বিয়ের ব্যাপারটা মুলতুবী রইল। আর চলতে থাকলো গোলাম আলি ফকিরের দাওয়াই। ফকির সাহেব ঘুরণি-পোকা দিয়ে তাবিজ দেন। ডয়া কলার এটের রস, বায়ডলনের পাতার মথন বানিয়ে মাথায় দেন মাখতে ; কিন্তু মাথা ঘুরণির চাকা আরো ফনফনিয়ে ঘুরতে থাকলো। ছেলে হওয়ার সময় থেকে মুক্তোর জরায়ুর দোষ ঘটে যায়। সে দোষটা এখোন আরো জটিল হোয়ে ওঠে। সে সাথে দেখা দেয় আরো অনেক মেয়েলি ব্যাধি —প্রদর, ছিচ। শরীর ভাঙতে থাকে। হোতে থাকে নিরক্ত। এখোন শেষ দশায় এসে দাঁড়িয়েচে উদরীতে।

ময়না-বেদানারা মুক্তো মাসীর পাশে গিয়ে বসে। নাকে কাপড় দিয়েও তিষ্টোনো দায়। চোখের পাতা ফুলে ঝুলে পড়েচে। ঢাকের মতন উঁচু হোয়ে উঠেছে পেট। হাত-পা'র পাতা ফুলে উঠেচে ব্যাঙের মতন হোয়ে। এবং ফুটি ফাটা হোয়ে হলদে রস গড়িয়ে পড়চে। ভন্ ভন্ কোরচে মাছির ঝাঁক। গুড়ি পিঁপড়ে ধরেচে গায়। বেদানা কি ময়না রোজ ছাগলের দুধ খাওয়ায়ে দিয়ে আসে। রাতে দু-তিন বার করে উঠে এসে দেখে যায়। মুক্তো বেঁচে আছে কি-না। শেয়াল-কুকুরে টেনে ছিঁড়চে কিনা।

বেদানা দুধ ঢেলে দেয় ওর মুখে। ঝিনুক দুই গেলার পরে আর খেতে চায় না মুক্তোমাসি। ফিসফিসিয়ে একটু জল চায়। আজ ক'দিন ধোরেই

চাইচে। সব লোভ এখোন ওর ঢুকেচে জলের ঘটির মধ্যে। কিন্তু ডাক্তারের নিষেধ ডিঙিয়ে বেদানার সাহস হয় না ওকে জল দিতে। ঘ্যাঙড়িয়ে আবার জল চায় মুক্তোমাসি।

এবার ময়না বলে :

—দে, বেদানা, একটু জল এনে দে মাসিকে।

—দেব?

—দে। আর বঞ্চিত করিস নে।

বেদানা জল নিয়ে আসে। সরু ধারায় ঢেলে দেয় মুক্তোমাসির মুখে। পিয়াস মিটিয়ে আকণ্ঠ জল পান করে মুক্তো।

সোনামুখীর মাটির সৌরভ সাঁঝের বাতাস পৌঁছে দেয় মৃত্যু-তীর্থ যাত্রীর পাশে। খেজুর বনে শেয়াল ডাকে। বিল পারান্তরে অনামী গাঁয়ের আকাশে দু-একটা তারা জ্বলে। শিমুলের মগ ডালে রাত প্রবাসী মাছাল ডানা ঝাড়ে। কাঁপতে কাঁপতে খসে পড়ে ঝরা পাখনা। বেদানা আবার যায় মুক্তোমাসির পাশে। লণ্ঠনটা টাঙিয়ে রেখে আসে। এই লণ্ঠনই সারারাত তার—শিথেনে জাগবে সাথীর মতন।

নিরোর বয়েস মাস্তর আঠারো-উনিশ। তার বুদ্ধির গায় এখনো ছেলেমী রঙ মাখানো। এমন একটা ছোকরা মাইন্দার পেয়ে সুশান্তর বেজায় সুবিধে হোয়েচে। সে একজন বন্ধুই পেয়েচে বলতে হয়। নিরো লাঙল চষতে যায় মাঠে মানে সুশান্তদের বাড়ির লাগোয়া নোতুন উঠিৎকরা বাগানমারা জমিতে। সুশান্তও যায় তার সাথে সাথে। নিরোর পেছন পেছন লাঙলের 'শিরেল' বেয়ে ও-ও হাটে। মাটির তলা থেকে কতোরকম পোকা ওঠে। মালপোকা, ঘুগরো পোকা, ওড়চুমো পোকা, ছাঁচি কেচো, ধেড়ে কেচো। নিরোর কাছ থেকে শিশু সুশান্ত ঐ সব মেটে পোকার নাম শেখে। সংগ্রহ করে ঘাসের ইতিহাস। ভাদ্‌লা, মোম-ভাদ্‌লা, কাঁকড়-কাঁচলের ইতিহাস। এ বয়সেই সে নিরোর সাথে বলে, বড়ো হোয়ে পোকা-মাকড়দের জীবনী লিখবে সে। রচনা কোরবে উপেক্ষিত ঘাসেদের ইতিহাস। নিরো কিছু বোঝে না। শুধুই হাসে আর বলে, তুমি খোকাঠাকুর পাগোল।

সুশান্তর পাখী পোষার সখ বেজায়। সেদিক দিয়ে নিরোরও সখ অসামান্য। এ কাজে খোকাঠাকুরকে প্রেরণা জোগায়ও সে অফুরন্ত। মোটা দেখে খেজুর

ডাঁটা কেটে আনে। যেটা চিরে ফেলে ছমুখ বেঁধে আড়-ভাবে একটা খিল পরায়। ফাঁদখানা দেখায় একটা কাৎলা মাছের মতন। তারপর সরু কোরে খেজুর পাতা চিকিয়ে ফাঁসি বানিয়ে ফাঁদের ছপাশে বেঁধে দেয়। উঠোনের কোণে ফাঁদখানা পাতে। আর তার মধ্যে ছড়িয়ে দেয় খুদ। খুদ খেতে যেয়ে পাখীদের পা আট্‌কে যায় ফাঁসিতে।

ইস্কুলের ছুটির দিন ছপোরবেলা মনুঠাকুর ছেলেকে জোর কোরে ঘরে পুরে আপনার পাশে শোয়ায়ে দেন এবং 'ঘুমো' বলে এক তাড়া দিয়ে তিনি নিজেই ঘুমিয়ে পড়েন। কামারের যাতার মতন নাক ডাকান মনুঠাকুর। সে ফাঁকে সুশান্ত নিঃশব্দে দোরের হাঁক খুলে বেরিয়ে আসে। নিরোও তোয়ের থাকে। গোয়ালঘরে টোঙের ওপোর দা হাতে। এবং নীরবে এগিয়ে আসা ছোট্টো-হালকা পা ছ'খানা দেখেই টপ্ কোরে নেমে পড়ে নিরো। ঝা ঝা করা ছপোর মাথায় কোরে উধাও হোয়ে যায় পশ্চিম বাগের বাঁশঝাড়ে। লম্বা ফাপওয়ালা তলতা বাঁশ কেটে আনে। বানায় বাংলা খাঁচা। কোনো কোনো দিন লাঙল চষবার সময়ই পরামর্শ ঠিকঠাক হোয়ে যায়। অবিশ্যি রোববার অথবা ছুটির দিন হোলেই তবে নিরো প্রস্তাব করে :

—খোকাঠাকুর, আজ এক জায়গায় যাবে ?

—কোথায় রে ? খোকাঠাকুরের ডাগর চোখ আরো ডাগর হোয়ে ওঠে।

—বিধু ডাক্তারের আমবনে। ওখেনে পাখীর ছা হোয়েচে ?

—যাবো, কী পাখীর রে ?

—গাঙ শালিক, কাঠঠোকরা আর হলদে পাখীর ছাও বোধহয় হোয়েচে। সেদিন দেখলাম, একটা হলদে পাখী গাছের খেরোল থেকে উড়ে গেল।

সুশান্তর অনেক দিনের সখ হলদে পাখী পুষবার। ওর শিশুমনে এ সখের বীজ বুনেচে সন্নিসীর বৌ মুক্তো। ওদের বাড়ি অনেকদিন ঝি ছিলো। গল্প কইয়ে হিসেবে মুচিপাড়ায় মুক্তোর নাম খুব। সুশান্তও গল্প-পাগলা। মুক্তোর মুখে বেগুনবতী মেয়ের উপকথা শোনার পর ওর শিশুমনের পাগলামি আরো বেড়ে যায়। মুক্তো তারপর শোনায় ওকে হলদে পাখীর জীবন-কাহিনী। আর জন্মে ঐ পাখী ছিল এক গেরস্থের বৌ। শাশুড়ী-ননদের গঞ্জনায় একদিন হলুদ-কালি মেখে এক গাল পান খেয়ে পাষাণ গাছে কোল দেয়। তারপর বনে গিয়ে জন্ম নেয় হলদে পাখী হোয়ে। তাই হলদে পাখীর গা হলদে। পিঠ কালো। ঠোঁট লাল। সুশান্তর শিশুমনে ভারি মায়া হয়, হলদে পাখীর ঐ জীবন-কাহিনী শুনে।

আর সে-সাথে সখও হয় একটা হলদে পাখী পুষবে। পরখ কোরবে ওর গায় হলুদ গন্ধ বয় কিনা। পান খাওয়া রাঙা ঠোঁটে মশলার গন্ধ ভুর ভুর কোরচে কিনা।

আহ্লাদে আটখানা হয় সুশান্ত। জিগ্যেস করে :

—তা কখোন যাবি ?

—যেতো হয় তো দুপোরে। কিন্তু তুমি গেলে তো বেজায় মুশকিলে পড়বে খোকাঠাকুর।

—ক্যানো ?

বট্‌ঠাকুর সেদিন বলে ছেল এবার পালালে বেজীকলে দেবে।

—বেজীকল ? ও আমি কেয়ার করিনে। খানিকখন নয় বেজীকলে থাকবো। তারপর দিদিমা এসে ছাড়িয়ে দেবে।

—তবে তুমি যেনো ঘুমিয়ে পোড়ো না খোকাঠাকুর।

—আমি ! না মনে। আমি কি ঘুমোই ? খুব মাতব্বরি চালে বলে সুশান্ত।

—তা হোলে বট্‌ঠাকুরের নাক ডাকলেই বেরিয়ে আসবে কিন্তু। আমি তালে বিচিলিগুলো কেটে রেখে যাবানে তাড়াতাড়ি।

—তুই বিচিলি কাটবি আর আমি ঝুড়িতে কোরে নাদায় তুলে দেবো। তা হলে আরো তাড়াতাড়ি হবে। কেমন ?

নিরো সমর্থন করে সুশান্তর ঐ প্রস্তাব। মধ্যাহ্ন ভোজনের পর যথাসময় মনুঠাকুর ছেলেকে ঘরে পোরেন এবং খুঁটুর কাঠের হাঁক দিয়ে দোর বন্ধ কোরে দেন। সাবধান করেন :

—আজ কিন্তু উঠে যাবিনে। চুপচাপ শুয়ে ঘুমোবি।

সুশান্ত অল্প-বিস্তর ঘাড় নেড়ে সায় দেয় বাবার কথায়। তারপর যথাসময় হাপরের মতন নাক ডেকে ওঠে মনুঠাকুরের। আর সুশান্তও সাফল্যের সাথে হাঁক খুলে বেরিয়ে আসে। ত্যাখে নিরোর বিচেলি কাটা পেরায় আধাআধি হোয়ে এসেচে। ওকে সাহায্য করে সুশান্ত ছোট্টো ঝুড়িতে কোরে নাদা বোঝাই দেয়। খোল গোলা জল ছিটিয়ে জাব মেখে রাখে। নিরোর এতে খুবই সুবিধে হয়। সে তাড়াতাড়ি কোরে বলদগুলো এনে জাবে বেঁধে দেয়। এবং বিধু ডাক্তারের আমবনমুখো ছোটে দু'জন পাখীর ছা'র উদ্দেশ্যে।

বিশালতার দিক থেকে মালিরবাগের সমকক্ষ না হোলেও বিধু ডাক্তারের

আমবন এ-অঞ্চলে দ্বিতীয় স্থান অধিকার কোরে বোসে আছে। এ বাগের আম সম্পর্কে নিরোর পরিচিতি সীমিত হোলেও আম গাছ বিশেষ কোরে কোন্ গাছে কতোটা খেরোল আছে, কোন্ খেরোলে ভাত শালিক আর কোন্ খেরোলে গাঙ শালিকরা ডিম পাড়ে, বছর বছর কোন্ খেরোলে হলদে পাখীর বাচ্চারা হয় এ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা তার নখদর্পণে।

হলদে পাখীর ছাগুলো বেশ ডাগর ডাগর হোয়েছিলো। দু-চার দিন বাদে উড়তে শিখবে। নিরো গাছে উঠে ত্যাখে চারটে পাখীর ছা। তার থেকে দুটো পেড়ে এনে সুশান্তর হাতে দেয়। সুশান্ত পরখ কোরতে থাকে। ত্যাখে ছা দুটোর পাখনার রঙ গাঢ় হোয়ে উঠেচে। ঘনতর হোয়ে উঠেচে ঠোঁটের রাঙিমা। আলি ঠোঁট, কচি পাখনার ঘ্রাণ নেয় সুশান্ত। পালকে কাঁচা হলুদের গন্ধ। পান খাওয়া ঠোঁটে ভুর ভুর কোরচে মশলার সৌরভ। ঠিক তো মুক্তোমাসির কথা। হলদে পাখী গেরস্তর বৌ-ই ছিল আর জন্মে। হলুদ মেখে, পান খেয়ে পাষাণ গাছে কোল দিয়ে মোরে ছিলো। হলদে পাখির কালো চোখের পানে চেয়ে আরো মায়া হয় সুশান্তর। আরো লোভ হয় উপকথার ওপোর। মুচিপাড়ার সেরা গল্পো কইয়ে মুক্তোমাসির কওয়া উপকথা। এই হলদে পাখীর জন্ম-কাহিনী শোনানোর পর মুক্তোমাসি ওকে কথাও দিয়েছিলো, এরপর আর একদিন শোনাবে বেগুনবতী মেয়ের উপকথা। কিন্তু হঠাৎ সে অসুস্থ হোয়ে পডলো। এবার সে সেরে উঠলে হয়। সুশান্তর প্রথম কাজ হবে মুচিপাড়ায় গিয়ে মুক্তোমাসির কাছে বেগুনবতী মেয়ের কথা শুনে আসা। হলদে পাখীর ঠোঁটের মশলার গন্ধের মতন হয়তো ঐ মেয়েরও ঠোঁটে অমনি কোনো স্মারকচিহ্ন লেগে আছে।

বাড়ি ফেরার পর বাবা মন্তঠাকুর সুশান্তকে রীতিমতো বকাবকি কোরলেন এবং আজ আর শুধু শাসিয়ে ছাড়লেন না। বেজীকলেও আটকালেন। তবু তার ছাড়া মন খুশিতে ভোরে উঠলো। মুক্তোমাসির কওয়া হলদে পাখীর উপকথায় আজ সে খাঁটি সত্যকে আবিষ্কার কোরল। এবার বেগুনবতী মেয়ের রূপকথা তাকে দেবে আর এক নোতুন সত্য। সে ভাবলো, আজ সারারাত, কাল সারাদিন বেজীকলে আটক থাকলেও সে অখুশী হবে না। খুশিতে থাকতে পারবে। যদিও সন্ধ্যের পরেই সে খালাস পেলো। দিদিমা ভবানী ঠাকরুণ চুপিসারে কামরার মধ্যে ঢুকে ওর হাত-পা'র মধ্যে দিয়ে গলানো লাঠিখানা বের কোরে নিলেন। খুলে দিলেন দড়ির বাঁধনগুলো।

মাহিন্দার নিরো গোয়াল ঘরে টোঙের ওপোর রাত কাটায়। আর ওর দাদা বিপ্‌নে রাতের খোরাক চাল কোনো কোনোদিন বা ভাত নিয়ে সন্ধ্যের পর বাড়ি যায়। সেদিন এক ব্যাপার ঘটল। মাঠ থেকে জমি মই দিয়ে বিপ্‌নে বাড়ি ফিরে এসে ডাকে :

—মা ঠাকরুণ, আমার খাবার দ্যাও। বাড়ি যাবো।

দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে শৈলজা বলেন :

—আজ আর ভাত নেই। চাল নিয়ে যাও। বলতে বলতে তিনি বড় ঘর থেকে এক খুচি চাল এনে দাওয়ার ধারে রেখে দেন। বিপ্‌নে গামছার মুড়োয় চালগুলো ঢেলে নেয়। ভবানীপিসি মালায় থলি হাতে ঠাকুর ঘরে যাচ্ছিলেন আহ্নিক কোরতে। দেখে গলায় বিষ দিয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন :

—বলি, ও বৌমা, লখ্যন কী তোমার গো!

দোরগোড়ায় কাঠ হোয়ে দাঁড়িয়ে যান শৈলজা অপরাধীর মতন। শুধোন :

—কী মা?

—কী মা? লক্ষ্মীর খুচি বিপ্‌নের হাতে দিলে তুমি! বলি, তোমার কপালে কি ঝাঁটা লেগেচে? ও ছোটলোকের মেয়ে।

কাঁদো কাঁদো হোয়ে শৈলজা উত্তর দেন :

—ঘাট হোয়েচে মা। আমি এখোন গঙ্গাজলে ধুয়ে নিচ্ছি খুচিটা।

দাঁত খিঁচিয়ে ওঠেন ভবানীপিসি :

—গঙ্গাজলে ধুলেই হোলো। হাড়ে-নাড়ে কিছুই নেই একেবারে। আর তোমার কথাই বা বলবো কী? যতো জানে ঐ-ছাগোল, মুচি-মেথর, হাড়ি-ডোম নইলে ওনার পিরীত আঁটে না। যেমন ছাগল তেমনি তার মাগ। হবেই তো। বলতে বলতে চোট পায় ঠাকুর ঘরমুখো চলে যান তিনি।

—ও মা, খেতে দাও। ক্ষিদে পেয়েচে। ছুটতে ছুটতে সুশান্ত রান্নাঘরে ঢোকে। এবং থমকে কাঠ হোয়ে দাঁড়িয়ে যায়। দ্যাখে, মা—শৈলজা ভাত চড়িয়ে উনুনের গোড়ায় বোসে। তার দু'গাল বেয়ে নেমেচে চোখের জলের ধারা। মুখের ওপোর আলোর শিখা পড়ায় আরো উজ্জ্বল, আরো করুণ হোয়ে উঠেছে ঐ ধারাগুলো।

—ও কী মা, তুমি কাঁদচো ক্যানো? কী হোয়েচে?

আঁচলে চোখ ঢেকে ফেলেন শৈলজা। বলেন :

—কই? কিছু হয়নি তো?

—তবে তোমার চোখে জল ক্যানো ?

—ধোঁয়া লেগেচে বাবা।

মায়ের এ জবাব খণ্ডন কোরতে পারল না সুশান্ত। তবু মন কিন্তু তার মানতে চাইল না। ঘনিয়ে রইলো সন্দেহের ছায়া।

পরদিন বিপ্‌নে ক্ষেতে লাঙল চষচে। সুশান্ত তার নিয়মিত অভ্যাস মাফিক মুখ মোটা একটা 'হরলিক্‌সে'র শিশিতে রঙবেরঙ-এর রকমারি পোকা মাকড় ধরে পুরচে। আর বিপ্‌নের কাছ থেকে শিখে নিচে তাদের নাম। এরই মধ্যে ধানের নামের, ঘাসের নামের আর পোকামাকড়ের নামের তালিকায় ভর্তি হোয়ে উঠেচে ওর এক্সারসাইজ খাতাখানা। আজকের মতো পোকা ধরা পর্ব শেষ হয়। বিপ্‌নে নিরো জিরোতে বসে শমীগাছের ছায়ায়। সুশান্ত এসে বসে ওদের ধারে।

বিপ্‌নে জিগ্যেস করে :

—খোকাঠাকুর, কাল তোমার ঠাম্‌-মা খুব বোকেছিল মা ঠাকরণকে, না ?

—কৈ না। তা তো জানিনে। ক্যানো ? ঠাম্‌-মা বোকবে ক্যানো মাকে ?

বিস্মিত হয় বিপ্‌নে। জিগ্যেস করে :

—সে কী ! তুমি জানো না খোকাঠাকুর, ও তুমি বুঝি তখোন ফেরোনি খেলার মাঠ থেকে। ঐ, মা-ঠাকরুণ আমাকে খুচিতে কোরে চাল দিয়েছিলো। আমি খুচি ছুঁয়ে চাল ঢেলে নিয়েছিলাম তাই। সে কী বকুনি ! বেজায় ভড়কে গিয়েছিলাম আমি। তাই আর মোটেই দাঁড়াই নে।

এবার মায়ের চোখের জলের কথা মনে পড়ে যায় সুশান্তর। এখোন আসল ব্যাপারটা স্বচ্ছ হয়ে ওঠে। বোঝে, সে যা ইস্থ কোরেছিলো, তাই ঠিক। মা মিছে কথা বোলেচেন তার সাথে।

—ও, তাই নাকি। চাপা নিঃশ্বেস ফেলে সুশান্ত।

—হ্যাঁ খোকাঠাকুর।

মুখখানায় কালো কালি ঢেলে পড়ে সুশান্তর, তার শিশির মধ্যেকার 'অঞ্জনি' পোকার মতনই কালো। সে আর বিপ্‌নে-নিরোর মুখের দিকে তাকাতে পারে না। ঘাড় নুয়ে কাচের শিশির মধ্যে আটকানো পোকাগুলোর পানে চেয়ে থাকে।

কিন্তু এর অনুবর্তী ঘটনা আরো ব্যথা দেয় শৈলজাকে। তিক্ত হোয়ে ওঠে বালক সুশান্তর মন। সেদিন নিরোর অসুখ করেচে। ক্ষেতের কাজে যায়নি। গোয়ালঘরে টোঙের ওপোর শুয়ে আছে।

ভবানীপিসি গোবর নিতে ঢুকেচেন গোয়ালে। হঠাৎ নিরোর টোঙের সাথে

তার মাথা ঠুকে যায়। আঘাতটা জোর মতোই লেগে থাকবে। মাথা ধোরে বোসে পড়েন পিসিমা। নিরো নেমে আসে নিচেয়। জিগ্যেস করে:

—লেগেচে দিদি ঠাকরুণ?

পিসিমা টের পাননি নিরো ওখানে শুয়ে আছে। তাহলে গোয়াল মুখে পা বাড়াতেন না। নিরোকে দেখে যেমন তার আঘাতের মাত্রা বেড়ে যায় তেমনি রেগে তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠেন। নিরো-বিপ্‌নে কতদিন ঘোরাফেরা করে এ-বাড়ী। এ-ও যেমন সত্যি, তেমনই সত্যি সতর্ক পিসিমা ফাঁকা ফাঁকা বেড়ান। এমনি হাতে-কলমে ছোঁয়া-ছুঁয়ি এই প্রথম। আর্তনাদ কোরে ওঠেন তিনি:

—হারামজাদা পাজি, এ তুই কী কোরলি! গলায় আমার তুলসীর মালা। আর তুই মুচি, ছোটোলোক, আমার মাথায় চড়ে বসেছিলি! এতোবেলা শুয়ে ছিলে কোন হরিসে? জামাই হোয়েচো না? বাবু চাকোর? দূর-হ এ বাড়ী থেকে, দূর! দূর! কপালে আঘাত হানেন পিসিমা। আবার বলে যান:

—শেষ বয়েসে আমার কপালে এই ছিল! দাদা গো, এমন কুপুত্তুর রেখে গিয়েচো তুমি। ধম্ম-কম্ম সব গেল আমার। বলতে বলতে স্বর্গত ভায়ের উদ্দেশে ডুকরে কেঁদে ওঠেন তিনি।

শৈলজা বারান্দায় দাঁড়িয়ে সব শুনছিলেন। নিরো বেচারা ঘোর অপরাধীর মতন টোঙের নীচেয় বোসে। তারও চোখ বেয়ে ঝর ঝর করে জল ঝোরচে। দেখে শৈলজার বুকখানা ফেটে যেতে থাকলো। সেদিনকের ঘটনায় বিপ্‌নে এমন প্রত্যক্ষভাবে আক্রান্ত হয়নি। আজ কিন্তু নিরোর ওপোর সরাসরি অশ্লীল আক্রমণ। স্নেহময়ী শৈলজা সইতে পারলেন না। এ-বাড়ি আসা অবধি নিরো সুশান্তর সাথে বেড়ায় চাকরের মতন না। খেলার সাথীর মতন। তাই পেট ঢ্যাবা ঐ কালো ছেলেটাকে শৈলজাও দেখেন সুশান্তকে গ্যাখার চোখ দিয়ে। এবং নিরো মুচি হোলেও ছোঁয়া-ছুঁয়ির ব্যাপারটা তার কাছে হোয়ে গিয়েছিলো উদার। নিরোর সাথে সুশান্ত মাঠে যায়। বিধু ডাক্তারের আমবাগান থেকে পাখীর ছা পেড়ে আনে। সোনামুখীর বিলে ফড়িং ধরে এক সাথে। এখানে ছুৎমার্গ বারে বারে পর্যুদস্ত হয়। মানে, একশো বার ছোঁয়া হয়। কিন্তু একশো বার তুলসী জল মাথায় দিয়ে শুচি হওয়া হয় না। মা শৈলজার আদেশ সন্ধ্যেবেলা তুলসী জল মাথায় দিয়ে ঘরে উঠলেই চলবে। তাই-ই করে সুশান্ত। এর দরুণ ভবানী ঠাকরুণের কাছে গালাগালিও কম খায় না। কিন্তু তার সে গালি-গালাজে কান দেন না কেউ। না মনুঠাকুর। না শৈলজা। এখোন নিরোর চোখে জল

দেখে শৈলজাও কেঁদে ফেললেন। আর ফেটেও পড়েন সে সাথে :

—এই নিরো, এখোনও বসে আছিস্ যে? চলে যা। মুচি হোয়ে জন্মে বামুনবাড়ি চাকর খাটতে এয়েছিস্ সে বড়? বেরিয়ে যা। বলেই চোট পায় বাড়ির মধ্যে ঢুকে যান শৈলজা।

এবার ভিমরুলের চাকে ঢিল পড়ে। ভবানীপিসি 'উদ্যোগার' কোরে তোলেন সারা বাড়িটা :

—শুনলে, কী আস্ফালনীর কথা! কলাইয়ের বাড়িতে মুড়ি চ্যাপটা করা হচ্ছে! না? তা ও যাবে ক্যানো? আমি যাচ্চি। আমাকেই যেতে বলা হোচ্চে। তা এ বাড়িতে যদি আর জল স্পর্শ কোরি তো আমার বাপান্ত দিব্যি। আজই যাবো।

দুম্ দাম্ কোরে মাটি কাঁপিয়ে ভবানীপিসি তার ঘরে ঢোকেন। আর পরক্ষণেই কানে আসে টিনের বাক্সো নামানোর জোরালো শব্দ।

—হোচ্চে কী পিসিমা?

মাঠ থেকে বাড়ি ফিরে মনুঠাকুর সংক্ষেপে ঘটনাটা শৈলজার মুখে শুনে পিসিমার ঘর মুখে এগিয়ে যান। পিসিমা ততক্ষণ তার পোটমানটা নিয়ে বাইরে নেমে এসেচেন।

—থামতো। খপ্ কোরে হাত এঁটে ধরেন মনুঠাকুর।

—আমাকে আটকাবি তো মরা বাপের হাড় খাবি। বলে দিচ্চি, মোনো।

হেসে ওঠেন মনুঠাকুর :

—তা নয় খেলাম। যাবে কোথায় তুমি?

—যে দিকে দু'চোখ যায়। তাই বোলে তোর ভাত আর মুখে দিচ্চি নে।

—তবে কার ভাত খাবে? কে তোমার জন্যি ভাত নিয়ে বসে আছে। হাসি হাসি মুখ মনুঠাকুরের।

পিসিমা তেঁতে ওঠেন :

—ভাতের কি অভাব আচে? শেয়াল-কুকুরের যদি খাবার জোটে তবে আমারও জুটবে। মেঙে-পেতে খাবো দোর দোর। মুচি-মেথর-হাড়ি নিয়ে রাজত্ব কোরো তোমরা।

—তা বেশ যেওখোন। এখোন তার কী? বলেই পোটমানটা ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা করেন মনুঠাকুর।

—ছাড় বোলচি মোনো। নৈলে এখুনি বলো খুন হোয়ে মোরবো। একধার

জল দিতে পারি নে বাবাকে। আর বাপান্ত কোরে এ-বাড়ির জল ছোঁবো। আবার? আবার তোমার গুণমতী বৌ-এর ঝি-গিরি কোরবো? উনি তো আমাকে তাড়িয়েই দিয়েচেন। কুকুরের মতন আবার পিণ্ডি গিলবো ওনার হাতের! ধিক্ আমার কপালে!

কপালে করাঘাত হানেন ভবানী পিসি।

চ্যাঁচ্যাচেঁচিতে তারাপদ ভট্‌চায্যিও এসে পড়েছিলেন। তিনি সাফাই গান:

—ঠিক কথা বলেচেন পিসিমা। উনি এ-বাড়ির ভাত-জল খেতে পারেন না আর। যাক। আপনি আমার বাড়ি চলুন পিসীমা।

—সেই ভাল। তারাপদদা, আপনি নিয়ে রাখুন তো পিসিমাকে।

তারাপদ ভট্‌চায্যি দু'দিন ধোরে ময়ান দিয়ে নরম করেন ভবানী পিসিকে। পিসি রাজী হন, আবার তিনি ফিরে আসবেন এ-বাড়ি। তবে বাপান্ত কিরে যখন মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেচে, বাইরে থেকে কিছু দিনের মতন ঘুরে আসবেন। আর এ ঘুরে আসার স্থান নির্বাচিত হোয়েচে শ্রীধাম নবদ্বীপ। পিসিমা একলাই যাবেন। তার পোটমানের টাকা পোটমানেই জমা থাকবে। খরচা যোগাবেন মনুঠাকুর। তাই-ই হোলো। টাকাকড়ি দিয়ে মনুঠাকুর পিসিমাকে কেশবপুর বাসে তুলে দিয়ে এলেন।

ঠাকুরমা চলে গেলেন। সুশান্তর খুবই ভালো লাগলো। মনে হোলো একটা উপসর্গ-ই বুঝি রওনা হোলো এ বাড়ি থেকে। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো গোটা বাড়িটা। অবাধ ডানা সুশান্তর এখোন। রাত দিন সে নিরোর সাথে বেড়ায়। হরদম্ নিরোকে ছোঁয়। দরকারে-অদরকারেও।

নিরো জিগ্যেস করে:

—দিদি ঠাকরুণ কবে আসবে খোকাঠাকুর?

—তা তো জানিনে নিরো। আর আসবে না। না এলে ভালো হয়। তাই না?

নিরো চুপচাপ থাকে। মনের ভাব কি তার বলা যায় না।

যাওয়ার সময় তারাপদ ভট্‌চায্যির সাথে পিসিমা বোলে গিয়েছিলেন মাসখানেকের আগে এ ভিটেয় পা দেবেন না তিনি। কিন্তু সাতদিন না উতরোতেই দেখা যায় উস্‌কো-খুস্‌কো মাথা, ময়লা দাগ ধরানো কাপড় পরণে, পোটমানটা কাঁখে কোরে বাড়ি এসে ওঠেন পিসিমা।

সুশান্ত তখোন বাঁশের চুঙো থেকে ফড়িঙ বের করে নিয়ে পাখীকে

খাওয়াচ্চে।

—কী ঠাম্‌-মা ফিরলে নাকি? তা তুমি অতো রোগা হোয়ে গেচো ক্যানো ঠাম্‌-মা?

—কোথায় রোগা? স্বপ্‌নে দেখচিস্‌ নাকি? মুখ বেঁকিয়ে ঠাকুরমা উত্তর দেন।

সুশান্ত প্রতিবাদ করে:

—না তো কি? তোমার মুখখানা শুকনো দেখচি। চুলগুলো কুলগর বাসা! তুমি বুঝি কিছু খাওনি এতদিন! হ্যাঁ ঠাম্‌-মা?

—না। কে ভাত নিয়ে বোসে রয়েচে আমার জন্যে? তাই তো তোদের বাড়ি ফিরে এলাম আবার।

কিন্তু শ্রীধাম নবদ্বীপ থেকে ফেরার পর আশ্চর্য পরিবর্তন ছাখা যায় এবার ভবানী ঠাকরুণের। তিনি নিরো-বিপ্‌নেকে সম্পূর্ণ এক নোতুন চোখে দেখতে থাকেন। শাশুড়ির মন যাতে আর বিষিয়ে না ওঠে তার জন্য শৈলজা বরং নিরো-বিপ্‌নে সম্পর্কে ছোঁয়া-ছুঁয়ির বাচ-বিচারটা বাইরের দিক থেকে আমল দিয়েই চলেন। ওদের বরাদ্দ সেই পিত্‌লে ঘটতেই জল দেন। গোয়ালঘরে কলাপাতায় ভাত। পরিবেশনও করেন গামচা পোরে।

ভবানী পিসি আপত্তি রাখেন:

—গামছা পরার দরকার কী বৌমা? আলগোছে দিলেই তো হোলো। যেনো ছোঁয়া না পড়ে।

শৈলজা মনে ভাবেন এটা পিসিমার মনের কথা নয়। অভিমান—আপসোসের অভিব্যক্তি। তাই তার চোখের সামনে ছুৎমার্গকে আরো জোর কোরে ধরেন।

মাথার অসুখটা শৈলজার বরাবর। সেদিন সে অসুখ বেড়ে গেছে খুব। চারটে 'এনাসিন' খাওয়ার পরও কমচে না। বিছেনায় শুয়ে কাতরাচ্ছেন। পাশে বোসে মন্টুঠাকুর মাথায় ঘসে দিচ্চেন আশ্চর্য মলম। এমন সময় নিরো-বিপ্‌নে মাঠ থেকে আসে। শৈলজা উঠে পড়েন ওদের ভাত দিতে।

পিসিমা বারণ করেন:

—তুমি শোও বৌমা। আমি ওদের ভাত দিচ্চি। কই নিরো, বিপ্‌নে, বোস এসে তোরা। বোলতে বোলতে তিনি উঠে যান। এবং রান্নাঘর থেকে কান উঁচু কাঁসার থালায় কোরে ভাত বেড়ে আনেন। কলা পাতা হাতে নিরো-বিপনেরা গোয়াল ধারে দাঁড়িয়ে ছিলো।

—কই? দাওয়ার ওপোর এসে বোস্। গোয়ালে গোরু বাঁধা। নেদেচে। ওখানে বোসে খাবি কি কোরে?

পিসিমার এ মন্তব্যে কাঠ হোয়ে যায় নিরো-বিপ্নে। হাড় ভাঙা মাঠের খাটনির পর খিদের আগুন লেগেচে ওদের পেটে। এ সময় কি ভবানী ঠাকরুণ ঠাট্টা কোরছে ওদের সাথে।

—কই? পাতা কোরে নে। ওরে ভয় নেই। উঠে আয়।

তবু বিশ্বাস হয় না নিরো-বিপ্নেদের, ভবানী ঠাকরুণের এ পরিহাস নয়। মনের কথা। ওরা ভয়-সংকোচ-মনে গুটি গুটি পায় এগিয়ে আসে। পিসিমা ধমক দেন:

—ওঠ্।

নিরো-বিপ্নে দাওয়ায় উঠে পাতা কোরে নেয়। পিসিমা ভাত দিয়ে সেই থালা হাতে রান্নাঘরে যান তরকারী আনতে।

আকাশ থেকে পড়েন মনুঠাকুর। পিসিমার কাণ্ড-কারখানা দেখে। যে-পিসিমা রান্নাঘরে ছেঁচেয় গামছা পরে এসে দাঁড়ান, শৈলজা সাবধানে তার পিতলে থালায় ঢেলে দেন ভাত তরকারি। পরিবেশনের পর নদী থেকে নেয়ে এসে শুচি হন। আজ তাঁর এ কী ভাবান্তর! সারা মুখখানায় পূজোনীয় অতিথি সৎকারের তৃপ্তির উজ্জল দীপ্তিচ্ছটা।

পুকুর ঘাট থেকে থালাখানা মেজে নিয়ে বাড়ি ফেরেন ভবানী ঠাকরুণ। দ্যাখা যায় আজ আর তিনি স্নানও করেন নি। এমন কি কাপড়খানাও কেচে আসেন নি। বিস্মিত হন মনুঠাকুর। স্তম্ভিত হন শৈলজাদেবী। পিসিমার এ কাজকে আজ আর তিনি স্রেফ অভিনান বোলে উড়িয়ে দিতে পারেন না। মনে হয় প্রগতিশীলতায় পিসিমা বুঝি আজ তাদের হার মানিয়েচেন।

সন্ধ্যের পর মনুঠাকুর গানের আসরে জমকে বসেচেন সবেমাত্তর। আহ্নিক সেরে পিসিমা আসেন। ডাকেন:

—ও মোনো; ধাম থেকে ফিরলাম। তা তুই তো একবার জিগ্যেস্ কোরলিনে, পিসিমা কী দেখলে? কেমন ছিলে? ক্যানো? রাগ কোরেচিস বুঝি?

—রাগ! সেকি পিসিমা? তোমার পরে রাগ! বরং খুব খুশী হোয়েচি।

—তাই নাকি! শোন, এবার গোলাপীকে দেখে এলাম যে।

—গোলাপী? কোথাকার গোলাপী পিসিমা?

—কেন! চিনলিনে। দাদার কাবরার বোন। যে তার ননদাইকে নিয়ে

বেরিয়ে গিয়েছিলো।

—তা কোথায় দেখলে তাকে?

—মঠ বাড়ি। সে তো বাবা গোঁসাইয়ের শিষ্য। ওকে মন্তর দিয়েচেন উনি। বাবা গোঁসাইয়ের কাছেই তো সে থাকে। ওনার সেবা করে। পুজোর বাসন-কোষন মাজে। জল এনে ছ্যায়। ফুল তোলে।

—গোলাপী—?

—হ্যারে। সে আর সে-গোলাপী নেই। কে বলবে কাবরার মেয়ে। কী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। কী এক জ্যোতি বেরোচ্চে ওর মুখখানায়।

—তা তুমি চিনতে পারলে? পিসিমা?

—আমি চিনতে পারতাম কি? ও-ই চেনা দিলে তাই। ঠাকুরের পেরসাদ দিতে আমার ধারে এসেই চিনে ফেললে!

—কী বোললে, তুমি ঠাকুরবাড়ির পিসিমা না! ভালো আচো ও পিসি? কবে এলে? ঢোক গিলতে থেমে যান ভবানীপিসি।

তারপর? আগ্রহী মন্নুঠাকুর জিগ্যেস করেন।

—আমি ঠাওরাতে থাকলাম। তখনো চিনতে পারিনি।

হেসে ওঠেন মন্নুঠাকুর:

—আচ্চা তারপর?

—বোললাম, আমি তো তোমাকে চিনতে পারচি নে। ও হেসে ফেললে। বললে, চিনতে পারচো না! আমি যে তোমাদের ঘরে খেয়ে মানুষ। আমার নাম গোলাপী। আমার দাদা মাদার। আমি জিব কামড়ালাম, ও-হরি।

—তা তুমি পেরসাদ নিলে পিসিমা।

চমকে ওঠেন ভবানীপিসি:

—ও-মা, তুই বলিস কী! পেরসাদ নেবো না। মহাপ্রভুর পেরসাদ। বাবা গোঁসাই পর্যন্ত হাত পেতে নেন। আর আমি কোন্ নরকের পোকা।

মনে মনে হাসেন মন্নুঠাকুর। যে গোলাপী রোজ এসে উঠোনের কোণায় দাঁড়াতো। কোচুর পাতায় এক মুঠো ভাত নিয়ে আলগোচে ঝুপ কোরে ফেলে দিতেন পিসিমা ওর হাতে। তারপর বিয়ে হোলো ঐ গোলাপীর। যুবতী বয়সে বিধবা হোয়ে বাপের বাড়ি ফিরে এলো। কতো কেল্লা-কেচ্ছা কোরলো। তিনবার বেরিয়ে গেলো। দু'বার গর্ভ নষ্ট কোরলো। দেখে শুনে ভবানীপিসি আর ওকে বাড়ির ত্রিসীমানায় পা বাড়াতে দিতেন না। আর আজ অবলীলাক্রমে

সেই গোলাপীর দেয়া প্রসাদ শুধু হাত পেতে নিলেন না, খেয়েও এলেন তিনি। যেহেতু বাবা গোঁসাই ওর হাতের প্রসাদ গ্রহণ কোরেচেন। এই অন্ধ সংস্কারেরই জয় হোলো শেষ পর্যন্ত। কিন্তু ঐ গোলাপী যদি আবার ঘরে ফিরে এসে হরিলুটের প্রসাদ বিতরণ করে তখোন কি ঐ অন্ধ সংস্কার তার জয় নিশান উড়োতে পারবে? আবার মনে মনে হাসেন মনুঠাকুর। মন্তব্য করেন :

—একটা কথা বোলবো পিসিমা?

—বল্ কী কথা?

—তাইতে—কি তুমি তখোন নিরো-বিপ্‌নেকে দাওয়ায় ডেকে এনে খেতে দিয়েছিলে? ভাত দিয়ে সেই থালায় তরকারী আনতে রান্নাঘরে ঢুকেছিলে? তাইতে কি তুমি চান কোরলে না? কাপড় কাচলে না, শুধু মাত্তর থালাখানা মেজে আনলে ঘাট থেকে?

—ঠিক ধোরেচিস্ তুই। আর ধাম থেকে এবার ফিরেও এলাম শীগগির শীগগির তাই। ভাবলাম যে—নিরো-বিপ্‌নের লেগে ঘর ছেড়ে এয়েচি, বাড়ি ফিরে গিয়ে তাদের সেবা কোরলেই তবে আমার পেরাচিত্তির হবে। সত্যিই তো আমি অন্যায় কোরেচি, মোনো। পিসিমা আঁচলে চোখের কোণ মোছেন।

মনুঠাকরের ভুল ভেঙে যায়। বোঝেন, সত্যি সত্যিই পিসিমা অন্ধ সংস্কারের বশবর্তী নন আর। এ তার নোতুন জন্ম। অচ্ছুৎ সন্তানদের সম্পর্কে তিক্ত-বিরক্ত হোয়েই এবার তিনি তীর্থযাত্রা করেন। তার দৃষ্টিভঙ্গীটা ছিল ঐদিকে নিবদ্ধ। কুলোটা গোলাপীর পরিণাম দেখে তাঁর সে দৃষ্টি খুলে যায়। আর তীর্থধর্মের খোঁজ পান ঘর পানেই।

রুদ্রাখ্যের মালাটা থলির মধ্যে পুরতে পুরতে তিনি বোলে যান :

—গোলাপীকে দেখে মনে হোলো, নিরো-বিপ্‌নেদেরও বাঁচবার পথ আছে। সে পথ বাবা গোঁসাই তো দেখিয়ে দিলেন আমাকে। তবে ওদের পথ আমি ক্যানো আটকে রেখে নিজের পথ কাঁটায় ঢাকি? তাই আমার তাড়াতাড়ি ফেরা। বোলতে বোলতে উঠে দাঁড়ান ভবানীপিসি। মনুঠাকুর সেতারটা টেনে নেন।

মুচিপাড়ার মুক্তো মাসি আর বাঁচে না। পাশ ফিরে শোবার জো নেই তার। চিৎ হোয়ে শুয়ে হাঁপ টানচে। পেটটা কোলার মতন হয়েছে ফুলে। নীল রঙের শিরা-উপশিরাগুলো পষ্ট হোয়ে উঠেচে। পেটের তিন চার জায়গা ফেটে রস-কসানি গড়িয়ে পড়েছে। পিচুটি পড়া চোখের কোণ বেয়ে নেমেচে জলের ধারানি।

বেদানা-ময়নারা ফাঁকে ফাঁকে আসে। ছাগলের দুধ ঝিনুকে করে খাওয়ায়ে দিয়ে চলে যায়। দুষিত দুর্গন্ধ আবহাওয়ার মধ্যে বসে সব সময় রোগীর পরিচর্যা কোরবার মতন ধৈর্য কার আছে? প্রত্যেকটা নিষ্ঠুর পল-বিপলের মধ্য দিয়ে প্রতীক্ষা গণে মুক্তো মাসি নিষ্ঠুরতম পলকের। প্রতীক্ষা গণে পাতিকাক দুটো পাকা ফল খেতে আসা পেঁপের ডালে বোসে। বাঁশের গা থেকে খুলে পড়ে শুকনো খোলারা। খোসে পড়ে হলদে পেঁপের পাতার দল। ঝরে বুনো পায়রার পাখনা, ঝরে পড়ার প্রত্যক্ষীভূত ইশেরায় মুক্তোকে অভয় দেয় এরা সব। কিন্তু তার চেয়ে আরো মর্মানুভূত আরো প্রত্যক্ষতর যন্ত্রণা, মুহ্যমান কোরে ফেলেছে মুক্তো মাসিকে।

শশীর মারফত ময়না সংবাদ পাঠিয়েছিলো মহুঠাকুরকে। সকালে তিনি এসে হাজির হন কোমরদ্দিমালকে নিয়ে।

রোগী দেখে শুনে মন্তব্য রাখে কোমরদ্দি:

—বেজায় দেরী হয়ে গ্যাছে বট্‌ঠাকুর। ছাখা যাক চেষ্টা-চরিত্তির কোরে।

—ছাখো কোমরদ্দি, যদি পেটের রসটা কমিয়ে দিতে পারো বাঁচুক না-বাঁচুক রোগী, তা হলে খানিকটে সোয়াস্তি পায়।

—রস? সে আমি কমিয়ে দিচ্চি এখোন-ই বট্‌ঠাকুর। ট্যাব কোরে পানি বের করে দিচ্চি।

ছুরির আগা দিয়ে পেট ফুটো কোরে ফেলে কোমরদ্দি। তারপর পেঁপের পাতার নল লাগিয়ে খানিকক্ষণ ধোরে চুষে ছেড়ে দেয়। পেট থেকে মাংস ধোয়া জলের ধারা গড়িয়ে আসে। পাঁচ-সাত সের জল বেরিয়ে যায়। সাথে সাথে পেটও আসে কমে। সাদা গাদো শাকের রস অনুপান দিয়ে অষুধ খাওয়ার ব্যবস্থা দিয়ে যায় কোমরদ্দি মাল। চিটে হোয়ে যায় মুক্তোর পেট। সে এ-পাশ ও-পাশ কোরে শোয়। মাটি ধোরে উঠে এসে পেঁপেতলায় বসে। রোদে-শিশিরে, বাতাসে, পাখির গানে ফিরে আসে আবার জীবন মমতা। ভাঙা খাঁচার পাখি আবার আকৃষ্ট হয় একচালার ভিটেয়। লাল টুকটুক পেঁপে ফলের মায়ায়। ঝির ঝিরে বাতাস কাঁপানো বাঁশের ঝাড়ের বাঁকা ভংগিমায়। উঠোনভরা ঘাসের চাবড়ার শিশির ভিজে গন্ধে।

কোমরদ্দি মাল রোজ আসে। দেখে যায়। ওষুধের পর ওষুধ বদলায়। খেতে ছায় যবের লেই, মান মণ্ড, কুলপে শাক, পুনর্নবার ঝোল। আর ছাগলের দুধ। কঠোর মানা নুন-জল খেতে দেওয়া।

বেদানা জিগ্যেস করে:

—মালবাদ্দি ভাই, মাসি সারবে তো?

—সারবে। যদি সামনের গোনটা কুলিয়ে যায়, তবে আর ভয় নেই।

মানে সামনের অমাবশ্তে সুমুখ কোরে যদি আর না ফোলে তা হলে নিশ্চয়ই সেরে উঠবে মুক্তো মাসি।

কিন্তু একাদশীর দিন ছাখা যায় ওর হাত-পার তেলো ভেড়ে উঠেছে। চোখের পাতা ঝুলে পড়ে নজর ফেলেছে ঢেকে। কোলার মতন উঁচু হোয়ে উঠেচে পেটটা। শ্বাস কষ্ট ছাখা দিয়েচে। আবার বিস্বাদ জীবনের তিক্ততা। পাকা পেঁপের রাঙা রঙ, ঝির-ঝিরে বাতাসে নাচা বাঁশের পাতা, বন-কপোতের ঝরে-পড়া পালকরা আবার হয় মুক্তোর চোখে অবজ্ঞাত, উপেক্ষিত। তিথির পর তিথি চলে যায়। অমাবশ্তের মহানিশা আসে। অতলান্তিক কালোয় রঙ হারায় মুক্তোর জীবন। এখোন বোঝা যায় কোমরদ্দি মাল ভেলকী বাজিই দেখিয়ে গেল। নিবে যা'ওয়ারই ইঙ্গিত জানিয়ে ছিল মুক্তো মাসির ক্ষণিক জ্বলা পিদীম। টিম টিম কোরে লণ্ঠন জ্বলে। পাশে বসা ময়না—বেদানা। অনতি তফাতে ঘেউ ঘেউ কোরে ডাকে পাড়ার কুকুররা। সোনামুখীর বিলচরের পাতি শিয়ালরা বিভৎস উৎসবে গলা বাজায়। মাথার ওপোর দিয়ে উড়ে যায় রাতচরা পাখিরা ত্রাসসঞ্চারী শব্দ সৃষ্টি কোরে ডানায়। পেঁপের পাতা খোসে পড়ে গাছ থেকে। সরু শুকনো ডালপালা পড়ে ভেঙে। বাঁশের ঝাড়ের আগায় হৈ-হুল্লোড় তোলে বুনো বাতাসের ঢেউ-মর্মর। ঐ শব্দরা এক জোটে কাল্পনিক ভয় রচনা কোরে চলে দুটো নারীর ভীরু মনে। ভয়, ভূত-পেতনীর। ভয়, গো-দানোর। ভয়, মুক্তো মাসিকে নিতে আসা লম্বা চুল-দাড়িওয়ালা লাঠি ঘাড়ে যমদূতদের। যত রাজ্যির অস্তিত্বহীন-ভিত্তিহীনদের ভয়।

মুক্তো মাসির মরণ-খবর সুশান্তর কানে পৌঁছায়। তার শিশুমন কেঁদে ওঠে। ওর মস্ত বড় আশা ছিল মুক্তো মাসি সেরে উঠে আবার ওদের বাড়ি কাজে আসবে, পুকুর ঘাটে বাসন মাজার সময় সে মুক্তোর সামনে গিয়ে বসবে। শুনবে বেগুনবতী মেয়ের উপকথা। কিন্তু সে আর হোলো না। বেগুনবতী বেগুনের মধ্যেই থেকে গেল। আর তার জীবন-সত্য চিরদিনের মতনই অজানা রয়ে গেল সুশান্তর। এ-দুঃখ তার জীবন-সাথী হোয়েই থাকবে। তবু সুশান্ত এ-দুঃখ বরদাস্ত কোরতে রাজী। কিন্তু তার বড় ভুল, বড় ক্ষোভ রইল। তার ঐ পোকামাকড়ের খাতায় ঐ ঘাসের নামের তালিকায় লিখে রাখবে মুক্তো মাসির নাম। ওর জীবন-কথা। ঐ নাম, ঐ জীবন-কথা দিয়ে একদিন সে বিশ্বের দরবারে হাজির কোরবে অলিখিত

বিশ্বসাহিত্য। মনের কাছে সে প্রতিশ্রুতি দিল, এমন ভুল জীবনে সে আর কোরবে না। এখোন থেকে সে নিজেই যাবে মুচিপাড়ায়। এবং বাড়ি বাড়ি ঘুরবে মুক্তো মাসির গোষ্ঠীর আর যারা আছে তাদের নাম, তাদের জীবন, উপেক্ষিত ঐ ঘাস—পোকা-মাকড়দের খাতা ভরে লিখবে। মুক্তো মাসির মরণের পর এ-অঞ্চলের সবচেয়ে নাম করা উপকথা কইয়ের তিরোধান ঘটল।

শশীর বিয়ের পাকা দেখা ঠিকঠাক হোয়ে গেচে। রাইপটলের ঝোড়োর মেয়ে মাদারীর সাথেই। বিয়ের দিন ঠিক হোয়েচে আসচে ছাব্বিশে অগ্রহায়ণ। মনুঠাকুর পাঁজি দেখেই ঠিক কোরে দিয়েচেন এ' দিন। তারণের গোড়াগুড়ি পোন সে "মুচনে বিয়ে" দেবে না ছেলের। মনুঠাকুরের গাঁয়ের মানুষ। তার আদর্শ ধোরে চলতে চায় তারণ। রাইপটল থেকে ওরা ফিরে আসার দিন সাতেক বাদে কন্যাপক্ষ পাকা দেখে যায়। ঝোড়ো একলা আসেনি। মাতব্বর চরণ দাস, সরণ দাসকে এনেছিলো। অমাতব্বরও এসেছিলো ওদের সাথে জন দুই। খাওয়া পর্বের আয়োজনও হোয়েছিল রীতিমত জুতসই। মাছ, মাংস, মণ্ডা-মেঠাই। মানে জিলিপি, গজা না। সন্দেশ-রসগোল্লা। ব্যবস্থাপক ছিলেন অবিশ্যি মনুঠাকুর।

স্বার্থ সিদ্ধ হওয়ার পর ভ্যাবল-ফুলবরদের সাথে বাছাড়-মশাইয়ের মুখোস পরা যে চাটাচাটি ছিল, সেটায় ছেদ পড়ে যায় চটাচটিতে। সে—সাথে ঘর ভাঙা—সুরপুরের মধ্যেকার ফাটলটা শুরু হয় মিলিয়ে যেতে। তাই শশীর বিয়ের পাকা দেখার সময় তারণ ঘর ভাঙাকে বাদ দেয়নি। মাতব্বরোচিত তোয়াজ কোরে আমন্ত্রণ দিয়েছিলো ভ্যাবল-ফুলবরকে। ভূরিভোজনে আপ্যায়িত কোরেওছিল সমুচিত।

এদিকে শশী-সুখোর গুপ্ত প্রণয় দানা বেঁধে চলেছে দিনকে দিন। অবিশ্যি দু-পক্ষের মাতব্বররা একজোট হোয়ে রাজীনামা দিয়েচে ওদের চোখোচোখি মাথার। শশীর বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত। কেননা এ-ধরণের প্রণয়কে সত্যিকারের প্রণয় বলা যায় না। যৌবনের উন্মাদনা মাত্তর। তাই শশীর বিয়ে হোলে, সুন্দরী বৌ পেলে, কালো মেয়ে সুখোকে ভুলতে মোটেই দেরী হবে না আর বালিকা মাদারীতে সে সৌন্দর্যের প্রতিশ্রুতিও পাওয়া যায়। এমনই মন্তব্য রেখেচে মাতব্বররা। তাই মুচিপাড়ার মেয়ে মহলের চোখ চরকী বাজীর মতন ঘোরে ওদের আনাগোনার সাথে সমতা রেখে। তবু কিন্তু সে-সমতার তাল কেটে যায়। কাঁক

আসে। তখোন অনৈতিহাসিক কাল থেকে দেখে শুনে আসা কিশোর-কিশোরীর এ-পিরীত-প্রণয় চর্চা বড়ি ভদ্দরের জল, নাল-পদ্মফুলরা, তেলীর পুকুর পাড়ের কসাড় লতাকুঞ্জ প্রত্যক্ষ করে। কিন্তু প্রতিবাদ করে না। বলা যায় না, এ ধরণের পিরীতে তারা খুশী, না অখুশী? খুশীই হবে মন বলে। নৈলে গুপ্তপ্রেম পৃথিবীতে টিকে থাকতে পারতো না। লতা-বন-গিরি-নদী ছায়ারাই দিত ফাঁস কোরে।

আশীর্বাদের দিন মাথা পেতেই ধান-দূর্বো নিয়েছিলো শশী। সুখোও এসেছিলো। বিমর্ষ দেখায় নি মোটেই ওকে। বরং হাসি মুখে, ত্রস্ত হাতে মাংগল্য রচনা কোরেছিল। ফুল-দূর্বা, কাঁচা হলুদ-চন্দন আহরণ কোরে এনেছিল আগ্রহে। ঠাকুর বাড়ি বারবার ছুটে ছুটে গিয়ে।

সোনামুখী বিলচরের উঁচু মাটির ঢিপির আড়াল, তেলীর পুকুর পাড়ের বৃন্দাবন, লতার ঝোপোন ঘেরা শিমুল গাছতলা পাড়ার মেয়ে মহল আবিষ্কার করার পর বুড়ি ভদ্দরের পাড়ে একটা ঠাঁই নির্বাচন কোরে নিয়েচে শশী-সুখোরা। এটা সাম্প্রতিক নির্বাচন। কতকগুলো ঝাঁকড়ানো ষাঁড়াগাছের ডাল ঝুলে এসে প্রায় মাটি পর্শ কোরেচে। আর ঐ ঝুলে পড়া ডালদের গা বেয়ে উঠেচে ঢোল কোলমী লতারা। দূর থেকে দেখায় ঠিক মন্দিরের মতন। ঐ গুল্ম-লতা ঠেলে ভেতরে ঢুকলে দেখা যাবে মন্দিরের মতন-ই তকতকে-ঝকঝকে মেঝে। বিয়ের কুটুমরা চলে যাওয়ার পরদিন শশী-সুখো ঢুকেছিলো ঐ নিভৃত নিরাপত্তায়। সুখো বলেছিলো:

—তুমি তো শিকারী—দিন কিনে বসলে।

—ক্যানরে? জিগ্যেস কোরেছিল শশী।

—নোতুন মানুষ আসচে। তোমাকে আর পায় কে?

—তাতে কী?

—তখোন কি আর এ-বাঁদীর কথা মনে থাকবে?

—ক্যান? মৌমাছি শুধু কি এক ফুলের মধু খায়?

—তুমি বুঝি মৌমাছি? ও শিকারী? তা হলে আমি ফুল। মৌমাছি শুধু এক ফুলের মধু খায় না যেমন, তেমন-ই ফুলও মাত্তর এক মৌমাছিকে মধু বিলোয় না।

সুখোর এ-পাল্টা জবাব ভাল লাগে শশীর। শশী উত্তর দিয়েছিলো:

—তুই তো খুব কথা জানিস সুখো। তা মধু বিলোনে তোর তো খুব অভ্যেস আছে। আমাকে তো নোতুন না।

—সুখো তখোনও শশীর গামছাখানার ওপোয় শুয়ে ছিলো। আর শশী ছিলো ওর পাশে বসে। সুখো ওর পিঠখানা চাপড়ে দিয়েছিলো শশীর কথা শুনে। জবাবও দিয়েছিলো :

—তুমি যা ফচ্‌কে না শিকারী।

—যা বলেছিস্। শিকারীরা অমনই ফচ্‌কে কাজিল হয়। কিন্তু তুই উঠবি নে? আর কতোখন শুয়ে থাকবি অমন চিতিয়ে?

সুখো লজ্জা পেয়ে মুখে আঁচল ঢাকা দিয়েছিলো। বলেছিল :

—আমরো, ঘরের চেয়ে বন ভালো। সাঁইপণ্ডিত বোলতো, রাম-সীতে রাজারানী হোয়ে বনেই সুখে থাকতো। রাধা-কেষ্ট যমুনার পাড়ে কদমবনে লীলা খেলা কোরতো। কত সুখ পোতো তারা।

শশীর এ মন্তব্যে অনুমোদন আছে তাদের বাগান বাড়ির মালিক যারা। কেননা বনবিহারের রস তারাই অনুভব কোরবেন কিছুটা। আর যাদের বন আছে শুধু বাড়ি নেই, তারাই সে-রসের ষোলো আনা অধিকারী।

খুশির পরে অখুশি। চাঁদের পরে অ-চাঁদ রাত। পৃথিবীর এ চিরন্তন নিয়মের রদ্-বদল হবে না কি? কেলি-কুঞ্জবনে কিশোর-কিশোরীর মিলনের মাঝখানে জটিলা-কুটিলা। গোদাবরীর মতন নির্বোধ বোয়ে যাওয়া রাম-সীতার দাম্পত্য প্রণয়ের সামনে বিষম উপসর্গ রাবণ! আজও এ ঘটনার ব্যতিক্রম ঘটল না। বুনো কলমীর জড়ি-বট্টি হোয়ে থাকা লতার ঝাড় সরিয়ে ঢালু পথ বেয়ে বাইরে আসে শশী-সুখো। আর গাঙের মধ্যে নেমেই কাঠ হোয়ে দাঁড়িয়ে যায়। আজ আর হ্যাপলা না। মুচিপাড়ার সাক্ষাৎ যম—ছোটোকানাই। এবং যাকে যমের দোসরই মনে করে শশী। ছোটোকানাইয়ের হাতে বিশকাটিওয়ালা কোচ। ও এসেছে পোনা চরানী গজাল মারতে। সে চোখ পাকিয়ে তাকায় শশীর পানে। হুঙ্কার দেয় :

—এই শশে, বাগানে কি হচ্ছিল?

শশীর সহায় ছিলো ধনুকখানা। তার মুখ দিয়ে কথা সরছিলো না। কোনো রকমে বোলেছিলো :

—পাখি মারতে এয়েছিলাম।

—পাখি! রাম্ পাঠা। তুই এসেছিলি কি মারতে? এই হারামজাদী মেয়ে?

সুখো চুপচাপ। তার বুকের কাপড়খানা তখোনও বেগোছালো। খোপার চুল এলোমেলো। কপালে এসে লতিয়ে পড়েছে। মাথা ভরা বন কলমীর ছেঁড়া

ছুটো পাতা। ফুলের ছিন্ন পাপড়ি, ছিন্নকেশর। সর্বাংগে পষ্টায়িত শৃংগার-তত্ত্বের শেষ লক্ষণ। বিশাল চোখ জোড়া, আয়ত কপাল অপরাধ তত্ত্বে টৈটম্বুর।

—দাড়াস্। হেড়ো চোলকে দেবো। ছামছাগোল! রামছাগলী! বোলেই ছোটোকানাই নিজেই আর দাঁড়ায় না সেখানে।

ব্যাপারটা শুনে তারণ চোটপাট কোরে উঠেছিল খুব :

—ছাগোলের বেজায় রস হোয়েচে। কোথায় সে গুয়োটার ছেলে? রোষকষায়িত চোখ চেয়ে জিজ্ঞেস কোরেছিলো মন্থরাকে।

মন্থরা ঠাণ্ডা কোরেছিলো স্বামীকে :

—থির হও। অমন ধারা চড মাতাল হোয়ো না। বাঁধা কাজ ভেঙে যাবে বলো। তোমার ছেলের গুণ হাজির হোলে কেউ আর মেয়ে দেবে না তখোন।

—না দেয় ঐ ষাঁড় দেবো ঘাড়ে যাঁতিয়ে শালার ছেলের। আর আমি যাচ্ছি। সতে ছিনালের সাথে বোঝাপড়া হবে আজ। গয়লার বকনা ছেড়ে দিয়ে থুয়েচে উদোম। গলায় দড়ি না দেয় যদি পা দিয়ে গলা দোয়ায়ে জিব টেনে বের কোরবো।

—যাক্। হাটে আর হাড়ি ভেঙো না। কানের জল কান দিয়ে বের করো এখোন। বলতে বলতে হাত ধোরে টেনে নিয়ে তারণকে বসিয়ে দিয়েছিলো মন্থরা বৌ।

এরপর কিছুদিন আর কোনো খবর নেই। কিন্তু চোরা প্রেমের রঙ একবার গায়ে লাগলে তার নেশা কাটিয়ে ওঠা দায়। বিশেষ কোরে শশী-সুখোদের বয়সের সন্দিখ্যানে যারা। মাত্তর গেল রাতের ঘটনা। তারণ-মন্থরা বরাবর শোয়। আর শশী থাকে ঢেঁকিশালের মধ্যে। টোঙের ওপোর। ফুটফুটে জোছনা রাত। হঠাৎ তারণের ঘুম ভেঙে যায়। দেখে টোঙের ওপর শশী নেই। মন্থরাকে না ডেকে পায় পায় সোঁতার দিকে এগিয়ে যায় সে। ত্যাখে ইস্কুল ঘরের ভিটের ধারে আমতলায় বসে শশী-সুখো। খাস্ খুস্ কোরে কথা বোলচে। আলো-আঁধারী হোলেও তারণ চিনতে পারে ওদের।

ওরাও তারণকে দেখে উঠে দাঁড়ায়। চোট পায় এগিয়ে গিয়ে শশীর হাত এটে ধরে :

—শালার ছেলে, এ কী হচ্ছে? ঠাস্ ঠাস্ করে দু-গালে দুটো চড় লাগিয়ে দিয়ে ছেড়ে দেয় শশীকে। ব্যাপার দেখে সুখো সোঁতা পেরিয়ে দৌড় দেয়। তারণও ছোটে পেছনে পেছনে। আপন মনে বকে যায় :

—ধরতে পারলে ঠ্যাং ফেড়েই ফেলব ওর। এতো আস্ফালানি! কিন্তু সুখো ততোক্ষণ কেটে উঠেছে। তারণ সরাসরি গিয়ে ওঠে ভ্যাবলের আস্তানায়।

—ও মাতব্বর, ঘুমোচ্চো? ওঠো তো। জোর গলায় ডাকে তারণ।

—কে? ঘুম ঘোরে ভ্যাবল সাড়া দেয়।

—আমি তারণ। বলি, শোনো একটা কথা।

—সমাচার কী? এতো রাতে!

—কী করি ভাই? আমি কী চলে যাবো গাঁ ছেড়ে?

—সে কী। ক্যানো? হোয়েচে কী?

—সীতের মেয়েই আমায় মুখ পোড়ালে শেষটায়। গাঁয় কাজ মাতব্বর, লোকে শুনলে মেয়ে দেবে এ-ঘরে। থু-থু দেবে না মুখে।

—কিন্তু শুনি তো এখোন আর ছোঁয়া-খাওয়া নেই ওদের।

—কে বলেচে তোমারে? এই মোক্তর ধরে ফেললাম যে আমি? হারামজাদা মেয়ের কী বুকের পাটা। এই রাত্তিরে উঠে গেছে একলা একলা। এমন কারোয়ান মেয়ে তো ভূ-ভারতে দেখিনি। এক পাড়া থেকে উঠে আর এক পাড়ায় যায়। মরদ ধোরতে। সীতে কী মরে থাকে! কোথায় যায় ও রাতে?

শেষের কথাটায় হাসি পায় ভ্যাবলের। ক্যানো না সীতে কোথায় যায় রাতে সে-সম্পর্কে ভ্যাবলই সবচেয়ে ওয়াকিবহাল। অবিশ্যি সুখো আসার আগে সীতে রাতে কোথাও যেতো না। ভ্যাবলই আসতো। যুবতী মেয়ে। আরো তাতে বিধবা। খুপরিপানা ছোট্ট ঘর। অসুবিধে বুঝে নোতুন রফা কোরলে ওরা। মানে ভ্যাবল সাড়া দিলে সীতেই উঠে যেতো। কিন্তু সুখো সেয়ানা মেয়ে। তার চোখে ধুলো দেয়া চলল না। মায়ের দেখাদেখি সেও শশীকে ধোরে বোসল। সীতে যাওয়ার আগে সাড়া নেয় সুখোর। সুখো কিন্তু ভান করে গাঢ় ঘুমের। মা অভিসারে যাওয়ার পিট পিটই মেয়েও চলে অভিসারে। মার মতন মেয়েরও গোপন চুক্তি হোয়ে গেছে বই কি শশী নাগরের সাথে। অনুরূপ ঘটনা আজও ঘটেছিলো। ভ্যাবলের হাসির কারণটা তাই।

তবু হাসি চেপে ভ্যাবল জিগ্যেস করে:

—সুখো বুঝি যায়?

—তাই তো। এখোন ব্যাপার হোয়েচে কি হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। নজর পড়ল ঢেঁকিশালে। চেয়ে দেখি টোঙের পরে ছাগল নেই। ক্যামন হোলো। উঠে পায় পায় এগোলাম। আমতলায় গিয়ে দেখি দুই পাটাপাটি। দেখে না, রাগে

ঝাল বেটে দিল গায়। দুটো চড় যা মারলাম ছাগলেরে সৈদি চড়। তাই না দেখে ও মারল ছুট্। আমি ছুটতে ছুটতে উঠলাম এসে তোমার বাড়ি। বল মাতব্বর, এখোন আমার উপায় কি?

এর মধ্যে দাসী মানে ভ্যাবলের বৌ তামাক সেজে দিয়েচে। তারণ অনেকদিন এ-পাড়ায় আসেনি। ভ্যাবলের বৌকে দেখেওনি অনেকদিন। এখোন দেখে ওর খুব মায়া হয়। চাপা রঙ। নিটোল গড়ন। ছোট্ট কপালখানায় সন্ধ্যে-বেলাকার পরা বেলে সিঁদুরের সুগোল কোঁটাটা এখোন সারা কপালময় ছড়িয়ে পড়েচে। টানা চোখ। কলম আঁকা ভুরু। পানের রসে পাতলা ঠোঁট দু'খানা রাঙা। এমন রূপসী বৌ, একে থুয়ে এমন রাত নেই ভ্যাবল সীতের কাছে যায় না। কিন্তু সীতে কী এর পার ধারে দাঁড়াতে পারে? সীতে পেতনী। কী আছে ওর। রূপ নেই। যৌবন নেই। কেবল এক গতর মাংস। রাম ছাগলী যেন। তারণের কানে আসে, দাসীকে পেরায়ই গঞ্জনা দেয় ভ্যাবল। মারধোর করে। পেট ভরে খেতে দেয় না। ভালো কাপড় কিনে দেয় না। দাসীর সামনে সীতেকে নিয়ে শোয়। এমন দিন নেই বিনা চোখের জলে দাসী ভাত খায়। কিন্তু এমন কেন হোলো। রূপসী বৌ পাশে রেখে ভ্যাবল সীতেকে নিয়ে ঘর করে? কী মধু পায় ও সীতের ফুলে? না সীতে গুণ কোরেচে ভ্যাবল মাতব্বরকে। ঘর ভাঙার মাতব্বর গুলোনার ধরণই ঐ। ফুলবরের বৌটাও তো খারাপ না। তাকে থুয়ে ও কোন্ আরামে বুড়ো মাগী ওর ঠাকুরুণ দিদির বয়েসী পুঁটের মার রসে মজেছে? হঠাৎ মনে পড়ে ওর নিজের ছেলের কথা। ও ব্যাটা হারামজাদা তো ওদের মতন ছ্যাচড়া হবে না? সীতের মেয়ের খপ্পরে পড়ে বৌকে তো গঞ্জনা দেবে না? ভাবী পুত্রবধূ মাদারী সোমত্ত বয়েসে খুব সুন্দরী হবে। দাসীর চেয়েও। এমনকি ময়না-বেদানাও ঘেসতে পারবে না ওর ধারে। কিন্তু শশে গুয়োটা সে-রূপের মর্যাদা দিতে পারবে তো? তা যদি না পারে তা হলে তারণের তো শেঁকো বিষ ছাড়া রাস্তা নেই। কিন্তু মরলে তো শালার ছেলেরই সুবিধে হবে। তখোন আমতলায় না, একেবারে ঘরতলায় নিয়ে তুলবে ঐ খামারী ষাঁড়।

খুব কষে দম দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ভ্যাবল হুঁকো বাড়িয়ে ধরে। বলে:

—খাও মাতব্বর।

চিন্তার সুতো ছিঁড়ে যায় তারণের। সে হুঁকো নিয়ে টানতে থাকে। ভ্যাবল বলে যায়:

—এতো রাতে আর ডাকবো না ফুলবরকে। কাল ওকে সাথে কোরে নিয়ে

তোমাদের বাড়ি যাবো।

—তা' হলে কিন্তু মাতব্বর, আমি চললাম। তারণ বলে যায়।

পরদিন সন্ধ্যের পর ফুলবরকে সাথে নিয়ে চুপিসারে ভ্যাবল গিয়ে পৌঁছয় তারণদের বাড়ী। তারণ হাতনেয় বসে পাটটাকুরে দড়ি কাটছে। আর বৌ-মন্থরা পরাচ্চে ল্যাম্পোতে শলতে।

হন্তদন্ত হোয়ে তারণ ডাকে :

—এসো ভ্যাবল, বোসো ফুলবর। ঘরের মধ্যে চলো।

ঘরের ভেতর পাটির ওপোর ওরা গিয়ে বসে। সামনে থপ্ কোরে বসে পড়ে মন্থরা।

ফুলবর কথা কয় প্রথমে :

—শুনলাম তো সব মাতব্বর। কাল তো মেলা রাতে গেছিলে তুমি।

—মেলা মানে এক ঘুমের পর।

—বেশ এখোন কী কোরতে চাও? ফুলবর প্রশ্ন করে।

—তোমরা যা বলো। তোমাদের ডেকেছিও তো সে জন্যি।

—আমি বলি ঘুরিয়ে দাও। ল্যাটা চুকে যাক। খেড়ন্ত শুয়ে যখন পা দিয়েছে ছাগল-ছাগলীরা তখোন আর ফিরোনো দায়।

ফুলবরের এ মন্তব্যে ফোঁস কোরে ওঠে মন্থরা :

—আচ্ছা তো মাতব্বর তুমি। বললে কী কোরে ও-কথা! আমার ছেলের ঘাড়ে ঐ কারোয়ান ষাঁড় গতিয়ে দিতে বোলচো! ক্যানো? ছেলে কী আমার দোজবোরে? পেরথম ছেলে শশে আমার। বিয়ে দেবো। ছোট্ট বৌ আনবো ঘরে।

—তোমার ছেলেব যে রস, কী কোরবে ছোট্ট বৌ এসে?

ভ্যাবলও সায় দেয় ফুলবরের কথায় :

—ঠিক কথা। এক ফোঁটা ঐ ছুঁড়িতে ওর কিছু হবে না। সুখোরে ও ছাড়তে পারবে না। তা সুখো তো ওর অনেক ছোটো। হোয়ে যাক। কী বল মাতব্বর? তারণের পানে তাকায় ভ্যাবল।

ভ্যাবলের ইচ্ছে শশীর মতন একটা ছোকরার সাথে সুখোর বিয়ে হোক। তাতে সুখোরও সুখ, সীতেরও সুখ। আর সীতে সুখী হোলে ভ্যাবলও সুখী। ফুলবরের সাথে এ যুক্তি-যোক্তা কোরেই এসেচে ভ্যাবল।

—তারণ চুপচাপ থাকে কিন্তু জোর প্রতিবাদ কোরে বোসে মন্থরা :

—না। সে হোতেই দেবো না। আমার ধড়ে মাথা থাকতে। এমন কাজ কেউ করে? বৌ মরে গেলে লোকে রাঁড় নেয়। আমার আইবুড়ো ছেলে। ঘড়ি ঘটা কোরে বিয়ে দেবো ওর। আমি কিসের লেগে এঁটো পাতা ঘরে আনবো?

ফুলবর রুখে ওঠে:

—যে গুণমান পুত্তুর তোমার। গুণ জাহির হোলে বিয়ে তো বিয়ে, নিকেও দেবে না কেউ।

গুণমান কে কতখানি সে আর আমার জানতে বাকী নেই মাতব্বর। বুড়ো হোয়ে মরতে গেলে, জোয়ান-যুগো বৌ ঘরে তবু তো সতেরো গণ্ডা।

তারণ বাধা দেয়:

—থাক। আর বক্যেতায় কাজ নেই। ঢের হোয়েচে।

মন্থরা ফোঁস কোরে ওঠে:

—বক্যেতা কী? বক্যেতা? অমনধরা উঠোন্তি বয়সে হোয়েই থাকে। তোমাদের হয়নি? বিয়ে হোলে ভালো হোয়ে যাবে। আর ঐ হারামজাদা খামারী তো খোচায়ে ঘা কোরেচে। এবার ভ্যাবলের ঘা লাগে:

—তুমি থো। এক কাটি বাজে না। কাটি না ঠুকলে দেশলাই জ্বলে না। আর আমারে শিখায়ো না। ছাবাল তোমার তুলসীর পাতা, না?

—তা কি বোলছি আমি? আমার ছাবাল তুলসীর পাতা? কিন্তু খোচাতে থাকলে মুনির মন টলে। তোমাকে যদি কোনো মাগী এসে 'কেলাপ্ত' খোচায় পার তুমি সামলাতে? পারো মাতব্বর? জলজল কোরে জ্বলে ওঠে মন্থরার চোখ জোড়া।

এবার ফুলবর প্রশ্ন বেড়ে:

—কিন্তু সুখোই যে কেবল খোচায় আর তোমার শশে খোচা খায় তাই বা তুমি জানলে কি কোরে?

—জানি বোলেই, বোলছি মাতব্বর। এক গাঁ ছেড়ে রাত্তির বেলায় আর এক গাঁয় এসে যে মরদ ধোরতে পারে সে খোচায় না তো খোচায় কি আমার ছেলে? কইতে কইতে মন্থর গমনে উঠে যায় মন্থরা। এবং তামাক সেজে এনে তারণের হাতে হুঁকো দেয়।

সমস্যার সমাধান হয় না। মাতব্বররা তামাক খেয়ে চলে যায়। ঘর ভাঙা সুরপুরের দু' পাড়া যেন দুটো ধারালো চোখ। সতর্ক পাহারাওয়ালার মতন

রাতদিন চৌকি দেয়। আর তারই মধ্যে দিয়ে ব্যাহত গতি শশী-সুখোর গুপ্ত প্রণয় উপল আহত ঝর্ণার মতন বেয়ে চলে লীলায়িত গতি ভংগিমায়। নোতুন পথ, নোতুন বাঁক বেয়ে।

শামুকের মতন মুখ থামটি এঁটে থাকে মন্থরার জেদ। জান কবুল। তবু সুখোর সাথে শশীর বিয়ে দেবে না। এদিকে তারণও পোড়ে গেছে বিষম মুশকিলে, পাকা দেখা শেষ। মাদারীকে ঘরে আনতে হবে, কিন্তু সে নেহাৎ একটা কচি মেয়ে। ধরো, তার সাথে শশীর বিয়ে হোলো, বধূ হোয়ে ঘরেও এলো সে। কিন্তু শশীর মনের মোড় যদি না ঘোরে? তখোন? লোকে কী বোলবে তাকে? মাতব্বর মানুষ তারণ। ছেলে ওর বদখেয়াল এতো জানা কথা। তবে ক্যানো বৌ ঘরে আনলে? ক্যানো বিয়ে দিলে ছেলের। তাও বাদ দেওয়া গেল। তারণ আর ক'দিন? আম পেকেছে বোটা খোসলেই হোলো। কিন্তু পরের মেয়েটা গঞ্জনা পাবে যে। তার বংশে বৌ গঞ্জনা কেউ দেয়নি। মন্থরাকে সে পরিপূর্ণ ভালবাসে। ওর চরিত্র সম্পর্কে একখানা আপছা মেঘ তারণের বুকের আকাশ দিয়ে ভেসে যায় সত্য; কিন্তু সে মেঘ বাজ-বিদ্যুতও হানেনি, জলও বর্ষণ করেনি।

সেদিন হাটবার। হাট কোরে বাড়ি ফিরেছে তারণ। উঠোনে পা দিয়েই শোনে ঘরে খুব জমজমাট গল্পোর আসর বসেছে। চাচের বেড়ার দোর ভেজানো। টিমটিম কোরে মেটে টেমি জ্বলছে। বেড়ার শতছিদ্র দিয়ে সোনার সুতোর মতন আলোর শিখা আসচে বেরিয়ে।

—কই, ও বড়ো বউ। তারণ ডাকে—

কিন্তু বড় বৌ ডাক শোনার আগেই ডাক আসে আরেক জনের:

—কে বেয়াই নাকি? ঘর দখল হোয়ে গেছে।

গলা শুনেই তারণ চিনে ফ্যালে আগন্তুক আর কেউ না,—ঝোড়ো। শশীর ভাবী শ্বশুর। আশংকার কালো মেঘ ঘনিয়ে আসে তারণের বুকে। আর ঐ মেঘ করা বুকের ওপোর দিয়ে ঝিলিকের সাপ খেলে যায় হিলহিলিয়ে। কু-সংবাদ ছোটে বাতাসের আগে আগে। হয়তো—শশী-সুখোর ব্যাপারটা পৌঁছে গেছে মেয়েপক্ষের কানে। তাই মেয়ের বাবা এসেচে বিয়ে না দেওয়ার পষ্ট জবাব দিতে। কিন্তু ঝোড়োর হাবভাব দেখে তা মনে হয় না। কেননা সংবাদ অশুভ হোলে আবহাওয়া স্যাঁতসেঁতে হোতো। তবু দোষী মনের চিন্তা দোষের খাত ধরেই চলে। বিশেষ করে হঠাৎ ঝোড়ো ক্যানো আসবে? কোনো রকমে তারণের

মুখে কথা সরে :

—ঘর দখল কোরে বো:সেছো? এই তো! বাঁচিয়েছো বেয়াই। বলি বাড়ির সব ভালো তো?

—হ্যাঁ ভালো। তুমি ভালো আচো।

—ঐ যাচ্ছে এক রকম, কতক্ষণ এয়েচো?

—তা সন্ধ্যের আগে। মনটা কেমন কোরে উঠলো। ভাবলাম, ঘুরে আসি একবার। তুমি তো যাবে না।

দোর খুলে বাইরে আসে মন্থরা। এবং হাট-বেসাতির ধামাটা নামিয়ে নেয় তারণের কাঁধ থেকে। হাত পা ধুয়ে ঘরে ঢোকে তারণ। খেজুর পাতার পাটি পাতা। পাটির ওপোর আবার কাঁথা বিছানো। কাঁথাটা গোটো-সোটো, বালিশও আছে। বালিশের ওপোরে মাথার দাগ। মানে ভাবী বেয়াই শুয়েও ছিলো বোঝা যায়।

তারণ গোটো-সোটো কাঁথাটা টেনে টুনে ঠিক কোরে দিয়ে বসে পড়ে।

—বোলচো তো বেয়াই যেতে, কিন্তু ফুরসুত কই? তারপর বলো নোতুন খবর কী। বলি ও বড় বৌ, তামাক সেজে দ্যাওনি বেয়াইকে? বলিহারি! তামাক দিয়ে যাও। ঝোড়ো বাধা দ্যায়, না, না। তামাক কী হবে? তামাক? ধারা খাও বেয়াই। পকেট থেকে দিয়াশলাই আর বিড়ি বের কোরে তারণের দিকে বাড়িয়ে ধরে।

—বিড়ি? ত ছ্যাতা রেখে দ্যাও তুমি। ও সব বাবুদের জন্যি। ও খেয়ে আয়েস পাইনে আমি বেয়াই।

—ধরো খাও একটা। তামাকতারে আসতে লাগুক।

বিড়ি ধরিয়ে টানতে টানতে ঝোড়ো বলে :

—নোতুন খবর কিচ্ছু নেই বেয়াই। মনটা ক্যামোন হোলো। তাই এলাম। মানসির কুটুম এলে গেলে, আর গোরুর কুটুম চাটলে টুটলে। বুঝলে?

তারণের বুকের মধ্যে একটা পেরেক ফুটে ছিলো এতোখ্যন। পুঁজ হোয়ে টস টসও করছিলো, এ:খান মনে হয় কে যেন টিপে দিয়ে পুঁজ পেরেক দুই-ই বের কোরে দেয়। সাথে সাথে সোয়াস্তি পায় তারণ। মন্থরা তামাক দিয়ে যায়, একান্ত আগ্রহ নিয়েই হুঁকোয় মুখ দেয় সে। বলে :

—বিড়ি আর তামাক আকাশ-পাতাল তফাৎ বেয়াই।

—তা ঠিক। কিন্তু হুঁকো-কলকে নিয়ে তো আর পথঘাট চলা যায় না?

ক্যানো যাবে না? আমি তো চলি। ধড়ো যাও। দম দিয়ে হুঁকো মুছে নিয়ে ঝোড়োর হাতে দেয় তারণ। তারপর মন্থরাকে নির্দেশ কোরে জিগ্যেস করে:

—ও বড়ো বৌ, রান্নাটান্না কোরচো কী। বেয়াইকে খেতে দাবে না কী দিয়ে?

রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আসে মন্থরা। বলে:

—ডাল, ডাটা চচ্চরি, আর মাচের ঝোল।

—কী মাচ? ও বেয়ান?

মন্থরার থেকে জবাব আসবার আগেই তারণ উত্তর দেয়:

—ও আর শুনো না বেয়াই। বোয়াল মাচ এনেছি একটা। কে জানে তুমি আসবে।

—ক্যানো? বোয়াল তো খুব ভালো মাচ। যদি গাঙ-বাওড়ের বোয়াল হয় না বেয়াই? রুৎ মাচ লজ্জা পেয়ে যায়! শুনলে ও বেয়ান, পেঁয়াজ দিয়ে গা-মাথা ঝোল করো। বুঝলে তো?

মুখের ঘাম মুছতে মুছতে মন্থরা ঝোড়ের পানে পরিপূর্ণ চোখে চায়। ব'ল:

—আচ্চা।

—না পারো তো বলো। আমি আসি। হেসে চোখ ঠেলে মন্থরা রান্নাঘরে ঢোকে।

খেতে বসে দু বেয়াই। মন্থরা যাচাই কোরে পরিবেশন করে ভাবি বেয়াইকে। ঠাট্টা-হাসি-তামসার ফোয়ারা বোয়ে যায়। পরিপাটি কোরে সাজগোজ কোরেচে মন্থরা। কাচানো ধোড়া পেড়ে শাড়ী পরেচে। প্রজাপতিযুক্ত টানাওয়ালা নথটা খোলা ছিলো। সেটাও নাকে দিয়েচে। চুল আঁচড়ে সিঁদুর পরেছে কপালে সিঁথেয়। নারকেল তেল মুখে ঘসে ঝকঝক কোরেচে মুখখানা। তারণ চেয়ে চেয়ে দেখচে তারও বেশী লোভী চোখে চাইছে ঝোড়ো হাট থেকে ফিরে ঘরে ঢুকে বিছেনা পাতা দেখে তারণের মনে একটু খট্‌কা লেগেছিলো বৈকি। এমন কী কুটুম ওদের ঝোড়ো? এখোনও ওর মেয়ে ঘরে আনেনি। আনবে কিনা তাই-বা কে বলতে পারে, সবই তো প্রজাপতির নিবন্ধ। এখোন সে মাত্তর ভাবি বেয়াই। অবিশ্যি আপ্যায়িত তাকে করা উচিত। তাই বলে ঘরের মধ্যে নিয়ে তুলে, বিছেনা পেতে বালিশ দিয়ে শোয়াতে হবে কিসের লেগে? কুটুম ক্লান্ত হোয়ে থাকে যদি পথ হেঁটে এসে, বিছেনা তো বাইরে কোরেই দেয়া যেতো। ঘরে ঢুকে

পোটোসোটো বিছেনা আর বালিসে মাথার দাগ দেখে তারণের মনে সন্দেহটা খচ্‌খচ্‌ কোরে ফুটে উঠেছিল। কিন্তু অন্য এক গুরু ব্যথার তলায় চাপা পড়ে গিয়েছিল এ লঘু ব্যথার খচখচানি। যা হোক চিরদিনকার মতন আজও ওর আকাশের তলা দিয়ে হাল্কা মেঘ উড়ে গেল চলন্ত হাল্কা ছায়া ফেলে। সে মেঘে না ঝলকে উঠল বাজ-বিজুলি, না ছিটোলো বিষ্টির জল।

যায় যায় কোরে দুদিন গেলো না ঝোড়ো। তারণ চিরদিন খানেওয়ালা মানুষ। দরাজ হাত। তারপর কুটুম-সাখ্যেত এলে সে হাত হোয়ে উঠে আরো দরাজ। শশী-সুখোর ব্যাপারটা তারণ-মন্থরার মনে বেশ একটা দুর্বল দাগ টেনেচে। তাই আপ্যায়নকে জোরালো কোরেই দুর্বলতার দাগ মুছে ফেলতে চায় তারণ।

যাবাব সময় মন্থরা ঝোড়োর হাত এঁটে ধোরে বলে:

—বেয়াই, কষ্ট পেয়ে গেলে। কিছু মনে কোরো না যেন। আর আমার বলো চারিদিক শত্তুর। এতটুকু কথা এতো বড়ো কোরে লাগান্‌-ভাঙান কোরতে পারে। তাতে যেন ভেঙে পোড়ো না। মেয়েটা দিয়ো এ-ঘরে।

—মেয়ে? তা তুমি চলো বেয়ান, এখোনই নিয়ে এসো গে। ওতো দিয়েই দিয়েচি তোমাদের। ছ্যাপ্‌ ফেলে সে ছ্যাপ্‌ চেটে নেয়ার লোক ঝোড়ো না। আর লাগান্‌-ভাঙান? ওর মদ্দি আমি নেই। তেমন বাবায় জন্ম দেয়নি আমায়। আশ্বস্ত হয় তারণ-মন্থরা।

কু-সংস্কারের মতন আগাছার যে কষাড় জঙ্গল মহুঠাকুরদের অনেকটা সুপ্ত জমি আগলে রেখেছিলো অনেক যুগ ধোরে, মুচিপাড়ার মুনিষদের দৌলতে ঐ মাটির ঘুমন্ত মাতৃক শক্তি চলেছে ফসল-সন্তান-সম্ভাবনার পথে। অনাবাদী জমি উঠিৎ করা থেকে ফসল ফলানো পর্যন্ত মুচিপাড়ার অনেক মানুষ খাটচে। অনেক নিরন্নর অন্ন রোজগারের সড়ক তোয়ের হোয়েচে। নইলে বাছাড়মশাইদের জোট সাপেক্ষ্য ছাঁটাই করা নীতি ঘরভাঙা-সুরপুরকে একদম পিষে মারতো বিষ-নীতির রোলার দিয়ে! শুধু এ উপায়টা ছিলো বলে এ পাড়া বাঁচতে পারলো। বোশেখের প্রথমেই সুবৃষ্টি হোয়েচে এবার। তাই আউস ধানের বীজ বুননও হোয়েচে ভালোভাবেই। সঞ্চিত উর্বর শক্তির কোষে এই বীজ নিশ্চিত মাতৃত্ব সম্ভাবনার ঐতিহাসিক সূচনা।

বিপ্‌নে বলে:

—বট্‌ঠাকুর চলো মাঠে নিয়ে যাই তোমাকে।

—ক্যানোরে বিপ্‌নে ?

—দেখে এসো, বুড়ি ভদ্দরের চরে কী বাহার মাল্লা ধান।

—তাই নাকি ?

—তাই না তো কী। ব্যানাঝুপি ধান ব্যানার ঝোপের মতন আকাশমুখো মুখ কোরে উঠচে। খাটো খাটো গাছগুলো না, ফি-ঝাড়ে বিশ-তিরিশটে কোরে কাটি। বুঝলে বট্‌ঠাকুর ? আপনি যাও তো এখুনি চলো।

—কালকে যাবো। আজ কাছারি যেতে হবে।

—কাছারি ! ক্যানো বট্‌ঠাকুর ?

—কী জানি ! ধান দেখে কাছারির মুখ চুল্‌কোচ্চে বোধ করি।

—বেল পাকলে কাকের কী বট্‌ঠাকুর, বিপ্‌নে মন্তব্য করে।

—তবু নায়েব-গোমোস্তা মানুষ তো। যদি কোনো ছ্যাদা বের কোরতে পারে।

বিকেলের দিকে কাছারি যান মনুঠাকুর। নায়েব চারু বিশ্বেস স-সম্ভ্রমে অভ্যর্থনা জানান :

—আসুন, বট্‌ঠাকুর। এই, চেয়ারটা সামনাসামনি টেনে দে তো।

খাটের ওপর তাকিয়া ঠেস দিয়ে বোসে চারু নায়েব। একজন পাইক তার সামনে চেয়ারখানা টেনে দেয়। মনুঠাকুর বসে পড়েন।

—তারপর ব্যাপার কী চারু ? খবর দিচ্চো কেন ?

—না, এমনিই। অনেকদিন আপনার পা'র ধুলো পড়েনি কাছারি। তাই একবার ডাকালাম। তা ভট্টচায্যি মশায়তো এবার লাল যাত্রী !

—কী রকম ?

—চরে যা ধান বেঁধেচে এবার আপনার দশ বছরের এক বছর। বাড়ির জমিও তো দেখলাম সব উঠিৎ কোরে ফেলেচেন। ব্যানাঝুপি ধান যে বেঁধেচে একেবারে কাস্তে ভাঙা ধান। লাঙল কোরলেন বুঝি ভট্‌চায্যিমশাই ?

মনুঠাকুর জবাব দেন :

—না চারু, লাঙল ঠিক কোরিনি, বন-জঙ্গলে ভরেই ছিল তো জমিগুলো। ভাবলাম জমি সাফ হোক। মুচিরা চাষ-আবাদ কোরে থাক। শুধু শুধু পড়ে না থাকলো।

—তা হালের গোরু কি ওরা কিনলো ? না আপনি কিনলেন ?

—আমিই কিনে দিলাম গোরু। বন কাটার, ভুই চষার খরচ-খরচা সব

আমারই। ওদের সাথে রফা হোয়েচে, পর-পর তিন বছর কোরে খাবে ওরা। শুধু খরচ-খরচার বাবদ টাকাটা দিয়ে দেবে আমাকে।

বিস্ময় প্রকাশ করে চারু নায়েব। মন্তব্য রাখে :

—সে কি! সাধে কি আর বলে বামুনে বুদ্ধি। তা আপনিও কোরতে গেলেন কেন ভট্টচায্যিমশাই? জমি উঠিৎ করার খরচ দিলেন আপনি। গাঁটের টাকা দিয়ে হালের বলদ কিনে দিলেন। এর পরও ওরা তিন বছর ওমনি-ওমনি কোরে খাবে! তাতে আপনার লাভটা কোথায়?

ভ্যাবাচাকা বনে যান মনুঠাকুর। ঢোক গিলে নিয়ে বলেন :

—আমার লাভ, তোয়ের জমি হাতে আসবে আমার।

—আঃ। মুস্কিল। জমি তো আপনিই তোয়ের কোরে দিচ্চেন ওদের হাতে। তিন বছরের মতন ওমনি-ওমান কোরে খেতে।

—যাক্ চারু। তিন বছর বাদে জমি যখন আমার হাতে আসছে তখোন তো নি-খরচায় তোয়ের জমি আসচে।

—কিন্তু ফসলটা? খরচ-খরচা বাদ দিয়ে লাভের অঙ্ক যে-ফসল আপনার ঘরে আসতো তার দাম কতো, ভট্চায্যিমশাই।

চারু নায়েব বুঝেচে বামন মনুঠাকুরের মগজে এ লোকসানটা ঢুকচে না। আর মনুঠাকুর ধূর্ত নায়েবকে ধরা দিতে চাইছেন না। সে লাভ-লোকসান সম্পর্কে বেপরোয়া হয়েই মনুঠাকুর মুচিদের জমি দিয়েছেন। বাছাড়ুমশাই প্রমুখ মাতব্বররা ওদের ছাঁটাই কোরে ভাতে মারবার যে প্ল্যান কেঁদোছলেন এ যে তারই বিপক্ষে জেহাদ ঘোষণা।

—তবে উঠি এখোন চারু। মনুঠাকুর ওঠার উদ্যোগ করেন।

চারু নায়েব বাধা দেয় :

—বসুন ভট্চায্যিমশাই, বসুন। এক কাজ করুনগে, জমি ফিরিয়ে নেন মুচিদের কাছ থেকে। অতগুলো জমি কিসের লেগে দিতে যাবেন? জমির বাবদ যা খরচ হবে আপনার তার দশ গুণ ফসল ঘরে আসবে যে ভট্চায্যি-মশাই।

মুচকে হাসেন মনুঠাকুর। বলেন :

—কথাটা ঠিক বোলেছো চারু। তবে কি. দেখলাম বন হোয়ে পড়ে আছে জমিগুলো। এদিকে হিরুরা মুচিজোন ছাঁটাই কোরে দিলে। সুবিধে বুঝে ফাঁক ভালে আমিও মুচিজন ধরলাম। সস্তায় জমি উঠিৎ হোয়ে গেল।

—তা ঠিক কোরেছিলেন আপনি ভট্টচায্যিমশাই। কিন্তু জমি যদি ওমনি কোরে খেতে না দিতেম ঠিক হোতো। তিন বছর ওমনি-ওমনি পেয়েই তো শাপে বর পেলো ওরা। বাছাড়মশাই তাই তো বলে :

—মুচিপাড়ায় 'ভ্যালানি' ভাঙতাম মনে এবার। তা বট্‌ঠাকুর বাদ সাধলো তার হবে কি?

অট্টহাসি মন্থঠাকুরের মুখে :

তাই নাকি চারু? তা অতো রাগ ক্যানো হিরুর মুচিপাড়ার ওপোর?

গড়গড়া খেতে খেতে চারু নায়েব বলে যায় :

—রাগ তো হবারই কথা ভট্‌চায্যিমশাই, মুচিরা গুমোরে মাটিতে পা দেয় না আজকাল। মজুর ডাকতে গেলে ওরা দামকে দুনো মজুরি চায়। মাগীরা বলে, ঢেঁকীর পরে আর উঠবে না। ধান-চালের দাম বেড়ে চলেচে আর ধান ভাণ্ডানীদের দর নেই। বাঁশে আগুন লাগচে দিন কে দিন। আর ডোল-ডালি-কুলো মাটির দর। মুচির জিনিস। না? এমনিধারা আস্পর্ধার কথা। বুঝলেন ভট্টচায্যিমশাই? তা আপনি যদি বাদ হাটা না জুটতেন, মুচিপাড়ার কাঁধে ঝুলি তুলে ছাড়তো বাছাড়মশাইরা।

এ কথা চারু নায়েবের মুখে শুনতে হবে কেন। বাছাড়মশাইরা মুচি মুনিষ ইস্তফা দেয়ার সাথে সাথেই তো মন্থঠাকুর তা বুঝেছিলেন। মুচিপাড়ার কাঁধে ঝোলা, হাতে হেরিকেন। তাই তার অনাবাদী জমিগুলো উঠিৎ কোরবার অজুহাত মানেই তো মুচিদের বাঁচার সড়ক তোয়ের করা। চারু নায়েবের এ-তড়পানি বাছাড়মশাইদেরই তড়পানি। মন্থঠাকুরের দেয়া সুখ-সুবিধেগুলো তুলে নিয়ে মুচিদের ওপোর চাপ সৃষ্টি করা।

হাসতে হাসতে মন্থঠাকুর বলেন :

—তা হয়তো হোতো। কিন্তু লাভ কি তাতে চারু? এতো বড়ো দুটো পাড়ার কাঁধে ঝুলি চাপিয়ে?

—না, বেজায় দেমাক হোয়েচে ওদের। ছোটো জাতের অতোটা দেমাক।

চারু নায়েবের আরো কিছু বক্তব্য ছিলো। কিন্তু মন্থঠাকুর এগোতে দেন না :

—যাক্, আমি উঠি তাহোলে চারু। তুমি আমার দাখ্‌লেগুলো লিখে রেখো। কাল-পরশু সময় কোরে একবার এসে বাকী টাকা দিয়ে নিয়ে যাবো।

—আপনার কাছে টাকার তাড়াতাড়ি কি ভট্চায্যিমশাই?

—না। তাড়াতাড়িটা আমারই। ধানের লম্বা শিষ ভুলতে দেখে জিব্‌ লকলোকিয়ে উঠতে পারে। নায়েব মানুষ তো তোমরা।

এক ঝলক কলকসহীন হাসি দেখা যায় চারু নায়েবের গোঁফের তলায়।

সেদিন মন্টুঠাকুরদের ঝাড়ে বাঁশ কেটে, বাঁশটা টেনে বের করার সময় তারণ হুপড়ে পড়ে যায় পগারের মধ্যে। যার ফলে ডান পা'টা বেশ মচকে গেছে। উঠোনে আমগাছের গোড়ায় বসে ঐ পা-খানা ছড়িয়ে দিয়ে তামাক টানছে তারণ। আর মন্থরা দিচ্চে তেল মালিশ কোরে। পাশেই গা ঘেঁসে ঘ্যাং-ঘোং কোরে ঘুমোচ্চে তারণের আদুরে বেড়ালটা। এমন সময় ভ্যাবলের বৌ দাসী আসে। সেদিন শশী-সুখো সম্পর্কে রাতের বেলার ঘটনাটা ঘটার পর দাসী আজকাল প্রায়ই এ-বাড়ী যাওয়া-আসা করে। সে-সাথে পরিবেশন করে অনেক কিছু গোপন খবরও। মানে দাসী অন্তর দিয়েই চায় না কাঁচা ছেলে শশী-সুখোর মতন একটা কারোয়ান মেয়েমানুষ খপ্পরে পড়ে নষ্ট হোয়ে যায়। ভ্যাবল কি ফুলবরকেও চেনে। টাকার বিনিময়ে ওরা সব কিছু কোরতে পারে। কোরেওচে।

দাসী এসে মন্থরার ধার ঘেঁসে বসে। খাসখুস কোরে বলে:

—একটা কথা বোলতে এলাম দিদি।

মন্থরার অনেক ছোটো দাসী। তাই ওকে বরাবর তুই বলেই ডাকে মন্থরা। জিজ্ঞেস করে:

—কী মাতব্বরণী? কী বলবি?

—শশেরে সাবধানে রেখো দিদি।

—ক্যানরে?

—ওরা ফাঁক পেলে ঘুরিয়ে দেবে কিন্তু।

—ওরা কারা?

—মাতব্বররা। এবার তারণ কথা বলে:

—কোন্ মাতব্বর গো? বড়ো মাতব্বর? না ছোটো জন? ভ্যাবল না ফুলবর?

—দুজনই। আমাদের উনিও আছে। ফুলবরও। কিন্তু কোরবে-কম্মাবে বলো সব ফুলবর। উনি তো চালাক মানুষ, বুঝলে দিদি?

মন্থরাকে সামনে রেখে তারণকেই লক্ষ্য কোরে বললো দাসী।

কথাটা ভালো ঠ্যাকে না তারণের কাছে। ক্যানো না এ-ধরণের বিয়েতে

ঘড়ি-ঘটার কিছুই নেই। কোনো রকমে তড়িঘড়ি কোরে সেরে ফেললেই হোলো। মানে, সুখো দেবে শশীর পায় এক ঘটি জল ঢেলে। আর শশী দেবে সুখোর হাতে পান-সুপুরি। এই তো ব্যাপার।

দাসী আর বসে না। চোট পায় চলে যায়। কিন্তু পরদিনই আবার সে আসে। আর এক নোতুন সংবাদ নিয়ে। তারণ তখোন কুড়ুল দিয়ে একটা বাঁশ কাঁড়চে। আর সেটা ধোরে রেখেচে মহুয়া—

তারণের সামনে দাসী বরাবর খাসখুস কোরে কথা বলে। দাসী বলে :

—দিদি শোনো, পুঁটের মাকে দিয়ে ফুলবরকে ধোরেচি। রাজীও হোয়েচে ফুলবর।

—কী বোলেচে ?

—বোলেচে মাতব্বর যদি টাকা দেয় তাহোলে এ বিয়ে ভেঙ্গে দিতে পারি আমি।

—ফুলবর তাই বোলেচে নাকি ? তারণ জিজ্ঞেস করে।

—দাসী ঘাড় নেড়ে জানায়, হ্যাঁ।

—টাকা নয় আমি দিলাম। কিন্তু বিয়ে বন্ধ কোরবে কী কোরে ?

—ফুলবর বোলছিলো, তোমরা যখন দখিনে 'ভাসনা' কাটতে যাবে, তখোন সুখোরে সরিয়ে ফেলবে ও। তারপর হয়তো নিকে দিয়ে দেবে আর কোথাও। নইলে শশের বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত সেয়ে রাখবে।

দাসীর কথা বিশ্বাস করে তারণ। ক্যানো না ফুলবর ডেকো-হেকো মাতব্বর। ওর অসাধ্য কাজ নেই। ও যদি সুখোকে সেরে ফেলে তবে যমেও খুঁজে পাবে না। তাই দাসীকে বারবার কোরে তারণ বলে ছায়, টাকা দিতে সে প্রস্তুত। কিন্তু কাজ যেন হাসিল কোরে দেয় ফুলবর। আর টাকার বহরটা মাত্রা ডিঙানো না হয় যাতে তার জন্য দাসী যেন পুঁটের মার কাছে সুপারিশ করে।

এ-ঘটনার বেশ কিছুদিন পরের কথা। তারণ হাট থেকে বাড়ী এসে লণ্ঠন ধরিয়ে বনমালী ব্যাপারীর কাছে যায়। বনমালী তখোন নিত্য-নৈমিত্তিক অভ্যাস মাফিক তাড়ি কি ধান্দী মদ খেয়ে বিছেনায় পড়ে আছে। বেদানা রান্না কোরচে।

—ব্যাপারী, ও ব্যাপারী !! বাড়ি আচো নাকি ?

ব্যাপারীর সাড়া মেলে না। সাড়া দেয় বেদানা :

—ঘরে শুয়ে আচে।

—ও-ও। ঘরে শুয়ে? তারণ সরাসরি ঘরে ঢুকে যায়। এবং ব্যাপারীর গা ধাক্কা দিয়ে ডাকে।

অতি কষ্টে বালিস থেকে ঘাড় উঁচু কোরে ঢুলু ঢুলু চোখ চায় বনমালী:

—কে? ও বড়দা?

ব্যাপারীর গোলগোল দুচোখ জলচে। জবা ফুলের মতন লাল। উগ্র গন্ধ বেরুচ্চে মুখ দিয়ে। নেশায় চুর। আসল ব্যাপার সহজেই বুঝে ফেলে তারণ। ডাকে:

—ও ব্যাপারী, আমি এলাম তোমার কাছে।

বনমালী তেমনি উপুড় হোয়ে শুয়ে আছে। এবার হি-হি কোরে হেসে ফেলে। সবরি কলার ছড়ার মতন দাঁতগুলো বেরিয়ে যায়: বলে:

—হ্যা-হ্যা-হ্যা, তা কি মনে করে বড়দা?

—কিছু টাকার দরকার ব্যাপারী।

—টাকা? টাকা? তা তোমারে টাকা দেবো না তো কারে টাকা দেব বড়দা? ও হাজরার মা। বলি কোথায় গেলি?

—এই তো। বেদানা রান্নাঘর থেকে সাড়া দেয়। এবং ধীরে ধীরে সামনে এসে দাঁড়ায়।

বনমালী রুখে ওঠে:

—কোথায় ছিলি? ও শালী, বড়দা এয়েছে, সে হুঁশ নেই মাগী। আমার গেজে কই?

চোখ বুজিয়ে ঝিমোতে থাকে বনমালী। বেদানা আড়ার ওপোর ঝোলানো ঝুড়ির মধ্যে থেকে বনমালীর তহবিলটা পেড়ে আনে। বলে:

—কই। এই যে ধরো।

—আমি কী করবো শালী? বড়দার হাতে দে।

এবার তারণ কথা বলে:

—তা গুণে-গেথে দেবে তো ও ব্যাপারী!

আবার দাঁত মেলিয়ে হেসে উঠে বনমালী। বলে:

—হ্যা-হ্যা-হ্যা-হ্যা। গণে? গণে? তোমারে টাকা দিতে হবে গণে? বেদানার হাত থেকে থলিটা টেনে-নিয়ে তারণের ধারে ছুঁড়ে ভায় বনমালী।

থলেটা কুড়িয়ে নিয়ে তারণ বলে:

—ধরো ব্যাপারী, আমার একশ টাকার দরকার। গুণে দাও।

—তুমি গণে নাও বড়দা, তুমি তো তুমি, অবিশ্বাস কারেও করে না বনা ব্যাপারী। তাহলে টাকায় এ্যাদ্দিন ছ্যাংলা ধরে যেতো। একশ' টাকা? ও তোমার আশীর্বাদে মুতের ফেনা আগার।

বনমালী কিছুতেই টাকা গুণে দেয় না। শেষ পর্যন্ত তারণকেই গুণে নিতে হয় একশ' টাকা।

এক বস্তা ধান ঘুস খেয়ে সাঁইপণ্ডিতকে পুড়িয়ে মেরেছিলো যে-ফুলবর, সে-ই আবার একশো টাকা ঘুস নিয়ে রাজী হয় সুখোকে সরিয়ে ফেলতে। অবিশ্যি একশো টাকার সবটাই কিন্তু ফুলবরের পকেটে পড়ল না। কিছুটা খেলে ভ্যাবল। আর সামান্য কিছু সীতে। সীতে প্রথমটা আপত্তি কোরেছিলো, একমাত্তর মেয়ে সুখোকে দূরে সরিয়ে দিয়ে ও থাকতে পারবে না। কিন্তু ফুলবর এক ভুলকী দিয়ে বুগু কোরেছিলো সীতেকে। শশী-সুখোতে একদম গর মানান। শশী রোগা ঘ্যানা, পাত ফড়িং, সুখো স্বাস্থ্যবতী। ওর সাথে বিয়ে হোলে সুখী হোতে পারবে না সুখো। তারপর শশীর এই প্রথম বিয়ে। জোর কোরে ওর সাথে একটা বিধবা মেয়ে ঘুরিয়ে দিলে সমাজ তা মেনে নেবে না। মাদারীর সাথে শশীর বিয়ে হবেই হবে। মাদারীর ভরা বয়েস হোলেই লাথি মেরে তাড়িয়ে দেবে সুখোকে। তখোন ওর দুঃখে শেয়াল-কুকুর পর্যন্ত কাঁদবে, তার চেয়ে সুখো আপাতত দূরে থাকবে তারপর একটা ছেলে দেখে শুনে ঘুরিয়ে দিলেই গোল চুকে যাবে। সীতে এ প্রস্তাবে অরাজী হয়নি।

তারণ-শশী 'ভাস্না' কাটতে চলেছে দখ্যিনে বাদা মুল্লুকে। নদী-নালা-খাল-বিল রাজ্যি। বর্ষাকালে জলের ওপোর ভাসতে থাকে যে দেশ। গোরু-মোষরা রাতদিন ভিজে ভিজে এক রকম গলাফুলো রোগে আক্রান্ত হয়। গ্রামকে গ্রাম উজোড় হোয়ে যায় গো-মড়কে। ভাগাড় নেই এদেশে। তাই ঐ সব মরা গোরু-মোষ গাঙ-খালে ফেলে দেয়। ডাঙা রাজ্যি থেকে ঐ সময় মুচিরা গিয়ে গাঙ-খাল ধারে উড়া-ক্যাওড়া-গেউ-বনে আড্ডা গাড়ে। আর ভেসে যাওয়া ঐ সব মরা গোরুর চামড়া তুলে নিয়ে বিনা পুঁজিতে মোটা পয়সা কামিয়ে আউশ ধান পাকার সাথে সাথে দেশে ফেরে। আর যারা দাওয়ালী নয়, সুর-শিল্পী মানে ঢাক-ঢোল-সানাই বাজিয়ে যারা, তারা আরো কিছুদিন অপেক্ষা কোরে আশ্বিন মাসে ফেরে বড়ো পুজোর ঠিক আগেই।

তারণ-শশীরা দু' বাপ-ব্যাটায় নয় কেবল। ভুতো-ছোটোকানাইরা চলেচে।

চলেচে আরো অনেকে ঘরভাঙা-সুরপুর থেকে। এদের গন্তব্যস্থান বিভিন্ন দিকে। বিভিন্ন গাঙে। কেউ যাবে পশর পারে। কেউ যাবে শিবসায়। কেউ কেউ বা রায়মঙ্গলে। তারণ-শশী বরাবর যায় আশাশুনি। মরিশ চাপ্ নদীর ধারে। কালীগঞ্জ থানার কাঁকশিলা নদী থেকে বেশ চওড়া একটা খাল বেরিয়ে শুতে খালির মধ্যে দিয়ে এঁকে-বেঁকে এসে পড়েচে মরিশ চাপে। তারই সঙ্গমস্থলে ছাতরে পড়া এক হিন্তাল তলায় ওরা আড্ডা গাড়ে। গোলপাতা আর হিন্তালের ডাল দিয়ে ছোট্ট কুঁড়েঘর বেঁধে তার মধ্যে তিন চার মাস কাটায় বাপ-ব্যাটা। বেছে বেছে ঠিকমত ঠাঁইটা মনোনীত কোরে নিয়েচে ওরা। মানে এখানে থেকে গাঙ-খাল ছুটো ধারায় ভেসে যাওয়া মালগুলো ধরে নেবার সুযোগ পায়।

এবার নিয়ে পর পর তিন বছর যাচ্ছে শশী 'ভাস্না' কাটতে। ওকে নিয়ে গেলে তারণ আশান্ পায় অনেকখানি। কেননা ছেলেমানুষ হোলেও চামড়া তুলতে ওস্তাদ শশী। তারপর কাদা ঘেঁটে খাল থেকে মাছ মেরে আনা, গাছে উঠে কাঠ ভাঙা, রান্না করা। আর সবচেয়ে বড় কাজ দূরের গাঁও থেকে মিঠে জল আনা। এ কাজটা সব থেকেই কঠিন। অনেক সময় চুরি-চামারি কোরে ডোবায় নেমে জল আনতে হয়। ওরা 'ভাস্না' কাটা মুচি একথা ধরা পড়লেই ছাল তুলে নেবে। এ-সব কাজ তারণকে দিয়ে সম্ভব নয়। তাই শশী যেতে থাকার পর ওর অনেক সুবিধে হোয়েচে। এবার কিন্তু শশী যেতে 'কাড়ুম-কুড়ুম' করে। তারণ-মন্থরার বুঝতে মোটেই বেগ পেতে হয় না ওর আপত্তিটা কোথায়। কিন্তু তারণ ওকে রেখেও যেতে পারে না কোনো রকমে। কে জানে? হয়তো বা তারণের অবর্তমানে কোনো অঘটন ঘটিয়ে বসতে পারে শশী। হয়তো সুখোকে নিয়ে উধাউ হোতেই বা কতখন। তারপর ফুলবর ঘুস্ খেলেও যে হারামী হোতে পারে না তারই বা প্রমাণ কোথা? ডুব দিয়ে জল খাওয়ার মতন তলে তলে থেকে ওর সাথে সুখোকে ঘুরিয়ে দিতেও পারে। বিশ্বাস কী? যা হোক এ-সব চিন্তা কোরে তারণের চেয়ে বরং মন্থরাই বেশী রকম সন্ত্রস্ত হোয়ে পড়েছিলো। শেষ পর্যন্ত অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে সে-ই রক্ত কোরতে পেরেচে শ্রীমান শশীকে। বিদায়ী শশী শিকারী অবিশ্যি গেল-কাল সুখোর সাথে দেখা কোরতে ভুল করেনি। দেখা কোরেচে বুড়ি ভদ্দরের ধারে ওদের সেই সাম্প্রতিক মনোনীত সাঁড়া তলায় নিরালা লতা-বেষ্টনী—অভ্যন্তরে।

সুখো বলেছিলো:

—ও শিকারী, তুমি তো চললে বাদা মুলুকে। আমার কথা কি মনে

থাকবে? গাঙ-খাল দেখে, বাদা বন দেখে, হরিণ, মাছ, চাক ভাঙা মৌ খেয়ে আমার কথা ভুলে ফেলবে একদম। শশী মুচকে হেসে এ কথার জবাব দিয়েছিলো :

—না রে। ছুতো নাতা নিয়ে ছেঁড়া কাটা কোরে শিগ্‌গির-শিগ্‌গির ফিরবো এবার সুখো। এ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো শশী।

মন্টুঠাকুরের জমি উঠিৎ করা থেকে খেতের কাজ কমে আসার পর মুচিরা দল বেঁধে, দখিনে গেছে ভাস্‌না কাটতে। যারা রয়ে গেছে তাদের কাজের কিছুটা ঘাটতি এখোন। মন্টুঠাকুরের ডাঙা জমি আউশের উপযোগী। একবার ঘাস নিড়নো হোয়ে গেছে। আর কিছুদিন বাদে ডাগর ডাগর ঘাসগুলো মেরে দিলেই চলবে। তারপর ধান একবার জেঁকে উঠলে ছোটো ঘাসরা আর কোরবে কি? যা-হোক আবার নিড়োবার মরশুম আসা পর্যন্ত মুচিদের প্রতীক্ষা কোরে থাকতে হবে। কিন্তু পেটের খিদে তো প্রতীক্ষা কোরবে না। সুতরাং বাঁচবার রাস্তার নোতুন সন্ধান হোতে থাকলো। নোতুন রাস্তার সন্ধান ঠিক বলা যায় না। রাস্তা পুরণো তবে চলাচল না থাকায় বুজে এসেছিলো সে পথ-রেখা।

নীলমণি তার ছেলে ইষ্টম এবং আরো কতগুলো জোয়ান ছোকরা নিয়ে দল গোড়ল। ঘরভাঙার ফুলবর-ভ্যাবলরা দল বাঁধলো বিরে, নবাইদের নিয়ে। এ-পাড়ায় ও-পাড়ায় শোনা যায় গেয়োলের গোরু-বাছুর চুরি হোচ্চে। খেতের লাউ-কুমড়া-শশা-কাঁকুড় উধাউ। হাঁড়ির পাস্তা ভাত, ভাজা মাছ অপহৃত। লোকে মন্তব্য করে, এ-সব ছ্যাঁচড়া চোরের কাজ। গেরস্থরা সজাগ থাকে। চোর কিন্তু ধরা পড়ে না। তখোন কেউ কেউ স্পষ্ট প্রকাশ করে, এ নীলে চোর ছাড়া আর কেউ না। ওকে ধোরবে কী কোরে? ও লুকুই মন্তর জানে। বাছাড়মশাইয়ের বিধবা শালী বক্তব্য রাখেন, একখানা সরু লাঠি কী একটা তক্তাপোষের পায়ার আড়ালে নীলে চোর যদি না লুকোয়, কার বাবার সাধ্যি ওকে ধরে। তাছাড়া ও আরো নীদেল মন্তর জানে। এক টিপ ধুলো পড়ে যদি ছড়িয়ে দেয় তাহলে এক বাড়ি লোক একদম ঘুমিয়ে মরে পড়বে। তখোন তার গার ওপোর দিয়ে মই দিয়ে গেলেও চেতনা পাবে না। নীলে চোরের শিষ্য-সাবুদরা এ মুল্লুক ছেয়ে নিয়েছে।

বাছাড়মশাই-এর বিধবা শালীর এ বিবৃতি দেওয়ার পরদিনই এক তাজ্জব চুরি হোলো মথুরবাছাড়ের বাড়ি। সাতটা ছাগোল আর সাতগণ্ডা হাঁস। মথুর সেদিন বাড়ি ছিল না অবিশ্যি। তার বৌ দোরে খিল দিয়ে লম্বালম্বি দোর

ধারেই শুয়ে ছিল। হাঁস-ছাগোল ছিলো ঘরের মধ্যেই। সকালে উঠে মথুরের বৌ স্থাখে যেমন দোর তেমনি খিল আঁটা। হাঁস-ছাগোল উধাও। তাজ্জব কাণ্ড তো। চোর ঢুকলো কোন্ পথে! শেষ পর্যন্ত পথ অবিশ্যি আবিষ্কার হোলো অন্তরীক্ষে। মানে টালি নামিয়ে চালের ফাঁক দিয়ে গলিয়ে নিয়ে গেছে ছাগোল-হাঁস। কিন্তু তা নয় হোলো। মথুরের বৌ তো ঘরে ছিলো না। ঘুমিয়েই ছিলো। হাঁসগুলো নাই প্যাঁক-প্যাঁক কোরে ডাকতে পারলো কিন্তু ছাগোলগুলো ভ্যাঁ-ভ্যাঁ কোরতে পারতো। বাছাড়ুমশাই-এর শালী বক্তব্য রাখেন, ঐ তো, নিদেল মন্তরের ঐ তো গুণ।

এর পর অবিশ্যি চললো হাত চালক, নল চালক, আয়না ভারনা, নখদর্পণ। শেষটা মুচিপাড়ায় ঘরে-ঘরে, আনাচে-কানাচে হোলা খানাতল্লাসী। কিন্তু না মিলল একখানা পাঁঠার ঠ্যাং না হাঁসের ঠোঁট। সুতরাং সন্দেহের বশবর্তীতা অকোজো হোয়েই রইল। ঘটনার কিন্তু এখানেই ছেদ পড়ে না। অর্থাৎ এর পরেকার চোরা ঘটনা যেমনি সংঘাতময় তেমনি সে চুরির ধারাও হু-বহু পালটানো। আর সে ঘটনাস্থল বড়ো ঘরে না হলেও বড়ো বাড়ি। চারু নায়েবের গোয়ালে। মস্ত ভাগলপুরী গাই। আট দশ সের দুধ দেয়। সেদিন সকালে নায়েব জাবনা নিয়ে গোয়ালে ঢুকে দেখে গরুটা পাটম পাট পড়ে আছে। তার চামড়াটা তুলে নিয়ে গেছে। অনুরূপ চোরা 'কেস' ঝপাঝপ চার পাঁচটা ঘটে যায়। সবগুলোর অকুস্থান অবিশ্যি গোশালা নয়। মাঠে! বুড়িভদ্দরের চরেও দু-একটা ঘটে। এরপর বেশ কিছুদিন বিরতি। গেরামগুলো স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচে। পাটোয়ারী বুদ্ধির লোকেরা বলাবলি করে, তাই বলে মনে কোরো না ভাই ভ্যাজাল চুকে গেছে। মোটেই না। চোর নোতুন পথ বাৎলে নিচ্চে। চুরির ধারা বদল হচ্চে।

ঠিক কথা। দিন পনের বাদে টের পাওয়া গেলো। আবার শুরু হোলো গরু মরা। এবার আর গোয়ালে নয়। মাঠে, চরে, সোনামুখীর আশপাশ।

যোগ্যিশ্বর মুচিপাড়ার নামজাদা গো-চিকিৎসক। ছিমন্ত এসে জানায় :

—তার একজোড়া বলদেরই অসুখ কোরেচে।

যোগ্যিশ্বর লক্ষণ জিগ্যাসা করে। ছিমন্ত বলে :

—কেবল লালাচ্চে। জাবর কাটচে না। খাচ্চেও না কিছু।

[illegible] ওস্তাদ দাওয়াই 'কেউরি' করা। মানে পাঁচজন সুদখোরের নাম কোরে তালাক দেওয়া মন্তর দিয়ে একটা সুতো পড়ে দেয় যোগ্যিশ্বর।

সুতোটা গরুর গলায় বেঁধে দেয়া মাত্তর পোকানো ঘা'র পোকাগুলো টপ্ টপ্ কোরে পড়ে যায়। ঘা শুকোয়। তিলে, খোর, পশ্চিমে যে কোনো রকমের কঠিন অসুখ ভেলকী বাজির মতন সেরে ওঠে। যোগিশ্বরের এ হেন ওস্তাদ দাওয়াই দড়িপড়া আমল পায় না। পরদিন শোনা যায় ছিমন্তর বলদ জোড়া মরে গেছে। তখোন যোগিশ্বর কবিরাজ আরো শোনে ঐ মরা গোরুর গায়ের লোম ভুস্ ভুস্ কোরে উঠে যাচ্চে। এবার সে মন্তব্য রাখে :

—বিষিয়ে মারা গেছে গরু জোড়া। মানে হয়ত বা বিষ খেয়েচে নয়তো সাপে কেটেচে।

এখোন থেকে এ ধরণের গোরুর রুগী রোজই আসে যোগিশ্বর কবিরাজের কাছে। যোগিশ্বর কেউরী করে, ওষুধ দেয় কিন্তু সব ফুস্‌ফাস্। পাইকারি হারে মরেই চলেচে গোরুর পাল। এর পর ছলিমদ্দি গাড়োয়ানের দামড়া গরু মারা যাওয়ার পর লোকের মনে খট্‌কা লাগে। ছলিমদ্দি গাড়ি চালিয়ে সংসার চালায়। সেদিন ওর শরীর খারাপ। তাই ভাড়ায় যায়নি। বুড়িভদ্দরের ধারে বাচড়ায় বেঁধে রেখে এসেছিলা গোরু জোড়া। সন্ধ্যের আগে গোরু বাড়ি আনতে গিয়ে, ভাখে ঝিম ধরে দাঁড়িয়ে আছে হালের দামড়া দুটো। তাদের মুখ দিয়ে লাল ঝোরচে। সামনে কতকগুলো শ্যামা ঘাস ছড়ানো। আধ খাওয়া। মনে হয় দুচার কল খেতে খেতে আর খায়নি। গোরুর দশা দেখে প্রাণ উড়ে যায় ছলিমদ্দির। গরীব মানুষ ও। সে এক মুঠি শ্যামা ঘাস কুড়িয়ে নিয়ে একরকম কাঁদতে কাঁদতে দৌড়ে চলে যায় যোগিশ্বরের বাড়ি। পথে যাকে ভাখে তার সাথে গোরুর কথা বলে। আর ঘাস মুঠো ভাখায়। তখোন আসল ব্যাপার সবাই বুঝে ফেলে। এসব দুর্বৃত্তদের কাজ আর এ দুর্বৃত্তরা আর কেউ না। নীলমনি এবং তার চ্যালাচামুণ্ডারা। ক্যানো না এ ধরণের কাজ কম বেশী পেরায় বছর বছর ওদের দ্বারা ঘটে থাকে। ক্ষেত-খামারে যখন জন-মজুরের কাজ ফুরিয়ে আসে তখোন একদল লোক শেকো বিষ মেশানো ঘাস খাওয়ায়ে গোরু মেরে ব্যবসা চালায়। পরদিন অনেক বারের মতন সন্দেহজনক বাড়িগুলো তন্ন তন্ন কোরে খানাতল্লাসী করে গাঁয়ের লোকেরা। কিন্তু অনেক বারের মতন এবার আর কোনো শেকো বিষ-টিস্ পাওয়া যায় না। তবু নীলমনি আর তার সম্প্রদায়ের ওপোর চোখ রাঙানো হয়। কিল, চড়, ঘুষিটাও পড়ে যায়। কিন্তু প্রমাণের অভাবেই পারে না ঘটনার চাকা ঘোরার গতি থামাতে।

এদিকে মল্লঠাকুরদের ক্ষেতে মজুরদের তাগিদ আসে অর্থাৎ ধানের তলায়

ডগার ঘাসগুলো নিংড়ে দিয়ে বুনো নিড়োনো সেরে দেয়ার কাজের। অমনি মুচিপাড়ার মুনিষরা দল বেঁধে ছোটে কাস্তে নিড়িন হাতে। সাথে সাথে যোগিশ্বর কবিরাজের বাড়ি গোরুর রোগীর ভিড় কমে যায়। থেমে যায় পাইকারি হারে গোরু মরা।

ধান গাছ লম্বা ঝাড়ালো হোয়ে ওঠার সাথে সাথে খেতে আসর জমিয়েচে অজস্র রকম পোকা-মাকড়রা। এক শিং দু-শিংওয়ালা পোকারা। ছুঁচলো মুখো-থ্যাবড়া মুখো পোকারা। কয়লা ফড়িং-শ্যামা ফড়িং-গঙ্গা ফড়িং-সেপো ফড়িং-খেওর ঠাকুরের ঘোড়ারা। বেশোপোকাই বা কত রকমারি। ধানী রঙের, জাম রঙের গাদি পোকার ঝাঁক আরো কত অজানা পোকার দল। যাদের কুরচিনামা নিরো-বিপ্নের থেকে জানতে পারেনি সুশান্ত। সে সব অনামী পোকামাকড়গুলো ধোরে কাঁচের জারে পুরে রেখেচে। কতকগুলোর ছবি এঁকেছে খাতায়।

সেদিন ধান নিড়োতে নিড়োতে নিরো বলে :

—খোকাঠাকুর তুমি তো ঘাস আর পোকামাকড়ের নামের ফর্দয় খাতা ভর্তি কোরলে। আর একটা পাতাও নেই। এবার আর একটা নোতুন খাতা কিনে নিয়ে আমার সাথে চলো। যাবে খোকাঠাকুর ?

উৎসুক সুশান্ত শুধোয় :

—কোথারে রে ?

নিরো বলে :

—আমাদের পাড়ায়। যাবে ?

—ক্যানো ?

—দেখো গর্ত্তর মধ্যি কতো রকমের পোকা-মাকড় কিলবিল কোরচে আমাদের পাড়ায়। ওদের নামগুলো লিখিয়ে দেবো তোমায় খাতায় !

শুনে তো সুশান্ত আহ্লাদে তখোন আটখানা। লাফিয়ে ওঠে :

—যাবো। চল তবে।

হেসে ফেলে নিরো। বলে :

—কখোন ?

—এখোনই।

—পাগোল হয়েছো তুমি খোকাঠাকুর। আজ না। কাজে একটু ঢিলে

পড়ুক। আর তুমি তায়ে জাব্দা দেখে একটা নোতুন খাতা কিনে ফ্যালো।

সুশান্তর শিশুমন ভারি চোটে ওঠে নিরোর ওপর। ওদের পাড়ায় পোকা-মাকড়ের এত্তোই যদি আমদানী, এতোদিন সে কথা ক্যানো বলেনি! আর আজ যদিই বা বললো, তবে তার এ গড়িমসিই বা ক্যানো? খেতভরা লোক, তাই সে মনের রাগ মনেই চেপে যায়। নিরোকে কিছু বলতে পারে না। শুধু জানিয়ে রাখে, বেশ। তবে আজ থাক। কিন্তু কাল যদি না যাস্ তো মজা টের পাবি।

•

আজ পণ করেই বসেছিলো ময়না। বাদশার স্মৃতি-সৌধ নির্মাণ কাজ শেষ কোরে তবে উঠবে। সোনামুখী সুঁচ-সুতো আর নিষ্ঠাপূর্ণ মন তিনটের একটারও অভাব ছিলো না। কিন্তু কাজ তার বেশী দূর এগোতে পারেনি। এমনি এক সময় এক হৈ-হট্টোগোল কানে আসে। ময়না কান উঁচিয়ে শোনে, মার শালাকে, ধর শালাকে, ওর জিব টেনে ছিঁড়ে ফ্যাল। ও শালা, হাঁড়ির ভাত চুরি কোরে খায় যেমন। শব্দ ক্রমেই এগিয়ে আসে। শেষ পর্যন্ত একটা আঠারো-উনিশ বছরের গোমড়া ছেলে চ্যাচাতে-চ্যাচাতে ময়নাদের উঠোনে এসেই দম্ কোরে পড়ে যায়। আর তার পেছনে পাড়ার ছেলেরা। দল বেঁধে তাড়া কোরেচে গোমড়াকে। মেরেওচে দস্তুর মতন ঘা কতক। কিন্তু এখোনো পোষায়নি বলে পেছন পেছন ধাওয়া করেচে। নীলমনির ছেলে ইষ্টম্ আর ঘরভাঙার নবাই এ দুজনেরই হাতে জাব্দা দুখানা বাঁশের লাঠি। মেরেই ফেলবে গোমড়াকে। বেগতিক দেখে ময়না তড়াক কোরে উঠোনে লাফিয়ে পড়ে। গোমড়া বুকে হ্যাচড়াতে হ্যাচড়াতে ময়নার কোলের কাছে সরে আসে। এর ফাঁকেই নবাই এক বাড়ি মারে ওর পিঠে।

ময়না চেঁচিয়ে ওঠে, এই নবাই, মারচিস্ ক্যানো ওকে?

না, মারবানে না পুজো কোরবানে।

ক্যানো? কী করেচে ও তোর?

ইষ্টম জবাব দেয়:

—ও ভাত চুরি কোরে খেয়েচে ওদের হাঁড়ির, ও শালারে ছুলে ফ্যালবো। তুমি সয়ো তো মাসি। ইষ্টম্ লাঠি উচোয়।

ময়না বাধা দেয়। বলে, না। মারতে দেবো না। কিছুতেই না।

নবাই চোটপাট কোরে ওঠে:

—না, মারতে দেবে না। মামার বাড়ির আব্দার—। ক্যানো? ওকি তোমার মার ভাতার?

—থাপড়ে গাল ভেঙে দেবো ফের যদি মুখ খিস্তি কোরবি। ময়না রুখে ওঠে।

—অতো সস্তা না। গাল ভেঙে দেবে। অধিদত্ত হাঁড়ির ভাতগুলো চুরি কোরে খেলো শালা। বাবা ভোরদিন খেটে এসে উপোস কোরে থাকলো। ওনারে পুজো কোরতি হবেনে। শালা গোমড়া। লাঠি উঠিয়ে মারতে যায় নবাই।

ময়না আগলে ধরে গোমড়াকে। সে বোঝে নবাই-এর মারার কারণটা যুক্তির বাইরে নয়। একুতিয়ারেই।

নতি-স্বীকার করে ময়না। বলে:

—নবাই—লক্ষী ভাই আমার, মারিসনে ওকে। গোমড়ামানুষ ও। বোঝে না। সত্যি ভারি অন্যায় কোরেচে।

ময়নার নতি স্বীকৃতি বশ করে সবাইকে। উদ্যত যষ্টি নামিয়ে নেয় সে।

নবাই-এর আক্রোশকে কেন্দ্র কোরে ছেলের দলের আক্রোশ, সে নবাই যখন ময়নার বশীভূত তখোন ছেলেদের আক্রোশ আর ঠাঁই পায় কোথায়? তারা এক এক কোরে চলে যায়। গোমড়া নিরাপদ মনে করে নিজেকে। সে তখোন ময়নার পানে তাকিয়ে কাঁদে, গোঙায় আর ইশেরা কোরে দ্যাখায় কোথায় মেরেচে ওকে।

চোখ ফেটে জল আসে ময়নার। সে হাত বুলোয় ওর গায়। বলে:

—বড্ডো মেরেছে তোরে চাঁদু? তা তুই ক্যানো চুরি কোরে ওদের হাঁড়ির ভাত খেতে গেলি, আমি তো রোজ তোকে ভাত দিই। আজ ক্যানো এলি নে?

গোমড়া কাঁদতে থাকে। আর অব্যক্ত ভাষায় তার ওপোরকার অত্যোচার কাহিনী প্রকাশ করে।

—তোমার চাঁদুকে বুঝি ওরা মেরেছে দিদি?

গোলমালে ভীড়ের মধ্যে বেদানা এসে কখোন দাঁড়িয়েছে ছেলে কোলে নিয়ে। ময়না তা খেয়াল করেনি।

—ও মা! তুই কখোন এলি। এ কে? বাবা মাণিক আমার। ওঃ! হাসি আর গালে ধোরচে না যে। ময়না কোলে নিয়ে চুমো দেয় বেদানার ছেলেকে। দিব্যি গোলগাল নাদুস-নুদুস ছেলেটা, না কালো না ফর্সা রঙ।

মানে না পেয়েছে বাবার রঙ। না মার।

ছেলেটা বুকের পরে নিয়ে নাচাতে নাচাতে বলে যায় ময়না :

—কী মার না মেরেছে ওরা চাঁদুকে। মেরেই ফেলতো। ভাগ্যি ভালো। ছুটতে ছুটতে ও এখেনে এসেছিলো তাই। তবু শুনতে চায়? মেরেই ফেলবে।

—ক্যানো? কী কোরেচে ও, দিদি?

—ও নাকি নবাইদের হাঁড়ির ভাত চুরি কোরে খেয়েচে। হতভাগা, ক্যানো তুই খেতে গেলি? রোজ আসে। আজ কী খেয়াল হোলো আসেনি। মরনে তাড়িয়েচে ওকে তাই। এই, এই, একি কোরলি! ও হারামজাদা ছেলে।

—বাঃ! দিদি? মুতেছে নাকি? ওরে দুষ্টু, মাসিমার গায় 'ফুল' কোরতে হয়? গেয়ান, বুদ্ধি আর কবে হবে তোমার? ময়নার কোল থেকে ছেলেকে তুলে নেয় বেদানা।

একফালি খেজুর পাতার পাটি এগিয়ে দিয়ে ময়না বলে :

—বোস। না, এ ছেলে তোর বোকা হবে না। এ খুব চালাক-চতুর হবে।

—কে বললে তোমায়? বেদানা জিগ্যেস করে।

—কে আর বোলবে? ওর চোখ-মুখই বলে দেয়। দেখছিস্ নে কী ছওড়া কপাল! খরখরে চাওনি।

—ঐ চাওনিই তো বদমায়েশের লখ্যন। এক নম্বর শয়তান হবে।

—না রে। প্রতিবাদ করে ময়না।

—তুমি না বললে, আমি শুনি দিদি? ফোঁস্ কোরে নিশ্বেস ফেলে বেদানা। ময়না বুঝে ফেলে বেদানার কোথায় যেন এক মস্ত হাহাকার। মস্ত শূন্যতা।

—কীরে? অতো আপসোস কিসের তোর?

—কই? না।

—তবু ভাঁড়াস আমায়।

—না। তোমাকে তো কিছুই ভাঁড়াই নে। তবে ছেলে বলো যাই বলো দিদি, এ সবই আমার অসার।

—ক্যান রে?

—ক্যান রে! তুমি কিছু বোঝো না! কিছুই জানো না তুমি! হাজরার বাবা বেঁচে থাকতে লোকের সাথে পরিচয় দিতো, হাজরা ওর হাটানো ছেলে। এখোন ব্যাপারীও আবার ধোরেচে ঐ-বুলি, হাজরা ওর হাটানো ছেলে, আর

একে কী বোলবে লোকে ? সেকি আমি জানিনে দিদি ?

—কি বোলবে ?

—কি বোলবে ? তাও শুনবে আমার মুখ দিয়ে। হায়রে পোড়া কপাল ! বলবে রাঁড়ের পেটের ছেলে। চোখ মুছতে থাকে বেদানা।

—তুই কাঁদছিস্ ! ঐ গোলকধাঁধায় এখোনো ঘুরচিস্ তুই !

—একি গোলকধাঁধা !

—গোলোকধাঁধা। ধাপ্পাবাজি। একদিন আমিও ঐ ধাপ্পাবাজির মধ্যে ঘুরছিলাম। আর নেই এখোন। সাঁইপণ্ডিত অনেক দিক থেকে আমার চোখ ফুটিয়ে দিয়ে গেছে রে বেদানা।

বেদানা কিছুই বুঝতে পারে না ময়নার কথা। শুধু ফ্যাল ফ্যাল কোরে তাকায়।

—কী বুঝলিনে ?

—না দিদি।

—তুই তো ছেলের ভাবনা ভেবে লজ্জায় বাঁচিস্ নে। কিন্তু এ ছেলে কি বাতাসে ভেসে তোর পেটে এসেচে। ব্যাপারীর সাথে রীতিমত বিয়ে হোয়েচে তোর। কেনা জানে ? কিন্তু যারা সধবাও না, বিধবাও না, আইবুড়ো মেয়ে। তারাই বাচ্চা ধোরলো পেটে। আর ঐ সব বাচ্চারা মুনি-মোহন্ত সেজে হাজার হাজার লোকের মাথায় রাখলো পা। কেউ কেউবা বীর হোয়ে দাপটে দুনিয়া তুললো কাঁপিয়ে আর তাদের মায়েরা সতী-সাধ্বী সেজে জেঁকে বোসলো রামায়ণ মহাভারতের পাতা। কই ? তারা তো লাজে মাথা নোয়ালো না ! অথচ ভেবে ভাখ তো, তোর চেয়ে ওদের লজ্জা কতো বড়ো। আরো শুনবি ? রাখাল ঠাকুর-পো বেঁচে থাকতে ব্যাপারীকে ভালো বেসেছিলি তুই। এই তোর অপরাধ আর তার চেয়ে মস্ত অপরাধ ঐ ভালবাসার পথ খোলোসা কোরতে বিষ দিয়েছিলি ঠাকুর-পোকে। তবু তুই তো ভালবাসার সাথে চোরামন নিয়ে খেলা খেলাস্ নি। যেমন কোরেচে ঐ সব সতী-সাধ্বীরা। স্বামীর মতন পাঁচ পাঁচ জন স্বামী ঘরে থাকতে আরো পরোপুরুষের ওপোর লালসা। স্বামীর সাথে মন চুরি কোরে পাঁচ পাঁচজন মরদ ধরা। এ-সব দোষের কাছে তোর দোষ সমুদ্দুরের কাছে গোষ্পদ খুরের জল।

এ-সব গোলোক-শাস্তর বেদানা জানে না। শোনেও নি কারো মুখে। এরপর ময়না একে একে মহাভারতের সব উপাখ্যানগুলো শোনায়ে দেয় ওকে। শেষ

পর্যন্ত এও বলে প্রবোধ দেয়, যতো বড়ো পাপীই হোক না বেদানা, অ-ভরসার কিছু নেই তার। তারও উদ্ধারের পথ রাজপথের মতনই চওড়া।

ময়নার কথা শুনে বেদানার বুকের ভার লাঘব হয় খানিকটে। তবু সে বলে :

—শোলোক-শাস্তর ও দিয়ে আখড়া জেতা যায় দিদি। তাছাড়া কী ঘাস জল খায় ওতে? শোলোক-শাস্তরের বাইরে রয়েচে চলতি সমাজ। তাকে তুমি ঠেকাবে কী দিয়ে? ধরো ঐ শশের বিয়ের সময় আমি কি ওর গায় হলুদ দিতে পারবো? নিকের বৌ বলে, আমারে এয়ো কাজে কেউ ডাকবেও না। ও দিদি, তোমার চাঁদু যে ঘুমিয়ে পড়েচে।

গোমড়াটা ওদের কথার ফাঁকে কখোন দাওয়ায় উঠে ঘুমিয়ে পড়েচে। লখ্য করেনি কেউ।

ময়না বলে :

—ঘুমোবেই তো, যে মার খেয়েচে ও। উঠতেই পারবে না দু-দিন।

যেতে যেতে বেদানা এগিয়ে আসে। বলে :

—ও দিদি, শুনেচো? অমর বৌ চলে গেলো যে!

—কে? কুসমী! মাইরি?

—মাইরি।

—তা কোথায় গেলো রে?

—তা জানিনে, তবে পঙ্কা গোঁসাই-এর সাথে।

আকাশ থেকে পড়ে ময়না। এ-পাড়ায় অমর বৌ সব থেকে ভালো। যেমনি ওর দেব-দেবতা ভক্তি, তেমনই স্বামীর ওপোর শ্রদ্ধা। দু-বেলা অমর পা পুজো করে। পা ধুইয়ে আঁচোলে মুছে দেয়। সময় পেলেই ঠাকুরবাড়ি ছোটে। শৈলজার পাশে বসে রামায়ণ-মহাভারত শোনে। এ-হেন কুসমী পঙ্কারাম গোঁসাইয়ের সাথে চলে গেল! ছেলে পিলে হয়নি কুসমীর। হবে না। আটসাট নিটুট বাঁধন শরীর হোলেও চলে যাওয়ার বয়েস তার চলে গেছে। কুসমীর বাপের বাড়ি কাকমারী। পঙ্কা গোঁসাই ঐ পাড়ারই লোক। বছর-খানেক আগে বাপের বাড়ি গিয়ে মাস তিনেক থাকে কুসমী। সেই সময় গোঁসাইজীর কাছে নাকি মন্তর নেয় ও। তারপর থেকেই পঙ্কারামের এ-বাড়ি আনাগোনা। এ-সব ময়না শুনেচে। বা দেখেও থাকে। ময়না আরো শুনেচে বৈষ্ণবদের মধ্যে যে চারটে সম্প্রদায় আছে আউল, বাউল, সাঁই, দরবেশ তার

মধ্যে পঙ্কারাম সাঁই সম্প্রদায়ের সাধু। যা নেই ব্রহ্মাণ্ডে, তা আছে এ-ভাণ্ডে। এই হচ্চে এদের সাধন ভজনের আদি তত্ত্বকথা। প্রচলিত বেদ বিধি আচার-অনুষ্ঠানের কোনোই মূল্য দেয় না এরা। দেহ ভাণ্ডেই সাধন ভজনের উৎস রস, ঐ রসোধারা ধরেই সাগরে উৎরে যেতে হয়। আর ঐ রস আহরণ কোরতে হয় পরকিয়া তত্ত্বর সাহচর্যে। এরা শিষ্যদের এই বলে ভজায়, পতি একমাত্তর পরম পতি। অর্থাৎ ঈশ্বর। আর সব আটপৌরে পতি। এ আটপৌরে পতি একাধিক হোতে পারে।

ময়না প্রথম প্রথম দু-একদিন গেছে কুসমীদের বাড়ি। আর এক গাল চাপ-দাঁড়ি গোঁফওয়ালা আড়ে-দিঘে তাল গাছের মতন বহর ঐ লোকটার মুখে ধরমো কথা শুনেচে। শুনেচে সাধন-ভজন প্রণালী। অবিশ্যি গোঁসাইজীর সব তত্ত্বকথা বুঝতে পারেনি ও। তবু যেটুকুন বুঝেচে ঘেন্নায় নাক কুঁচকে সরে আসতে হোয়েচে ওকে। তারপর অনেক দিন দেখেচে ঐ লোকটাকে। দেখেচে কাক-কুলিনা ডাকা ভোরে ওদেরই বাড়ির সুমুখ দিয়ে বুড়ি ভদ্দরে নাইতে যেতে। তেল মাটি আরো কত কী ছাই-ভস্ম গায় মেখে ডলতে ডলতে। যতবার নজর পড়েচে ততবারই চোখ ফিরিয়ে নিয়েচে ময়না। আজ কুসমী হতভাগী ঐ তালগাছপানা লোকটার সাথেই চলে গেলো! ওর ভক্ত মন শেষটা পটলো কিনা একটা লোমশ ভালুকের মোহে! তাও এই তিরিশ-পঁয়ত্রিশ বছর বয়েসে!

অম্র বেচারীর জন্য মনটা ভারি খুড়তে থাকে ময়নার। ঠাণ্ডা মানুষ অম্র সাত চড়ে এক কথা কয় না। কুসমী ছাড়া কিছুই জানে না। কুসমীই বুঝি কর্তা। অম্র গিন্নী। এমন নিরীহ ঠাণ্ডা মানুষ ছাড়তে পারলো হতভাগী।

অম্রদের বাড়িটা পাড়ার একদম মুড়োয়। ময়না বলে :

—চল তো দেখে আসি বেদানা। বলেই ওকে একরকম টানতে টানতে নিয়ে যায় ময়না।

ঝক্ঝক্ কোরচে বাড়িখানা। যেন হাসচে। উঠানের মাঝখানে মাথায় হাত দিয়ে বসে অম্র কাঁদছে। নেহাৎ ছেলে মানুষের মতনই কাঁদছে। ময়নাদের দেখে সে-কান্না আরো বেড়ে যায়। ময়না যা অনুমান কোরেছিলো, তাই ঠিক। অম্রকে বেজায় দাগা দিয়ে পালিয়েচে কুসমী। আশ্চর্য। তবু কুসমীর মায়া ও ছাড়তে পারেনি। এবং পালিয়ে যাওয়ার দরুণ মোটেই দুষচে না ওকে। সব দোষের বোঝা-বোচকা চাপিয়েছে পঙ্কারাম সাঁইয়ের ঘাড়ে।

নাক মুছতে মুছতে ময়নার পানে তাকিয়ে বলে যায় অন্ন :

—ঐ পঞ্চা শালা, শালার গোঁসাই গুণ কোরে নিয়ে বের কোরেচে ওরে। নইলে ওকি যায়? লোকের মেয়ে মানুষ আর আমার মেয়ে মানুষ? কেউ বলতে পারে অন্নর বৌ কোনো পুরুষ লোকের মুখের পানে চোখ চেয়েচে?

অন্নর বক্তব্য মোটেই মাত্রা ডিঙোনো না। ময়না তা ভালই বোঝে। সেও সহানুভূতিসূচক ঘাড় নাড়ে। অন্নর ছোটো ভাই সুচা। মস্তান হিসেবে ছোটোকানাইয়ের পরেই সুচার স্থান। নিশুত রাতেই কুসমীকে নিয়ে বের কোরেচে গোঁসাই। সুচা তখোন ঘুমিয়ে। এখোন সে তাই কোমরে গামছা বাঁধছে। সুচার দোষারোপ কুসমী-গোঁসাই দুজনেরই ওপোর।

তাই সে চোটপাট কোরেচে, আমি চ্যাতনা থাকলে একটার ওপোর আর একটাকে রেখে চাক চাক কোরে কাটতাম।

অন্ন প্রতিবাদ করে :

—নারে। বড় বৌ-এর কোনো দোষ না। ও নির্দোষ। ওরে গুণ কোরে নিয়ে গেচে পঞ্চা শালা। ছাখা হবে না? ও ক্যামোন গোঁসাই, দেখে নেবো সেদিন।

সুচা মুখ খিচিয়ে ওঠে :

—তুমি রেখে ছ্যাও। গুণ না ছাই। শয়তান মাগী। না গেলে ট্যাকে গুঁজে নিয়ে গেছে গোঁসাই। না? রাত পোয়ালেই কাকমারী যাচ্চি। ও দুটোরে নিকেষ কোরে তবে আমার আর কাজ।

রাত পোহালে সত্যি-সত্যিই কাকমারী যায় সুচা। আর পরদিন ফিরেও আসে। কিন্তু নিকেস কোরে আসতে পারেনি কাকেও। বরং ও নিজেই নিকেল হওয়ার মতন হোয়ে ফেরে। মানে সুচা বাঘের মতন ঝাঁপিয়ে পড়ে দাড়ি এঁটে ধোরে পঞ্চা সাঁইকে মাটিতে শোয়ায়ে ফেলে। বেগতিক বুঝে কুসমীই লম্বা হেঁসো দা নিয়ে সুচার ওপোর হামলা ছ্যায়। এবং যেভাবে কোপ ঝাড়ে ঠিক মতো লাগলে মাথার আধাআধি মাটিতে নামিয়ে আনতে পারতো। কিন্তু সুচাও হুঁশিয়ার ছিলো তাই হেঁসোর আগাটা মাত্তর লেগেছিলো ঠুক কোরে। তাতেই চামড়া কেটে হাড়ের গায় ঠুক কোরে উঠেছিলো। সুচা প্রাণ এবং প্রাণের বড়ো মান বাঁচাতে আর এক মোত্তরও দাঁড়ায়নি ওখানে।

সে বাড়ি ফিরে এসে আনুপূর্বিক ঘটনার বিশদ বিবরণ দিয়েচে দাদা অন্নকে। অন্নর মগজে পেরেকের মতন বিঁধে থাকা ধারণার শেকড় উপড়োয় নি কিন্তু। সে

মন্তব্য কোরেচে, পঞ্চা সাঁই তাল গাছে পেরেক ঠোকা, তুক-তাক কোরে বের কোরেচে ওর বৌকে। মুচিপাড়ার সব মেয়েমানুষগুলো দাগী। কুসমী ওর তেমন মেয়েমানুষ না। অন্ন ওর প্রস্থিতা কান্তার ছিন্ন শাড়ির ন্যাকড়াগুলো খুঁজে বার করে। বার করে চালের বাতায় গুঁজে রাখা ছেঁড়া চুলের গাদা। তারপর পুজোর ফুলের সাজিখানার মধ্যে ঐগুলো পুরে রাখে আড়ার গায়। রোজ শুয়ে ঐ স্মারক চিহ্ন দেখে দেখে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত কাটিয়ে দেবে অন্ন।

বাগানমারা জমি বেজাই তেজী। ঐ জমির ধান তাই আজো পেকে ওঠেনি। চামরের মতন শীষগুলোয় কেবল রঙ চড়চে। কিন্তু বুড়িভদ্দরে চরের ধান ঝলমল কোরচে সোনায় সোনায়। মনে হয় পাতালের সীতাকে এতোদিন পরে ফিরিয়ে এনেচে নিরো-বিপ্নে এবং মুচিপাড়ার আর আর মজুরদের রক্ত তপস্যা।

রোদ ঝলমল সকাল। রোদ ঝলমল বুড়িভদ্দরের জল। আঁকাবাঁকা বাঁক। এমনই এক ঝলমল করা সকালে ফিরে আসে তারণ-শশী ভাটির দেশের নদী—নালা—খাল—বিল—পাড়ি দিয়ে। হরিণ চরা শ্যাম-সম্পভূমি; উড়া ক্যাওড়া—হিন্তাল—গজন বনের মায়া কাটিয়ে।

উঠোনে পা দিতেই শশীকে ঘিরে ধরে ওর সাঙাতরা—ইষ্টম, বোষ্টম, সতীশ। মনে হয় কতোদিন দেখেনি ওরা ওদের প্রিয় শিকারীকে। তিন মাসের না দেখা। এর মধ্যে শশী বুঝি আকাশ-পাতাল পালটিয়ে গেছে। পেটে থরথর কুলটি দেখা দিয়েছে। গায়ে টেনে দিয়েছে আর এক পোঁচ কালি। বুঝি ভাটির দেশের পলিমাটি মেঠেল মাটির ছেলেকে পেয়ে পরিয়ে দিয়েছে তার স্নেহ—সত্তা—রঙ।

সতীশ ওর ডান হাতখানা এঁটে ধরে বলে :

—শশে, তুই তো বেশ মোটা হয়েছিস!

—আমি তো মোটা হোয়েছি। কিন্তু তুই এতো কাবু হলি ক্যানরে সতে?

—আমার যে আবার অসুখ কোরেছিলো। সাত আটদিন ভুগলাম।

বোষ্টম তড়বড় কোরে বলে ওঠে :

—ও শিকারী, তোমার শিকার চলে গেছে।

বোষ্টম তাড়া দেয়:

—এই শুয়োর।

শশী ঠিক বুঝতে পারে না। জিজ্ঞেস করে:

—কী রে?

—কই? কিচ্ছু না। ফাজলামি।

শশী ঘুঘুমারা ছেলে। ঘুঘুর চেয়েও চালাক। এখোন সে বেশ বোঝে, ওরা কী একটা গোপোন কোরচে ওর কাছে। তবু সতীশ—বোষ্টমদের সামনে ও আর পীড়াপীড়ি করে না। কেনো না ওরা বয়েসে ছোটো। সাথে-সংগে বেড়ালেও ইয়ারকি করা চলে না, শশীর যা-কিছু গোপন, যা-কিছু ইয়ার্কি ফাজলেমি ইষ্টমের সাথে। ওরাই শুধু দুজন দুজনকে জানে।

ইষ্টম বলে:

—এই সতে, এই বোষ্টম, তোরা তালে খেয়ে দেয়ে আয়। শশেও তালে খেয়ে নিক। তারপর ভাটি-মুল্লুকের গল্প শোনাবো। যা—তাড়াতাড়ি কোরে আয় গে। বোষ্টম বলে:

—তুই? তুই যাবিনে খেতে?

—আমি? আমি তো খেয়ে এলাম।

সতীশ বোষ্টমকে বিদেয় কোরে দেয়। শশী আপত্তি করে না। ও তো তাই-ই চায়। ওর-ও মন উস্‌খুস কোরচে সুখোর খবর নিতে।

শশী- ইষ্টম গল্প কোরতে কোরতে ঘরভাঙা মুখো যায়।

মন্থরা ডাকে:

—ও শশে, তা এখোন আবার চল্লি কোথায়? একটু জিরো। তারপর খেয়েদেয়ে বেরোস্।

—আসি। বলে শশী চলে যায়।

ইস্কুলের ভিটের ধারে আমতলায় পৌঁছয় এসে। ইষ্টম বলে:

—বোস এখেনে শশে।

—এখেনে!

—বোস না একটু। বলতে বলতে ওর হাত ধরে টেনে নিয়ে বসে পড়ে দুজন। শশীর কিন্তু এখানে বসার ইচ্ছে মোটেই ছিল না। ও সুখোদের বাড়ির

ধার দিয়ে ঘুরে আসবে। অন্ততঃ দেখে আসবে তিন মাস না দেখা ওর প্রণয়িনীকে।

শশীর গায় একটা নোতুন কেনা রেডিমেড ছিটের সার্ট। সে পকেট থেকে দুটো বিড়ি বের করে। একটা ইষ্টমকে দেয়। আরটা নিজের মুখে লাগায়। নোতুন শেখা কায়দায় দিয়াশিলাই ধরায়। মানে থচ্ কোরে শব্দ সৃষ্টি না কোরে বারুদ লাগানো পিঠের ওপোর কাঠিটা টেনে আনে।

বিড়িতে বার দুই টান দিয়ে নাক মুখ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে শশী জিগ্যেস করে :

—এই ইষ্টম, সুখোর খবর রাখিস্? ক্যামন আছে?

ইষ্টম হেসে ওঠে।

বুকের মধ্যে ধড়াস্ কোরে ওঠে শশীর। মনে পড়ে যায় তার—বোষ্টমের কথা,—ও শিকারী, তোমার শিকার চলে গেছে। তবে কি সুখো বেঁচে নেই! আর কিছু জিগ্যেস কোরতে সাহস হয় না শশীর। যদি কোনো দুঃসংবাদ সরবরাহ করে ইষ্টম।

—কী? হাসলি যে!

—না এমনি, সুখো তোর ভালো আছে, তবে এখানে নেই সে।

—নেই! কোথায়?

—তা তো বলতে পারিনে শশে।

—আবার বিয়ে দিয়েছে নাকি ওর?

—না রে। বিয়ে দিলে আমরা জানতে পারতাম না? তুই চলে যাওয়ার পর ও অন্তর্ধান। জিগ্যেস কোরলে সাঁতে মাসী কিছু বলতে চায় না। আকাশ ভেঙে পড়ে শশী শিকারীর মাথায়। আঙুলের ফাঁকে আটকে থাকা বিড়ি আঙুলেই জ্বলে জ্বলে নিভে যায়।

—একটা মানুষ চলে গেল পাড়া থেকে। কোথায় গেলো? কী হোলো? তোরা কিছুই জানতে পারলি নে! খোঁজ কোরেছিলি? আর কেউ না জানুক, তুই তো জানিস, তার সাথে আমার সুবাদটা। সে হিসেবেও তোর খোঁজ-খবর নেয়া উচিত ছিল না ইষ্টম!

শশী উঠে দাঁড়ায়। ছুঁড়ে ফেলে দেয় নিবন্ত বিড়িটা। কাঁদো কাঁদো হোয়ে ইষ্টম বলে :

—তুই রাগ কোরচিস্ শশে! মা কালির 'কিরে' আমি যদি মিথ্যে কথা

বলি। সুখো চলে যাওয়ার খবর শুনেই আমি খুব চেষ্টা কোরেচি তার খোঁজ নেবার। কিন্তু কেউ বলতে চায় না। সীতে মাসীর কাছে কম কোরে দশ কিতে জিগ্যেস করলাম, মাসী, সুখো কোথায়? তারে দেখিনে ক্যানো? আমতা আমতা কোরে মাসী কয়, তার বিয়ে দিয়ে দিয়েছি। জিগ্যেস করি, কোন গাঁয়? বলে, সে তুই চিনবি নে। অনেক দূর। আর তারা বড়ো ভেগে। আমাদের চেয়ে উচো।

শশী প্রশ্ন করে:

—তা তুই জিগ্যেস কোরলিনে কবে বিয়ে হোলো? আমরা তো টের পেলাম না?

—বলো কী! কোরি নি? বলে, কারেও তো বলি-কইনি। ভারী তো বিয়ে। উলু নেই। বাজনা নেই! কেবল পান-সুপুরী আর জল ঢালাঢালির ব্যাপার। তার কবো কী? ঢোক গিলে নিয়ে আবার বলে যায় ইষ্টম, তবে বিয়ে ওর হয়নি শশে। তাহলে কেউ না কেউ টের পেতো।

শশী আর কথা কাটাকাটি করে না। পায় পায় বাড়ি ফিরে আসে এবং কোনো রকমে দুপুরের খাওয়া শেষ কোরে বেরিয়ে পড়ে নিঃসঙ্গ। ইষ্টম, বোষ্টম কি সতীশ কাকেও সাথে নেয় না। ঘুরতে ঘুরতে ঠাকুর বাড়ি গিয়ে নিরোর সাথে দেখা করে। মনুঠাকুরের বাড়ি মাইনে থাকার পর নিরো মাসে দু'একদিনের বেশী বাড়ি যায় না। ঠাকুর বাড়ি পড়ে থাকে। পাড়ার সম্পর্কে আজকাল সে মোটেই ওয়াকিবহাল নয়। নিরোর সঙ্গে দেখা কোরে সুবিধে হয় না কিছু। সেখান থেকে উঠে এদিক সেদিক ঘোরাঘুরি কোরে পৌছয় শশে। দেখে নিঝঝুম বাড়িখানা। সবাই খেয়েদেয়ে ঘুমোচ্চে। ঘরের কোণায় ওর ভাত রয়েচে চাপা দেয়া। মাচার নীচেয় টিম টিম কোরে জ্বলা লণ্ঠনটা টেনে আনে। উপুড় করা শানকিখানা তোলে। তারপর ঝোলে ফেলে ছড়িয়ে খেয়ে উঠে পড়ে। দোর ভেজিয়ে দিয়ে বাইরে এসে আঁচায়। উঠোনে ঘোরাফেরা করে। দাঁড়াশ সাপের মতন যে রাস্তাটা একে-বেঁকে সোঁতা পেরিয়ে ঘরভাঙায় গিয়ে উঠেচে; সেদিক পানে তাকায়। চোখ ফেরায় সোনামুখীর বিল পানে,—তারাখচিত আকাশ হুমড়ে পড়া ঘুরঘুট্টি রাত মাথা গ্রাম-গ্রামান্তে। তারপর ঢেঁকিঘরে চোঙের ওপোর এসে শোয়। ঘুম আসে না চোখে। এপাশ ওপাশ করে স্মৃতির রূপালী পর্দায় ভেসে যায় ফেলে আসা অতীত জীবনের নাট্যশালা। তেলীর পুকুর। বয়ড়া বন। শিমূল গাছতলা। পুকুরের উঁচু পাড়।

বুড়িভদ্দরের ধারেকার লতা-বেষ্টনী ঘেরা নিরালা সাড়াতলার লীলা কাহিনী। ওর মুকুল ধরা জীবনের বড় আশায় বাদ সেধেচে সুখো। আশাশুনির মরিশ চাপ নদীর মতন পারহীন আশা। লোনা গাঙের অজস্র জল—জোছনার মতন ঝিক্‌মিক্ করা আশা।

এবার বাড়ি আসার সময় অনেক কিছু এনেচে শশী সুখোর জন্যি। টক খেতে ভালবাসে সুখো তাই বাছাই বাছাই ক্যাওড়া ফল এনেচে। এনেচে শাঁসওয়ালা গোল ফল, কউয়া ফল। আর বাদা বনের টাট্‌কা মৌ। এ-সব উপঢৌকন দেবে ওর ভালোবাসার মানুষকে। তারপর শোনাবে বাদা মুলুকের গল্পকথা। রঙ চড়িয়ে ফলাও কোরে শোনাবে। একদিন জ্বালানী কাঠ ভাঙতে উঠেছিলো শশী অনেক উঁচুতে এক হেতালীর গাছে। ঐ গাছের শুকনো ডালে পেঁচিয়ে ছিলো এক খড়ি চোচ সাপ। চেনা দায়' ঠিক শুকনো ডাল রঙ। ডালটা ভাঙবার জন্য মুঠো কোরে ধরতেই ঘাড় বাঁকিয়ে ছোবল মেরেছিলো আর কী ওর মাথায়। রখ্যে ও মাথাটা সরিয়ে নিয়েছিলো ফস কোরে। নইলে ঐ লোনা গাঙেই থাকতে হোতো শশীকে। সুখোর সাথে জন্মের শোধ ছ্যাখা হোতো না। আর একদিন পড়েছিল এক শামুক ভাঙা কেউটের পাল্লায়। বিলে গিয়েছিলো কাঁকড়া মারতে। একটা গর্তর মধ্যে লাঠি চালিয়ে খোঁচা দিতেই ফোঁস কোরে উঠে সাপটা বেরিয়ে এসে শশীকে তাড়া করে। ওর জানা ছিল, তাই প্রাণপণ এঁকেবেঁকে ভেড়ি বেয়ে মাইলখানেক দৌড়ে তবে রেহাই পায়। সটান সোজা দৌড়লে নিশ্চিত ছোবল দিতই সেদিন। তাহলে আর পা বাড়াতেই হোতো না। একথা শুনে চোখ ডাগর ডাগর কোরে ভয়ে শশীকে জড়িয়ে ধোরতো সুখো। ওর ভারি মজা হোতো তখোন। এরপর শোনাবে এক লোমহর্ষক কাহিনী। যে-কাহিনীতে উত্তরণের আগে শশী নিজেই চমকে উঠবে একবার। ক্যানো না মরণের খাবল থেকে নিশ্চিত ছিটকে আশা গল্প বলেই। আশাশুনি গাঙে জোয়ার লেগেচে। মস্ত দুটো মরা-গোরু ভেসে যাচ্চে। আর এক ঝাঁক কামট গরুর পেছন পেছন ধাওয়া কোরেচে। ভেসে চলা ঐ জল জন্তুদের ছ্যাখা যাচ্চে না যদিও কিন্তু গাঙের তলায় ওদের দ্রুত পুচ্ছ আলোড়ন জলের ওপোর বলব তুলচে। ঠিক কড়াইয়ে দুধ জাল হওয়ার মতন। লাস দুটো ধরতে গাঙে ঝাঁপ দেয় শশী। হিংস্র কামট পাল আক্রমণ কোরে ধেয়ে আসতে থাকে শশীর দিকে। নিরুপায় শশী ক্ষিপ্র হাতে ল্যাজ মুঠো কোরে ধোরে গোরুর লাসের ওপোর উঠে বসে। তাই রখ্যে পেয়ে যায়। না

হলে ওর সর্বশরীরের মাংস একদম চেঁচে খেয়ে নিত সেদিন। তার পর কুমুরের কথা। রয়াল বেঙ্গল টাইগারের কথা। সুঁদুর গাছে উঠেছিল একদিন শুকনো ডাল ভাঙতে। তলা দিয়ে যাচ্ছিল এক বাঘ,—কুড়ি একুশ হাত লম্বা ল্যাজ সমেত। শশী হাতে দা খানা ছুঁড়ে মেরেছিলো ওকে। বাঘও গোল্লা গোল্লা চোখ পাকিয়ে গোঙায়ে উঠে লাফ দিয়েছিলো ওকে পেড়ে আনবার জন্য, কিন্তু শশী ছিল বাঘের লাফের পাল্লার বাইরে। মানে কুড়ি হাতের ওপোরে। সেদিন শশী যদি ঐ সুঁদুর বুনে বাঘের শিকার হোতো তাহলে খেলিয়ে খেলিয়ে থাবড়ে-থাবড়ে মারতো ওকে। ভারী মজা হোতো না সুখো? এ প্রশ্নে সুখো আতঙ্কে শিউরে উঠে শশীর বুকের মধ্যে মুখ লুকোতো। শশীর জানা ছিলো সুখো সাপ—বাঘ—কামট—কুমুরের ভয় যত না করে তার চেয়ে বেশী ভয় ছিল ওর ভূত—পেতে—গো-দানোর। তাই ঐ গো-দানো সম্পর্কে একটা ভুয়ো গল্পোর খসড়া রচনা কোরে রেখেছিলো বইকি সে। গল্পটা এমনই ধারা। শশী প্রথম রাতের দিকে ঘুমোতে আর তারণ খাল মুখে জেগে পাহারা দিত ভেসে যাওয়া গোরু মোষ ধোরবার লেগে। দুপোর রাত পর্যন্ত ঘুমিয়ে নিয়ে বাবাকে টোঙে পাঠাতো শুতে। আর ও খাল মুখ আগলে থাকতো। নিশীথ রাতে খালের দুধার ব্যাপী ওড়া-ক্যাওড়া-গেঁউ গাছের ঝোপে ঝাড়ে ঝিঁঝিঁ পোকারা ডাকতো। গর্তে-ফাটলে রকমারি পোকা-মাকড়রা অশ্রুত স্বরগ্রাম সাধতো। লোনা জলের গোঙানির সাথে সুর মিলিয়ে রেওয়াজ কোরতো দূর বাদাবনের রয়াল বেঙ্গল টাইগাররা। কেউটে সাপদের শামুক ভাঙার ঠন্‌ঠন্ ঠনাস্ শব্দ ভেসে আসতো। এসব শুনতে খুবই ভালো লাগতো শশীর। একদিন ফুটফুটে জোছনা রাত। দূর থেকে ছাখে বাঁকের মাথায় প্রকাণ্ড একটা গোরু কি মোষ হবে ভেসে আসচে খরস্রোতে। শশীর হাতে আকড়া-পরানো লম্বা লগি। ও প্রস্তুত হচ্ছে লাসটা বড় গাঙে পড়ার আগেই দখল করতে হবে! সহসা শশীর নজর পড়ে, ওর থেকে মাত্তর পনর-কুড়ি হাত দূরে এক প্রকাণ্ড গো-দানো। খালের এপারে এক-পা আর এক-পা ওপারে দিয়ে খাড়া হোয়ে দাঁড়িয়ে। হাত দুটো ঠেকেছে খালের জলে। শশীর তোড়জোড় দেখে সেও বুঝি তোড়জোড় কোরছে ঐ গোরুর লাসটা লুফে নেয়ার। শশীর কোমরে জালের কাটি। হাতে হোগলপাত ছুরি। মুখে বিড়ির আগুন। যত বড় তালেবর হোন না কেন উনি, ছোঁওয়ার হিম্মৎ হবে না শশীকে। সুখো হয়তো এ প্রশ্ন বেড়তেও পারে শশীকে। কিন্তু গল্প রচয়িতা শশী সে জবাবটাও ঠিক কোরে

রেখেছিলো। শশীরা সুদূর মুলুক পাড়ি দিয়ে বাদা রাজ্যি এসেছে ঐসব দানো-দত্যিদের মুখের গ্রাস কেড়ে খেতে। সে-রাগে হয়তো ও ঐ গোরুর লাসটা ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারে শশীর ঘাড়ে। এখানে তো ছোঁয়া-ছুঁয়ির প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু তা হলেই তো হয়েচে। জগদ্দল ঐ পাহাড়ের চাপে শশী শিকারী তো লেপটেই যাবে একদম মাটির গায়। অথবা এমনও হতে পারতো ঐ গো-দানোটা তার আকাশ পাতাল হাঁ-ওয়ালা মুখখানা ব্যাদন কোরে দাঁত সিটকে শশীকে ভয় দেখাতে পারতো। তাতে ওর বুক যদি কেঁপে উঠতো তাহলে তো আর কোনো রকমে বাচন থাকতো না। একথা শুনে সুখো নিশ্চয়ই আঁতকে উঠবে। এবং ওর হাত চেপে ধোরে নিশ্চয়ই আকুতি কোরবে, ওগো তুমি আর কখনো বাদা মল্লুকে যেতে পাবে না ভাসনা কাটতে। বলো যাবে না। আমার বুকে হাত দিয়ে বলো। এ সুযোগ শশী শিকারী কদাপি হারাতো না। সুখোর উঁচু বুকে আচ্ছা মতো হাত দিয়ে আরাম কোরতো। এ পর্যন্ত এসেই সাঙ্গ হোতো আতংক সৃষ্টির গল্প বলা। এরপর শুরু অভিমান আর চোখের জলের পালা। ভাটির দেশে খালের ধারে মোটামোটা গর্ত কোরে কান মাছরা তার মধ্যে সেধিয়ে থাকে। মাগুর মাছের মতন অবিকল দেখতে। তবে মাগুরের চেয়ে অনেক বড়ো। দেড়-দু-সের পর্যন্ত হয়। ভাটার সময় জল পড়ে যায় খালের তলায়। তখোন গর্তগুলো বেরিয়ে পড়ে। গর্তের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে অনেক রকম কলা-কৌশল কোরে বিষাক্ত কাঁটাওয়ালা ঐ কান মাছ ধোরতে হয়। সতর্কর অভাব হলেই কাঁটা হেনে দেবে মাছরা। তখনো জলুনি তো হয়ই। এমন কি অনেক সময় লোক মারাও যায়। এমনই মরণ কবুল কোরে শশী ভাটার সময় খালে যায় কান মাছ মারতে। একলা শশী বলে নয়। লোনা রাজ্যের সকলেই যায়। মেয়েরা পর্যন্ত। একদিনের কথা। পাশাপাশি দুটো গর্ত। শশী একটা গর্তে হাত ঢুকিয়ে মস্ত একটা কান মাছের টুঁটি ধোরে টেনে আনবার চেষ্টায় আছে। কিন্তু বাগে আনতে পারচে না কিছুতেই। এমন সময় একটা মেয়ে এসে শশীর পাশের গর্তটায় তার বাঁ হাতখানা ঢুকোয়। মেয়েটা সুখোদের বয়েসী। আর কালো হোলেও সুখোর চেয়ে ফরসা। আরো ঘনো গোছা মোটা কালো চুল। আরো ডাগর-ডোগর। শশী অপূর্ব কায়দায় মাছটা টেনে বাইরে আনে। মস্ত বড় মাছ। মানে কান মাছ আর ওর চেয়ে বড় হয় না। মেয়েটা তাজ্জব বনে যায়। শশীর মাছ ধরার কলা-কৌশলে, বলে তুমি তো খুব ভাল মাছুড়ে। আমার মাছটা এট্টু ধরে দেবা? বাঁ হাত

দিয়ে আমি সাপটাতে পারছিনে মোটে।

শশী জিগ্যেস করে :

—বাঁ হাত দিয়ে মাছ ধোরচো ক্যানো তুমি? ডান হাতে কী?

মেয়েটা ডান হাত দেখিয়ে বলে :

—এই গ্যাখো, কাল কাঁটা মেরেছিলো এখেনে। আঙুলগুলো বেঁকচে না। গ্যাওনা মাছটা ধোরে।

শশী চেয়ে গ্যাখে, মেয়েটার ডানহাতের পিঠের খানিকটা জায়গা রক্ত জমে কালো হোয়ে আছে। কাঁটা হেনে দেওয়া ঠাঁই বেশ একটা স্পষ্ট দাগ। টস্ টস্ কোরচে ফুলে ব্যাঙের মতন হোয়ে। শশীর বেজাই মায়া হয়। সে তখুনি গর্তে হাত ঢুকোয়। এবং মোত্তর খানেকের মধ্যেই মাছটা বের কোরে এনে ওর খারায় পুরে দেয়। সেদিন থেকেই মেয়েটা ওকে ভালোবেসে ফেলে। ভাটার সময় রোজ খালে আসে। পাশাপাশি হোয়ে মাছ মারে। বাড়ি থেকে হুড়ুম ভাজা এনে শশীকে খাওয়ায়। কোনোদিন বা টাটকা মৌ। আবার মাঝে মাঝে ডেকে নিয়ে যায় ওদের বাড়ি। খালের ওপারেই। হুমড়ে-পড়া ছোট্টো ঘরখানা। ভেটেলী ধানের নাড়া দিয়ে ছাওয়া একখানা চাল। আর দুখানা চালে গোলপাতা। গরান আর পশুর গাছের সরু সরু কচড়া দিয়ে বেড়া বানানো সে-ঘরের। নিচু তার দাওয়া। সে-দাওয়ায় শশীকে বসতে গ্যায় সেগুন কাঠের পিঁড়ে। ওর মা বাসমতী ধানের চালের প্যায়েস রাঁধে। ভুর ভুর করে বাড়িখানা তার বাসে। ভুর ভুর করে ঐ মেয়ের সারা গা। শশীকে পায়েস খাওয়ায় সে, খাওয়ায় আধোসা, পাটিসাপটা, কাচিপোড়া পিঠে।

এক একদিন বায়না ধরে মেয়েটা বিলে গিয়ে পাখি মেরে দেওয়ার জন্য। না বলতে পারে না শশী। গুল্‌তি আর গুলি নিয়ে যায়। শিকার করে ধানী পাখী, বেলে হাঁস, গাঙ্‌চিল। একদিন মস্তবড় একটা সারস-ও মেরেছিলো। বেলা ডুবে আসে। পাখীরা উড়ে যায়। তখোন মেয়েটা বলে, চলো যাই ভেড়ির ধারে ঐ বনে। একথা শুনে সাঁঝেরি মতনই ঘনিয়ে আসবে সুখোর মনে সন্দেহ। মুখখানা আঁধার কোরবে সে। ফোঁস কোরে ফেলবে দীর্ঘ নিশ্বেস। তখোন ভারী মজা লাগবে শশীর। মনে মনে মুচকে হাসবে সে।

তারপর বনে ঢুকে কাউ ফল, ক্যাওড়া ফল গাছে ওঠে। ঝাঁকা দেয় ডাল ধোরে। তলায় পড়ে রাশীকৃত ফল। মেয়েটা আঁচল ভরে কুড়োয়। শুকনো কাঠের আঁটি বাঁধে। ভেড়ির ধার থেকে তোলে হর গোঁজার ফুল। কানে

পরে। খোঁপায় গোঁজে। শশী কাঠের বোঝা মাথায় নেয়। আর মেয়েটা নেয় পাখিগুলো। তখোন আকাশ-পাতাল অথৈ আঁধারে হাবু-ডুবু খাচ্চে বিল-মাঠ-ভেড়ি। সুখোর মতন ঐ মেয়েটাও গো-দানো ভীরু মন। তাই শশীর সাথে একান্ত ঘেঁসাঘেঁসি হোয়েই চলে ও। একথা শুনে সুখো নিশ্চয়ই চটে উঠবে। শুধোবে, ক্যামন ধারা ঘেঁসাঘেঁসি সে? তখোন শশী শিকারী এ-সুযোগ নেবে ঠিক। সুখোর সাথে ঘেঁসাঘেঁসি হোয়ে দেখিয়ে দেবে নজির এবং ঘেঁসাঘেঁসি হোতে ঘসা-ঘসিও হবে।

ঐ মেয়েটার নামও জেনে এসেচে শশী, টুমটুমি। আর টুমটুমিও জেনেছিলো শশীর শিকারী নামটা। ওরা বাড়ি আসবার দু-তিন দিন আগের থেকে সে কী কান্না মেয়েটার! শিকারী তুমি চলে যেও না। যাও তো আমারে নিয়ে যাও। নইলে আমি মরিশ চাপে ঝাঁপ দেবো!

আসার সময় মেয়েটা ঘাটে এসে দাঁড়িয়েছিলো, ঠিক কাঠের পুতুলের মতন। শশীও চেয়ে চেয়ে দেখছিলো। তারপর ওদের নৌকো ঘুরে গোলো অন্য বাঁকে।

শশীর স্বরচিত গল্পের এ-বাসর ঘর মরিশ চাপ নদীর ধারের ঘরের মতন ভেঙে গেল ভাঙনের অতল গর্ভে।

টোঙের ওপোর শুয়ে অমনি রাত জাগে শশী। শিয়রে ঢেকি ঘরের মেঝেয় খুদকণা লোভী ইঁদুররা ছুটোছুটি করে। সৃষ্টি করে লঘু শব্দ। নিশাচর পাখি উড়ে এসে বসে মটকার ওপোর। শোনা যায় তার পক্ষ বিধুনন। শুকনো ডালপালা খসে। মচমচে পাতার-ওপোর রাতচলা জানোয়াররা রচনা করে পদধ্বনি। উচ্চকিত হয়ে ওঠে শশীর মন। ঐ ঠিক সুখো এলো। এতদিন অজ্ঞাতবাসে লুকিয়ে ছিলো কোথাও। আজ ওর শিকারী এসেচে শুনেই চিরাভ্যস্ত অভিসারে এলো ঠিক। কিন্তু প্রত্যেকটা শব্দই শঠ। চালবাজ। সুখোর নিশ্চিত অভিসারের ছলাকলার ভূমিকায় নিপুণ অভিনেতা।

পরদিন তারণ ঠাকুরবাড়ি যায় দেখা কোরতে। মনুঠাকুর তখোন সেতারে মশ্‌গুল। ভবানী পিসিমা নিচের বারান্দায় একখানা তাল পাতার 'চাটকোল' দেন পেতে। বলেন:

—বসো তারণ। কবে বাড়ি এলে?

—কালকে মা ঠাকরুণ। বলতে বলতে সে গড় হোয়ে মাটিতে ঠক্ কোরে মাথা কুটে প্রণাম করে।

—সুখে থাকো। তা ভাল ছিলে তো?

—তা ছিলাম আপনাদের আশীর্বাদে।

ভবানী ঠাকরুণ বাড়ির ভেতর চলে যান। একখানা নোতন গৎ বাজানোয় হাত দিয়েছেন মনুঠাকুর। বেশ খানিকক্ষণ বাদে তার বাজনা শেষ হয়।

—তারপর তারণ, কবে এলে? জিগ্যেস করেন মনুঠাকুর।

—কালকে বটুঠাকুর।

—কাজ-টাজ কেমন হোলো?

—তা ভালোই হোয়েছে আপনার আশীর্বাদে। মাল-টাল পেয়েছিলাম এবার বেশ সাইজ মতন। একটাও বে-সাইজ না।

অর্থাৎ গোরু মোষ যা এবার পেয়েছে তারণ সব মোটাসোটা। একটাও বাছুর না।

—তবে আর কী? এবার শশীর বিয়ে দিয়ে ফেলো। তা তোমার ব্যাটার বৌ খুব ভাগ্যবতী হবে তারণ।

—সে আপনি জানো বটুঠাকুর।

—না-না। পয়া—অপয়া এ বেশ বোঝা যায়। আর তোমার ছেলেও তো বেশ ভালো ছেলে। ওর বৌ খারাপ হবে ক্যানো?

বটুঠাকুরের এ মন্তব্য তারণের বুকের মধ্যে কেমন কোরে ওঠে। শশীর মতিগতি দেখে এ দু-দিনেই তারণ বেজায় অতিষ্ঠ হোয়ে উঠেছে। তাই ভেবেছিলো, বটুঠাকুরের কাছে সব খুলে-খেলে বলে ওকে সংশোধনের পথ জেনে নেবে। কিন্তু বটুঠাকুরের মুখে ছেলের প্রশংসাবাদ শুনে, তার কেলেংকারীর কথা বলতে ওর ঘাড় মাটিতে কেটে পড়লো। তার মনের কথা মনের আগুনে পুড়ে পুড়ে পাথুরে কয়লার মতন দগ দগে লাল হোয়ে উঠলো।

মনুঠাকুর বলেন:

—ধান তো পেকে উঠলো তারণ, কবে পোচ দিচ্চো?

তারণ হেসে ওঠে:

—সে কি আমি বোলবো বটুঠাকুর? আপনি পাঁজি দেখো। কবে ধান ছেদনের দিন আছে। আপনারি ধান কাটার লেগেই তো তাড়াতাড়ি ফিরলাম। না হোলে আরো মাসখানেক থেকে আসতাম।

—বেশ তো। তা তুমি যাও এখোন। বিপনেকে দিয়ে খবর পাঠাবো তোমায়। তা চরের ধানই তো আগে কাটতে হবে। কী বলো ?

—হ্যাঁ বট্‌ঠাকুর। আপনার বাড়ির খেতের ধান এখোনও হয়নি। যে তেজী জমি !

এপারে সুরপুর আর ওপারে বায়সা। মাঝখান দিয়ে বহতা মজা গাঙ বুড়ি ভদ্দর। বুড়ির মতনই বিগত যৌবনা। কিন্তু উঁচু পাড়ওয়ালা চওড়া বাঁক দেখলে মনে হয় একদিন এর যৌবন ছিল। ছিল উন্মাদনা। আগে খেয়া নৌকোয় পাড়ি জমাতে হোতো। আর এখোন 'ক্যালভার্ট' দেয়া একটা কাঁচা রাস্তা দু-গাঁয়ের যোগ সুবাদ রখ্যে কোরচে। চাঁদ-সূর্য-আকাশ বঞ্চিত বাঁশবন। আর ঐ বাঁশবন বায়স অর্থাৎ কাকের বাতান। তাই গেরামের নাম হোয়েচে বায়সা। এই বায়সার নামজাদা লোক শরৎঠাকুর। এক ডাকে চেনা। নামজাদা। অবিশ্যি টাকা পয়সার দিক থেকে নয়। তান্ত্রিক জ্যোতিষী হিসেবে। তন্ত্র, জ্যোতিষ সম্পর্কে তার জ্ঞানের বহর কতোখানি তা আমার জানা নেই। কিন্তু মানুষ হিসেবে খুব মিষ্টি, মধুর। স্বল্পভাষী, নিরহংকার। শরৎ জ্যোতিষীকে নিয়ে জনশ্রুতির মুড়ো-দাড়া নেই কিন্তু। কারো মন্তব্য, ইনি কালী সাধক। বায়সার জাগ্রত কালীতলায় প্রায় তাঁর রাত কাটে। মায়ের সাথে এঁর কথা হয়। কেউ এক কলম লিখে দেয়, ফলিত জ্যোতিষে শরৎ আচার্যের দখল অসাধারণ। বাস্তুগণনা, শল্য উদ্ধার, হারানো গণনার ফলশ্রুতি অব্যর্থ।

অনেক চেষ্টা-চরিত্তির কোরেও সুখোর কোন খোঁজ-খবর মিলোতে পারে না শশী। তখোন বাধ্য হোয়ে একদিণ গণক বাড়ি যায় সে। কাকেও সাথে নেয় না। একলাই যায়। বন্ধুদের ওপোর ওর আর বিশ্বাস নেই। কে জানে সুখোকে সরিয়ে দেয়ার ব্যাপারে এদের কোনো পাক-চক্কর নেই ?

অনেক দিন আগে শশী একবার মাত্তর গিয়েছিলো জ্যোতিষী বাড়ি। গণনার দায়ে নয়। বার্ষিক যোগান কালী পুজোর নোতুন বরণ ডালা দিতে। তখোন খুব ছেলেমানুষ শশী। যাহোক জিগ্যেসায়-জিগ্যেসায় ঠাকুর বাড়ি পৌছয়। সাত চালা চৌরীঘর। তার দাওয়ায় বসে আচার্য দেব। একজন মোছলমান চাষীর গণনা হচ্চে। হারানো গণনা। গোরু হারানো।

কালো সরু পৈতা গলায়। না লম্বা, না বেটে মানুষটা। দোহারা গড়ন। শ্যামবর্ণ। মুখখানা লম্বা, সুঁচলো। খোঁচা খোঁচা এক গাল দাড়ি। চেহারায়

কোন কিছু বৈশিষ্ট্য নেই।

গণনা সম্পর্কে যা কিছু বলার এর আগে বলা হোয়ে গেছে। এবার শেষ কাঝারি বলে দেন গণকঠাকুর, শোনো ভাই, গোরুর ঠিক-ঠিকানা বলে দেবার পর আর কোনো কথা জিগ্যেস কোরতে পারবে না। এক মোস্তর বসাও চলবে না। ঘাড় গুঁজে মুখ বুজে চলে যাবে। গোরু পেলে কালীর মান্ত সোয়া ষোলো আনা দিয়ে যাবে। আর খুশী কোরবে আমাকে। বুঝলে তো।

ঘাড় নেড়ে সায় দেয় লোকটা।

—শোনো ভাই, আগেই বলেচি, গোরু চোরে চুরি করেনি। মাঠ থেকে দড়ি ছিঁড়ে পালিয়েছে। এখোন তাকে দেখচি, গৌরী ঘোনায়। পূবের মাঠে। পশ্চিমমুখো মুখ কোরে ঘাস খাচ্চে। গোরুটার পিঠে একটা কাক বসে। ঠুকরে ঠুকরে আটালু খুঁটচে। যাও। হ্যাঁ, শোনো, এখোন দেখছি গোরু তোমার গৌরী ঘোনার পুব মাঠে। তুমি না পৌছনো পর্যন্ত গোরু ওখানে দাঁড়িয়েই থাকবে, এ মনে কোরো না যেন। তাই পুব মাঠে গোরু যদি না পাও, তাহলে অন্য মাঠে, আশ পাশের লাগোয়া গাঁ গুলোয় খুঁজবে। যাও। গৌরী ঘোনার পুব মাঠে। পশ্চিমমুখো মুখ কোরে গোরু এখোন ঘাস খাচ্চে। গৌরী ঘোনায়। শেষ কথাটা বেশ একটু জোর গলায় বলেন শরৎ গণক। ঘাড় গুঁজে, মুখ বুজে চলে যায় লোকটা।

শশী উঠোনের কোণায় দাঁড়িয়ে আছে। জ্যোতিষী প্রশ্ন করেন, কী ছোকরা, তোর কী ?

—আমি একটু গোণাবো ঠাকুর।

—গোণাবি, দাঁড়া, আসছি। বিস্তে, 'বকরনল' করো—মানে গোণতে আসা ছোকরার গণনার ঠিকমত ব্যাপারটা জেনে লও। বলতে বলতে শরৎ গণক গাড়ু হাতে এক রকম দৌড়তে দৌড়তে বাঁশবন মুখো চলে যান।

সাত চালা ঘরের সামনা সামনি আর একখানা পাঁচ চালা চৌরীঘর। তার দাওয়ায় বসে একটা লোক। বছর পঞ্চাশেক বয়েস হবে। জিয়েল মাছের মতন কালো রঙ। লিকলিকে চেহারা। লম্বালম্বা পাতলা দাড়ি মুখে। জল-জল কোরচে হলদে কুঁচে চোখ জোড়া। শেষের দুর্বোধ্য কথাগুলো জ্যোতিষী ঠাকুর বোধকরি তাকেই নির্দেশ কোরে বলে গেলেন।

লোকটা এবার শশীকে লক্ষ্য কোরে জিগ্যেস করে :

—কী ছোকরা, তুমিও গণাবে ?

—হ্যাঁ। আপনি ?

—আমিও। তা এ ঠাকুরকে ধরাই দায়। এসেচি কি এখোন ? ঐ যে লোকটা দেখলে না ? গোরুর গণনা কোরে নিয়ে গেলো ? ওকে দিয়ে চারজন হোলো। ভাবছি এবার গোণাবো। এলে তুমি।

শশী বলে :

—তা আপনি গোণাও আগে। আমারটা নয় পরে হবে।

—না, না। তুমি গণিয়ে যাও আগে। আমার মেলা গণনা। হারানো গণনা। বাস্তু গণনা। রাশি গণনা। এক মোত্তরের কাজ না।

ঝক্‌মক্ কোরে ওঠে শশীর মুখখানা। বলে :

—আমারও তো হারানো গণনা।

—আঃ মরণ! আর কেনো বলো ছোকরা। একশো টাকার কোরে পাঁচ পাঁচ খানা নোট। একটা কৌটোয় পুরে ধানের ডোলের মধ্যে ঠেসে রেখেছিলাম। কাল টাকা নিতে গিয়ে দেখি যেমন কৌটো তেমনি আছে। টাকা উধাও। এ কোন দেশী চুরি বলো তো ?

শশী সমবেদনা জানায়। জিগ্যেস করে :

—ঠাকুর নাম বলে দিতে পারবে ?

—নাম ? না। নাম বলতে চায় না। বলে, গুরুর হুকুম নেই। তবে কাছের লোক কি দূরের লোক নিয়েছে। আপনজন বা পরজন। মেয়ে কি পুরুষ। কালো না ফর্সা। তার গায়ের চিহ্ন। বয়স। এ সব বলে দেবে। নইলে টাকা কি ফাউ ?

—ঠাকুরের গণনা খাটে কেমন ?

—গণনা ? নির্ঘাৎ। ও-বছর নৌকো হারালো। গণাতে এলাম। বলে দিলে, যাও, চুক নগরের গাঙে আছে। দখিণ বাঁকে তাল সারির নীচেয় ডোবানো রয়েচে। ঠিক তাই-ই। আর বছর হারালো বৌ-এর কানের দুল। গণাতে এলাম। বলে দিলে, যাও। জলে হারিয়েচে। সোজা ঘাটে নেমে হাটু জলে খোঁজো গে। যা বললে, ঠিক তাই। দু-চার বার হাতড়া দিতেই পেয়ে গেলাম। এ ঠাকুর ছাড়া আর কোনো গণকেরে বিশ্বাস হয় না আমার। তা তোমার কী হারিয়েছে ছোকরা ? ছাগোল ? না গোরু ?

নিজের হারানোর বিষয় শশীকে খুলে-খেলে বলে, এবার শশীর হারানোর বিষয় জানার দাবী আছে লোকটার। এমনই তার প্রশ্নভঙ্গী।

—না। ছাগোল গোরু না।

খাসখুস কোরে জিগ্যেস করে, তবে?

—মানুষ। শশীও খাসখুস জবাব দেয়।

—ও-ও। তোমার বৌ?

হেসে ফেলে শশী। বলে, না। আমার বিয়ে হয়নি।

—তবে? তোমার ভাই? না বোন?

—না, তাও না।

—পুরুষ না মেয়ে?

—মেয়ে মানুষ।

—ও-ও। বুঝেচি। তোমার সাথে বুঝি ভালোবাসা ছিলো?

শশী কথা কয় না। ঘাড় নীচু করে। মুচকে হেসে লোকটা জিগ্যেস করে:

—তোমার বাড়ি?

—ঐ তো, সুরপুর।

—তোমরা?

—আমরা ঋষিপুত্তুর।

এমন সময় শরৎ গণক এসে যান। বলেন:

—ও ছোকরা, তুমি দাঁড়িয়ে ক্যানো? বোসো।

পাঁচ চালার দাওয়ায় বসা লোকটা বলে ওঠে:

—নারায়ণ, কুরে, বিস্তে, কুরে। মানে বারান্দায় বসতে দিও না, ও মুচি।

তখোন শরৎ গণক একটুকরো খড়ি নিয়ে উঠোনের কোণে গিয়ে বসে পড়েন। শশীকে আদেশ করেন:

—যাও, তিনটে দুর্বো তুলে এনে এখানে বোসো।

শশী তিন গাছা দুর্বো নিয়ে এসে ঠাকুরের সামনে ভুম্যাসনেই বসে পড়ে। শরত গণক একটা রাশি চক্র আঁকেন। এবং তার মধ্যে গ্রহদের যার যে ক্ষেত্র স্থাপন করেন।

—তোর নামটা কি রে? হ্যাঁ বাবা? প্রশ্নকর্তা গণক।

—শশী।

—বাবার নাম?

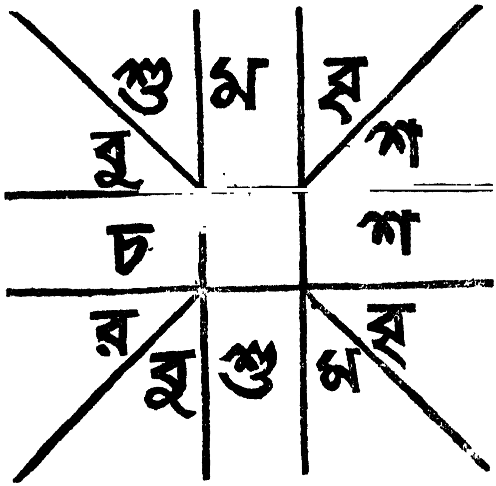
—তারণ।

—বাড়ী?

—সুরপুর।

মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে শরৎ গণক মন্তব্য করেন :

—ও-ও। তুই সুরপুরের তারণের ছেলে? আচ্ছা, এই যে চক্রটা দেখছিস না? মাঝের ঘর বাদে বারোটা ঘর আছে। এর যেটার মধ্যে খুশী, মা কালীর নাম স্মরণ কোরে ঐ দুর্বো তিনটে আর গুরুমান্য ন' সিকে রেখে দে।



শশী কোমরের 'জালী' থেকে ন' সিকের পয়সা বের কোরে দুর্বোর সাথে থুয়ে দেয়। গণক মুখে এক জাতীয় অস্ফুট অশুভ জ্ঞাপক শব্দ কোরে সাড়ম্বরে গণনা শুরু করেন। তার গৌরচন্দ্রিকাটা এমনই :

—জয় কালী, নাগাই চণ্ডী, ভৈরবী, সাঁই, সিদ্ধেশ্বরী, বাক বাণী, চূড়ামণি, কালীঘাটের কালী মা, ঘোষ পাড়ার সতীমা, অগ্রদ্বীপের গোপীনাথ, নিশান কালী, হাজরা। গণনার প্রতি করশক্তি চালনা। বাস্ত-ভিটে রাশি—নাড়ী-নক্ষত্র, ঠিক কোরে বলে দাও।

কালী! কালী!! কালী!!!

অতঃপর মেষ থেকে চর, স্থির, দ্ব্যাত্মক ইত্যাদি ক্রমে শনির ক্ষেত্র মকর পর্যন্ত গণে যান গণৎকার। ঐ ঘরেই শশী দুর্বো—গুরুমান্য রেখেছে।

তারপর চেঁচিয়ে ওঠেন :

—বিচ্ছে, 'বকরণ চোলাও'। মানে ঠাকুর, ব্যাপারটা বলে দাও। কালী! কালী!! কালী!!!

এবার টেনে টেনে বলে যান, ঠিক কোরে বলো কালী! বাস্তু গণনা? রাশি গণনা? হারানো গণনা?

এবার পাঁচ চালার দাওয়ায় বসে থাকা লোকটা খ্যাকার দেয়। মানে ইশেরায় জানায়, হারানো গণনা। মাথা নাড়তে নাড়তে গণক মন্তব্য রাখেন:

—তোর তো বাবা বাস্তু গণনাও না, রাশি গণনাও না। এ যে দেখচি হারানো গণনা। কেমন? বলো, বলো, বলো।

—হ্যাঁ, ঠাকুর। শশী উত্তর দেয়।

হুঁ। এখোন কি হারিয়েচে। কোথায় আছে। পাওয়া যাবে কি না। এই তোর জানার ইচ্ছে?

—হ্যাঁ, ঠাকুর।

—আচ্ছা। এবার একটা ফুলের নাম করো তো বাবা?

বিষম ভাবনায় পড়ে যায় শশী। ওর মগজ মুল্লুক হাতড়িয়ে খুঁজে বেড়ায় ফুলের নাম।

শরৎ ঠাকুর ধমক দেন:

—ভাবচিস কী! যা মুখে আসে তাই বলে ফেল।

—ফুল? জবা ফুল।

—একটা ফলের নাম কর।

—ফল? নারকেল।

—নদী?

—নদী? ধরো আমাদের বুড়িভদ্দর।

এবার কর গণে গণে শরৎ জ্যোতিষী বলে যান, দুই আর চারে ছয়, ছয় আর পাঁচে এগারো। তিন এগারম্ তেত্রিশ। তেত্রিশ দুনো ছেষট্টি। তিন বাইশম্ ছেষট্টি। এক শুন্যে নড়ে নড়ে। নড়া চড়া যোগ। 'বিস্তে, চোল্ শ্যালো'। মানে কি হারিয়েছে বলে দাও। ঘাট গজা (গয়না)? মুসড়ো (গোরু)? গোল (ছাগোল)? নুষ (মানুষ)? এবার গলা খ্যাকার শোনা যায়। মানে শশীর মানুষ হারিয়েছে।

—কালী! কালী!! কালী!!! ঠিক কথা কোয়ে দাও। ওঁ।

তোর তো মানুষ হারিয়েচে। কেমন শশী?

শশী সায় দেয়, হ্যাঁ, ঠাকুর।

—এখোন জানতে চাস তুই, মেয়ে মানুষ? না ব্যাটা মানুষ? কেমন তো?

সম্মতি সূচক মাথা নাড়ে শশী।

আবার গণনা শুরু হয়। আর সে সুরে সুর মিলিয়ে প্রশ্ন করাও হোয়ে যায়। চর, স্থির, দ্ব্যাত্মক। চরের আদ্য। স্থিরের নবম। দ্ব্যাত্মকের পঞ্চম। বৃহস্পতি যোগাযোগ। কর্ম কুণ্ডলী ভোগাভোগ। ঘানা হণ্ডি:য়েচে বিন্তে? মানে এর কি বিয়ে হোয়েছে ঠাকুর?

অমনি হাই তুলে দাওয়ার বসা লোকটা বলে ওঠে:

—নারায়ণ (না)।

ফের ফল, ফুল, নদীর নাম, জিগ্যেস করা হয় শশীকে। এবং শশীও থেমে থেমে উত্তর দেয়, ভাটি ফুল। ত্যালাকুচোর ফল। আর নদীর নাম মনে না আসায় নাম করে সোনামুখী বিলের। অট্টহাসিতে ফেটে পড়েন শরৎ জ্যোতিষী। এবং কতকগুলো দুর্বোধ্য ভাষার শ্লোক আওড়ানোর পর ঠারে জিগ্যেসাবাদ শুরু হয়। বিন্তে, চোল্ স্যালো, নাভি? নাভি? মানে ঠাকুর বলো, মেয়ে মানুষ?

গলা খ্যাকার আসে!

—কালী! কালী!! কালী!!! বিলো বিলি? বিলো বিলি!: মানে ভালোবাসার মানুষ? আবার গলা খ্যাকার। ঘনোঘনো মাথা দোলান জ্যোতিষী। বক্তব্য রাখেন:

—ও শশী, এ যে বাবা মেয়েমানুষ। তার সাথে যে ভালোবাসা ছিলো তোর। কীরে? তাই না?

শশী কথা কয় না। মৌনম্ সম্মতি লক্ষণম্।

এবার আর আটকাবে না জ্যোতিষীর। এখোন তিনি যা-ই বলবেন, তাতেই সায় দিতে বাধ্য শশী। ফড়ফড় কোরে বলে যান তিনি:

—এ তো পাক-চক্কর কোরে সরিয়ে দিয়েচে দেখচি। দুটো লোকের যোগসাজস। একটা কালো। আরটা ধলো। কালো লোকটা পুরুষ! আর ধলোটা মেয়ে। পাবি বাবা, তবে দেরী হবে। শনির ক্ষেত্রে ধোরেছিস তো। ঘুরাবে খুব তোকে।

শশী জিগ্যেস করে:

—কোথায় আছে এখোন ঠাকুর?

—ঐ তো মুশকিল। নড়াচড়া যোগ যে। আজ এখানে। কাল ওখানে। পরশু সেখানে। যাক্। এখোন কোথায় আছে বলে দিচ্চি। এরপর আর কিছু জিগ্যেস কোরবি না। এক মোত্তর বোসবি না। ঘাড় গুঁজে, মুখ বুজে চলে যাবি।

যে-গেরামের নাম বলে দিচ্ছি, যদি নাগাল না পাস সেখানে, তার আশপাশের চগাঁগুলো খুঁজিস। তারপর অবিশ্যি কোরে আসবি। কালী! কালী!! কালী!!! এখোন দেখচি হলদি পোতায় আছে। মুচিপাড়ায়। চটপট চলে যা। কালীর নামে সোয়া ষোল আনা মানসা কোরে যাস।

ঠাকুরের পায়ের গোড়ায় ঠক্ ঠক্ কোরে মাথা ঠুকে চলে যায় শশী।

শশী চলে যাওয়ার পর খুব হাসিহাসি হয় দুজনে। দাওয়ার ওপোর বসা লোকটা জ্যোতিষী ভায়রা কনেক ঠাকুর। ইনি যোগাড়ে। ক্লায়েন্টের কাছ থেকে সংবাদ সংগ্রহ এবং ঠারে জ্যোতিষীকে সরবরাহ, এই হচ্ছে তার কাজ। এ বাবদ মোটা একটা বখরা বরাদ্দ আছে কনেক ঠাকুরের জন্য।

শিকারী ছেলে শশী। ওর যে-চোখ দুর্ভেদ্য ঝোপ ঝাড় থেকে কুকো পাখি, হোরেল ঘুঘু খুঁজে বের করে, সে-চোখ হার মেনে যায়। হোলদি পোতার মুচিপাড়া থেকে খাটবেড়ে দেউলি, সামটা, তাজপুর, রূপোসপুর পাতাপাতা, কোরে ধোড়ে। কিন্তু সুখোর তালাশ পায় না শশী। কেউ বলতেই পারে না এ-দিগরে সে পা বাড়িয়েছে।

তার পর দিন শশী আবার আসে জ্যোতিষীর আশ্রমে। জ্যোতিষী শুনে বক্তব্য রাখেন:

—পাবি নে, সে তো আমি জানি। লগ্নে শনি। ঘুর আছে এখোনো তোর কপালে।

—কী কোরলে ঘুর কাটে ঠাকুর। শশী জিগোস করে।

—সেটা সঠিক কোরে দেখতে হবে। মায়ের কী কথা হয়।

—তবে তাই করো আপনি।

হেসে ওঠেন আচার্যদেব, তা কি তুই পারবি কুলোতে।

—কী লাগবে? আপনি বলো দেখি শুনি।

—লাগবে ঘেরতো-কুললি, মধু-কুললি, শাল-ষোল, কবুতরের পীলে, নিস্ কালি পাঁটা। আর মদ দু বোতল।

শশী চিন্তা করে না। সে কেবল মাত্তর ভাস্না কেটে ফিরচে বাদা মুল্লুক থেকে। পকেট তার গরম অনেক।

—তা কতো টাকা লাগবে ঠাকুর, সাধন কোরতে?

—গাছ থেকে পড়েন যেন তান্ত্রিক ঠাকুর, টাকা! টাকা আমি কী কোরবো? আমি যা ফরমাস কোরবো, তাই এনে দিবি তুই।

এবার শশীই পড়ে আকাশ থেকে। বলে :

—আমি! আমি ওসব চিনি? কোথায় পাবো? কী দিতে কী দেবে। সে হয় না। আপনি দয়া কোরে—যোগাড় কোরে দাও ঠাকুর। আমি টাকা দিয়ে খালাস। কতো টাকা লাগবে?

—দে, তবে গোটা পঁচিশ টাকা। নেয্য দামের বেশী আর কী দাবী কোরবো তোর কাছে বাবা? তবে খুশী কোরিস আমারে। গাঙ পার হোয়ে কুমুরকে যেন কলা দেখাস নে।

—কোরবো ঠাকুর, ঠিক খুশী করবো।

—আচ্ছা, তোর নাম তো শশী? তোর সে, তার নাম?

—সুখো।

—সুখো! খাসা নাম। আচ্ছা আজ হচ্চে বুধবার। বিশ্যুৎ, শুক্কুর, শনিবার সাধন কোরবো। রোববার সকালে তুই আসবি শশী।

—আচ্চা। দূর থেকে ঠাকুরের পায় মাথা নোয়ায়ে শশী চলে যায়।

—ঠাকুর, বাড়ি আছো?

জিগ্যেস করে ঠাকুরের ভায়রা কনেক ঠাকুর :

—কী বলো?—কী দরকার? গণাবে?

—না। অন্য দরকার।

—আছে। বাড়ি কোথায়?

—সুরপুর।

এমন সময় গাড়ু হাতে শরৎ জ্যোতিষী পুকুর ঘাট থেকে-এসে পৌছন।

—পেরনাম হই ঠাকুর।

—তারণ না?

—হঁ্যা ঠাকুর।

—কী মনে কোরে? এতো সকালে?

এবার ভেউ ভেউ কোরে কেঁদে ফেলে তারণ। বলে :

—ঠাকুর আমারে বাঁচাও।

ভ্যাবাচাকা বনে যান শরৎ জ্যোতিষী। জিগ্যেস করেন :

—কী? হোয়েচে কী?

চোখ মুছতে মুছতে তারণ বলে যায় :

—আমার ছেলের নাম শশী। ছাগোলের পেত্নী লেগেচে ঠাকুর। খামারী এক রাঁড়ের মোহে পড়ে গেছে ছাগোল।

—তা বিয়ে দাওনা ক্যানো? বিয়ে দাও। সব ঘোড়া রোগ ভালো হোয়ে যাবে।

—শোনো আপনি, বোলচি সব। বিয়ের সব ঠিকঠাক। পাকা দেখা পর্যন্ত। অগ্রাণ মাসে বিয়ে। গুয়োটার ছেলে এখোন গোঁ ধোরেচে, বিয়ে কোরবে না। ঐ রাঁড় নেবে। আমি ঘুস খাওয়ায়ে লোক দিয়ে সরিয়ে দিয়েছি ঠাকুর, ঐ কারোয়ান মাগীকে। ও শালার ছেলে এখোন বেড়াচ্চে ওঝা-গুণীন্ ধোরে। আয়নাভারন, নখ দপ্পন কোরে ঐ রাঁড় মেয়ে আনবে। তা আপনি ঠাকুর, এমনি কোরো ঘুরিয়ে দাও, মন যেন ও-মাগীর কথা একদম ভুলে ফেলে। তোমার দুটো পায় পড়ি ঠাকুর।

তারণের ভাবগতিক দেখে দাওয়ার ওপোর বসা কনেক ঠাকুর দাঁত পাটি মেলিয়ে নিঃশব্দ হাসি হাসতে থাকে। জ্যোতিষীর মুখেও মুচকি হাসির ঝলক দেখা যায়। বলেন:

—ঠিক আছে। আমিও ওর মন ঘুরিয়ে দিচ্চি। আর তুমিও অগ্রাণ মাসে বিয়ে দিয়ে ফেলো ওর। দেখি, ঘোড়া রোগ কোথায় দাঁড়ায়। কিন্তু এসব তান্ত্রিক কাজ। মেলা খরচ-খরচা তারণ।

—গরীব মানুষ। যাতে পারি তাই করে নেও ঠাকুর। তা কত কী লাগবে?

আকাশের দিকে তাকিয়ে বিড় বিড় কোরে হিসেব কোরে নেন গণক ঠাকুর। বলেন:

—টাকা ষাটেক। তার কম আর হয় না তারণ।

কাঁচা পয়সা কামিয়ে এসেছে তারণ। এখোন টাপেটোপে বোঝায় থোলে। সে আর বিশেষ কথাও বলে না। বিশেষ কমও করে না। কর করে কতকগুলো নোট বের কোরে শরৎ জ্যোতিষীর পা'র গোড়ায় রাখে। বলে:

—এই দিলাম। কিছু মনে কোরো না ঠাকুর।

টাকাগুলো তুলে নিয়ে ঠাকুর গণেন। মন্তব্য করেন:

—দশ টাকা কম দিলে তারণ? তারণ সবিনয় হাত জোড় করে।

—যাক। শোনো তারণ, একুশটা পুর গেরামের তেমাথা রাস্তার ধুলো, সাত কবরের মাটি। আর এক ডাকে একটা কলা কিনে নিয়ে আসবে। কাল সন্ধ্যের মধ্যে চাই।

—কলা কি খাওয়াতে হবে ছাগোলেরে ? ও শালার ছেলে তো খেতে চাবে না ঠাকুর।

—না, না। খাওয়াতে হবে না। কলাটা পড়ে দেবো। কোমর জলে দাঁড়িয়ে এক পোচে কেটে ফেলে, মাথা ডিঙোয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। তাতেই ছাড়া-ছাড়ি হোয়ে যাবে। আর ধুলো মাটি পড়া গায় দিতে হবে। কিছুটা বালিসের মধ্যে রাখতে হবে পোটলা কোরে। যাও। কালকের মধ্যে চাই কিন্তু।

তারণ চলে যায়। দাঁতপাটি বের কোরে প্রাণ খুলে হাসে এবার কনেক ঠাকুর। মন্তব্য করে :

—যে গ্যাঁড়া কল পেতেচো শরৎদা, যেতেও কাটবে, আসতেও কাটবে। মুচকে হাসেন শরৎ জ্যোতিষী।

রোববার। কোল আঁধারী ভোর। শশী কাঁচা রাস্তা পেরিয়ে বায়সার নাম-জাদা বাঁশ বনের পথে পা ছায়। দাঁড়কাকরা তখোনো তাদের রাতের আস্তানা ছেড়ে ওড়েনি। ডাকা-ডাকি শুরু কোরচে। ঝোপে-ঝাড়ে বুলবুলরাও শিশ দিচ্চে কিন্তু দেখা যাচ্চে না। শশী জ্যোতিষী বাড়ি গিয়ে পৌছয়। দ্যাখে, জোগাড়ে কনেক ঠাকুর। সকালেই মুখ-হাত ধুয়ে গ্যাঁট হোয়ে বসেচে পাঁচ চালার দাওয়ায়। আর তামাক প্রিয় শরৎ গণক হুঁকো টানচেন।

—আরে, শশী যে! এসেচিস ?

—হ্যাঁ ঠাকুর। গড় হোয়ে পায়ের গোড়োয় মাথা ঠেকায় শশী।

—সাধন তো করলাম শশী। বুড় বুড় কোরে তামাক টানতে টানতে জ্যোতিষী বলেন।

—তারপর কী দেখলে ঠাকুর ? আকুল চোখে চায় শশী।

—না, না। ভাবনা নেই তো তোর। ভালই আছে সে।

—কোথায় আছে ঠাকুর ?

দম খেয়ে যান জ্যোতিষী। তারপর ঢোক গিলে নিয়ে বলেন :

—আছে ? আছে অনেক দূরে। বললাম না সেদিন, কালো ধলো জুটো মানুষ। যোগসাজসে পরীসাধক দিয়ে চালান দেওয়ায়েচে। এখোন সে পরীর দেশে।

—তা হলে এখোন উপায় ঠাকুর ?

—উপায় ? না না, উপায় কোরে দেবো ঠিক। তবে তোর লগ্নে শনি। খুব আছে কপালে।

—কতো ঘুর ঠাকুর।

—তা বলতে পারবো না। তবে বেশ কিছুদিন। কিন্তু ছেলের জোগাড়ে আছে ওরা। এর ফাঁকে ছেলে পেলেই ঘুরিয়ে দেবে।

শশীর বুকের মধ্যে তড়িৎ ছুটে যায়। বলে:

—তাহলে ?

খড়-কুটো পুড়তে হবে বাবা। অমনি হবে ? বিয়ে বেঁধে ফেলতে হবে।

—তাই বেঁধে দ্যাও।

—দেবোই তো। শোন, ম্যালা না। দশটা টাকা দে। অমাবস্যে আছে। তোর কপাল ভালো। ঐদিন বিয়ে বন্দ কোরবো। তুই কালকের মধ্যে তিনটে জিনিস যোগাড় কোরে দিবি।

শশী জিগ্যেস করে: কী কী ঠাকুর ?

—সাতটা পুর গাঁয়ের তেমাথা রাস্তার ধূলো। একখানা কাঁচা সরা। আর মহাশ্মশানের চিতের ছাই।

—মহাশ্মশান মানে ?

—যেখানে রোজ মড়া পোড়ায়। এ দিগরে গরীবপুর ছাড়া মহাশ্মশান নেই। কিন্তু চিতের ছাই আনলে হবে না। নিয়ম আছে। খাঁ খাঁ করা দুপোর রাতে শ্মশানে যাবি। উলঙ্গ হোয়ে তিন মুঠো চিতের ছাই তুলে আনবি। দম ভরে তুলবি কিন্তু। আর কাঁচা সরাটা চুরি কোরে আনতে হবে। চাইলে দেবে না। বিক্রিও কোরবে না।

কাঁচা সরা সংগ্রহ কোরতে মোটেই ভাবে না শশী। বিশে পালের বাড়ি রাস্তার ধারেই। ওর পোনের পাশেই চাক বসানো। চাকের ধারে মেলা কাঁচা হাঁড়ি, কলসী, সরা। ওর থেকে খুব একটা আনতে পারবে সে। কিন্তু মহানিশায় গরীবপুরের মতন ভয়ঙ্কর শ্মশান থেকে চিতের ছাই সংগ্রহ কোরে আনার কথা শুনে শশী একটু দমে যায়। কেননা এ শ্মশান সম্পর্কে কতো না লোমহর্ষণ কাহিনী ওর শোনা আছে। সন্ধ্যের পরই ও শ্মশান ভূত-প্রেত-ডাকিনী-শাকিনীদের অবিসম্বাদিত দখলে এসে যায়। তারা পচা গলা আধাপোড়া মড়া নিয়ে কাড়াকাড়ি কোরে খায়। মাতে অশ্লীল উল্লাসে।

জ্যোতিষী মাত্রেই চালাক। মুখ দেখে মনের খবর বলে দেয় তারা। শরৎ জ্যোতিষী বলেন:

—ঘাবড়ানোর কিছু নেই রে শশী। গরীবপুর শ্মশানের নাম শুনে তুই

ভোড়কে গেছিস, ক্যামন ? আচ্ছা, আমি সাদা সরষে পড়ে দিচ্চি। কাপড়ের মুড়োয় বেঁধে নিয়ে যাবি। কারো বাবার সাধ্যি নেই তোর একটা পশম ছোয়।

'জালী' থেকে দশটা টাকা বের কোরে শরৎ তান্ত্রিকের পায়ের গোড়ায় রাখে শশী। এবং সরষে পড়া কোচার মুড়োয় বেঁধে নিয়ে চলে যায়।

কালো ত্রয়োদশীর রাত। সব বাড়ি, সব গেরাম, সব মাঠ-বন ঘুমন্ত পুরী। এক মাত্তর শশী আর রাতচরা জীব-জানোয়ার—পোকা-মাকড়রা ছাড়া। দু'মাইল রাস্তা হেঁটেচে শশী। সামনে এখোনো এক মাইল হাঁটতে হবে। তবে পৌছবে গরীবপুরের মহাশ্মশানে।

মিশিকালো রাত-রঙ বনের বিরল ছিদ্রপুঞ্জ লেপটে একাকার হোয়ে গেছে। বন হোয়েছে দেহান্তরিত বিরতিলুপ্ত কালো পাহাড়ে। অস্বচ্ছ তারার আলোয় পথের সাদা রেখা ধোরে চলেচে সে। মাঝে মাঝে দু'চারটে আকস্মিক শব্দ কানে আসচে ওর। ঝোপ-ঝাড়ের তলা দিয়ে রাতচরা জানোয়ারদের পায়ের শব্দ। গাছ থেকে ফল-পাতা-ডাল ঝরে পড়ার শব্দ। এ-সব শব্দ জোট আর শ্মশানের চলতি কাহিনীরা মিলে শশীর মনে যে আতঙ্কর সঞ্চার কোরচে না, তা নয়। কিন্তু সব ভয়দের জয় কোরে চলেচে সে আজ। প্রেমের টানে, না কামের টানে, না দুয়েরই টানে ? বলা মুশকিল। তবু তার আতংকিত মনে ঐ রাত-ফলকে আল্পনা আঁকা জোনাকির মতন জ্বলে জ্বলে উঠচে ক্ষণিক এক দীপ্তিচ্ছটা। আলেয়ার মতন শট, ছলনাময়ী সে দীপ্তি। একদিন ময়নাদের বাড়ি সতীশের ধারে বসে ছিল শশী। সাঁইপণ্ডিত রামায়ণ পড়ছিলেন,—সীতা হরণ। রাম-লক্ষ্মণ সোনার হরিণ মেরে কুটিরে ফিরে এসে দেখেন শূন্যঘর। সীতা নেই। দু-ভাই আকুল হোয়ে ছুটলেন সীতাকে খুঁজতে। পঞ্চবটীর ঝোপ-ঝোপন, লতাবিতান পাতাপাতা কোরে ঘোরেন। কোথাও পান না জানকীরে। রাম বলেন, লক্ষ্মণ, জানকী ঠিক লুকোচুরি খেলচেন। আমাদের মন বুঝবার জন্য এখানে কোনো কুঞ্জবনে লুকিয়ে তামাসা কোরচেন। অথবা গোদাবরীর পদ্মবনে পদ্মালয়া বুঝি সীতাকে মেরে রেখেচেন। শশীর এখোন সে-কাহিনী মনে পড়ে যায়। প্রত্যেকটা শব্দের সাথে ওর মনে হয়, এবার বুঝি সুখো এলো। রাস্তার পাশে বনলাপুরীতে কারো কুঁড়েঘরে আশ্রয় নিয়ে ওর মন পরীখ্যে কোরছিল এতোদিন। এখোন এ নিশীথ রাতে ওকে দেখতে পেয়ে বেরিয়ে এলো। এমন লুকোচুরি সুখো তো অনেক দিন খেলেচে। তেলীরপুকুরে শশীকে যাওয়ার ইশেরা কোরে ওর আগে আগে চলে গিয়েছে। শশী গিয়ে দেখেচে ঘাটে কেউ নেই। হঠাৎ

বয়ড়া বাগান থেকে বেরিয়ে এসেচে হাসতে হাসতে। আজো তো এমন হোতে পারে হয়তো শশীর মতন সেও বিরহিনী। বারান্দায় বসে সারারাত জাগে। অথবা পরীরা দয়া পরবশ হোয়ে দুর্দশা দেখে এখানে ওর সামনে ছেড়ে দিয়ে যেতেও পারে তো। যতো দূরেই হোক না পরীর দেশ। তারা তো উড়েই আসবে। এক মন্তোরেই তো পৌঁছে দিতে পারে। অনেকদিন না-দেখা শশীকে দেখতে পেয়ে সুখো ঠিক জড়িয়ে ধোরবে। বোলবে, শিকারী, তুমি তো ভাটির দেশের মায়ায় আমাকে ভুলে যাওনি? আমি ভুল বুঝে মান কোরে এসেছিলাম। শশীও বুকের মধ্যে টেনে নেবে সুখোকে। নিঝুম রাতের বনমহলে মিলন হবে। সহসা শিয়াল-কুকুরের আঁচড়া-আঁচড়ি, কামড়া-কামড়ি, চ্যাঁচামেচিতে ওর মিথ্যে স্বপ্নের রেশমী জাল ছিঁড়ে যায়। চেয়ে ভাখে সামনে মহাশ্মশান। শশীর ধারণা ছিল, নামকরা ভূত—পেরেত—ডাকিনী—শাকিনীর বাতান গরীবপুরের এ শ্মশান। কৃষ্ণ ত্রয়োদশীর রাতে তাদের সাথে ওর নিশ্চিত দেখা হোয়ে যাবে। কিন্তু মনের জোর ওর সাংঘাতিক বেড়ে গিয়েচে। শরৎ তান্ত্রিক বলেচেন, সরষে পড়া কাছে থাকতে কারো সাধ্য নেই তোর একটা পশম ছোঁয়। কিন্তু যাদের দোহাই দিয়ে গরীবপুরের শ্মশান গাম্ভীর্যমণ্ডিত, যাদের আশ্রয় কোরে যুগ-যুগ প্রচলিত কথা উপকথা, তাদের আজ হদিস কোথায়? সেই ছায়াশূন্য দীর্ঘাবয়ব পচা গলা শব মাংসভোজী ভূত-প্রেত-কবন্ধ? আর গোড়ালি অবধি ঝুলেপড়া তাম্রকেশী দীর্ঘস্তনী ডাকিনী-শাকিনী রাকিনীরা? আর তাদের অশ্লীল উলংগ উল্লাস?

তার পরিবর্তে শশী ভাখে গোল্লা গোল্লা চোখওয়ালা একদল কুকুর। আর ডাগর ডাগর পেট এক পাল পাতি শিয়াল। এরা কেউ শ্মশান বৈরাগী নয়, শ্মশান ভোগী, আধ পোড়া একটা মড়া নিয়ে কেউ কেউ টানাটানি কোরচে। কেউ কেউ বা জলের ধারে বাঁশের আপার মধ্যে পুরে পুঁতে ফেলা মড়া টেনে তুলে তার নাড়ী-ভুঁড়ি চিবোচ্চে। বাঘের মতন একটা কুকুর হাড় ভাঙচে মটমট শব্দ কোরে। ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত হাড়গোড়, শিরদাঁড়া, শুকনো—কাঁচা অস্থি—কংকাল, মাথা, মাথার খুলি। শ্মশান ভূমি কংকাল ভূমি। শশীর মনে পড়ে যায় নূরপুরের গো-ভাগাড়ের কথা। শ্মশানও শব্দময়। কিন্তু সে-শব্দ কপট নয়। স্বচ্ছ-পরিশ্রুতি শব্দ। শেয়াল-কুকুরের কামড়া-কামড়ির শব্দ। নাড়ী-ভুঁড়ি-মাংস ছেঁড়ার শব্দ। হাড় চিবোনোর শব্দ। আর মাথার ওপোর অজস্র জটওয়ালা ছাতরানো পাকুড় গাছের ডালে শকুনদের ডানা ঝাড়ার শব্দ। বাসার মধ্যে

তাদের বাচ্চাদের কান্না-ককানির শব্দ। ডা'নে-বাঁয়ে, সামনে-পেছনে সংকুচিত চোখ চায় শশী। চায় পাকুড় গাছের মটকার ডালে। না ভূত, না পেত্নী কাউকে দেখতে পায় না। ভূত-বৌরা পিটেও গড়ে না। চ্যাং-ব্যাং-ফড়িং-টিকটিকি-গিরগিটি চচ্চড়িও করে না। ঠ্যাঙে দড়ি বেঁধে ঝোলানো মড়া খাবলে খাবলেও খায় না ভূত বাচ্চারা। কিম্বা কিম্ভূতকিমাকার কোনো মূর্তি দাঁত-মুখ শিটকে ওকে ভয়ও দেখায় না। শশীর বুক থেকে অনেকদিন ঝুলিয়ে রাখা একখানা ভারী পাথর নেমে যায়। নির্ভীক হাল্‌কা হয় বুকখানা। সে একটা চিতের ধারে এগিয়ে যায়। টাটকা চিতে। কাঠ কয়লা ছাইগুলো ঝকঝক কোরচে। একখানা মোটা কাঠের তল গুঁড়ি থেকে তখনো অল্প অল্প ধোঁয়া উড়চে। বোধহয় সন্ধ্যের আগেই মড়াটা পুড়িয়ে গেচে। ভালো কোরে চিতেটা নিবোনোরও সময় পায়নি। আসার সময় শশী বিশে কুমোরের চাকঘর থেকে কাঁচা সরা চুরি কোরে এনেচে। দম্ আটকে তিন মুঠো ছাই তাতে তুলে নেয়। গামছার মুড়োয় ভালো কোরে গোরে দিয়ে সেটা বাঁধে। তারপর শব্দ-চাতুরী-মুখর সেই পথ ধোরে বাড়িমুখো হাঁটে।

সোমবার শশী শরৎ তান্ত্রিকের বাড়ি গিয়েছিলো। চিতাভস্ম আর কাঁচা সরা দিতে। ওর ব্যাপার শুনে তান্ত্রিক যেনো আর নেই। শশীর সাহসের অজস্র তারিফ কোরেছিলেন। বলেছিলেন, ধন্যি ছেলে, তুই বাবা শশী। কাল আমি ফুল কাড়াবো তোর জন্যি। বুধবার আসবি তুই। আর দখ্যিনে বাবদ টাকা আনবি।

বুধবার সকাল সকাল শশী গিয়ে পৌঁছয় তান্ত্রিক বাড়ি। শরৎ ঠাকুর তখোনো প্রাতঃকৃত্য সারেন নি। দাওসায় বসে তামাক খাচ্চেন। তার কপাল জোড়া রক্ত চন্দন-সিঁদুর ফোঁটা। ও ঘরের বারান্দায় দালাল কনেক ঠাকুর মাদুরের ওপোর গ্যাঁট হোয়ে বসে চাকু দিয়ে হরেক রকম গাছের শেকড় কেটে একগাদা মাদুলি পুরচে। বেল, অনন্তমূল, অশ্বগন্ধা, রামবাসক, শ্বেতবেড়েলা এমনই আরো অনেক মূল।

—এসেছিস বাবা? কই? দখ্যিনাস্তটা করতো আগে।

শশীর থলে হাল্‌কা হোয়ে এসেচে। কোমর থেকে জালীটা খুলতে খুলতে জিজ্ঞেস করে:

—দখ্যিনে কত্তো ঠাকুর?

—বের করতো দেখি। সারা রাত পুজো করলাম তোর লেগে। ফুল

ঝাড়ালাম। তোর ভাগ্যি ভালো শশী, মা একেবারে হাতে হাতে ফুল দিয়েচেন।

শশী পাঁচ টাকার একখানা নোট বের কোরে তান্ত্রিকের পায়ের গোড়ায় রাখে।

—দূর, ওতে কি হয়?

—ন্যাও ঠাকুর। কামোনা সিদ্ধি হোলে খুশী কোরবো।

—পাগল তুই! কামনা তোর ঠিক সিদ্ধি হবে। বের কর।

বাধ্য হোয়ে শশীকে আর পাঁচ টাকা বের কোরতে হয়। শরৎ তান্ত্রিক ঘরে ঢোকেন। এবং একটা জবা ফুল আর কাগজে মোড়া নীল সুতো দিয়ে জড়ানো সেই কাঁচা সরাখানা শশীর সামনে রাখেন। তারপর বলে দেন:

—শোন্ শশী, সন্ধ্যেবেলায় একটা মাত্তর তারা দেখে গাঙের ঘাটে যাবি। একটা পিত্‌লে ঘটী কি মেটে ঘট নিয়ে। ঘাট দিয়ে নেমে জল পুরবি। উঠবি আ-ঘাট দিয়ে। হ্যাঁ, জল পুরবি কিন্তু খুব সাবধানে। ঘটের জল যেন বাইরে না যায়। খবরদার। বাড়ি এসে একতাল কাদার ওপোর ঐ ঘট পাতবি। যেখানে কেউ না যায় এমনই একটা কোণে। ঘটের মুখে দিবি আমের পল্লব, পান-সুপারি আর এই জবা ফুলটা। কাদা দিয়ে পিদীম গড়াবি। সরষের তেল, ন্যাকড়ার পোলতে দিয়ে জ্বেলে দিবি। আপনিই নিবে যাবে পিদীম। ফুঁ দিয়ে নিবোস পাছে। পনেরো দিন পনরোটা পিদীম দেওয়ার পর ষোলো দিনের দিন সকালে কাক-কুলি না ডাকতে পিদীমগুলো গাঙের জলে দিয়ে আসবি। বাড়ি এসে ঘটের ধারে সরাটা উপুড় কোরে রাখবি। সুখো না আসা পর্যন্ত ঘট-সরা নাড়াবিনে। খবরদার। দশ দিন, দশ মাস, দশ বছর বাদেও যদি আসে আসতেই হবে। আর না-ফেরা পর্যন্ত বিয়েও আটকানো রইলো। যা। ঘাড় গুঁজে চলে যাবে। পেছন ফিরে তাকাবিনে। যদি কেউ ডাকেও কথা কবিনে। দু-তিন মাস বাদে একদিন দেখা কোরে যাস। ইতিবাচক ঘাড় নেড়ে শশী চলে যায়।

তখোন নি-নড় জায়গা আর কোথায় পাবে শশী? ঢেঁকি ঘরের মাচার তলে ওর শিয়রের দিকে চওড়া একটা গর্ত খুঁড়ে তারই মধ্যে ঘট পাতে। পিদীম দেয়।

* * *

চামরের মতন বাইলওয়ালা বেনাঝুপি ধান কাটতে কাটতে বিপনে বলে:

—বট্‌ঠাকুর, কাস্তে ভাঙা ধান। খেতের দিকে তাকালে মনে হয় মা-লক্ষ্মী ভুঁই আলো কোরে বসেচে।

হাসতে হাসতে মন্টুঠাকুর বলেন :

—সে তোদেরই কেরামতি, বিপ্‌নে। তুই, যোগিশ্বর, নিরো, তোদেরই খাটনির ফল।

বিপ্‌নে প্রতিবাদ করে :

—তাই বললে হয় বট্‌ঠাকুর সে-সাথে তোমারও কপাল আছে।

মুচকে হাসেন মন্টুঠাকুর। কথা কাটাকাটি করেন না।

বিপ্‌নে বলে :

—বুঝলে বট্‌ঠাকুর, ধান কেটে নিয়ে 'ভেয়ার' দিয়ে সরষে বুনতে হবে। বাগান-মারা জমি। দেখবে কী মজাদার সরষে হয়। ভিট পড়ে যাবে।

আবার হাসেন মন্টুঠাকুর। বলেন :

—বুনিস। তার জন্যি কী?

এবার ছোকরা মাহিন্দার নিরো সুরু করে :

—ঘান ভাঙানো তেলে যা ঝাঁঝ বট্‌ঠাকুর! নাকে দিলে জ্বলে ওঠে। বুঝলে?

অর্থাৎ ঘান ভাঙানো তেল সম্পর্কে নিরোই পুরোপুরি ওয়াকিবহাল। বট্‌ঠাকুরের কাণ্ডজ্ঞান একদম বোকা।

তিনি উত্তর দেন :

—হুঁ।

—শীতকালে কড়ো কড়ো ভাত ঘান ভাঙানো তেলে মেখে খেতে কী মজা!

—খাস্, যতো পারিস।

হাসি হাসি মুখ মন্টুঠাকুর বলেন। নিরোর খুশী দেখে খুব খুশী হন তিনিও।

মুচিপাড়ার মুনিশরা এক জোটে কাজ করে খেতে। পঁচিশ-তিরিশখানা কোরে কাস্তে চলে, কচ্ কচ্ কোরে পোঁচের শব্দ হয়। হালা ভরা ধান শীষ শুয়ে পড়ে যেতে। তারপর আঁটি বেঁধে 'জালি' দেয়া হয়। আর ঐ জালিগুলো গোরুর গাড়ি বোঝাই হোয়ে খামারে ওঠে। মন্দিরের চুড়োর মতন ধানের পালায় ভরে ওঠে খামার। মা লক্ষীর সোনার মন্দির।

ধান ঝাড়াই হয়। তিন বছরের মতন জমিগুলো মুচিরা কোরে খাবে। কষাড় জংগল মেরে জমি উঠিৎ কোরেচে ওরা। অফলা মাটিতে ফলিয়েছে কাস্তে ভাঙা ফসল। অহল্যাকে কোরেছে মাতৃত্ব দান। তাই মন্টুঠাকুর খরচ-খরচার বাবদ-ধানটা নিয়ে বাকী ফসল মুচিদের দিয়েছেন।

নোতুন ধান গোলায় ওঠার পর একদিন ভবানী পিসিমা প্রস্তাব করেন :

—মেনো, এক কাজ কর বাবা। নোতুন পায়েস কোরে দরিদ্র-নারায়ণের সেবা দে।

মনুঠাকুরের জীবন-দর্শনের ধারা ভিন্নমুখী। দরিদ্র-নারায়ণরা তাঁর বাড়ি এসে খাবে। এবং তাদের খাওয়ায়ে উনি পুণ্য কামাই কোরবেন। এ নিছক ভাওতাবাজী। এতোগুলো মাটি মনুঠাকুর বেড় দিয়ে রেখেছেন ওর নিজের কবলে। জন্মসূত্রগত কোনো স্বত্ব এতে নেই। হয় চালাকি আর নয়তো জবর দখল ছাড়া। দরিদ্র-নারায়ণরা তাদের রক্ত দিয়ে ভিজিয়ে ফসল আজো তারই গোলায় তুলে দিয়ে গেছে। এ-ফসল ন্যায়তঃ তাদেরই। এখোন অনুগতর মতন ওরা দোরে এসে দাঁড়াবে। খাবে আর ধন্যবাদ দেবে। ফাঁকতালে পিসিমা কোরে নেবেন ধর্ম কামাই। এ মনুঠাকুরের নীতিবিরুদ্ধ। বরং তিনি চান একদিন এমন যুগ আসুক, ওরা শক্তি দিয়ে ওদের দাবী আদায় কোরে নিক। সেদিন তিনিই দেবেন সবার আগে গোলার চাবি খুলে। যারা জমি চষে কোঁড়ে। ফসল ফলায়। তাদেরই দেবেন জমি এবং অভিনন্দন দুই-ই। তবু পিসিমার প্রস্তাবে রাজী হোতে হয় তাকে। ক্যানোনা মাত্তর কিছুদিন আগে এই দরিদ্র-নারায়ণরা ছিল তার চক্ষুশূল। ছায়া ডিঙিয়ে স্নান কোরে শুচি হোতেন। সম্প্রতি বাবা গোঁসাই-এর মতাদর্শ 'যত্র জীব তত্র শিব', এদিক পানেই তার মন-মতির দিকদর্শন কাঁটা ঘুরে চলেছে। শিবের খাতিরেই পিসিমা সেবা দিচ্ছেন জীবকে, জীবের খাতিরে নয়। মন্দিরে জীব থাক না থাক, শিব থাকলেই পিসিমার পুজো আটকায় না। মনুঠাকুরের মতাদর্শ কিন্তু এর সম্পূর্ণ উল্টো। মন্দিরে জীবই মুখ্য, শিব গৌণ।

—বেশ তো পিসিমা, তুমি যা কোরবে তাইই হবে।

পিসিমা তো শুনে আহ্লাদে আটখানা। পরদিন সীতে-পুটের মাকে ডাকিয়ে আনান। খুব ঘটা কোরে ধান ভানে তারা। মনুঠাকুর মুচিপাড়া নেমন্তন্ন কোরে আসেন। পিসিমা নিজের হাতে খুব পরিপাটি কোরে পায়েস রান্না করেন। কিসমিস, এলাচের গুঁড়ো, কর্পূর, তেজপাতা দেন। পরিবেশন করেন নিজেই। উচ্ছিষ্ট পাতা পর্যন্ত ফেলতে দেন না দরিদ্র-নারায়ণদের। অবাক হোয়ে যান শৈলজা দেবী। মনুঠাকুর মনে মনে হাসেন।

রবিশস্যর চাষ সুরু হয়। নিরো-বিপনের মরার ফুরসুৎ নেই। সোনামুগ, কালোমুগ, বৃহিমুগ, বিউলি কলাই বোনে। সরষের ভুঁই চষে। মই দেয়।

আবার চষে। আবার মই। গুঁড়ো গুঁড়ো কোরে ফেলে মাটির হাড়—ঢেলা ভেঙে।

বিপ্নে বলে :

—বট্ঠাকুর ছ্যাখছো আপনি? ক্যামোন করে হাড় ভাঙতে হয় জমির? মাটি তুলো তুলো কোরে ফেলতে হয়। নইলে বলো সরষে হয় না। নিরো বক্তব্য রাখে :

—বট্ঠাকুর, গোল আলুর বীজ এনে দেবে? আলু লাগাবো। ঘান ভাঙানো তেল দিয়ে আলু ভাতে মাখলে যা খেতে লাগে না বট্ঠাকুর, জুতোলেও মুখ ফেরে না।

মনুঠাকুর হাসি চাপতে পারেন না। নিরো শিখোতে চায় ওকে, ঘান ভাঙানো তেল মাখা আলু ভাতে তোপা খাবার। সরষে বোনা হোচ্চে। এরপর আলু লাগানো হবে। আলু উঠবে। কলু বাড়ি থেকে ঘান ভাঙায়ে তেল আনা হবে। তখোন হাতে-নাতে প্রমাণ কোরে দেখিয়ে দেবে শ্রীমান নিরো সত্যিই ঘান ভাঙানো তেল মাখা আলু ভাতে খেতে থাকা মুখ জুতো পেটালেও ফিরতে চায় না।

রবি ফসল বোনার মরশুমের সাথে সাথে মুচিপাড়ায় লেগে যায় ধুমধাম। বড়ো পুজো মানে দুর্গোৎসবের দেরী নেই। বাবুর বাড়ি মায়ের মন্দিরে ঢাক-ঢোলক-সানাই বেজে ওঠার আগেই সুরসংলাপে মাতৃপুজা শুরু হয় অচ্ছুৎপাড়ায়। ঢাক-ঢোলকের তলা হয় ছাওয়া। কালকা আকানো নোতুন কাপড়ে ঝকঝক কোরতে থাকে বাদ্যযন্ত্রগুলো। পুরোদমে তালিম দেওয়া হয়। সুর শিল্পীদের সঙ্গে সঙ্গে বাঁশ-বেত শিল্পীদেরও জীবন হয়ে ওঠে কর্মচঞ্চল। বাবুর বাড়ির চাকরা ভোগী রায়েত এরা। মানে বাবুরা ভিটে বাড়িটুকু দিয়ে রেখেচেন। লিখে পড়ে দেননি অবিশ্যি। দান-বিক্রী হস্তান্তরের স্বত্ব নেই। খাজনার বাবদ দিতে হয় বারো মাসের তেরো পার্বণে ঢাক-ঢোল, সানাই বাজিয়ে। পুজোর বরণ ডালা, কুলো, লুচি রাখার ঝুড়ি, চাঙারি, ডোল। প্রতিমা আড়াল করে রাখার চাঁচ। কাট চলা করা, মন্দির প্রাঙ্গণের ঘাস চাঁচা। বলির পাঁঠাদের তদারকি করা। এমনি-ভাবেই খাজনা শোধ করে কেউবা। খাজনার বাবদ মেয়েদেরও খাটনি দিতে হয়। সে খাটনির ধারা অন্যবিধ। মুচিপাড়ার মেয়েরা অবিশ্যি চিড়ে-খই ভাজতে পায় না। দিতে হয় চিড়ে কুটে। ধান ভেনে। নানান গ্রাম, নানান পরগণা থেকে পুজোর সামগ্রী যোগান দেওয়ার ভার পাওয়ারা আসে। পাঁঠা,

ভেড়া, মোষ, হোমের ঘি, ফুল-ফল-মূল। অর্থাৎ যার ওপোর যেমন বার্ষিক হুকুম। এরা পুজোর ক'দিন থাকবে, খাবে আর তার বিনিময়ে খাটবে। শহর থেকে আসা বুড়ো-যুবো-বাচ্চা বাবু-বাবুনিদের এবং তাদের আত্মীয় কুটুমদের কাপড় কাচবে। তামাক সাজবে। আরো অনেক ফাই-ফরমাস কুলোবে। কিন্তু মায়ের মন্দিরে ঢোকার, মাকে অঞ্জলি দেওয়ার, অধিকার পাবে না। কী মজার কথা! ওরা গুড় আনলো, নারকেল আনলো, সে গুড়-নারকেল দিয়ে বানানো হ'ল সন্দেশ-চন্দ্রপুলী, ওদের আনা ধানের আতব চাল দিয়ে নৈবেদ্য পায়েস পিঠে বানানো, ফল হোলো উপকরণ। সেগুলো মায়ের পুজোয় লাগালো। নৈকষ্য কুলীন ভট্টাচায্যির রুচি বিকার হোলো না গ্রহণ কোরতে! আটকালো না তাদের আনা ফুলে পুজো সারতে। কিন্তু অঞ্জলি দেওয়ার বেলায় পুরুত ঠাকুরের মারফতে সে ফুল তাদের হাতে এসে পারলে না মায়ের পা ছুঁতে!

যা হোক পুজোয় আসা প্রজামহলরা খাবে। চার পাঁচ দিন। তাই সৌতে, পুঁটের মা, ময়না এবং আরো অনেকের তাগিদ আসে। পুজোর দেড়-দুমাস থাকতে ওরা যায়। সকালে পান্তা খেয়ে। আর সন্ধ্যেয় নেমে আসে ঢেকির ওপোর থেকে। এক এক গাদা কোরে মোটা আউশ ধান ভেনে। চোখ পড়ে গিয়ে খোবোলে। ঘামে জব জবে হোয়ে যায় মাথার চুল। পরনের কাপড়। এ দেড় দু-মাস খুদ-কুড়ো, এক মুঠো চালের পর্যন্ত অধিকার প্রত্যাহৃত। এক মুঠো ভাতেরও। পাঁচ থেকে দশ কাঠা জমি মাত্তর। দেশ নিরিখ খাজনা বড় জোর আট আনা থেকে এক টাকা। খাজনার বিনিময়ে এমনই ভূতখাটনি আদায় করেন বাবুরা। সে সাথে ভূমি দানের পুণ্য সঞ্চয়টাও। এ যেন এক ঢিলে দুই পাখি মারা। এতে বাবুদের জমিদারী ছিলো নিরাপত্তায়। নির্ভেজালে। এই স্বল্প পরিমাণ নিষ্কর জমি দিয়ে তার বিনিময়ে দেহ শুল্ক এবং সামগ্রী আদায় কোরে বাবুরা বড়াই করতেন, জমিদারী যুগ ছিল গ্রামীণ শান্তির যুগ। না। মোটেই তা নয়। গ্রামীণ শান্তি ছিলো পাথর চাপা ঘাস। দুর্বল, বি-রঙ, সূর্য বঞ্চিত। তাই পাখনা মেলতে পারেনি। পায়নি সবুজের স্বাধিকার।

একটা লোকের পেছনে একপাড়া লোক ফাই-ফরমাস কুলোবে। তার কাপড় কাচা থেকে পা-টেপা গা-ডলা পর্যন্ত। এর এতটুকুন চুন পান থেকে খসলে হাড় গুঁড়ো হবে। পিঠে জুতো ছিঁড়বে। দাড়িতে দাড়িতে বেঁধে রোদ্দুরে খাড়া করিয়ে দেয়া হবে। এতো বৈষম্যের মধ্যে শান্তি নাক গলাতে পারে? তাই দেখা যায়, ছাই চাপা আগুন, কেটে উঠেচে মাঝে মাঝে। যার

ফলশ্রুতিতে কাছারী বাড়ি থেকে নায়েবকে বস্তা বোঝাই হোয়ে হোতে হোয়েচে গাঙের জল সই। পাইক-বরকন্দাজদের পেটের নাড়িভুঁড়ি দেয়া হোয়েচে এলিয়ে বল্লমের খোঁচায়। জমিদার-গাঁতিদারদের হতে হোয়েচে চাক চাক কোরে কচু কাটা। অবিশ্যি এর প্রতিক্রিয়া দেখাও দিয়েচে। তবু গ্রামীণ শান্তিকামী জনতার আগুন নেভেনি। শুধু অবৈজ্ঞানিক বিপ্লবের বাবদই ব্যর্থ হোয়েচে গণ-অভ্যুত্থান। আগুেল প্রজারাই সুবিধে অন্বেষী হোয়েই জমিদারের ওকালতি কোরেচে। কাঠের আছাড়ওয়ালা কুড়ুলের মতনই কোপ হেনেছে গেয়াতি গাছ-গাছালির গোড়ায়।

এমনই ধুমধাম-হুমদামের মধ্যে দিয়ে বাঙলা দেশের সবচেয়ে বড়ো, সবচেয়ে প্রতীক্ষিত উৎসব দুর্গাপূজা এসে যায়। বাবুর বাড়ির দালান কোঠাগুলোর ছিরি-ছটা ফেরে। কবুতর-চামচিকের নাদি, ঝরাপাখনার আবর্জনা সাফ করা হয়। চুণ দিয়ে কলি ফিরিয়ে তকতকে ঝকঝকে করা হয়। ছাতের ওপোর থেকে ঝুলেপড়ে বাহারে শাড়ী। আড়ে দোলে ঝলমলে জামা-কাপড়, সায়া ব্লাউজ। ঝাড়ের আলোর, পোষাক-আষাকের ঝলমলানি, অলংকারের চাকচিক্য, আর কলকণ্ঠ হাসির কাকলি সরগরম কোরে তোলে ঘুমন্তপুরী।

বাবুর বাড়ির দেবী মহিষমর্দিনী নয়। সিংহবাহিনী। ষষ্ঠ্যাদি কল্পারম্ভ। বেলমূলে বোধন হবে। তাই ঐ দিন সন্ধ্যের আগেই যোগিন্দ্যেশ্বর-ফুলবররা হাজির হয় তাদের দলবল আর ঢাক, ঢোলক, কাঁসি, সানাই নিয়ে। চণ্ডী মণ্ডপের সামনে মস্ত এক ছাতরানো অশ্বত্থ গাছ। নীলমণি দু তিনদিন আগে ঐ গাছতলার ঘাস, শুকনো পাতা দেঁড়ো কোদাল ধরে সাফ-সাফাই কোরে দিয়েচে। ষষ্ঠী থেকে দশমী পর্যন্ত পাঁচদিন বাজনদাররা দিনরাত কাটাবে ঐ গাছতলায়। শোবে বেদে পাটীতে। খেজুর পাতা দিয়ে ঐ পাটী বুনে দিয়েচে মুচি-পাড়ার মেয়েরাই। ঐ খাটুনিও নিষ্কর জমি ভোগের আওতায়।

কানাই ঢুলি মারা যাওয়ার পর মুচিপাড়ায় তেমন প্রতিভাধর ঢুলি আর জন্মায় নি। ঢাকের দিক থেকেও তাই। ভুট্টু ঢাকির সাথে সাথে চলে গেছে এ—দিগরের ঢাক—বাজনার গৌরবময় যুগ আরতীর সময় ঐ ঢাকী-ঢুলিদের ঢাক-ঢোল যখন একযোগে বেজে উঠতো তখনো জাঁদরেল শিকারী বড়োবাবুর শিকারী মন পর্যন্ত ঢাকা পড়ে যেতো ঐ বাদ্যিতে। আর ছোটোবাবু বেচারী তো নাকের জলের চোখের জলের গংগা-যমুনা সংগমে হাবুডুবু খেতেন। বিসর্জনের পর বিদেয়-আদায় অর্থাৎ টাকা-পয়সা দিয়ে না, বাবুদের পরিত্যক্ত পুরনো ধুতি-শাড়ী,

জামা-গেঞ্জী। টোপ-খাওয়া পিতল-কাঁসার থালা-ঘটী-বাটী বকশিস্ দেওয়া হোতো। সে-সময় ছোটো বড়ো দু-তরফের ঢাকীতে-ঢাকীতে, ঢুলিতে-ঢুলিতে পাল্লা-পাল্লি চলতো। পিঠে ঢাক ঝোলানো তুষ্টু ঢাকী আর ও-তরফের বংকা বাইনের ঢাকে পড়তো জোড়া কাঠি,—ড্যাম—কুড়—কুড়, ড্যাম—কুড়—কুড় কুড়—কুড়ুক্যা। সাথে সাথে পেটের ওপোর ঝুলে পড়া কানাই ঢুলির ঢোলকে পড়তো আগা কোকড়া কাঠি। দেখাদেখি খেড়ে লাফ মেরে দাড়ি নেড়ে মাথা ঝাঁকিয়ে চোখ মিটকি মারা হাজরা বাইন এগিয়ে আসতো একেবারে আসরের মাঝখানে। মাতব্বরী কেরামতি দেখিয়ে সে চাইতো বাজী মাত কোরতে। কিন্তু তাই কী হয়? হাজরার ভাঁড়ের ভবানী নাস্তি হোয়ে যেতো হাতের কাঠি অনড় হোয়ে আসতো। যখনই কানাই ঢুলির হাতের বোলের, মুখের বোলের মধ্যে শ্রোতারা কোনোই ভেদ রেখা টানতে পারতো না। এ দু-শিল্পীর যুগ অবসানের পর ঢাক-ঢোল বেজে আসচে ঠিক কিন্তু দুধের আপসোস মিটোতে হোচ্চে ঘোলে।

এবার নোতুন ঢুলী সতীশ এসেচে বাবুর বাড়ি। ঐ ও-ই ঢোল বাজাবে। সানাইও রেওয়াজ করে সে। অবসর মতন সানাই বাজিয়ে শোনাবে।

ছোটোবাবু বিভু সরকার খুঁৎখুঁতে মানুষ। পুজো সম্পর্কে বেজায় হুঁশিয়ার। অন্য বাবুরা ভ্রূক্ষেপও করেন না বড়ো কেউ। বারবেলা, কালবেলা, কালরাত্রি কতো দণ্ড কতো পলে লাগবে, ছাড়বে। ঘড়ি এবং জলঘড়ি দুদিক দিয়েই সময় নির্ণয় কোরে সন্ধিপুজো। চা-খোর তারাপদ পুরুত পুজোর ক'দিন চা খান কী খান না। খুদিরাম কামার গেলো বছরের মতন ভাত খেয়ে পাঁঠা কাটতে এলো কি না। এর সব কিছুর শাসন, সতর্কীকরণ তদারক বিভু সরকারের।

বোধনের আগেই তিনি বাজনদারদের ধারে এসে খোঁজ খবর নেন:

—এ যোগিন্দ্রশ্বর, বলি, বাজনদাররা সব এসেচে তো?

তামাক খেতে খেতে যোগিন্দ্রশ্বর উত্তর দেয়:

—হ্যা ছোটোবাবু।

—সাবধান। যেনো অংগহানি না হয়। বলি, ঢাকী কে এবার?

—সাদীপুরের নকুল ছোটোবাবু। তুষ্টু কাকা মারা যাওয়ার পর ও-ই তো বাজিয়ে আসচে।

—তুষ্টু? ও আর বোলো না। ঢাকের কাছে ট্যাম্-টেমে। আর ঢুলি কই?

—ঐ যে ছোটোবাবু। বাচ্চা ঢুলী। সতীশকে নির্দেশ কোরে যোগিগ্যশ্বর দেখায়।

আকাশ থেকে পড়েন ছোটোবাবু।

—ও ঢোল বাজাবে! ও বাজনার কী বোঝে?

—পারবে ছোটোবাবু। মার আশীর্বাদে।

—না, না। এ ছেলেখেলা না যোগিগ্যশ্বর।

যোগিগ্যশ্বর কিছুটা বেয়াকুব বনে যায়। বলে:

আচ্ছা ছোটোবাবু, বোধন তলার বাজনাটা শুনুন আজ। অসুবিধে হয় অন্য ঢুলী আনবো।

—কে? কে-ও ঢুলীটা? ছোটোবাবু প্রশ্ন করেন।

—কানাই ঢুলীর ছেলে, ছোটোবাবু।

বিস্ফারিত হোয়ে ওঠে ছোটবাবুর চোখ-মুখ:

—কানাই ঢুলীর ছেলে! তা ও বাবার নাম রাখতে পারবে তো?

—আশা তো করি। জবাব দেয় যোগিগ্যশ্বর।

সন্ধ্যের পর বিল্বমঙ্গল তলায় বোধন আরম্ভ হয়। সে সাথে শুরু হয় ঢাক-ঢোল, সানাই-কাঁসির ঐকতান বাদন। বাচ্চা ঢুলী সতীশ গলায় ঢাক ঝুলিয়ে নেচে নেচে বাজনা বাজায়। এক গুণ ঢুলীর চারগুণ ঢোল। ঢোলের আড়ালে সম্পূর্ণ ঢাকা পড়ে যায় সতীশ ঢুলী। প্রথমটা দর্শকরা তো হেসেই ফেটে পড়ে। কিন্তু বাচ্চা ঢুলীর তাল বোধ উদীয়মান শিল্প-প্রতিভা চমৎকৃত করে সবাইকে। বাজনা শেষ হয়। আবেগভরে ছোটোবাবু বলে ওঠেন:

—বাঃ! বাপকা বেটা!

সতীশ ঢোলক রেখে দেবীর পানে তাকিয়ে মাথা নোয়ায়ে ছোটোবাবুর পায়ের গোড়ায় গড় হোয়ে ধুলো নিয়ে জিবের আগায় ছোঁয়ায়, মাথায় রাখে।

বেকায় খাপ্পা হন ছোটোবাবু:

—আঃ! পাজি কোরলি কী! ছুঁয়ে দিলি! যোগিগ্যশ্বর, কাণ্ডজ্ঞানটা কী তোমার? ও নয় নোতুন। কিন্তু তোমার তো শিখিয়ে আনতে হয় ওকে। ছি! ছি! ছি!

ভ্যাবাচ্যাকা মেরে যায় যোগিগ্যশ্বর। এক মোক্তোরে আবহাওয়া যায় পাল্টে। মাঠে মারা যায় সব সাফল্য, সব কৃতিত্ব।

ছোটোবাবু ছুটতে ছুটতে খিড়কির ঘাটে যান। এবং ভুস্ ভুস্ কোরে এক

গাদা ডুব দিয়ে চণ্ডীমণ্ডপে আসেন। তারাপদ ভট্‌চায্যি শংখর জল দিয়ে শুচি করে দেন।

মুচিপাড়া থেকে বাবুপাড়া বেশ খানিকটে তফাতে। নেহাত কাজের দায় ছাড়া বড়ো কেউ একটা পা বাড়ায় না এদিকে। ভয়-সংকোচ পা বাড়াতে দেয় না। আরো একটা কথা, শ্রেণীবৈষম্য যেখানে আকাশ-পাতাল ফারাক, নীচুতলার মানুষরা সেখানে এসে ভাপসে উঠে। তাই এ পরিবেশ এড়িয়েই চলে সাধ্যমতো। সতীশ দূর থেকে এর আগে বাবুর বাড়ির দিকে এক আধদিন নজর দিয়েছে। কিন্তু এতো সান্নিধ্যে পৌঁছয়নি আর কখনো। এখোন এত উঁচু উঁচু দালান কোঠা দেখে তাক লেগে যায় ওর। ছাতের পানে তাকাতে ঘাড় খালি লাগে, মাথায় লাগে ভিরমি। হঠাৎ ওর মনে পড়ে যায় রামায়ণের কথা। সাঁইপণ্ডিত পড়তেন লংকার রাবণ রাজার বাড়ির বর্ণনা। কী আড়ম্বর! কী জাঁকজমক সে বাড়ির। উঁচু উঁচু সোনার ছাদ। হীরে মুক্তো মাণিক দিয়ে লতাপাতা আঁকানো মোটামোটা থাম, রঙে রঙে ঝিকিমিকিতে চোখ ঝলসে যায়। তা হলে রামায়ণে তো মিথ্যে লেখেনি। ওর শিশুমন বার বার প্রশ্ন করে, তবে ওকি সেই রাবণ রাজার বাড়ি এসেছে আজ। সেই সোনার লংকায়।

শশী এসেছে পুজোর কাঁসি বাজিয়ে হোয়ে। সে ওর পাশে বসে ঝিমোচ্ছিল, সতীশ গা ঝাঁকা দেয় শশীর, এই শশে, ঘুমোচ্ছিস।

—না রে। খিদে লেগেচে।

—কখোন খেতে দেবে। জিজ্ঞেস করে সতীশ।

—দিরিং আছে রে। বাবুরা খাবে দাবে। তারপর কামার কুমার, নাপিত, বাইতিরা, তারপর আমাদ্দের। জানিসনে তো বাবুর বাড়ির যোড়ন।

সত্যই বাবুর বাড়ীর 'যোড়ন' জানা নেই সতীশের। শশী আজ তিন বছর অবধি এ পুজোর কাঁসি বাজিয়ে, তার সবকিছু ওয়াকিবহাল

অনেক রাতে বাজনদারদের খাওয়ার ডাক পড়ে। পুজোর দালান থেকে বেশ খানিকটা দূরে একফালি বাচড়া জমি। সেখানকার ঘাস চেঁচে ফেলে খাওয়ার জায়গা বানানো হোয়েচে। মেটে গেলাশ—পাতা নিয়ে ওরা গিয়ে বসে। পরিবেশন করে বংকা আর হাজরা বাইন। সীতে-পুঁটের মা-দের ভেনে দেওয়া সেই মোটা আউশ চালের ভাত। খেসারির ডালের ঝোল। হলদে জল বললেই হয়। আর কুমড়োর ঘ্যাঁট। সতীশ বরাবর একটু পেটুক। এ বাবদ মা ময়নার কাছে অনেকদিন বকুনি খেয়েছে ও। কিন্তু পেটুক স্বভাব কি

যায়? ওর ধারণা ছিলো বড়োলোক বাবুদের বাড়ি এসেচে পুজোয় বাজাতে। খাওয়া-দাওয়া হবে দস্তুরমতো। যাচাই কোরে না দিক তবু পোষায়ে দেবে ঠিক মহামায়ের প্রসাদ পাঁঠার মাংসটা, কিন্তু একখানা হাড় পড়ল না পাতে! বেজায় ভেঙে পড়ে বাচ্চা ঢুলী।

সপ্তমী পুজো শেষ হয়। সারা দিনমান ছুটোছুটি, সন্ধ্যেয় বাজবে আরতির বাজনা। তখোনই ডাক পড়বে শশী-সতীশদের। এতো হুড়োহুড়ি। এতো দৌড়াদৌড়ি। তবু খাঁচায় আটকানো পাখির মতন উশ-খুশ কোরচে ওর শিশুমন। এ যেন সাঁইপণ্ডিতের পাঠশালার চেয়েও মারাত্মক বন্দীশালা। এ পরিবেশেই কিছুতে ও সামিল হোতে পারবে না। ওর বাবা শিল্পী মানুষ হোয়ে কি কোরে দীর্ঘ জীবন কাটিয়ে গেছে। পাঁচ দিন ওর কাছে মনে ঠেকেছে পাঁচ বছর। আজই যদি প্রতিমা বিসর্জন হোতো, এখুনি ও ছুটে যেতো তার কুঁড়েঘরে। পাখনা মেলে উড়ে বেড়াতো সোনামুখী বিলে, বুড়ি ভদ্দরের চরে, মালির বাগে। এমনই মন নিয়ে শশীকে ডেকে নিয়ে সতীশ বেড়াতে বেরোয়।

শশী জিগ্যেস করে:

—ওদিকে কোথায় যাবি সতে?

সতীশের লক্ষ্য মালির বাগ। বলে:

—চল, মালির বাগতে বেড়িয়ে আসি গে।

শশী আপত্তি করে:

না রে। তার চেয়ে চল বাবুপাড়ার মধ্যে। কতো কী দেখিয়ে আসবা নে।

সতীশ রাজী হয়। পুজোর দালানের পুব পাশ দিয়ে একটা পথ ঢুকেচে বাবুপাড়ায়। আগে শশী গাইড। পেছনে সতীশ। লম্বা মস্ত হল ঘরের ধারে এসে শশী দাঁড়িয়ে যায়। জিগ্যেস করে:

—বলতো সতে, এখেনে কী হয়?

—আমি কি জানি? মস্ত মেনে ঘর তো। কী হয় এখেনে শশে?

—এর নাম নাটমন্দির। এখেনে গান হয়।

কী গান?

—সব রকম গান। যাত্রা, থিয়েটার, বাইজী নাচ। কাল অষ্টমী। আরতির পরে নাচ গান হবে।

—কারা নাচবে?

—ক্যান? মাগীরা।

—তাজ্জব বনে যায় সতীশ। মাগীরা আবার নাচ গান করে!

আবার চলেচে দুজন। বৈঠকখানার সামনে এসে গাইড দাঁড়িয়ে যায়। এবার প্রশ্নকর্তা সতীশ।

—এ-ঘর, কী ঘর শশে?

—বৈঠকখানা। দেখছিস নে নলওয়ালা কতো বড়ো বড়ো গড়গড়া! রূপোর বাধানো হুকো? দেখছিস কী লম্বা লম্বা হুকো! আবার কলকের কী বাহার ছাখ! রূপোর কলকে বলো। বুঝলি? সতীশের গালে মাছি ঢোকে। হুকো-কলকের এতো বাহার! কই? ওদের পাড়ায় তো এমোন ঢকের হুকো-কলকে একটাও নেই! যোগিন্দর, তারণ, ভ্যাবল, ফুলবর মস্ত মস্ত গুড়ুকখোর এক একজন। কিন্তু এমন ঢকসই হুকো-কলকে তো কারো নেই!

—কী সতে? হুকো দেখেই যে কাট হোয়ে গেলি। আর তামাকের সৈরভ পেলে কী কোরতিস না জানি, সতীশের গা ধাক্কা দিয়ে শশী বলে।

—ক্যান রে? সে আবার ক্যামন?

—অম্বরী, বালাখানা। বাবুরা যদি এখোন খেতো, তুই নড়তেই পারতিস নে এখানতে। এমন মজাদার সৈরভ।

আবার দুজনের চলা শুরু, কতো জাঁকজমক, কতো চাকচিক্য, কতো জৌলুসের মাঝখান দিয়ে চলেচে ওরা! কতো খাদ্যসামগ্রীর গন্ধ নাকে আসে। গাওয়া ঘিয়ে ভাজা লুচির গন্ধ। ক্ষীরছাঁচ-চন্দ্রপুলির গন্ধ। নলেন গুড়ের মুড়কীর গন্ধ। পাঁঠার মাংসর গন্ধ। অকালের আম, কাটাল, আনারসের গন্ধ। সারা বাবুপাড়াটা কেবল জৌলুস আর গন্ধ-সমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছে। এতো খাবারের আমদানি থাকতে ওদের বরাতে জুটলো কিনা খেসারির ডালের হলদে জল আর কুমড়োর ঘ্যাঁট!

—এই ছোঁড়ারা, সর, সর।

আচমকা সতীশ শশী চেয়ে ছাখে এক দল মেয়েছেলে। ওর মা ময়না, বেদানা মাসীর বয়েসী। সুখো-বাতাশীর মতন কেউ কেউ বা। 'গা ভরা' গয়না ঝলমল কোরছে। হাতে কতো রকমের চুড়ি। লাল নীল পাথর বসানো। রং-বেরঙের রকমারি শাড়ী-জামা। ঝিকমিক কোরছে জরি দেওয়া আঁচল পাড়। অবাক হোয়ে যায় সতীশের শিশুমন। এতো বাহারে শাড়ী দুনিয়ায় আছে! এতো ঝলমলে গয়না! কই? ওদের পাড়ায় কেউ তো পরে না এমোন! ওর মা ময়নার পরনে তো একখানা পুরো কালো পেড়ে ধুতি। দুহাতে মাত্তর দুটো

কাঁচের চুড়ি। বেদানা মাসির হাতে চুড়ি আছে মেলা। কিন্তু সবগুলো কাঁচের। শাড়ীখানা মোটা লাল পেড়ে। মনথরা দিদি, ফুলবর-ভ্যাবলের বৌ সবারই এক দশা। এমনই সব চিন্তা মনের মধ্যে তোলপাড় কোরতে কোরতে গাইডের পেছনে পেছনে ঘোরে ও। শশীও এক এক কোরে ওকে বাবুর বাড়ির যা-কিছু দ্রষ্টব্য দেখিয়ে ছায়। এমনকি হাতী ঘর, ঘোড়া ঘর, সিমেন্টের মেঝে ইটের দেয়াল, ছাদওয়ালা গোয়াল ঘর পর্যন্ত দেখাতে ভুল করে না। যতোই ছাখে শশী ততোই ওর মনের মধ্যে ঘোরালো হোয়ে ওঠে কালকের ঐ সন্দিগ্ধ জিগ্যেসা। চিত্রায়িত হোয়ে ওঠে রামায়ণের লংকাপুরী। তা হলে সত্যিই কী ও রাবণ রাজার দেশে এসে গেছে। আবদ্ধ যম রাজার মতন সহীসরা ঘোড়ার ঘাস কাটছে। শনির মতন কালো মানুষরা কাচ্চে কাপড়। ঐ তো আকাশ ছোঁয়া দালান বাড়ি। নানা রঙের লতাপাতা আঁকানো থাম। গা ভরা গয়না রাবণ রাজার বৌরা, মেয়েরা, ব্যাটার বৌরা ঢোলে ঢোলে ঘোরাফেরা কোরছে। দাপটে চলছে অতিকায়-ইন্দ্রজিতরা। চাঁদ-সূর্য বাঁধা আছে, ভয়ে জড়োসড়ো দেব-দেবতারাও ফাই-ফরমাস কুলোচ্ছে। এ-বাড়ি কী কোরে রাবণের বাড়ি না হোয়ে যায়? কিন্তু শ্রুতিধর শিশু রামায়ণ গানে শুনেছে, রাবণ রাজার দাপটে আকাশ, পাতাল, পৃথিবী-কাঁপতো। তুনিয়া লুটতরাজ কোরে সোনার কাঁড়ি আনতো। আর তাই দিয়ে গোড়তো সোনার লংকা। কিন্তু এরা কী দিয়ে কোরলো এতো বড়ো বাড়ি, গাড়ি, সোনা? কোথায় পেলে এতো টাকা! তবে এরাও কি রাবণ রাজার মতন লুটেরা!

কে দেবে এ প্রশ্নের সুখী উত্তর ওকে? বেজায় মুশড়ে পড়ে ওর শিশুমন। কিন্তু তখোনই কানে লাগে ওর সাঁইপণ্ডিতের পড়া রামায়ণী সুর চন্দ্রলোক সূর্যলোক যমলোক জয় কোরেছিলো যে রাবণ রাজা, সামান্ত ভিখিরী রামচন্দ্র বানরদের হাত কোরে তাকে মেরেছিলেন, এক লক্ষ ছেলে সোয়া লক্ষ নাতি একটাও ছিলো না বংশে বাতি দেওয়ার মতন। তবে ওর আর ঘাবড়ানোর কী আছে? ও ক্যানো পারবে না রাবণ নিপাত কোরতে? ও আরো বানর না; মানুষ। তার বুকখাতা ফুলে ওঠে অমিত অব্যক্ত এক জোরের জোয়ারে। তবু যে প্রশ্নটা তার ঐ বুকখানাকে পাখির মতন ঠোঁট দিয়ে ঠোকরাচ্ছিল, সে কিন্তু ঠোকরাতেই থাকলো। তার প্রশ্ন পাখী উত্তরের নীল আকাশে কবে পৌঁছবে?

দিশেহারা সতীশ শশীকে শুধোয়ঃ

—বলতো শশে, কী কোরে এরা এতো বড়ো বড়ো বাড়ি কোরলে? সোনার

কাঁড়ি? হাতি-ঘোড়া? কোথায় পেলো এতো টাকা?

—তুই কী বোকা সতে! ওরা যে জমিদার ওদের কপালের জোর কতো। ওরা ছাই ধরলে সোনা হয়। এ জবাবে খুশী হয় না সতীশের মন। ওর মনের অজ্ঞাত দিকটা তেমনই ঝাপসা থেকে যায়। সাঁইপণ্ডিতের ছাত্তর ও। গোঁজামিল দিয়ে ওকে বোঝানো দায়। সে মনে মনে ভাবে, প্রতিমা বিসর্জনের পর বাড়ি পৌঁছে ওর প্রথম এবং প্রধান কাজ হবে মায়ের কাছ থেকে জেনে নেয়া, বাবুরা এতো টাকা কোথায় পেলে? তাদের রোজগারের রাস্তা কী? যা দিয়ে বাড়ি-গাড়ি সোনা-দানা হাতী-ঘোড়া কিনলে—এ সব কি তাদের গতর ঘামানো আয়? না ওরাও রাবণ রাজার মতন লুটেরা!

এক ঝাঁক নোটন পায়রা গোলাকারে ঘুরতে ঘুরতে চিলে কোঠার ছাতে উড়ে বসল। সতীশ ঐ পাখীর ঝাঁকের পানে চেয়ে এঁকেবেঁকে হাঁটছিল।

—এই ছোঁড়াটা।

চমকে ওঠে সতীশ তাড়া খেয়ে। তাকিয়ে দেখে বাবুপাড়ার তিন-চারটে যুবক ছেলে।

—কে রে ছোঁড়াটা? শান্তি জিগ্যেস করে ভূপেনকে।

কী জানি? বাজনদার ছোঁড়াটা না?

—তাই হবে। সেদিন নেচে নেচে ঢোল বাজাচ্ছিল এই ছোঁড়া। এই ছোঁড়া, বেয়াকুবির মতন রাস্তা চলিস ক্যানো? ছুঁয়ে দিচ্ছিলি যে আর একটু হোলে!

বোধনের দিনকের ঘটনাটা ভুলে যায় নি সতীশ। সত্যিই সেদিন সে ছোটো বাবুর পা ছুঁয়েছিলো। তাই পর্যক্রামক দোষে দোষী সে। আর ছোঁয়ার শিক্ষাটা তার মর্মে মর্মে বিঁধে আছে। থাকবেও চিরকাল এ তার জীবনের ইতিহাস হোয়ে। কিন্তু আজ তো সে ছুঁয়ে দেয়নি। ছুঁয়ে দেয়ায় আর ছুঁয়ে দেয়ার কাছাকাছি হওয়ায় অনেক তফাৎ। তাই সেও বুক ফুলিয়ে সুরে সুর মিলোয়, ছুঁইচি নাকি?

—আচ্ছা গ্যাস তো! মন্তব্য করে ভূপেন।

—থাপড়ে গাল ভেঙে দেবো। মুচির কিছু না কোরে।

সতীশও তেরিয়া হোয়ে ওঠে:

—মার না থাপ্পড়। গাল বাড়িয়ে দেয় সে। শান্তি থাপ্পড় মারতে হাত উঁচায়। ভূপেন হাত এঁটে ধরে। বোধকরি মুচিকে মারলেও জাত যায়, মুচির

মার খেলেও জাত যায়। এই প্রবচনের বশবর্তীতাই ভূপেনকে বাধ্য করে ঠেকাতে। সে শান্তির হাত ধোরে টেনে নিয়ে যায়।

সতীশ কিন্তু দমে না মোটেই। ওদের শুনিয়ে শুনিয়ে বলে :

উ। মুচির গায়ে বেজায় গন্ধ হোয়েছে। মুচির ঢোলে গন্ধ না। বাজনায় গন্ধ না। গায়ে গন্ধ।

বাঁকা চোখ চেয়ে চেয়ে শান্তি ভূপেনদের দলবল চলে যায়। সতীশের মনের হাসি-খুশি আমরে যায় একদম। মাত্তর দু-দিন বাবুর বাড়ি এসেছে ও। এর মধ্যে দুটো দুটো তিক্ত ঘটনা ওর মন-মেজাজ তিতিয়ে দিয়েছে একেবারে। শিশুসুলভ চপলতাকে দিয়েছে দমিয়ে। কিন্তু চাপল্যই যে-বয়েসের মনের স্বভাবগত ধর্ম তাকে বেশীক্ষণ চেপে রাখা চলে না। মাত্তরকয়েক বাদেই উড়তে শুরু করে।

মহাষ্টমী পূজার বলির বাজনা শেষ হয়। চমৎকৃত হয় অগুণতি শ্রোতা-দর্শকরা বাচ্চা ঢুলীর বাজনা শুনে। বাহবা দেয় জনতা। সবাই এক বাক্যে বলতে থাকে, বাপকা ব্যাটা। কানাই ঢুলীর ঠাই বজায় হোলো।

আরতির পরেই আসে অঞ্জলির লগন। অন্তঃপুর মহিলারা আসবেন। জনতা সরিয়ে প্রশস্ত পথ তোয়ের করে দেয়া হয়। কেদার পরামাণিক গংগাজল ছিটিয়ে শুচি কোরে দেয়। সে পথ অগ্রবর্তিনী বাবুর বিধবা মা মাসীমা পিসিমারা। তাদের পেছনে বধূগণ, কুমারীগণ। গন্ধে প্রসাধনে বসনে ভূষণে উজ্জ্বল তারকারা যেন। মহিলাদের পিছনে ঢোকেন বাবুরা, ছোকরা বাবুরা।

বাচ্চা ঢুলী সতীশ বাজনদারদের আস্তানা ছেড়ে ভিড়ের বগলের তলা দিয়ে ফাঁকতালে ঢুকে পড়ে পূজা মণ্ডপে! এবং সবার সাথে পুরুতের হাত থেকে সেও ফুল নেয়। অঞ্জলি দেয়, চরণামৃত গ্রহণ করে।

—এই ছোঁড়ারা সর সর।

তারপর মেয়েরা চলে যান। ভিড়ও আসে হালকা হোয়ে। সতীশ তখোনও হাঁ কোরে ঠাকুর দেখচে। এমন সময় তাকে আবিষ্কার করে শান্তি, বাবা দেখেচো। কী সর্বনাশ। বাজনদার ছোড়াটা পুজোর ঘরে ঢুকেছে। কী আস্পর্ধা!

বড়োবাবু আকাশ থেকে পড়েন। যেনো তিনি আর নেই, কই? কই রে।

সতীশ তেমনি দাঁড়িয়ে। কাঠের পুতুলের মতন।

বড়োবাবু সবেগে ছিটকে পড়েন দূরে। সে-সাথে অ্যাটম বোমার মতন

ফেটেও পড়েন :

—কী! এতোবড়ো বুকের পাটা হারামজাদা পাজির! ও পরশু এক কাণ্ড কোরেচে। কাল এক কাণ্ড কোরেচে। তারপরে আজ আবার এ কাণ্ড! এ কার শিখোনী? কে ওর যুক্তিদাতা?

ছোটোবাবু ঠাকুর ঘরের মধ্যেই ছিলেন। তিনি কোরছিলেন প্রসাদ বাছাই। মানে সন্দেশ, প্যাঁড়া, ক্ষীরছাঁচ, চন্দ্রপুলী এবং দামী ফলমূলগুলো থেকে আলাদা কোরছিলেন দরিদ্রনারায়ণ সেবার শাঁক-আলু, আখ, বাতাবিলেবু, ছোলাবুট, বাতাসাগুলোকে। বড়োবাবুর চোটপাট শুনে বেরিয়ে আসেন। এবং সামনে সতীশকে দেখে ঠিক বাঘ দেখার মতন কাণ্ডখানা কোরে ওঠেন।

—এই ছুঁচো, তুই কখোন এলি এখানে? পাজির সাহস তো আচ্ছা। ওর কপালে যে চন্দনের ফোঁটাও দেখছি! তাহলে অঞ্জলি দিয়েচেও ঠিক। আঁৎকে উঠেন বড়োবাবু, অ্যাঁ! অঞ্জলি! বোললি কী তুই বিভূ! কী অলখ্যান এ! কী ঘোর অলখ্যান! আমার কোনো পুরুষে যা হয়নি তাই! ঠাকুর মশায়! হাঁক ছাড়েন বড়োবাবু।

তারাপদ ভট্চাযি্য আতপ চাল, নৈবেদ্য গামছায় বাঁধছিলেন। উত্তর দেন :

—আজ্ঞে।

—আপনার কপালের চোখদুটো তো বেশ ডাগর-ডাগর দেখছি। বলি কার কপালে ফোটা দেন, সে হুশটা থাকে না! আশ্চর্য!

বেয়াকুব বনে যান ভট্চাযি্য মশায়। আমতা আমতা কোরে বলেন :

—ভিড়ের মধ্যে ঠিক কোরতে পারিনি বড়োবাবু।

—ঠিক কোরবেন কী কোরে? আপনাদের চোখ থাকে সন্দেশের হাঁড়িতে। আর মোটা পাঁঠার দিকে। যতো সব কাণ্ড-কারখানা। বিষপুটুল পাজিটা এখোনো দাঁড়িয়ে যে। এই দারোয়ান রগড় দেখচো? উড়ো শুন্থি কোরে নিয়ে যাও ছুচোটাকে।

হুকুম পেয়ে দারোয়ান লুফে নেয় সতীশকে। তার চুল ধরে উড়ো শুন্থি কোরেই রেখে আসে আস্তানায়। এবার বড়োবাবু—ছোটোবাবু এক জোটে গিয়েই আক্রমণ করেন যোগিন্দ্যশ্বরকে।

—যোগিন্দ্যশ্বর, এ কাণ্ড কারখানা কী? বলি এসব তোমাদের শয়তানি না শিখোনি? একরত্তি একটা ছেলে একেবারে অতিষ্ঠ কোরে তুলেচে! কেন! কী ব্যাপার! পরশুদিন এক কাণ্ড কোরে বসলো। কাল বাধালো এক কাণ্ড।

তারপর আজ আবার এই ব্যাপার। তোমরা শিখিয়ে না দিলে একফোঁটা ঐ ছেলের কি সাহসে কুলোয়? না মাথায় উগোয়?

যোগিন্দ্রেশ্বরের সামনে দাঁড়িয়ে সতীশ ফুলে ফুলে কাঁদে। সে চোখ মুছতে মুছতে বলে:

—না আমাকে কেউ শিখোয় নি। সকলে অঞ্জলি দিতে যাচ্ছে, আমিও গেলাম। বড়োবাবু চটে ওঠেন:

—সকলে কারা? যোগিন্দ্রশ্বর গেছে? ভূতো গেছে? কোন বাজনদারটা গেছে পুজোর ঘরে?

—ক্যানো? আপনারা তো গেলে। আপনাদের সাথে আমিও ঢুকলাম। আপনারা অঞ্জলি দিলে আমিও দিলাম। জলের মতন সহজ সরলভাবে বলে ফেললো সতীশ।

এবার ছোটোবাবুর পালা।

—এই হারামজাদা ছুঁচো, কাল তোকে একবার বারণ কোরে দিয়েছি না?

—সে তো পা ছুঁতে বারণ কোরেছিলে। পা আর কোনোদিন ছোঁবো না। কিন্তু আপনি পুজোর দালানে উঠতে বারণ করোনি। অঞ্জলি দিতেও না।

বড়োবাবু ফোড়ন দেন:

—কী টর-টরে কথা। কাঁচে কাটা বোল! ওর বাবা তো অমন ছিল না। সাত চড়ে এক কথা কয়নি। আর ও কী জানোয়ার হোয়েছে! সেদিন ওর বাজনা শুনে বেজায় খুশী হোয়েছিলাম, ভেবেছিলাম, অল্প বয়েসে খাসা বাজনা শিখেছে। বাবার মতন বেশ নরম তরিবাদ হবে। এখোন দেখছি তার উল্টো, বাবার নাম ভাসাবে কি ডুবোবে। শোনো যোগিন্দ্রশ্বর, আমি এক কলম লিখে দিতে পারি, এ তোমাদেরই কাজ। তোমাদেরই কেউ ওর কানে মন্তর দিয়েছে। নইলে এক ফোঁটা ঐ ছেলে, ওর বুকের পাটা অতো চওড়া হয়নি। তবে এ-ষড়যন্তর আমি বের কোরবই কোরবো। সেদিন কিন্তু রেহাই পাবে না। এ-কাল্ মই দেবো মুচি-পাড়া। তর্জনী নাচিয়ে বলেন বড়োবাবু।

যোগিন্দ্রশ্বর জবাব দেয়:

—না বড়োবাবু, পিরতিমের সামনে দাঁড়ায়ে বোলচি, আমি এর কিচ্ছু জানিনে।

—তবে কে জানে? পাড়ার মাতব্বর তুমি। বের কোরে দাও কার উসকানিতে এতো বড়ো অন্যায় পথে পা বাড়ায় ঐটুকুন ছেলে।

তারাপদ ভট্‌চায্যি পায় পায় এসে বড়োবাবুর পাশে দাঁড়িয়েছেন। রহস্যটা তিনিই দেন আবরণ মুক্ত কোরে, আপনি তো বাইরে থাকেন বড়োবাবু। আপনি কী কোরে ধরবেন এ-পাক চক্করের গোড়া কোথায়।

আমড়ার আটির মতন চোখ চান বড়োবাবু। জিগ্যেস করেন:

—কোথায়?

—এসব কীর্তিকলাপ আমাদের মনুর।

—মনু মানে? মনুঠাকুর?

—হ্যাঁ। তাছাড়া আর কে? ঐ তো লাই দিয়ে মুচিদের মাথায় তুলেছে। এখোন মাথা ভরে কেননা মুতবে বড়োবাবু? ওর সাঁকরেদ ছিল আর একজন। সে কলা খেয়ে গেছে। মানে মুচিরাই পুড়িয়ে মেরেছে তাকে।

—পুড়িয়ে মেরেছে। কে সে?

—বিপিন সাঁই, বড়োবাবু। পাঠশালার পণ্ডিত ছিলো আপনি দেখেছেন। মনে নেই। লম্বা খোনো ফরসা লোকটা। দিনকতক কী কেল্লা-কাণ্ডই না কোরলে!

—কী রকম?

—আপনি তখোন মহলে বোধহয়। ফিংড়ির কাছারী। মুচি পাড়ায় এক পাল ছেলে ঢোকালে এনে পাঠশালায়। মোড়ল মাতব্বররা এক জোট হোয়ে অনেক খড়কুটো পুড়িয়ে তবে তাড়াতে হয়। ব্যাটার ছেলে ইস্কুল খাড়া কোরলে গিয়ে মুচি পাড়ায়! মনুঠাকুরের ঝাড়ের বাঁশ খেতের খড়। আর বাক্‌সের টাকা।

মাথা ঝাকান বড়োবাবু, ও-ও। মনুঠাকুর বুঝি ইন্ধন যোগান।

ষোলা আনা, বড়োবাবু। ওর আস্কারা পেয়েই তো গা বেয়ে উঠেচে মুচিরা। ঐ ছোঁড়াটা, ওর অতো আদিখ্যেতা আসবে কোত্থেকে? মনু আর বিপিন সাঁই। ও আবার বিপিন পণ্ডিতের ছাত্তর। সতীশকে নির্দেশ কোরে বলেন তারাপদ ভট্‌চায্যি।

—তাহলে ঠিকই বোলেচি আমি। এসব ওদেরই শিখোনো, তা সে বিপিন পণ্ডিতের হ'ল কী তারপরে?

—ইস্কুল খাড়া কোরলে মুচি পাড়ায়। কিন্তু ইস্কুল করা তো কোথায় কতো। লুচ্চো-বদমায়েস বেটা মুচি পাড়ার মেয়ে মানুষদের নিয়ে আরম্ভ কোরলে 'কিলি-কিচি'।

—বলেন কি আপনি ঠাকুরমশায় ! বড়োবাবুর চোখ দুটো কপালে ওঠে।

—আমি বলবো ক্যানো বড়োবাবু ? ঐ তো যোগ্যিশ্বর আছে, ভূতো আছে, জিগ্যেস করেন। রাতদিন মুচিপাড়ায় পড়ে থাকে। খায়-দায়। রামায়ণ-মহাভারত শোনায়। আর ওদের ঘরের মেয়ে মানুষদের নিয়ে কেল্‌লা করে। শেষপর্যন্ত ওরাই তো হাতে নাতে ধোরে ইস্কুল ঘরে আটকে পুড়িয়ে মারলো।

— তারপর ?

—তারপর আর কি ? ছারপোকাও গেল। ছারপোকার বাতানও গেল।

—কিন্তু অবাক কোরলেন আপনি আমাকে ঠাকুরমশায়। বিপিন সাঁই-এর মন এতো নিচেয় নেমেছিলো ! ওর বাবা পিতাম্বর সাঁই কী গোঁড়া মানুষই না ছিলো। গীতা পাঠ না করে জল খেতো না ! আর ওর ঔরসে এমন ছেলে ! কুরুকুলের মুষল যাকে বলে, তাই যে !

—ও সব জন্মের বৈলখ্যন, বড়োবাবু, বলেন ভট্‌চায্যি মশায়।

মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বড়োবাবু মন্তব্য রাখেন :

—ঠিক বলেচেন আপনি। কিন্তু মনুঠাকর মশায়ই বা কী।

—ও হোয়েছে বামুনের ঘরে কলুর বলদ।

তারাপদ ভট্‌চায্যির আরো কিছু বক্তব্য ছিলো। কিন্তু মনের কথা মনেই থেকে যায় তার। মনুঠাকুরকে এগিয়ে আসতে দেখে।

—কী বড়োবাবু ? বাজনাদারদের ধারে দাঁড়িয়ে যে !

মনুঠাকুরের মুচি-প্রীতির ইতিহাস শুনে বড়োবাবুর মনে যথেষ্ট উম্মার উদ্রেক হোয়ে ছিলো। তিনি একটু তপ্ত মেজাজেই জবাব দেন :

—শোনেন নি কিছু।

মনুঠাকুরের কপালখানা কুঁচকে ওঠে :

কই ? না তো। ব্যাপার কী !

বড়োবাবু সতীশকে নির্দেশ কোরে বলে যান :

—ঐ ছোঁড়াটা, যোগ্যিশ্বর বোলচে তো কানাই ঢুলির ছেলে নাকি ও। বিশ্বাস হয় না। অমন মানুষের ঔরষে একটা অকাল কুষ্মাণ্ড হোয়েছে।

অধৈর্য হোয়ে ওঠেন মনুঠাকুর। সতীশের মতন আর একটি নিরীহ ঠাণ্ডা ছেলে মুচিপাড়ায় তো মুচিপাড়ায় সারা সুরপুর গ্রামে আছে বলে জানা নেই মনুঠাকুরের। তার ওপোর এ অপবাদ সত্যই বেজেছে ওর। তিনি জোর

গলায় বলে ওঠেন :

—ভূমিকা রাখুন বড়োবাবু। ও কোরেছেটা কী? তাই বলুন।

তাই-ই তো বোলবো। ওর দোষ কী একটা? সেই বোধনের দিন থেকে রোজই একটার পর একটা 'যা-না-তাই' কোরে চোলেচে ও। বোধনের আরতি শেষ হোলো। ছোটোবাবুর পায়ের গোড়ায় এসে মাথা ঠেকিয়েই একদম পা ছুঁয়ে ফেললে! কী বুকের পাটা ভাবুন তো হারামজাদা পাজির।

গুরুগম্ভীর মেজাজ হোয়ে যায় মনুঠাকুরের। বলেন :

—তাই-তো! বেজায় অন্যায়। সত্যি নাকি সতে? ছোটোবাবুর পা ছোঁয়েছিস তুই? যোগিন্দর, ফুলবর!

সতীশের চোখ মাটির তলায় মিশে গেছে। যোগিন্দর, ফুলবর মাতব্বরদের মুখে রা নেই।

—আচ্ছা, তারপর বড়োবাবু। জিগ্যেস করেন মনুঠাকুর।

ঢোক গিলে নিয়ে বড়োবাবু শুরু করেন :

—কালকের ঘটনাটা শুনুন। শশী আর ঐ কাঁসি বাজিয়ে ছোঁড়াটা, কী যেন ওর নাম যোগিন্দর! সতেকে নির্দেশ কোরে জিগ্যেস করেন বড়োবাবু।

—যোগিন্দর লাগবে ক্যানো? আমি বোলচি বড়োবাবু, ওর নাম সতে।

—যাই হোক, ঐ শশে আর সতে চলতে চলতে পড়েছে গিয়ে একেবারে শান্তি-ভূপেনদের গা'র ওপোর। তাই শান্তি বোধহয় বলে থাকবে, এই ছোঁড়াটা, ছুঁয়ে দিলি। আর ও অমনি ফোঁস কোরে উঠে বললে কী না, উঃ, মুচির গায় গন্ধ, মুচির ঢাকে-ঢোলে গন্ধ না। বাজনায় গন্ধ না। ডোল-ডালা লক্ষ্মীর আড়িতে গন্ধ না। মুচির গায় গন্ধ! শুনুন তো ঐ বিষপুটুল ছেলের কথা। ও কোথায় দাঁড়িয়ে কাদের সাথে…।

এবার সতীশ প্রতিবাদ কোরে ওঠে :

—আমি কি ছুঁয়েছিলাম? আমি…।

—এই পাজি, মুখোমুখি উত্তোর! তাড়া দিয়ে ওঠেন বড়োবাবু। তারপর মনুঠাকুরের পানে তাকিয়ে বলেন :

—দেখলেন, ঠাকুরমশায়? আস্পর্ধাটা!

—আচ্ছা, ওকে বলতে দেন বড়োবাবু। তারপর ওর ব্যবস্থা হবে। এই সতে, বল কী বোলছিলি?

চোখ মুছতে মুছতে সতীশ বলে যায় :

—শশে আর আমি হাতী-ঘোড়া দেখে ফিরছি। এমন সময় এক ঝাঁক পায়রা উড়ে এসে ছাতে বসলো। আমি ঐ পায়রা দেখতে দেখতে হাঁটছিলাম। কিন্তু বাবুদের গা'র ওপোরও পড়িনি, ছুঁইও নি। এমন সময় এক বাবু বললে, ছোঁড়াটা বেয়াকুবির মতন রাস্তা চলিস্ ক্যান! ছুঁয়ে দিচ্ছিলি যে আর একটু হোলে। আমিও তখোন উত্তোর দিলাম, ছুঁইছি নাকি? তাতে আর এক বাবু বললে, আচ্ছা গ্যাস তো। তখোন তার পাশের সেই বাবু বলে উঠলো, থাপ্পড়ে গাল ভেঙে দেবো। মুচির কিছু না করে।

—তারপর কী হোলো? সতীশকে প্রশ্ন করেন মন্টুঠাকুর।

—তারপর গাল বাড়িয়ে দিয়ে আমি বলেছিলাম ঃ

—মারো না থপ্পড়। তখোন বাবু থাপ্পড় মারতে হাতও উঠিয়েছিলো। কিন্তু আর এক বাবু তার হাত ধরে টেনে নিয়ে গেলো।

—তা হোলে ছুঁসনি তো? এই সতে? প্রশ্নকর্তা মন্টুঠাকুর—।

—না বাবু।

—আচ্ছা, আজকের ঘটনাটা কী বড়বাবু?

বড়োবাবু বলতে থাকেন ঃ

—কেবল দেখলাম অষ্টমী পুজোর বাজনা বাজিয়ে গেলো। আমরা গেলাম অঞ্জলি দিতে। ও ছুঁচো কোন্ ফাঁকে তলে তলে ভীড়ের মধ্যে ঢুকেছে। চন্দনের কৌটা নিয়েছে। ফুল নিয়ে অঞ্জলিও দিয়েচে। তারপর হাঁ কোরে দাঁড়িয়ে ঠাকুর দেখচে। ভয় নেই। ডর নেই। এসব শিখোনো না হলে ওর মাথায় উগোয়? কাল যে আবার কী কোরে বসবে ভেবে আমি তো শিউরে উঠচি।

—কাল? কাল বসবে গিয়ে ভট্‌চায্যির আসন দখল কোরে। গম্ভীরভাবে জবাব দেন মন্টুঠাকুর।

—আঃ! মন্টু থামতে পারো? বাধা দেন তারাপদ ভট্‌চায্যি।

—ওর আর থামাথামি কী তারাপদ দা?

মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে এবার মন্তব্য রাখেন বড়োবাবু:

—ওঃ! তাহলে আমি ঠিকই শুনেছি।

—কী শুনেছেন বড়োবাবু। জিগ্যেস করেন মন্টুঠাকুর।

—অপ্রিয় সত্য বলতে হচ্ছে ঠাকুরমশাই। মুচিদের সবকিছু আস্পর্ধার গোড়ায় আপনি।

এবার হেসে ওঠেন মনুঠাকুর। বলেন:

—এ আর অপ্রিয় কী? অতি প্রিয় সত্য বড়োবাবু।

—কিন্তু এ আস্কারা দেয়া কি আপনার মত লোকের ঠিক হোয়েচে?

তেমনই হাসি হাসি মুখ মনুঠাকুরের:

—বেঠিকটাই বা কিসে! না দিলে একদিন কানডলে, নাকমলে আদায় কোরবেই কোরবে। তার চেয়ে ভালোয় ভালোয় দেয়া-ই বুদ্ধিমানের কাজ।

চোখ পাকিয়ে তাকান বড়োবাবু। বলেন:

—কী দেয়া? লাই দেয়া! আস্কারা দেয়া!

এবারও হাসি হাসি মুখে মনুঠাকুর মন্তব্য রাখেন:

—ওদের ছোঁয়া দেয়া, পুজোর দালানে উঠতে দেয়া অঞ্জলি দিতে দেয়া যদি লাই দেওয়া হয় তবে তাই। কিন্তু মনে কোরবেন না বড়োবাবু, ওরা ঘাড়ে ঢাক বোয়ে আনবে চিরকাল আপনার বাড়ি। আর ঐ ঢাক পিটিয়ে আপনার দেবতার চিত্ত বিনোদন কোরবে। জাহির কোরবে আপনার মহিমা। আর তার বিনিময়ে আপনি দেবেন ঘৃণা, বঞ্চনা, আছোঁয়া। কালের চাকা মেসিনের চাকার চেয়ে ঘোরে বড়োবাবু!

এবার তারাপদ ভট্‌চায্যি চটে ওঠেন:

—আরে; তর্ক করো ক্যানো তুমি মনু? যা চলে আসচে, তাই চলবে। ঘর গড়া আইন কোরলে হয় মনু?

—ঘর গড়া আইন না, তারাপদ দা। যা চলে আসচে তাও চলবে না। চাকা ঘুরচে যে। এ ঘোরা কে ঠেকাবে? দারোয়ান রেখে দেউড়ীর পর দেউড়ী তুলে আটকাতে পারবেন ঐ বাজনদারদের? আটকালেন না সামান্য একটা বাচ্চা ঢুলীকে? প্রতিক্রিয়া শুরু হোয়েছে। ঐ বাচ্চা ঢুলীই তার পূর্বলক্ষণ, অগ্রদূত।

—এতোটা বাড়াবাড়ি ভালো না, ঠাকুরমশাই। শেষটা যা শুনলাম, বিপিন পণ্ডিতের দশা না হয়।

অট্টহাসি হেসে ওঠেন মনুঠাকুর। বলেন:

—কী বললেন বড়োবাবু? আমারও দশা হবে সাঁইপণ্ডিতের মতন? তাহলে তো বেঁচে যাই। এভারেষ্টে উঠতে, উড়ো জাহাজে উড়তে কতো লোক মরলো। শেষ পর্যন্ত এভারেষ্টও হার মানলো। মানুষও উড়লো। যারা হেসেছিলো, টিটকিরী দিয়েছিলো, চুণ হোয়ে গেলো তাদের মুখ।

বড়োবাবুর মুখে আর তর্ক যোগায় না। এবার তিনি তারাপদ পুরুতকে নির্দেশ দেন :

—দেখুন ঠাকুরমশায়, কাল মহাষ্টমী পুজোর আগেই প্রতিমা অভিষেক কোরে নেবেন। আর সে সাথে আমাদের সবার চান্দ্রায়ণটা সেরে দেবেন। এক ঢালা ছোঁয়াছুয়ি হোয়ে গেছে। বুঝলেন তো। তারপর পুজো চলে যাক। পরের কথা পরে হবে। চোট পায় চলে যান বড়োবাবু।

পরদিন প্রতিমা অভিষেক হবে। বাবুপাড়া বর্গে কোরবেন চান্দ্রায়ণ। মুচি ছোঁয়ার পাপ স্খালন কোরতে। কিন্তু এক অপ্রত্যাশিত কাণ্ড সব ভণ্ডুল কোরে দেয়। সকালে দেখা যায় বিল্বমঙ্গল তলার সামনে ছোটোবাবু জুতো খুলে নীলমণিকে হরদম পিটছেন। আর বলছেন, গুয়োটার ছেলে, রাতে কি নাকে তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছিলি? নীলমণি হাউমাউ কোরে কাঁদছে আর বলছে, না বাবু, আমি মোটেই ঘুমোই নি। ছোটোবাবু রুখে ওঠেন, ঘুমুস নি বেটা তো শেয়ালে পাঁঠা খেলো কী কোরে? এমন সময় হন্তদন্ত হোয়ে ছুটতে ছুটতে আসলেন বড়োবাবু। বলির পাঁঠা শেয়ালে খাওয়ার কথা মুহূর্তে রাষ্ট্র হোয়ে গেছে গ্রামময়। এটা ঘোর অমংগলের পূর্বাভাষ। তিনি ছোটোবাবুর খাবল থেকে লুফে নেন নীলমণিকে। এ ঠিক যেন এক শিকার নিয়ে দুই শেয়ালের ছেঁড়াছিঁড়ি। কাড়াকাড়ি। ছোটোবাবু তো জুতো খুলে পিটছিলেন। বড়োবাবু লেগে গেলেন জুতো পায়-ই। দমাদম লাথির পর লাথি। তার শিকারী মনের গোঁ চেপে গেছে একদম। আর কে ঠেকায়? এর মধ্যে মোটাবাবু মানে মেজোবাবু এসে গেছেন। তিনিও লেথোতে শুরু কোরেছেন তাঁর গোদাগোদা পায়। এমন সময় হৈ-চৈ কোরে এসে পড়ে ছোকরা বাবুর দল—শান্তিবাবু-ভূপেনবাবুরা। তারা নীলমণিকে নিয়ে আরম্ভ করে ফুটবল খেলা। সারা বেলতলায় গড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। তারাপদ পুরুত মন্দিরে দুর্গানাম জপ কোরছিলেন। জপ সেরে তিনিও মুচকে মুচকে হাসতে হাসতে এসে দাঁড়ান। কপালে লাল চন্দনের ফোঁটা। অর্কফলায় জবাফুল গোঁজা। ধবধবে সাদা মোটা পৈতেটা তখনোও বুড়ো আঙুলে জড়ানো। তিনি মন্তব্য রাখেন, ও ব্যাটার গাফেলতিতেই পাঁঠা শেয়ালে খেয়েছে। মায়ের ভোগের পাঁঠা। ঘোর অমংগল। পাঁঠার বদলে ঐ শয়তান ব্যাটাকে বলি দেয়া হোক। অনেক পুরুষ বাবুর বাড়িতো নরবলি হয়নি। পুরুত ঠাকুরের কথায় নব্যবাবুর দল থেপে যায়। তখোনই আধমরা-ক্ষত-বিক্ষত নীলমণির ঠ্যাং ধোরে টানতে টানতে নিয়ে যায় মোষ কাটা হাড়কাঠের ধারে। কামারের হেপাজত

থেকে খাঁড়া-দা নিয়ে আসে শান্তি। ভূপেন হাড়কাঠের মধ্যে নীলমণির গলা পুরে দিয়ে খিল এঁটে দেয়। এক ছোকরা বাবু হাত দুটো ধরে পিঠ মোড়া দেয়। শান্তি খাঁড়াখানা উঁচিয়ে ধোরে জহ্লাদের অভিনয় করে। ভেউ ভেউ কোরে কেঁদে ওঠে নীলমণি। বাজোনদারদের বুকের মধ্যে ঢেঁকির পাড় পড়ছিলো। যোগিন্দ্রশ্বর-ভূতো-ফুলবররা ভাবছিলো, এ-যাত্রা ওরাও বুঝি রেহাই পাবে না। যে-খুন চেপেছে বাবুদের ঘাড়ে। সতীশ কিন্তু এর আগে বার কয়েক ঝুঁকেছে বাবুদের মুখোমুখি হোয়ে ঐ অত্যাচারের প্রতিবাদ কোরবে। কিন্তু যোগিন্দ্রশ্বর ভূতোরা তা কোরতে দেয়নি। আটকে রেখেছিলো এতোক্ষণ। এবার সে ছিঁড়ে কেটে বেরিয়ে আসে। তার শিশুমন অবিশ্বাস কোরতে পারে না, যারা নীলমণিকে ফুটবলের মতন লেখিয়ে লেখিয়ে হাড়কাঠে এনে পুরচে তারা বলিও দিতে পারবে না। সে সোজা গিয়ে দাঁড়ায় বাবুদের সামনে; হাড়কাঠের গোড়ায়। প্রতিবাদ করে, তোমরা আমার কাকারে কাটবে! ক্যানো? রোজ এতো এতো পাঁঠা কেটে খাচ্চো, পেট ভরচে না তাতে! এখোন মানুষ কেটে খাবে! কাটোতো, খ্যামোতা দেখি। আমিও চললাম। আর কখনো ঢোল বাজাতে আসচিনে তোমাদের পুজোয়। বলতে বলতে সে হাড়কাঠের খিল খুলে ফেলে নীলমণিকে টেনে আনে।

ছোটোবাবু—বড়োবাবুরা—বেলতলায় দাঁড়িয়ে তারাপদ ভট্চাষ্যির সাথে মুচি মারার বাবদ ডবল প্রায়শ্চিত্তের আলোচনা কোরছিলেন। ক্যানো না প্রতিমা অভিষেক এবং প্রায়শ্চিত্ত হওয়া পর্যন্ত মহাষ্টমী পূজা আরম্ভ হোতে পারে না। যেহেতু এখোন প্রতিমা অশুচি, পুরুত অশুচি, বাবুরাও অশুচি। এতো অশুচিতার মধ্যে পুজোয় দৈব দুর্বিপাক হোতে পারে।

শিশু সতীশের চোটপাট দেখে বাবুরা সত্যি-সত্যিই ঘাবড়ে যান। বাচ্চা ঢুলি যে বদ মেজাজী ছেলে ঢোল নিয়ে যদি চম্পট দেয় তা হলে অংগহানি পুজো হবে। ঘোর অমংগল ঘটবে।

খুঁতখুঁতে মানুষ ছোটোবাবু এগিয়ে এসে নব্যবাবুদের টেনে নিয়ে যান। সে সাথে নীলমণিকে সতর্ক কোরে দিয়ে যান, এই নীলে পাঁঠার ধারে যা। খবরদার, রাতে ঘুমোস পাছে।

নীলমণির তখোনও কান্না থামেনি। গায়ের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে সে পাঁঠার তদারকিতে চলে যায়। শিশু সতীশের দুগালে চক্চক কোরতে থাকে চোখের জলের তপ্ত সাক্ষর।

বিসর্জনের পরদিন বিদায়ী বাজনা শোনায়ে বকশিষ আদায়ের প্রবৃত্তি বাজনদারদের কারো নেই। বিশেষ কোরে শিশু সতীশের। এখানকার পাওয়া বাহবার মুখে একগাল থু-থু দিয়ে ওর মন চাইচে বাড়ি ফিরে যেতে। তবু মামুলি প্রথা এড়িয়ে এ-রাবণ রাজার দেশ থেকে পা বাড়ানোর উপায় নেই। তাই ঢাক-ঢোলক বাজলো। সানাই ও সুর ধোরলো কিন্তু শিল্পীমন উড়তে পারলো না তার অবাধ প্রজাপতি পাখায়।

আশ্বিনী সংক্রান্তির অপর নাম-ডাক সংক্রান্তি। পুবে ফরসা দেয়ার সাথে সাথে মুচিপাড়া জেগে ওঠে। আর গোরুর কবিরাজ যোগিশ্বর গা তোলে তারও আগে। মানে সূর্যের জ্যোতির্ময় সংবাদদূতী 'পৈতে' তারার অভিসার লগ্নে। সোনামুখীর বিল কোলাচে কার্তিকসাল ধান ফুলচে। বৈদিক প্রথানুসারে পোয়াতির সাধ দিতে হয়। তাই গর্ভবতী ধান—ক্ষেতকে যোগিশ্বর সাধ দেয়। টেনে টেনে সুর কোরে ছড়া কেটে :

আরের ধান লটঘটি আমাদের ধান বায়ায়পটি
ধান তুমি সাধ খাও বর দাওরে হো—ও—ও।

যোগিশ্বর ভূমিহীন। সোনামুখীর বিলে এক ছটাক মাটি নেই ওর। এক মুঠো ধানের শরিকও সে না। তবু এ-ধান আপন স্বত্বর উপলব্ধিতে ভোরে তোলে ওর বুক। তখোন গর্ভবতীতে সীমিত সাধ ছড়িয়ে পড়ে পৃথিবীময়। বিল, মাটি, জল, গাছ-গাছালি, গরু-বাছুর, এমনকি ওর ঢাক-ঢোল-সানাইকে পর্যন্ত উদ্দেশ কোরে সুরে-ছড়ায় সাধ দেয়। আর সে সুরে সুর মিলোয় ঐক্য কণ্ঠে সারা পাড়া।

তারপর হোগোলপাত ছুরি নিয়ে বেরোয় জংগলে। ওষুধ তুলতে। একশো আট রকমের শেকড়। তার মধ্যে ভাট, আচোট, আকোন্দো আছে। আছে বেলমূল। চাকুলে, গুয়ে বাবলা ও ছোটো ইশে, বড়ো ইশে। ওর গোটা বছরের পুঁজি। এ দিয়ে গোরু-মোষ-ছাগোল চিকিচ্চে কোরবে। ডাক সংক্রান্তির দিন আহরণ করা এসব গাছ-গাছড়ার ওষুধ, যে রোগে লাগাবে সে রোগে লাগবে।

কর্ম-চঞ্চল মেয়েমহল। শিশুমহলও। ছোটো এক-একটা ঘোটি নিয়ে দল বেঁধে চলে গাঙের ঘাটে। আঘাটা দিয়ে জলে নামে। চান কোরে ভরা ঘটি নিয়ে ঘাট দিয়ে ওঠে। বাড়ি ফিরে পাঁচ ফুলের পাতা, গোবোর-চোনা মিশোনো

ঐ জল মাথায় ছিটোয় সব। কামনা করে আয়ু, আরোগ্য। নিমপাতা খায়। খায় পাত কাঠির ধোঁয়া। কাঁচা হলুদ মাখে, কাজল পরে। অনেকদিন বাদে ময়নার ডাগর চোখ আরো ডাগর হোয়ে ওঠে কাজল রেখায়। হলুদ রঙে ঝলমল কার আয়ত কপালখানা।

সন্ধ্যের পর হাজরাকে নিয়ে সতীশ যায় শশীদের বাড়ি। ডাকে :

—ও শশে! কী কোচ্চিস?

শশী টোঙের ওপোর বসে বিড়ি ফুঁকছিলো। বলে :

—কিচ্ছু না। আয়।

সতীশ বলে :

—চল, কাড়ু খেলে আসি গে।

সুখো চলে যাওয়ার পর শশীর মনে আর সে ফুর্তি নেই। ওর শিকার প্রতিভায় ভাটা লেগেচে। হাতের শিকার হরিণী ফসকে যাওয়া—ব্যাধের দশা ওর। সব উৎসাহ, সব উৎসব সুখোর সাথে সাথে বিদায় নিয়েছে। সতীশ হয়তো কিছুটা বোঝে ওর মনের ভাব। কিন্তু জিগ্যেস কোরতে পারে না। আর শশীও পারে না ব্যক্ত কোরতে। যদিও বন্ধুর মতন দুজনের মধ্যে মেশামেশি আছে। এ বাধার পাঁচিল খাড়া কোরচে ওদের মধ্যেকার বয়সের তর তফাতটাই। ইস্টমের দিক থেকে কিন্তু এ—বালাই ছিলো না। ওর মনের সবগুলো চোরাকুঠরী ইস্টমের বেলায় খোলা। কিন্তু সুখো চলে যাওয়ার পর ইষ্টম যেনো ওর থেকে কাটা কাটা থাকতে চায়। ক্যানো? এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হোলে মুশকিলে পড়তে হয়। আর আবছা যে জবাবটা খাড়া করা যায় তা হচ্চে, শশী ওস্তাদ শিকারী। ওর সন্ধান অব্যর্থ। ওর প্রিয়তম শিকার ফসকে গেছে। তাই নিশপিশ কোরচে সে শিকারী মন। এখোন ফাঁকতালে ইষ্টমের মুখের শিকার কেড়ে নেয় যদি? মানে যদি শিকার কোরে বসে পাতাসীকে? হয়তো বা সেই আতংকে ইষ্টম কাটিয়ে বেড়ায়।

শশী বলে :

—তাইতো সতে, আমি তো কাঁড়ু বানাই নি। ভেবেচি এবার আর মশাল খেলবো না।

সতীশ বলে :

—দূর! তাই কি হয়? আমি এনেছি কাড়ু বানিয়ে। এই ভাখ, একটা, দুটো, তিনটে, এই চারটে। এছাড়া হাজরাও এনেছে আরো তিন চারটে।

—আবার তাল বাধালি তুই। মশাল খেলার বয়েস বুঝি আমার আছে? চল শুনচিস্‌নে যখোন।

মুচিপাড়ার পুবে বিস্তীর্ণ মাঠ। ঐ মাঠ ঠেকেচে গিয়ে মনুঠাকুরদের খড়ের ভুঁইয়ের গায়। এ মাঠেই অচ্ছ্যুৎ ছেলেদের বহ্ন্যুৎসব হয়। শীতাতুর রাতের গায় বানায় শত শত অগ্নিছিদ্র। উত্তর বসন্তর পথ প্রস্তুতি।

শশীর বিয়ের দেরী নেই আর। তাই জোর তালিম দেয়া হোচ্ছে। হাটবার ছাড়া রোজ সন্ধ্যের পরই আসর জমকে ওঠে। কোট-প্যান্টলুন-টুপী পরে ইংরেজী বাজনাদাররা সাহেব সাজে। ইষ্টম পিঠে নেয় জয় ঢাক। আর ফুলবর মাতব্বরী চালে মারে জোড় কাঠি। গুম্ গুম্ আওয়াজে—হিলোল্লিত হোয়ে ওঠে মুচি পাড়া, নুরপুর ঘরভাঙা গেরাম। ব্যাকপাইপ বাজে। বোল ধরে সানাই। কিন্তু সবচেয়ে বাচ্চা ঢুলি সতীশ ফেটে পড়ে বেশী আহ্লাদে। শশীর বিয়ের লগ্নকে উজ্জ্বল মুখর কোরে তুলবে সে। তার স্বর-শিল্পর চরম অবদান দিয়ে।

দেখতে দেখতে প্রতীক্ষিত লগ্ন এসে যায়। ছাব্বিশে অগ্রাণ। মনুঠাকুরের ছোইওয়ালা গোরুর গাড়ীতে উঠে শশী চলে বিয়ে করতে। পরনে লাল কস্তা পেড়ে ধুতী। নীল রঙের কামিজ গায়। গলায় বেনের দোকানের কাঠের মালা। মাথায় টোপর। ধ্যাবড়ানো কাজল চোখে। চন্‌নন বিন্দু দিয়ে চিত্রিত কপালখানা। কালো রঙের ওপোর সাদা চন্‌নন বেশ মানিয়েছে। ঝিকমিক কোরছে। বিলের পর বিল। মাঠের পর মাঠ। অসমতল কাঁচা রাস্তা বেয়ে গোরুর গাড়ী চলেছে রাইপটনমুখো। হোঁচট খেতে খেতে। খোঁড়াতে খোঁড়াতে। ক্যাঁচকুঁচ শব্দ সৃষ্টি কোরে। সে শব্দ বিরামহীন। বিরতিলুপ্ত। বাঁকা শীষ নুয়ে-পড়া বাসমতী ধানের সোনালী ক্ষেত, মুগ-মসুর ক্ষেত ছোলা ক্ষেত। হলুদের বান ডাকা শরষে ভুঁই দেদার চলেছে। রবি ফসলের অফুরন্ত সমারোহ। অচ্ছিদ্র সৌরভ মসগুল কোরে তুলেছে শশীর যৌবন চঞ্চলমন। সতীশ, ইষ্টম, বোষ্টম ওর ইয়ার বন্ধুরা ঘিরে বসেছে ওকে। থেকে থেকে সানাই বাজছে। খুব ভালো লাগার স্বচ্ছ আকাশখানা ক্ষণে ক্ষণে ছায়ান্বিত কোরছে উড়ে যাওয়া হাল্‌কা টুকরো মেঘের ঝাঁক। কিন্তু সতীশের? ওর ভালো লাগার সীমা-সীমানা নেই। দু'ধারের অজস্র ফসলের মতন ওর স্বরশিল্প সাধনা ফলিত আজ। সেদিন বাবুর বাড়ির পুজাঙ্গনে ওর শিল্প-প্রতিভার যে অপমৃত্যু হোয়েছিলো আজ তার নবজন্ম হোয়েচে রবিফসলের কাঁচা সৌরভে। জেগে উঠেছে ঠিক হনুমান আনা গুল্মরস ছোয়ানো শক্তিশেল বিদ্ধ লক্ষ্মণের মত। অথচ সেদিনকার পরিবেশ ছিলো

সমৃদ্ধ। আকাশ ছোঁয়া ইমারত। তার ছাতে উড়ছিলো নোটন কবুতর। হৈ-হল্লোর মুখর সমারোহ। তবু ঢোলক সানাইয়ের সুর ঐ সব ইটের দেওয়ালে মাথা খুঁড়ে হচ্ছিল আত্মঘাতী। আজকার এ অনাড়ম্বর আকাশতলায় ফসল ফলা বিল—ঝিলমাঠের ছোঁয়াচে সে জীবনস্পৃহা ফিরে পেয়েছে। পেয়েছে পাখির মতন ওড়বার স্বাধিকার।

মন্টুঠাকুরের নির্দেশমাফিক বিয়ের লগ্ন আটটায়। তার আগেই রাইপটনের গ্রাম এলেকায় পৌঁছে যায় বরযাত্রীরা। বাঁওড় ধারে ছাতরানো বটতলায় এসে গোরুর গাড়ী থামায়। বাজনদাররা কোট-প্যাণ্টলুন-টুপী প'রে সায়েব সাজে। শশীর চুলগুলো নোতুন কোরে আঁচড়ে দিয়ে টোপরটা ঠিকঠাক কোরে পরিয়ে দেয়া হয়। সতীশ ঢুলির ঢোলকে কোকড়া কাঠি পড়ে। সে সাথে ইংরাজী বাজনা বেজে ওঠে। জয়ঢাকে ব্যাকপাইপ জগঝম্প সানাই। মন্থর গমনে গোরুর গাড়ী চলে মুচিপাড়া মুখো। দূর থেকে দেখা যায় এগিয়ে আসা লণ্ঠনের আলো। দু' একজন ভারতা বয়েসের লোকদের সাথে ছেলে-ছোকরার দলবল এগিয়ে নিয়ে যায়।

উঠোনের মাঝখানে একটা খেজুর পাতার পাটির ওপোর কলকা আঁকানো কাঁথা বিছানো বরাসন। তার পাশে ঢালোয়া বেদে পাটি পাতা। বরযাত্রীদের জন্য। হন্তদন্ত হোয়ে ছুটে আসে ঝোড়ো। বরযাত্রীদের অভ্যর্থনা জানায়। তামাকের ধোঁয়ায়, হুঁকোর বুড়বুড় শব্দে আর হৈ-হুল্লোড়ে জমজমে হোয়ে ওঠে বিয়ে বাড়ি।

বরপখ্যের মাতব্বর হোয়ে এসেচে ফুলবর। অবিশ্যি ঘরভাঙা নুপুরের মাতব্বররা সবাই এসেচে। ভ্যাবল, যোগিশ্বর, ভূতো, তারণ। কিন্তু মাতব্বরী সর্বসম্মতি-ক্রমে চাপিয়ে দেয়া হোয়েচে ফুলবরের ঘাড়ে।

ফুলবর চোটপাট করে ওঠে ঝোড়োকে বলে, ও বেয়াই, তোমার পুরুতঠাকুর কই?

মুচিবাড়ি পৌরহিত্য করার মতন বামুন একান্ত দুষ্প্রাপ্য। কেননা সমাজে যারা একদল অছুৎ, দৈবাৎ ছোঁয়া লাগলে যাদের চান্ কোরে গংগা জল মাথায় দিয়ে তবে শুচি হোতে হয়, কে আসবে তাদের বাড়ি যাজন কাজ কোরতে। তাই মাতব্বররা ঐ পুরুতের পিঁড়িতে বসে বিয়ে-ছেরাদ্ধর কাজ সেরে ন্যায় অনেক সময়। তবে ঘটনাচক্রে মাদারীর বিয়েতে ঝোড়ো এক পুরুত জুটিয়ে ফেলেচে। এর নাম বরদা-ঠাকুর। নৈকষ্য কুলীন বামন। তবু তিনি ক্যানো মুচিবাড়ি

এলেন পুরুতগিরি কোরতে? এর পেছনে এক ইতিহাস আছে। বরদা-ঠাকুরের অবস্থা ছিলো নিতান্ত অস্বচ্ছল। তাই আড়ে-আড়ালে মুচিপাড়ায় যাজন কাজ কোরতেন। অবিশ্বি চাল-কলার বোচকা না বাঁধলেও দক্ষিণেটা গাঁটে গুঁজে বাড়ি ফিরতেন। কিন্তু এ চোরা-কারবার একদিন ফাঁস হোয়ে যায়। তখোন বামুন পাড়া গলা টেকা দিয়ে তাকে গাঁ থেকে তাড়িয়ে দেয়। নিরুপায় বরদা-ঠাকুর তখোন মুচিপ্রধান গেরাম কাকমারী যান। এবং শরণার্থী হন মাতব্বরদের। মাতব্বর মহল তাকে একখণ্ড জমি দিয়ে তার ওপোর ঘর বেঁধে দেয়। বরদা-ঠাকুর সেখানে থাকেন আর পুরুতগিরি করেন মুচিপাড়ায়। কিন্তু তখোনো ঠাকুরমশায় পাণিগ্রহণ করেন নি। এবং এ পাণিপীড়ন যদি নাই করেন তাহলে বংশপীড়া একদিন তাকে নির্মূল কোরবে। মাতব্বরদের কাছে একদিন সে কথা ব্যক্তও করলেন ঠাকুরমশায়। আর এমন আভাসও দিলেন ঋষিকন্যা পেলেও তার পাণিপীড়নে অরাজী নন তিনি। প্রথমটা মাতব্বররা শুনে চম্‌কে ওঠে। সে কী। এ হোতেই পারে না। ব্রহ্মতেজে তা হ'লে ওরা পুড়েই মরবে। ঠাকুর-মশাই অনেক কোরে বোঝান, ওদের ও-ধারণা একদম মিথ্যে। বামুনরা সবাই শূদ্রানী। আদিশুর যজ্ঞ কোরতে কান্যকুব্জ থেকে যে পাঁচজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ এনেছিলেন, তারা সবাই শূদ্রকন্যার পাণিগ্রহণ করেই বংশ রেখেছেন। কিন্তু এ কথা তারা মানতে পারলো না। এমন সময় যশোর থেকে এলেন মহীতোষ রায়চৌধুরী। প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ্। শুধু তাই নয়। ঘরভাঙা—হুপুরের সাঁই-পণ্ডিত যেমন এনেছিলেন রেনেসাঁসের যুগ, তারই দৌলতে এখানকার মুচিপাড়ায় ইস্কুল প্রতিষ্ঠা হয়। শিক্ষার আলোকসম্পাতে ঝলমল কোরে ওঠে এ অন্ধ কুটরী। এখানে তার অবদান অবিস্মরণীয়। যা হোক তারই মধ্যস্থতায় শেষ পর্যন্ত মাতব্বর মহল রাজী হয়। ঠাকুরমশায় ঋষিকন্যার পাণিগ্রহণ করেন। এখোন তার সুখী সংসার। বাচ্চাকাচ্চাও হোয়েচে অনেকগুলো।

বরদা-ঠাকুর দাওয়ার ওপোর আলাদা মাদুরে বসেছিলেন। ঝোড়ো তাকে দেখিয়ে বলে:

—ঐ তো পুরুতঠাকুর।

ফুলবর এগিয়ে গিয়ে মাতব্বরী চালে বলে:

—ঠাকুরমশায়, বিয়ের লগ্ন বলো আটটায়।

আপনি তাড়া দিয়ে সব গুছিয়ে-গাছিয়ে ন্যাও। লগ্নমতো কাজটা যেন হয়। ও বেয়াই, তোমার—মাতব্বরদের ডাকো-ডোকো। অনুমতি চাও। বিয়ে আরম্ভ

হোয়ে যাক।

ফুলবরের চোটপাটে এবার বরদা পুরুতও চোটপাট কোরে উঠেন :

—বলি ও ঝোড়ু, কেলে কই ? কলার খোলা আনো।

ফুলবর জিজ্ঞেস করে :

—এখোনো বুঝি আবুদ্দায়িক হয়নি ? ঠাকু মশায় ?

—না মোনে।

—আপনি তাড়া দেওনি তায় হবে কী ? বলতে বলতে ফুলবর ভারিক্কে চালে অন্যদিকে চলে যায়।

এদিকে রাত পেরায় আটটা বাজে-বাজে। বিয়ের কোনো রকম তোড়জোড় নেই।

যে যার কাজে মেতে আছে। মানে খোঁপরদালালী নিয়ে। এমন সময় তারণ চোটপাট কোরে ওঠে। আর ছোটো কানাইকে দিয়ে ঝোড়োকে ডাকায়। ঝোড়ো তখোন রংয়ের পরে আছে। সে চোখে দেখচে ধুতরোর ফুল। হি-হি কোরে হাসতে হাসতে এসে দাঁড়ায়। জিগ্যেস করে :

—কী বেয়াই ? ডাকচো ? তা বলো, বলো।

তারণ রুখে ওঠে :

—সব সময় চ্যাংড়ামো ? বলি রাত কটা বাজে এখোন ?

তারণের ধমকানিতে ঝোড়োর রঙের ঝোঁক খানিকটে কেটে যায়। বলে :

—রাত ? না না মেলা বাজেনি বেয়াই।

—আটটায় লগ্ন। তা খেয়াল আছে ? তোমাদের ঐ মুচনে বিয়ে বলো আমি দেবো না। তা আগেই বলে দিয়েচি। তাহলে ছেলে তুলে নিয়ে হাঁটা দেবো কিন্তু বলে দিচ্ছি। যাও, তোমার মাতব্বরদের ডেকে আনো ঝপ্ কোরে।

তারণের চোটপাটে ঝোড়োর হুঁশ হয় এবার। তার রঙের ঝোঁক আরো খানিকটে কেটে যায়। জোর পায় মাতব্বর বাড়িমুখো চলে সে। কিন্তু বেলা গেল কলা আনতে কলায় নমঃ। ঝোড়োও ফেরে না। মাতব্বররাও না। অতিষ্ট হোয়ে ওঠে তারণ। ছোটো কানাইকে পাঠায়। ছোটো কানাই যায় আর আসে।

—কী হোলো ? আসচে ? প্রশ্ন করে তারণ।

—না।

—কী কোরচে।

—কী জানি? কী গোলতানি কোরচে।

মুখখিস্তি কোরে ওঠে তারণ :

—শালার মুচনে ঘোট। যা আমার গায় সয় না তাই। বলেই সে পায় পায় মাতব্বর বাড়িমুখো চলে।

চরণদাসের বাড়ির ধারে পৌঁছে তারণ ভাখে রীতিমতো মজলিস বসেছে উঠোনে। পাড়ার বারো আনা রকম লোক জমায়েত হোয়েছে রাস্তার মোড়ে, গাছতলায়, ঘরের আনাচে-কানাচে জটলা। ফিসফাস। যুক্তি-যাক্তা। শলা-পরামর্শ। চরণের ভাই চড়া গলায় তড়পাচ্ছে :

—তুই যা ঝোড়ো। তোর রূপোমাসী.ক নিয়ে থাকগে যা। আমরা মুৎতেও যাবো না তোর বাড়ি।

ঝোড়ো নরম গলায় বোলচে :

—চ্যাচাস নে ভাই। বাড়িভরা কুটুম সাখ্যেত। যাতে জাত মান বাঁচে তাই কর এখোন।

—কক্ষনো না। কাটা জবাব দেয় শরণ।

চরণও সায় মিলোয় ওর মতে। বলে :

—কে যাবে তোর বাড়ি খেতে? তোর ঐ ছিনাল মাসীর রান্না? আমাদের যদি চাস্ ঝোড়ো, তবে রূপোমাসীকে আগে খ্যাদা। আর ভাত-ব্যান্নন্ আদাড়ে দে। তারপর আমরা যেয়ে রান্না কোরে খাবো। ক্যানো? আমাদের ঘরে মেয়েমানুষ নেই? তারা রান্‌তে জানে না?

এমন সময় তারণ সামনাসামনি হাজির। মুচি সমাজের এক ডাকে চেনা মাতব্বর তারণ। আবার এ গেরামের জামাইও সে। তাই ওকে দেখে চরণ শরণ মাতব্বররা একটু বুক ভাবা খায়। চরণ বলে :

—এসো গো।

তারণ মাতব্বরদের কথা শুনে বুঝে ফেলেচে বিয়ে বাড়ি সম্পর্কেই গোল পাকাচ্চে ওরা। সমাজ সামাজিকতাই এ ঘোট মংগলের উপলক্ষ্য। তবু সে কিছু মাত্তর না-জানা, না-বোঝার ভান করে বলে :

—তা তোমরা দিরিং কোরচো ক্যানো গো। লগ্ন যে উৎরে গেলো। আর বেয়াই, তোমার মতন নিরিমিষে লোক আর একটাও দেখিনি। তোমাকে পাঠালাম, মাতব্বরদের ডেকে আনো। আর তুমি এখানে বসে গদ্দি গড়ান কোরচো।

তারণের স্বরে শরণও স্বর মিলোয় :

—ঠিক বলেচো গো। যারে বলে নিরিমিষে ও তাই।

—তোমার মেয়ের বিয়ে আর তুমি বেড়াচ্চো রঙ চড়িয়ে! ওগো, ওঠো, চলো সব, চরণ-শরণদের লক্ষ্য কোরে তারণ বলে :

—তা আমাদের জন্থি আটকাচ্চে কিসে? যার মেয়ে সে ওটবে তো? মেয়ে দান কোরচে ও? না আমরা? বললে শরণ।

তারণ প্রতিবাদ করে :

—কিন্তু তোমরা অনুমতি না দিলে পিঁড়িতে বসতে পারে কেউ?

—অনুমতি? তা এখান থেকে দিয়ে দিচ্চি গো। শরণ বললে।

তাই কী হয় গো! তোমরা মাতব্বর, তোমরা উঠোনে না গেলে, অনুমতি না দিলে, ও কেমন কোরে মেয়ে ছায়? আর আমিও বা চোরের মতন ক্যামোন করে নিয়ে যাই?

এবার চরণদাস কথা বলে :

—তা হোক গো বাপু। তুমি জামাই মানুষ। অনুরোধ কোরো না। ক্ষেত্তর যা দাঁড়িয়েচে তাতে কোরে ঝোড়োর বাড়ি যেতে পারিনে বাপু। তোমার সাথে তো কোনো গণ্ডগোল নাই। আমরা অনুমতি দিচ্চি; ও তোমার ছেলেকে মেয়ে দিক। ওরা সুখে সচ্ছন্দে থাক।

তারণ বলে :

—তাই কী হয় গো? পাড়ার মোড়ল মাতব্বরদের বাদ দিয়ে ছেলের বিয়ে দিয়ে নে যাবো আমি! তার চেয়ে বিয়ে থাক। ছেলে তুলে নিয়ে চলে যাই। তোমরা গোলতানি করো বাপু। ক্যানো? এ-পাক চক্কর হোচ্চে কী জন্থি গো?

শুনে ছাখো তোমার বেয়ায়ের কাছে, শরণ বলে।

তারণ জিগ্যেস করে :

—ও বেয়াই; বলি সমাচার কী? মাতব্বররা তোমার বাড়ি যেতে চায় না ক্যানো? কী দোষ তোমার? আমারও তো শোনার দরকার। সত্যি যদি তেমন কিছু হয় আমিই বা দুষী ঘরে কাজ কোরতে গেলাম ক্যানো?

—না বেয়াই, সে সব কিছু না। ঐ রূপোমাসীরে নিয়ে…বলতে বলতে থেমে যায়।

রূপোমাসীর ব্যাপারটা তারণের অজানা নয়। রাইপটনেরই মেয়ে রূপো-

মাসী। বিয়ের কয়েক বছর বাদে বিধবা হোয়ে বাপের বাড়ি ফিরে আসে। কাঁচা বয়েস। তাই হলদিপোতার গণশার সাথে ওর আবার বিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু বিয়ের মাস ছয়েক পরে রূপো দিব্যি ফুটফুটে এক সন্তান প্রসব কোরলে। ওর ছিরি-স্বাস্থ্য দেখে কেউই টের পায়নি রূপোর পেটে বাচ্চা আছে। মহা ফাঁপোরে পোড়লো গণশা। রূপোকে সে অজস্র ভালবাসতো। কিন্তু উপায় কী? শেষ পর্যন্ত বিসর্জন দিতেই হোলো তাকে। রূপো ছেলে কোলে কোরে রাইপটন ফিরলো। ওর বাবা কিন্তু তখোন বেঁচে নেই। মার সাথে পরের বাড়ি ধান ভেনে সংসার চালায়। খোঁজ পেয়ে পাশের গাঁয়ের ওর সেই পিরীতির মানুষটাও আসা-যাওয়া শুরু করে। এর দু-বছর পর হঠাৎ একদিন বাচ্চাটা মারা গেলো। মারও ঘোটল লোকান্তর। পাড়ার লোক কেউ ওর বাড়ি যায় না। উঁকি মেরেও তাকায় না। এক মাত্তর ঝোড়ো ছাড়া। তাই ঝোড়োকে রূপোমাসী ছাড়তে পারে না। দায়-বেদায়ে বুক দিয়ে এসে ঠেকায়। আর ছাড়তে পারে না ওর সেই ভালোবাসার লোকটাকে। একদিন যে ওকে মাতৃত্ব দিয়েছিলো।

তারণ বলে:

—তা বেশ। গোল যখোন বেধেচে, ফয়সালা একটা কোরে ফ্যালো। গোলমালের তো মিটমাটও আছে।

শরণ বক্তব্য রাখে:

—না বাপু, এ ক্যাঙ্গাল মিটবার না। কে যাবে ওর বাড়ি? ঐ খান্‌কি মাসী থাকতে? ওকেই নিয়ে থাক ও।

—কী বললি। শালার কিরেট। আমার মাসী খান্‌কী! গুষ্টি ঠ্যাঙাই তোদের মতন মাতব্বররে। তেরিয়া হোয়ে ওঠে ঝোড়ো।

—কী-ই? গুষ্টি ঠ্যাঙাবি? আয় দেখি শালো, কতো ঠ্যাঙা মজুত কোরেছিস। বলতে বলতে শরণদাস লাউমাচা থেকে একখানা আস্তো বাঁশ নিয়ে উঁচিয়ে ধোরে ছুটে আসে। চরণের ছেলে বের কোরে আনে লম্বা হোগোলপাত ছুরি। চরণও ধৈর্য হারায়:

—ফ্যাল শালারে, গোরু ছোলা ছুলে ফ্যাল।

মাতব্বরের হুকুম পেয়ে অমাতব্বররা জাপটে ধরে ঝোড়োকে। এর আগে চরণের উঁচিয়ে ধরা বাঁশখানা তারণ খপ কোরে এঁটে ধোরেছিলো। তাই রখ্যে। নইলে ঝোড়োর মাথাটা একদম ছাতু হোয়ে যেতো।

এদিকে রীতিমতো হাতাহাতি বেধে গেছে। হই-হল্লা শুনে বরযাত্রীরাও

এসে পড়েচে ছুটতে ছুটতে। ছোটো কানাই বেগোতিক দেখে ছোঁ দিয়ে লুফে এনেচে ঝোড়োকে। তবু কিন্তু হাতাহাতি—ঘুষোঘুষি থামে নি। পক্ষাপক্ষ বাচ-বিচার নেই। যে যেমন পারচে হেটো মারের মতন চলেচে এলোপাতাড়ি ঠেঙিয়ে।

ব্যাপার আয়ত্তের বাইরে দেখে তারণ ছুটে যেয়ে চরণদাসের হাত এটে ধরে। বলে :

—বাপু ঠেকাও। তুমিও পাগোল হোলে দেখচি। ও সব শুয়োর। ওদের কি কাণ্ডগ্যান আছে ?

চরণের হুঁস ফিরে আসে। সে হাত উঁচো কোরে বলে :

—ওরে থাম বাপু সব। থাম। অমনি কেল্লোর মাথায় টুকি পড়ে যায়। কিন্তু এখানেই মুশকিলের আসান হয় না। শরণদাস কোট কোরে বসে, ওরা মাতব্বররা কিছুতেই ঝোড়োর বাড়ি পা বাড়াবে না। পাতও পাড়বে না। ঝোড়ো বড়ো মাতব্বর ওর দাদা চরণদাসকে অপমান কোরেচে। আবার সাধাসাধি, তেল দেওয়া-দেয়ির পালা আরম্ভ। তারণ ঠাণ্ডা মাতব্বর। রাইপটনের জামাই। কাজটা তাকেই কোরতে হবে। এমনি কোরে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের মাঝ দিয়ে গোলমালের ছেদ পড়ে। রফা হয়, মাতব্বরদের পাঁচ টাকা কোরে জরিমানা দেবে ঝোড়ো। "মান তোড়া" কথা বলার বাবদ। আর সভার মান ষোলো আনা। এবং সভার মাঝখানে মাতব্বরদের পায় তেল-হলুদ মাখিয়ে দেবে। প্রত্যেকের পাতে দেবে এক একটা রুই মাছের মুড়ো। আর রূপোমাসী আজকের মতন বিয়ে বাড়ি ঘোরা-ফেরা কোরতে পারবে না। পারবে না পরিবেশন কোরতে। রূপোমাসীকে যদি সমাজে উঠতে হয়, নোতুন কোরে ভোজ দিতে হবে। সে ভোজে রূপোর নির্ভেজাল অধিকার থাকবে পাকস্পর্শের এবং পরিবেশনের। তথাস্তু।

এরপরই জটলা মাৎ। মাতব্বররা বিয়ের উঠোনে গিয়ে বসে স্বতন্ত্র আসনে। কাঁথা বিছানো পাটির ওপোর। অমাতব্বররাও পিল্‌পিল কোরে গিয়ে জমকে বসে বিয়ে বাড়ি। বরকে তুলে নিয়ে পিঁড়ির পরে বসানো হয়। আর একখানা পিঁড়িতে দেড় হাত ঘোমটা টানা বৌকে তুলে ধরাধরি কোরে শশীর পাশে এনে বসিয়ে দেয়। সাহেবী পোষাক পরা ইংরেজী বাজনদাররা এগিয়ে আসে আসরের পাশে। সানাই বেজে ওঠে। বাজে জয়ঢাক, ব্যাকপাইপ। সতীশ ঢুলির ঢোলোকে কাঠি পড়ে—ডুডুম—ডুম—ডুম—ডুম। তারপর সাতপাক।

তারণের জেদ ছিল মহুঠাকুরের গাঁয়ের মানুষ সে। তাই তার ছেলের "মুচনে" বিয়ে হোতে দেবে না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত "মুচনে" বিয়েই কোরতে হয় শশীকে। বর-বৌ যখোন বাসর ঘরে ঢোকে তখোন পুবে ফরসা দিয়েছে। মাদারীর কপালের সিঁদুর কৌটার মতনই উষার কপালে জ্বল জ্বল করচে প্রভাত তারার টিপ। রাইপটনের বাওড় চরে শেয়াল ডাকে—হুক কা হুয়া হুক কাক কা হু। রাতের শেষ যামার্ধের বিজ্ঞপ্তি। সে সাথে দীর্ঘ পিঙ্গিল জটওয়ালা বটগাছের চুড়োয় ঝুড়ির মতন গোল বাসার মধ্যে জাগে জটায়ুর বংশধর মাছাল পাখিটা। তীব্রস্বরে ঘোষণা করে সকালের আগমনী বার্তা।

পরদিন। বাসী বিয়ের পর বর-কন্যে রওনা হবে। তাই সকাল সকাল উৎসব শুরু হয়। বাসী বিয়েটা দেশাচার ছাড়া আর কিছুই না। তাই কী উচু কী নীচু সব সম্'জেই এর প্রচলন নেই সব দেশে।

প্রথমে কড়ি দিয়ে জামাই কেনাকেনি। তারপর দড়ি দিয়ে মাপজোক। বাঁধা-বাঁধি। একে বলা হয় স্ত্রী-আচার। কোনোও কোনো দেশে বিয়ের রাতেও এ আচার অনুষ্ঠিত হয়। শাশুড়ী অথবা শাশুড়ীস্থানীয়া কেউ জামাই-এর ধারে এসে একটা শোলোক ছড়া পড়ে। শোলোকটা হোচ্ছে :

কড়ি দিয়ে কিনলাম,
দড়ি দিয়ে বাঁধলাম,
হাতে দিলাম ভেঁপু,
একবার ভ্যা করো তো বাপু।

জামাই যদি পট কোরে ভ্যা কোরে বসে তাহলে সে ছাগোল বনে যাবে। মানে প্রতিপন্ন হবে সে একটা বোকা জামাই। সাধারণ বুদ্ধির অভাব তার। অথচ ভ্যা না কোরেও উপায় নেই। কেননা এই ভ্যা করাটাই হোচ্চে মহিলা মহলে জামাই-এর বাক্‌দ্বার উদ্‌ঘাটন। এই ছাড়পত্রই প্রমাণ দেবে জামাই চালাক, না হাবা-বোবা। কিন্তু চতুর শিকারী শশীকে সহজে ভ্যা করানো যায় না। যদিও শেষ পর্যন্ত তাকে ছোট্টো একটা 'ব্যা' কোরতে হয়। আর সাথে সাথে ঠাট্টার পাত্তরদের মধ্যে হাসি-মস্‌করার ফোয়ারা ছুটে যায়। এরপর কড়ি খেলা। উঠোনের কোণে হাতখানেক চওড়া একটা কুয়ো কাটা হয়। তারপর এয়োরা ঐ কূয়ো ভর্তি জল আনে। বর-বধূকে কুয়োর ধারে নিয়ে গিয়ে বসানো হয়। মাদারীর হাতে দেয়া হয় পাঁচটা কড়ি। সে ঐ কড়ি কুয়োর মধ্যে সেরে ফেলবে

তার একান্ততম চতুর গোপনীয়তায়, আর শশী তা খুঁজে বের কোরে দেবে। কিন্তু শশীর যে শিকারী প্রতিভা ঘনপাতার অন্তরাল থেকে অব্যর্থ সন্ধান দিয়ে হোরেল ঘুঘু পেড়ে আনে এখোন তারই ঘটে শোচনীয় পরাজয়। এক মাত্তর ছল-চাতুরীর আশ্রয়ই এ পরাজয়ের হাত্ত থেকে ওকে বাঁচায়। পতাসী খুব ঘাঘু শয়তান মেয়ে। ইষ্টম আসার সময় সে ওর পকেটে কয়েকটা কড়ি দিয়ে ছায়। কেননা ওর বন্ধু শশী যদি কড়ি খেলায় হেরে যায় তবে সে হার সুরপুর ঘরভাঙার মেয়ে মহলেরই। ইষ্টম ওর পাশেই দাঁড়িয়েছিলো। সে শশীর গা টিপে গোপনে গোপনে ওর হাতে কড়ি চালান দিয়ে ছায়। ছলে-বলে তারই জিত হয়। এবার শশীর পালা। ও কড়ি সারবে। আর মাদারী দেবে তা বের কোরে। শশী আর আয়াসের সাথে হাত মিলোতে চায় না। সে একদম একটা কড়ি গাফ কোরে ফ্যালে। আর অবশিষ্ট চারটে সেরে রাখে কাদায়। ফলে মাদারীর হার হয়। এরপর জামাই মেয়ে বরণ পর্ব। উঠোনের মাঝখানে আলপনা আঁকানো পিঁড়িতে শশী বর এসে দাঁড়ায়। আর তার বাঁ-পাশে দুধ আলতা গোলা থালার ওপোর মাদারী-বৌ। প্রথমে ধান দুর্বো দিয়ে আশীর্বাদ করে শাশুড়ী তারপর বর্ষীয়সী মহিলা মহল। এবার সত্যিকারের বরণ শুরু। এখোন রূপোমাসীর ভূমিকা অপরিহার্য। বরণের মৌলিক কলা কুশলতায় এ-পাড়ার রূপোমাসী একমেবা দ্বিতীয়ম্। চওড়া কালো পেড়ে ধুতীপরণ। এক পিঠ ফুলন্ত চুল ছেড়ে দেয়া। কষে কোমোরে জড়ানো আঁচল। রূপোমাসী প্রথমে দেখায় প্রদীপ বরণ। সতীশ ঢুলি আজ ঢোলোক রেখে সানাই ধরেচে। নোতুন সানাইয়া করুণ সুরে বরণের গান ধরে :

এতোদিন ছিলেরে ধান্য মাঠের মাঝেতে
আজ এসেচো ধান্য তুমি রাম-সাতের বিয়েতে।

থরো থরো কাঁপচে বেতসীলতার মতন রূপোমাসীর ছন্দায়িত দেহলতা। কাঁপছে কাঁপা হাতের প্রদীপ। লীলায়িত সর্পিল শিখায় আশীর্বাদের প্রতীক হোয়ে স্পর্শ কোরচে বর-বধূর কপাল। চিরায়তির শুভ কামনায় সিঁদুর কৌটোর ছান্দসিক লঘু পরশ ঠেকছে গিয়ে সরু সিঁথির রেখায়। ঘেমে-নেয়ে উঠেচে রূপোমাসী। পিঠের কাপড় ভিজে সোঁত বইচে লাবণ্য-লাভার। কপাল ঘেমে দর দর করচে কাঁচা পারা। নোতুন সানাইয়া সুরের অর্ঘ্যে একে একে স্বাগত জানাচ্ছে ধান, দুর্বো, হলুদ, মালাকে। ছবির মতন নিশ্চুপ, নিশ্চল দর্শকরা। নোতুন সানাইয়া আবার নোতুন সুরে তান ধরে :

যশোদার কোলে কাঁচা ছেলে,
যশোদা বরণ বরে হেলে দুলে,
ও যশোদা, বরণ বরো তো ভালো দেখি।
যশোদার হাতে সিঁদুরের কৌটা,
যশোদা বরণ বরো গোটা গোটা।
ও যশোদা, বরণ বরো তো ভালো দেখি।
যশোদা বরণ বরে দোলায়ে চুল,
যশোদায় সাজায়ে দেবো তুলে চাঁপার ফুল,
ও যশোদা, বরণ বরো তো ভালো দেখি।
যশোদার কপালে চন্দনের কৌটা,
যশোদা বরণ বরে গোটা গোটা,
ও যশোদা, বরণ বরো তো ভালো দেখি।
যশোদা বরণ বরে হেলে দুলে,
আঁচল খুলে পড়ে লুটায় ধুলে
ও যশোদা, বরণ বরো তো ভালো দেখি।

সবশেষে কলাবরণ আর চাপড়বরণ। অপূর্ব কলা কৌশলে হাতের বুড়ো আঙুল দুটোকে ছন্দায়িত কোরে শশী শিকারীর মুখে কদলি ঠেকিয়ে দেয়া হয়। তারপরই বিব্রত কোরে ফেলা হয় চাপড়বরণে। চতুর হোরেল ঘুঘু মারা শশী শিকারী আদৌ বুঝতে পারে না, উর্বশীর মতন লীলাচঞ্চল হাত দু-খানার পট কোরে মন-মতি বিগড়ে যাবে। আর ঠাস্ ঠাস্ কোরে দু'গালে মারবে চাপড়। অব্যর্থ শিকার প্রতিভাশালী যে শশী শিকারী, স্থান-কাল-পাত্রের প্রভাবে এমনই প্রভাবিত হয় যে দু গাল চাপড়ের প্রতিশোধ নিতে হয় তাকে এক ঝলক মুচকি হাসি দিয়ে।

বাসী বিয়ের ভোজ খাওয়ার পর যাত্রার উদ্‌যোগ। উঁচু-নিচু সকল শ্রেণীর চিরাচরিত লৌকিক প্রথানুসারে মেয়ে আঁচলে তিন মুঠো চাল আর পাঁচটা কড়ি দিয়ে বলে, মা, এতোদিন তোমার যা খেয়েছি পরেছি সে ঋণ শোধ দিয়ে আমি শ্বশুর বাড়ি চোললাম। মা ডুকরে কেঁদে ওঠে। রূপোমালী শশীর দিদি-শাশুড়ী সুবাদ। সে শশীকে বোঝায়, বৌকে ভালোবাসিস ভাই। ঘাট পেলে মাপ কোরে নিস। গঞ্জনা দিসনে।

কন্যার পিতৃগৃহ যাত্রার লগ্ন চিরকাল বিষাদ-বিধুর। এ বিষাদ-বিদায় ব্যথা

ঋষি হৃদয়ও স্পর্শ কোরেচে। মাদারী কাঁদতে কাঁদতে গাড়ীতে উঠে বসে। টোপর-পরা শশীও বসে গিয়ে তার পাশে! সানাই বাজে করুণ সুরে। উলু পড়ে। অঝোরে কাঁদতে থাকে চাঁপা! ঝে'ড়োর চোখে জল নামে। নারী মহল আঁচলে ঘন-ঘন চোখ মুছতে থাকে। ব্যথাতুর চাকার শব্দে আঁকা-বাঁকা মেঠো পথ মুখরিত কোরে গোরুর গাড়ী পথের বাঁকে মিলিয়ে যায়।

মাদারীর দাদা বুদো চলেচে ওর সাথে। অনেকখানি পথ এগিয়ে এসেছে ওরা। তখোনো মাদারী-ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদচে। শশী গিয়ে বসেচে ছোইয়ের বাইরে গাড়োয়ানের ধারে। আর বুদো এসে বোসেচে মাদারীর ধারে। সে ওকে বোঝাচ্চে আবার শিগ্‌গীর শিগ্‌গীর বাড়ি ফিরবে ওরা। শ্বশুর বাড়ি যাচ্চিস। কতো কী দেখবি সেখানে। কতো আমোদ-আহ্লাদে থাকবি।

মাঠের পর মাঠ। বিলের পর বিল! গ্রামের পর গ্রাম। সামনে আর একদল বরযাত্রীর সাথে দেখা। বরযাত্রীরা চলেছে হেঁটে। আর বর-বৌ একই পাল্কীতে। বেহারা দুলকি তালে চলেচে আর হাঁকচে—

ও-হো-ও,-ও-হো-ও, হো-ও,
পরের মেয়ে সাবধান!
ওহো দুলী-বৌ পরের মেয়ে সাবধান।
চিলের ছাদে জোড়ে জোড়ে
ঘুর্ণি কবুতর—ওড়ে
আড়ের পরে দোলে শাড়ী,
ঐ দেখা যায় পাঠান বাড়ি।
ঐ দেখা যায় নলের বেড়া—
ঢোল কলমীলতায় ঘেরা
পরের মেয়ে সাবধান।
ওহো-ও, ওহো-ও…।

মাদারীর বালিকা-মন বেহারাদের হাঁকা-হাঁকিতে ডুবে যায়। ভুলে ফেলে কান্না। সে লম্বা ঘোমটার ফাঁক থেকে ডাগর চোখ চায় ওর দাদার পানে। শুধোয়:

—ও কারা যায় দাদা?

বুদো বলে:

—ঐসব বরযাত্রীরা। আর পাল্কীতে যাচ্চে বর-বৌ।

শুনে মাদারীর ভারী সাধ হয়। ও-ও যদি অমনধারা পাল্কীতে চড়ে শ্বশুর বাড়ি যেতে পারতো। ভারী মজা হোতো তাহলে! ওর বর ক্যানো পাল্কীতে উঠে এলো না ওকে বিয়ে কোরতে? কিন্তু ওর মনের এ জিগেসার উত্তর আজ আর দাদার কাছে চেয়ে নিতে পারলে না। অনেক পরে চেয়েছিলো শশীর কাছে, ওগো, তুমি পাল্কী চড়ে বিয়ে কোরতে যাওনি ক্যানো? শশী বলেছিলো ক্যানো? কী হোয়েচে তাতে? মাদারী উত্তর দিয়েছিলো, তা হলে আমরা দু'জন এক পাল্কীতে চড়ে আসতে পারতাম। বেহারারা হাঁকতে হাঁকতে পাল্কী বোয়ে আনতো। খুব মজা হোতো তাহলে। শশী জবাব দিয়েছিলো, পাল্কীতে তো ভদ্দর লোকেরা ওঠে। আমরা যে মুচি। বেহারারা আমাদের পাল্কী ব'বে ক্যানো? শুনে মাদারী ফোঁস কোরে নিশ্বেস ফেলেছিলো, মনে মনে বলেছিলো, এবার মরে যেনো ভদ্দর লোকের ঘরে যেতে পারি। তা হলে পাল্কীতে চড়ে জাঁকজমক কোরে শ্বশুর বাড়িতে আসতে পারবো।

বৌ দেখে খুব খুশী হয় মন্থরা। পাড়ার লোকরাও। যেমন একমাথা চুল। ছোট্ট কপালখানা। কলম আঁকানো ভুরু। টানা-টানা চোখ। রঙ একটু চাপা বটে কিন্তু গোলগাল গড়ন। লাবণ্য ফুটে বেরুচ্চে। তবু সীতে-পুঁটের মা-রা সমালোচনা কোরতে ছাড়ে না।

সীতে বলে:

—দেখলি পুঁটের মা? ছেরু দেখলি বৌ-এর? ঐ নিয়ে আবার মন্থরা মাগী 'ছেতন' কোরচে।

পুঁটের মাও সীতের ঝোলে ঝোল মিশোয়:

—যা বলেচিস ভাই। ছেতেন বলে ছেতেন। ওর চেয়ে আমি তোর সুখোরে ভালো দেখতাম। আর সুখোর চেয়ে ওর কী বয়েস কম? ও-ও তো দশাসই মাগী।

—আরে একটু র'। কলাগাছের জল গায় পড়েছে বই তো নয় কেবল। ধাপিয়ে উঠলো বলে। তখোন এক জায়গায় দাঁড়ালে শাশুড়ী-বৌ চেনা দায় হবে।

সীতে সায় দেয়:

—যা বলেচিস ভাই। আরো একটা জিনিস দেখেছিস? আমার সুখোর কাঁকাল একদম সরু। মুঠোর মধ্যে ধরা যায়। আবার পাছা-চ্যাটা। আর

এ যেন গাবের ঢেঁকী। মাজা পিট এক ঢাল।

সীতের আরো কিছু বলবার অভিপ্রায় ছিলো। কিন্তু পুঁটের মার মুখ সুড়-সুড়িয়ে ওঠে :

—ওরে সীতে, আর একটা অলক্ষণ আছে। তুই তা নজর দিস্ নি।

—কী রে ?

—ওর সামনের দাঁত দুটো উঁচো। চুল আছে মাথায়। কিন্তু সুখোর মতন না। সীতে বলে ওঠে :

—সুখোর চুল ? ছেড়ে দিলে পাছার নীচেয় এসে নামে। আর কালো কী! ভোমরার মতন। শশের বৌ-এর চুলের আগা কটা-কটা, ধোঁয়াসে। এমনি কোরে শেষ পর্যন্ত সমালোচনার ছুরি চালিয়ে মাদারীকে চিরে চিরে একদম ক্ষত-বিক্ষত কোরে ছাড়ে সীতে-পুঁটের মা-রা।

বিয়ের আগে তারণ মন্টুঠাকুরকে নিমন্ত্রণ কোরে এসেছিলো। বৌ বাড়ি এলে এবার বৌ দেখার নিমন্ত্রণ কোরে এলো।

মন্টুঠাকুর বৌ দেখে বাড়ি ফিরলে ভবানী পিসিমা শুধোন, ও মোনো কেমন দেখলি বৌ ?

—খাসা বৌ, পিসিমা।

উল্লসিত হোয়ে ওঠে পিসিমার মন। বলেন :

—তাই নাকি রে !

—হ্যাঁ পিসিমা। যেমনি নাক-মুখ চোখের গড়ন। তেমনই উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ।

পিসিমা ইতস্তত: কোরে বলেন :

—একটা কথা বোলবো মোনো ?

—কী পিসিমা ?

—আমার ভারী ইচ্ছে হয়, শশের বৌ দেখে আসি। তোর কী মত ?

—আমার আবার কী মত ? যদি তুমি সত্যিই যেতে চাও, যাও। গেলে আমি খুশীই হবো পিসিমা।

শুনে খুব খুশী হন ভবানী পিসি। মন্তব্য করেন :

—তা হলে আমি আর বৌমা কাল যাবো। কিন্তু তুই তো মুখ দেখে এলি টাকা দিয়ে না ?

—হ্যাঁ।

—ক' টাকা দিয়ে মুখ দেখলি ?

— পাঁচ টাকা।

—আমরা কী কোরবো ?

—বলো, তুমি কী কোরতে চাও।

মনে কোর্ছি, ওরা তো সোনার গয়না পরতে পায় না। তুই একটা সোনার নথ এনে দিস। তাই দিয়ে মুখ দেখে আসবো আমরা।।

পরদিন নন্দ স্যাঁকরার দোকান থেকে একটা নথ কিনে এনে দেন মন্তুঠাকুর। প্রজাপতিওয়ালা টানা দেওয়া সোনার নথ। লাল-নীল পাথর বসানো। শৈলজাকে নিয়ে পিসিমা যান বৌ দেখতে। তারণ-মন্থরা তো অবাক! হন্তদন্ত হোয়ে ছুটোছুটি করে। কোথায় বসাবে ? কী পেতে বসতে দেবে। মন্থরা দুখানা পিঁড়ি এনে আঁচলে মুছে উঠোনে বসতে দেয়। গড় হোয়ে পায়ের গোড়ায় মাথা ঠেকায় স্বামী-স্ত্রী।

ভবানী পিসি বলেন :

—কৈ ? নোতুন বৌ কই ও তারণ ? বৌ দেখতে এলাম আমরা।

মাদারী ঘরের মধ্যে বসেছিলো। মন্থরা তার হাত ধোরে নিয়ে আসে। ভবানী পিসি-শৈলজার পায়ের গোড়ায় মাথা ঠেকায় নোতুন বৌ।

জন্ম এয়ো হও। পাকা চুলে সিঁদুর পরো। পিসিমা আশীর্বাদ করেন। তারপর ঘোমটা তুলে মুখ দেখেন। সুন্দর মুখ। ঘন চুলের ফাঁকে সরু সিঁথি জ্বলজ্বল কোরচে। সিঁদুর রেখায়। ছোট্ট কপালখানার মাঝখানে সুগোল সিঁদুর ফোঁটা। তার নিচেয় আবার কাঁচ পোকার টিপ। ঘাম বিন্দু জমা নাকের আগায় ঝরে পড়েছে সিঁদুর গুঁড়ো। লাবণ্যের প্লাবনে ডগমগ কোরচে মুখাবয়ব। বৌ দেখে মোহিত হন ভবানী ঠাকরুণ। মনে মনে বলেন, এ মেয়েকে ভদ্রঘরের অতি রূপসী মেয়ের পাশে স্বচ্ছন্দে দাঁড় করানো যায়। তারপর মন্থরার পানে তাকিয়ে মন্তব্য রাখেন :

—খাসা বৌ হোয়েচে তোমার। ও বৌমা, চোখ চাও তো।

মাদারী এতো বেলা চোখ বুজিয়েই ছিলো। ভবানী পিসির কথায় এবার ডাগর চোখ জোড়া নীলপদ্মর মতন ফুটে ওঠে।

পিসিমা আঁচলের মুড়ো খুলে নীল পাতিল কাগজে মোড়ক করা নথটা বের করেন। এবং মাদারীর নাকের রুপোর নাকচাবিটা খুলে সেটা পরিয়ে দেন। কাঁটাওয়ালা প্রজাপতিটা আটকে দেন চুলের সাথে। বাঃ। বেশ মানিয়েচে।

সাথে সাথে শৈলজা একটা কৌটা দেয় পিসিমার হাতে। নিজের হাতে গড়া ক্ষীরছাঁচ চন্দ্রপুলী। পিসিমা ঢাকনি খুলে একটা চন্দ্রপুলী হাতে নেন। বলেন:

একটু হাঁ করো তো বৌমা। মাদারী হাঁ কোরতে চায় না।

হাঁ করো। খেতে হয়। নোতুন বৌ তুমি। তোমাকে দেখতে এলাম। মিষ্টি মুখ করিয়ে যেতে হয়।

পিসিমার চাপে মিষ্টি মুখ কোরতে হয় মাদারীকে। মন্থরা জল এনে দেয়। জলও খাইয়ে দেন ভবানী পিসি। আর জল ভারে নুয়ে পড়ে শৈলজার চোখ। তার মনে পড়ে যায় পিসিমার সাথে গোয়াল ঘরে নিরোর ছোঁয়া লাগার দিনটার কথা। এ কি সেই পিসিমা! অজস্র শ্রদ্ধায় অমিত ভক্তিধারায় তাঁর পায়ের গোড়ায় নুয়ে পড়ে শৈলজার মন।

রক্ষাকালী তলায় জোড়া নিস্‌কালো পাঠা মানসা শোধ দিয়ে শশীর বিয়ে দেয়া হবে এই ছিলো কথা। কিন্তু সুখোর ব্যাপার নিয়ে শশী যখোন মতিচ্ছন্নতার চরম সীমানায় পা বাড়ায় তখোন মন্থরা আবার কালীতলায় মানসা করে। ভালোয় ভালোয় শশীর শুভ কাজ হোয়ে যাক। ওর মন-মতি ফিরে আসুক। তিন গাঁ মেগে মন্থরা কালীতলায় পুজো দেবে। বিয়ের আগে তারণ মনুঠাকুরের কাছে যায় পুজোর দিন দেখতে। মনুঠাকুর ব্যাপারটা শুনে বলেছিলেন, দু' দু' বার পুজোয় মেলা খরচ। তার চেয়ে শশী বিয়ে কোরে আসুক। তখোন একসাথে দুটো মানসা শোধ দিলেই চলবে। তারণ বলেছিলো, কিন্তু মানসা শোধ দিয়ে যে বিয়ে দেয়ার কথা ছিলো বটুঠাকুর? তার কী? বটুঠাকুর তখোন উপায় বাৎলে দেন, শশীর কপালে সোয়া ষোল আনা ছোঁয়ায়ে তুলে রাখা হোক। তারপর নোতুন বৌ ঘরে এলে ঘটা কোরে পুজো দিলেই হবে। তাতে যদি কিছু দোষ-ঘাট হয় মনুঠাকুর ঘাড়ে নেবেন।

যা-হোক ঘটা কোরেই রক্ষাকালী পুজো হয়। মন্থরা নোতুন বৌ সাথে কোরে তিন গাঁ মেগে আনে। দুটো মানসাই শোধ দেয়া হয়? ভবানী পিসিমার অনুমোদন ক্রমে পৌরোহিত্য করেন মনুঠাকুর। দখ্যিনেটা পাওনা হয় বরদাঠাকুরের।

ভবানী পিসিমা শৈলজাকে নিয়ে মুচি বাড়ি বৌ দেখে আসার পর মাতব্বর মহলে সব রব পড়ে যায়। অনেকে এমনও মন্তব্য করেন, মনুঠাকুর ওর বৌ, পিসিকে গুন কোরেচে ঠিক। তাই মুচি:ত ওদের আর আঁঠা নেই। তারাপদ

ভট্টাচায্যির মা নাক কুঁচকে মুখ বাঁকিয়ে মন্তব্য রাখেন, ঘোর কলি। নৈলে মোনোর পিসিমার এ পিরবিত্তি হবে কেনো? অন্তরজলিতে পা বাড়িয়েছে যে! তারুণে মুচির বাড়ি যাওয়া! তার ব্যাটার বৌ ছ্যাখা! তার গালে মিষ্টি মেঠাই তুলে দেয়া। ছিঃ! ছিঃ! মুখে আনতেও ঘেন্নায় বমি ওঠে।

শ্রোতা বাছাড় মশায়ের শালী বিনোদিনী। তিনি টিপ্পনী কাটেন :

—রাগ কোরো না দিদি। আমি আবার উচিৎ কথা কই বোলে মানুষ ভালো হইনে। তোমাদের বামুন জাতির কপালে আগুন লেগেছে। আগে লেগেছে ব্যাটাদের। এখোন দেখচি মাগীদেরও। তা ছুঁড়িটুড়ি হয় তবু গায় সয়; কিন্তু বুড়িদের এ হোলো কী! বামুনদের হাতের জল কেউ খাবে আর? না পুজো-আচ্ছায় বামুন পুরুত ডাকবে?

এমনই সব চাপা রবের ডালপালা গজাতে থাকে দিনকে দিন। কিন্তু মন্টুঠাকুর মুচি বাড়ি কালী পুজোয় পুরুতগিরি কোরে আসার পর ঐ ডালপালায় ফুল-ফল ধোরে ভীষণ প্রতিক্রিয়াশীল হোয়ে ওঠে। এরই মধ্যে তারাপদ ভট্টাচায্যির ছোটো মেয়ের বিয়ে হোয়ে যায়। এবং এ বিয়েতে মন্টুঠাকুরের নিমন্ত্রণ বাদ পড়ে। একঘোরে মন্টুঠাকুর মুচকে হাসেন।

শশীর বিয়ের পর এক বছর চলে যায়। এ এক বছর মাদারী বাপের বাড়িতেই আছে। শাস্ত্রীয় মতে নব বধূকে এক বছর পরে শ্বশুর বাড়ি আ'নতে হয়। একেই বলা হয় দ্বিরাগমন। শশী অবিশ্যি এর মধ্যে তিন চার কিতে শ্বশুর বাড়ি গেছে। মাদারীর লজ্জায় আঁটসাট বাঁধন ঢিলেও হয়ে এসেচে অনেকখানি। ঘোমটার বহরও এসেচে খাটো হোয়ে। এখোন সে শশীর সাথে আড়ে-আড়ালে ফিস্‌ফাস্ কোরে কথা কয়। কিন্তু এক ঘরে রাতে থাকতে পায় না। এ ধরণের মেলামেশার ওপোর হুঁশিয়ারী শাসনের তদারকি চলচে। এবং চলবেও ততদিন যতোদিন না বালিকা-বধূ ঋতুমতী হয়। তাই মাদারীর মনের খবর বলা কঠিন। কিন্তু শশীর যৌন-লালসা অনাস্বাদিত নয়। তার বুকের মধ্যে তাই তুষের আগুন ধিকি ধিকি জ্বলচে। এ সময় সুখো যদি সামনে থাকতো তা হলে শশীর ধৈর্যর বাঁধ সীসে দিয়ে গড়া হোলেও গলে পড়তো।

'ভাসনা' কেটে বাপ-বেটায় বাড়ি ফেরার পর একদিন তারণ ঠাকুর বাড়ি যায়। মন্টুঠাকুরকে বলে :

—বট্‌ঠাকুর একটা দিন দেখে দেও। বৌ আনতি হবে।

মনুঠাকুর বলেন, তা ঠিক তারণ। বাপের বাড়ি আর ফেলে রাখা ঠিক না। সেয়ানা মেয়ে। বলতে বলতে তিনি ঘরের ভেতর ঢোকেন। এবং মোটা পি, এম. বাগচির পাঁজী বের কোরে এনে পাতা ওল্টাতে থাকেন। শুভদিনের নির্ঘণ্ট খুঁজে দ্বিরাগমনের দিন বের করেন। তারপর দিন-পঞ্জিকার সাথে মিলিয়ে বলেন :

—আসচে দোশ-রা মাঘ ভালো দিন আছে তারণ। ঐদিন তোমার বৌকে নিয়ে এসো গে।

—বেশ। আপনি যা বলো বটঠাকুর। তা হলে···।

—কী? বলো।

—আপনার গাডীখানা···।

—বেশ তো নিয়ে যাবে গাডী। তার আর কী? আমার গাড়ী থাকতে নোতুন বৌ হেঁটে আসবে ক্যানো?

দোশরা মাঘ এসে যায়। আজই যেতে হবে তারণকে রাইপটন। ক্যানোনা একদিন আগে না গেলে বাপের বাড়ি থেকে গুছিয়ে-গাছিয়ে মেয়েছেলে নিয়ে বের হোতে পারবে না। আরো তাতে নোতুন বৌ। আগের থেকে ঝোডোকে সংবাদ পাঠিয়েছে তারণ। চিঠি-পত্তরের মারফতে নয়। এ সমাজে সে সুযোগ-সুবিধে অচল। ওদের পাড়া থেকে হাটুরেরা আসে কেশবপুরের হাটে চামড়া বেচতে। তাদের মাধ্যমেই সংবাদ সরবরাহ করা। দুপুরে খাওয়া সেরে গাড়ী নিয়ে তারণ পুত্রবধূ আনতে রওনা হোয়ে যায়।

বাইরের দিক থেকে বৌ আনার ব্যাপারে যদিও শশী একদম নির্লিপ্ত কিন্তু তলে তলে সব খবর রাখে সে। তারণ বৌ আনতে গেলো। কাল সন্ধ্যের আগেই গাড়ী এসে পৌঁছবে। এ চিন্তাটা খুবই ভালো লাগতে থাকলো শশীর। রাতে খাওয়ার পর টোঙের ওপোর এসে শুয়ে পড়ে। ওর মনের ওপোর দিয়ে ভেসে চলে চিন্তার ছায়া-ছবিরা। ছ সাত মাস আগে মাদারীকে দেখে এসেচে শশী। কাল যখোন গাডী থেকে উঠোনে এসে নামবে তখোন অনেক উন্নতি দেখবে ওর। নিশ্চয় সে অনেক মোটাসোটা হোয়েচে। গায়ের রঙ অনেক খুলে গেছে। ঢিলে হোয়ে এসেচে লজ্জার গেরো। আরো খাটো হোয়ে এসেচে ঘোমটার বহর। অনেক রাত জাগলো শশী। অনেকবার প্রবঞ্চিত, উচ্চকিত হোলো অনেক রকম শব্দের দ্বারা। গোরুর গাডীর চাকার ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ। ডাল-পাতা খসার শব্দ। রাতচরা জীব-জানোয়ারদের চলাচলের শব্দ। এমনই

শব্দ জোট আর একরাতে বঞ্চিত-লাঞ্ছিত কোরেছিলো ওকে সুখোর ফিরে আসার অলীক প্রত্যাশায়। তবু আজকের থেকে সে দিনকের পাওয়াটা ছিলো অনেক বেশী সম্ভাবিত। কিন্তু মন তো বোঝে না। অভাবিত ঘটনার প্রভাবে তারণ তো এ রাতেও তার পুত্রবধূকে নিয়ে ফিরতে পারে।

সোনামুখীর বিল পারান্তরের গেরাম থেকে ভেসে আসে মোরগের কর্কশ কণ্ঠস্বর,—রাতের সমাপ্তি ঘোষণা। ধড়মড় কোরে জেগে পড়ে শশী। বৌ আসবে আজ এ চিন্তাটা সকালের মতনই মিষ্টি-মধুর ঠেকে ওর কাছে। শীতের অদীর্ঘ দিন দেখতে দেখতে চলে যাবে। বেলা গড়িয়ে পড়বে পশ্চিম আকাশে। কাঁচা রাস্তায় গোরুর পায়ে ধুলো উড়িয়ে গ্রাম-মাঠ মুখোর কোরে গাড়ী এসে থামবে উঠোনের মাঝখানে। কিন্তু এতো গেলো স্রেফ কল্পিত চিন্তাধারা। বাস্তবের বেলায় ব্যাপার ঘোটলো এর সম্পূর্ণ উল্টো। লম্বা মিনিটের কাঁটাটা খাটো ঘণ্টার কাঁটার চেয়ে আজ হোয়ে পড়লো আরো খাটো। আরো দীর্ঘসূত্রী। সারাটা দিনমান কেটে যায় কেশবপুরের রাস্তার পানে তাকাতে তাকাতে। চাঁচ দিয়ে বানানো ছই তোলা মনুঠাকুরের গোরুর গাড়ী। সাদা-কালো বলদজোড়া। খলিল নগরের পশ্চিম দিগন্তরেখায় বেলা ডুবে যায়। ধূসর সাঁঝের ছায়ায় পথ বোয়ে আসে আপছা-আঁধারী। খোঁড়াতে খোঁড়াতে আসা গোরুর গাড়ীগুলোকে গোরুর গাড়ী বলেই চেনা যায় মাত্তর। কিন্তু সে গাড়ীর মালিক মনুঠাকুর আর গাড়োয়ান তারণ এটাই সনাক্ত করা সম্ভব হয় না। তাই শশীকে বারংবার হোতে হয় প্রবঞ্চিত। ক্রমশঃ ধূসর ছায়া গাঢ়ো হয়ে ওঠে। আর ঐ গাঢ়ো রংয়ে সামিল হোয়ে যায় মাঠতল, পথরেখা। নৈরাশ্য ঘনিয়ে আসে শশীর বুক ভরে। অশুভ ভাবনার দাপ-দাপটে। রাইপটন থেকে গোরুর গাড়ীতে আসতে এতোখ্যন ক্যানো লাগবে? খেয়ে-দেয়ে, হেউ হেউ কোরে বেরোলেও এতো বেলা স্বচ্ছন্দে পৌঁছনো যায়। তবে মাদারীর অসুখ কোরলো না তো। না জোড়া দর মুখে গোরুর গাড়ীটা উল্টে গেল! বেজায় হুড়ুম-গেড়ে রাস্তা। মনুঠাকুরের বাছুর গোরু। বেজায় পাগলা। বুড়ো বাবা হয়তো রুখতে পারেনি। কিন্তু অতো উঁচু থেকে যদি গাড়ী এসে পড়ে কুচ মোড়ার বিলের মধ্যে তা হলে গাড়ী তো চুরমার হবেই। মানুষ-গোরু কেউ-ই বাঁচবে না। ঠিক এমনই কিছু একটা ঘোটেছে। গাড়ী উল্টে পড়ে চাকা দুটো আকাশমুখো উঠে গেছে। গোরুর পা ভেঙেচে। বুড়ো বাবা খাদের মধ্যে পড়ে কুকাচ্চে। মাদারীর মাথা কেটে গেচে। চিত্রায়িত হোয়ে উঠেচে এ ঘটনাটা শশীর মনের পর্দায়। সহসা তার

চিন্তার সুতোয় টান পড়ে। অতি কাছেই শোনা যায় গোরুর গাড়ীর চাকার আওয়াজ। ওদের উঠোনের দিকে এগিয়ে আসছে। শশী টোঙের ওপোর উঠে গিয়ে গা-ঢাকা দেয়। সত্যিই গাড়ী উঠোনে এসে থামে। মন্থরা জোর পায় ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। পুত্রবধূর হাত ধোরে নামায়। শশী টোঙের ওপোর বসে উঁকি মেরে তাকায়। স্বাথে ওর অনুমান বাস্তবের হাতে হাত মিলিয়েছে। ধোঁড়াসাপ-পেড়ে শাড়ীপরা মাদারী বেশ মোটা-সোটা হোয়ে গেছে এর মধ্যে। অনেক খাটো ঘোমটার ফাঁক থেকে মুখখানা স্পষ্ট দেখা যায়। দেখা যায় দিব্যি রং খুলে গেছে সে মুখের।

যতো রাত হোতে থাকে মাদারীর বুকের কথা বলা কঠিন, শশীর বুক কিন্তু দুরু দুরু কাঁপতে থাকে। সুখোর সাথে জড়ানো ওর জীবনের পূর্ব ইতিকথা মা মন্থরা তো জানেই। তাই তো তাড়াতাড়ি কোরে ওর বিয়ে দেয়া। নিশ্চয় মা ওর মনের আকুলতা বুঝবে। এবং সে পরিপ্রেক্ষিতে আজ রাতে ওর শোবার ব্যবস্থা ঠিক ও ঘরে হবে। শশী কিন্তু তবু খাওয়ার পরে টোঙের উপর গিয়ে শুয়ে পড়ে। ক্লান্ত তারণও গিয়ে শোয় বারান্দায়। মন্থরা মাদারীকে নিয়ে খেতে বসে। শাশুড়ী-বৌ-এ অনেক গল্প হয়। অধৈর্য প্রত্যেকটা মুহূর্ত কাটতে থাকে। খাওয়ার শেষে থালা-বাসন টেনে আনে বড়ো ঘরে। ঠুং-ঠাং শব্দ কানে আসে শশীর। শাশুড়ী-বৌ ঘরে ঢোকে। বিছেনা পাতা হচ্চে। এখনই নিশ্চিত ডাক আসবে ওর। ও-ঘরে শোবার ডাক। হঠাৎ ঝাঁপের দোর টেনে দেয়ার শব্দ হয়। বাঁশের হুড়কো আটকানোর শব্দও কানে আসে শশীর। মসীলিপ্ত রাতের মতন নৈরাশ্যের গাঢ়ো আস্তরণ নেমে আসে ওর মনের ওপোর। এরপর ধিকিধিকি তুষের আগুনের জ্বলনি। শব্দ গোষ্ঠির ক্রমাগত চলা কি। এ নিয়েই অনিদ্র রাত পোহায় শশীর।

এমনি কোরে দিনের পর দিন গড়িয়ে চলে। শশীর সাথে মাদারী আড়ে-আড়ালে কথা কয় এখোন খাওয়ার সময় পরিবেশনও করে। জল দেয় পান দেয়। কিন্তু সান্নিধ্য এর বেশী আর এগোতে পারে না। শশীর যৌনলিপ্সা কিন্তু দিনকে দিন মাতাল। সামনে সমুদ্দুর। টইটম্বুর জল। পিপাসাও ওর আকণ্ঠ। কিন্তু কী বিড়ম্বনা ঠোঁটে ছোঁয়ানোর উপায় নেই। মাঝে মাঝে ধৈর্য হারিয়ে ফেলে শশী। পিছলে যায় পা। তখোন অবৈধভাবে চরিতার্থ করে পিপাসা। সাময়িক চরিতার্থ। জলের অভাবে তরমুজ খেয়ে তেষ্টা মেটানো। মাটির সাহচর্যে জল আহরণ কোরতে না দিয়ে জলের কলসীর মধ্যে বসিয়ে রাখা গাছের দশা এখোন

শশীর।

সেদিন মন্থরার বাতের অসুখটা বেড়ে গেছে। ফুলে উঠেচে দু' হাঁটু। নড়বার যো নেই। তাই শশীকে বললে :

—শশে, বৌমারে একটু দাঁড়িয়ে আয় তো। তেলিরপুকুরে জল আনতে যাবে। শশীর মনের ভাব বোঝা দায়। সে রেগে ওঠে ; এতোবেলা মনে ছিলো না? তাড়াতাড়ি কোরতে বলো।

মেটে কলসী কাখে নিয়ে মাদারী আগে আগে চলে। শশী তার অনুবর্তী হয়। সন্ধ্যের আবচ্ছায়া মাঠের পথে নেমে এসেচে। কিন্তু বাগানঘেরা তেলির-পুকুরে সে ছায়া আরো ঘোরালো। নির্জন ঘাট, শুড়ি পথ বেয়ে নীচের নেমে শশী বলে :

—বৌ, বয়রা কুড়িয়ে আনবো? একটু দাঁড়া তো।

শশী পেরায় রোজই বয়ড়া কুড়িয়ে নিয়ে যায়। চিনে বাদামের মতন খেতে। মাদারীও খুব ভালোবেসে খায়। তবু সে আপত্তি করে :

—এখোন থাক। সকালে নিয়ে যেও। আমি একলা দাঁড়াতে পারবো না।

—না রে। আমি আসার আগেই ইষ্টম শালা এসে কুড়িয়ে নিয়ে যাবে। তুইও চল্। বোলতে বোলতে এক রকম জোর কোরেই ওর কাখের কলসীটা ছিনিয়ে নিয়ে ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে রাখে। এবং হাত ধোরে টানতে টানতে নিয়ে যায় বয়ড়াতলায়। কিন্তু বয়ড়া কুড়োনো শশীর যেমন তেমন। সে এক হাত দিয়ে কোমোরে জড়ানো গামছাখানা খুলে বয়ড়াতলায় পেতে ফেলে। ব্যাপারটা মাদারীর কাছে এখোন স্পষ্ট হোয়ে যায়। সে হাত ছিনোছিনি কোরতে থাকে। এবং আপত্তি জানায় :

—ছি! এখোন না। মা বারণ কোরেচে।

—কিন্তু কে কার বারণ শোনে।

মনে হোলো মাদারী বুঝি লজ্জায় মরমে মরে গেছে। নীরবে নীচু মুখে ঘাড় গুঁজে ভরা কলসী কাখে বাড়ি ফেরে সে।

না থেকে যারা বঞ্চিত, তাদের চেয়ে মস্ত অভাগা যারা থেকেও বঞ্চিত। শশী ছিল এতোদিন ঐ শেষের দলে। আজ এ-দল থেকে সে ছাড়া পেলে। হাট থেকে বাড়ি ফিরে উঠোনে পা দিতেই শশী শোনে ওদের বাড়িতে বেশ একটু গোলমাল। পাড়ার মেয়ে-মহলে হাট মিলেচে। ব্যাপার কী? শশী জোর পায় এগিয়ে যায়। কিন্তু তাকে আর বেশিদূরে এগোতে হয় না। পাতাসী এগিয়ে

এসে বলে :

—দাদা এসেচো ? ছানা-চিনির বায়না দিয়ে এসেচো তো ?

শশী ক্যাল-ফ্যাল কোরে তাকায়, বলে :

—কী বললি ?

—বোলচি, ছানা-চিনি-লুচি খাওয়াতে হবে আমাদের।

—ক্যানো ?

মুখ নেড়ে নেড়ে পাতাসী কয় :

হুঁ হুঁ বৌদির 'কাজ' হোয়েচে।

এবার আসল ব্যাপারটা বুঝে ফেলে শশী। সে আর কথা কয় না। এক ছুটে একদম উঠোন পার।

নারীর আগুঋতু দর্শনের নামকে কোনো কোনো অঞ্চলে বলা হয় 'কাজ' হওয়া। হিন্দুর দশবিধ সংস্কারের আওতায় না পড়লেও বিয়ের মতনই অনেক কিছু ক্রিয়া-কলাপ অনুষ্ঠিত হয় এ উপলক্ষ্যে। অবিশ্যি তথাকথিত ভদ্রসমাজ থেকে 'দায়-ভাগ' এখোন দায়মুক্তো হোয়ে এসব নীচুতলায় সমাজে আশ্রিত হোয়েচে।

মন্থরার মুখে খবর পেয়ে বর্ষিয়সী মহিলা-মহল ছুটে এসেচে। একজন 'জেয়াজ' পোয়াতি অর্থাৎ যার প্রথম সন্তান বেঁচে আছে সে এসে মাদারীকে ঘরের কোণে বসিয়ে দিয়েচে। এবং ঘিরে রেখেচে গণ্ডী দিয়ে। আর ঋতুমতী নববধূর কোলে দিয়েচে একটা পাথরের নোড়া। ঐ নোড়াটা সন্তানের প্রতীক। চারদিন বধূ ঐ ঘরের কোণায় গণ্ডীর মধ্যে নোড়া কোলে কোরে বসে থাকবে। চারদিন পর্যন্ত সূর্যদেবের মুখ দেখতে পাবে না। দুধ মিষ্টি দিয়ে ছাড়া ভাত খেতে পাবে না। এখান থেকে বধূর শুরু হয় মাতৃত্ব লাভের দীর্ঘ তপস্যা।

চার দিনের দিন মাদারীকে গণ্ডী থেকে বাইরে আনা হয়। চান করানো হয় তেল-হলুদ মাখিয়ে। ঠাকুর বাড়ি থেকে সর্বৌষধি মহৌষধি মিশানো শান্তি জল পড়ে এনে খাওয়ানো হয়। সন্ধ্যের আগে শুরু হয় স্ত্রী-আচার। শশীদের ঘরের কানাচে খেজুর পাতার বেড়া দিয়ে খানিকটে জায়গা ঘিরে ফেলা হয়। শশীকে দিয়ে কাটিয়ে নেয়া হয় একটা কুয়ো। পাঁচজন এয়ো জল এনে ঐ কুয়ো ভরতি করে। গোটা বাড়িটা হোয়ে যায় মহিলা-মহলের এক্তিয়ারভুক্ত। এমন কি শশীরও পর্যন্ত সেখানে প্রবেশাধিকার থাকে না। এর পরই শুরু হোয়ে যায় 'কাদামাটি', বিগতবসনা পঞ্চনারী প্রথমে ঐ কূপে অবতরণ করে। তারপর বর্ষীয়সীরাও।

ভীষণ কাদা ছেঁড়াছুঁড়ি চলে। আর আদি রসাত্মক গানে অনাদিদেব শিবের লীলা-কীর্তন। এর থেকেই বেশ বোঝা যায় সৃষ্টির উদ্ভব আদি রস থেকে।

মন্থরার নির্দেশমাফিক তারণ নোতুন বিয়ান চাঁপাকে নিয়ে এসেচে। সে সাথে এনেচে রূপোমাসীকেও। শশীর একরকম দিদি শাশুড়ী, তাই এক্ষেত্রে রূপোর ভূমিকা অপরিহার্য।

তারণের এক মাত্তর ছেলে শশীধন। এই তার প্রথম এবং শেষ কাজ। তাই মেয়েরা মন্থরাকে ধোরে বসে, লুচি খাওয়াতে হবে। ওদের রুচির দৌড় ঐ লুচি জলপান পর্যন্ত। সন্ধ্যের পর মন্থরা পাড়ার মেয়েদের পেট পুরে লুচি জলপান দিয়ে বিদায় দেয়। প্রাত্যহিক নিয়মমাফিক খাওয়ার পর শশী এসে টোঙের পরে শুয়ে পড়েচে। কিন্তু ঘুমোয় নি। মন্থরাদের থেতে বেশ থানিকটে রাত হোয়ে যায়। তারপর আরো থানিকথন কাটে নোতুন বেয়ানদের সাথে গল্প-গুজবে।

শশী কিন্তু এখোনো তেমনি জেগে আছে। হঠাৎ তার কপালে একথানা ঠাণ্ডা হাতের ছোঁয়া লাগে। এবার ঘুমের ভান করে সে সাড়া দেয় না। হাতথানা ওর মাথা ধোরে ঝাঁকায়। সাথে সাথে ডাকও দেয়।

—শশী, ওঠ শালা।

শশী ঘুমের ঘোরে উঃ-উঃ কোরে সাড়া দেয়।

এবার রূপো থাস-থুস কোরে বলে:

—শালা ওঠো। বৌ নিয়ে শোও গে। বোলেই তার হাত ধোরে টেনে নিয়ে ও-ঘরে চলে যায়। কপট ঘুমঘোরে শশী বিছেনায় গিয়ে শুয়ে পড়ে। রূপো বেরিয়ে যায়। আর অনতিপরেই মাদারীকে এক রকম হ্যাঁচড়া টানা কোরে নিয়ে ঘরে ঢোকে। এবং শশীর গায়ের ওপোর ছুঁড়ে ফেলে দেয়। মাদারী তখোনই সোজা হোয়ে বিছেনার ওপোর বসে। রূপো কানে কানে ফিসফিস কোরে বলে:

ভাতার নিয়ে শুবি, তার এতো লজ্জা কিসের। এই শালা বৌ থাকলো। বলতে বলতে সে বেরিয়ে যায়। আর বাইরে থেকে ঝাঁপের দোর টেনে বন্ধ কোরে দেয়। একটু পরেই শোনা যায় পালনপাতা মলের আওয়াজ। আর কাঁচের চুড়ির ঝুনঝুন্ শব্দ। যে মাদারী লজ্জায় ঘরে ঢুকতে চাচ্ছিল না, সেই উঠে এসে এখোন হুড়কো দিয়ে দোর আটকে দেয়।

আবার সোনামুখীর বিল সোনামুখী হোয়ে উঠেচে ধানের সোনায়। চামরমণি, বাকতুলসী, বাসমতী ধানের দেদার ফসল। যেদিকে তাকাও ধান আর ধান। সোনা আর সোনা। সোনামুখীর ধানের ভাবধারাকে আশ্রয় কোরেই বুঝি ফলেচে শশী-মাদারীর দাম্পত্য-জীবনের সুখী ফসল। শশীর মনের প্রবৃত্তি-ধর্ম এখোন একমুখী। মাদারীর ভালবাসা কেন্দ্রায়িত। প্রেম আর যৌন-লালসা এ দু'য়ের ভেতরকার আধিপত্য জোরালো মাপকাঠি দিয়ে তার মান নির্ণয় করা বেজায় মুশকিল। মাদারীর সাহচর্য শশীর মন থেকে একদম মুছে ফেলেছে সুখোকে। সুখোর স্মারক-সমাধির পরে এখোন যে জয়ঝাণ্ডা উড়চে সে কি প্রেমের? না কাম লালসার?

সোনার হরিণী-ধান মৃগয়ার লগ্ন ঘনিয়ে আসে। ছোটান ধানে পোঁচ পড়ে। আটি বাঁধা বিচেলি গোরুর গাড়ি বোঝাই হোয়ে চলে গ্রাম-গ্রামান্তরের খামারে। আসে বড়ান ধান কাটার দিন। বাঁকুই-কারশাল। গামছা পরে হাঁটু জলে কোমর জলে বুক জলে নামে মুচিপাড়ার মজদুররা। ভুতো, ছোটোকানাই, ভ্যাবল, ফুলবর এবং ওদের দলবল। শীতের সোনামুখী বরফগলা জল। ধান কেটে যখোন ডাঙ্গায় ওঠে সব, হাত-পার তেলো মড়ার মতন ফ্যাকাশে চুপসে গেছে আঙুলগুলো। সারা গা ভরতি লেগে আছে লম্বা লম্বা পেটো জোঁক। রক্তখোর পেটো জোঁক। এ-ওর গা থেকে টেনে টেনে ছাড়িয়ে দেয় সেগুলো। রক্তর বসুধারা নামে গা বেয়ে। বাড়ি গিয়ে চুন লেপে দেয় ঘা-মুখে। এমনইভাবে রক্ত-তর্পণ করে ওরা ফসল আজ্ঞানো থেকে ঘরে তুলে দেয়া পর্যন্ত। তারপর হা-হা খাঁ-খাঁ করে সারা বিলটা। নরম মাটি কাঁকুড় ফাটা ফেটে হোয়ে ওঠে ধারালো। সে সাথে সোনামুখীর স্বত্ব-স্বামীত্ব ফিরে আসে এ পাড়ায় হাতে। ছাগোল-গরু চরানোর, ঝরা ধান কুড়োনোর। অচ-তলার জল-ভিজে নাড়া কাটার। মাঘের শেষে জল নামে। চাষ শুরু হয়। শুরু হয় বিলতলার বড়ান ধান বোনা। ক্রমশঃ খর্বায়িত হোতে থাকে সোনামুখীর অবাধ অধিকার। ছয় ঋতুর চাকা ঘোরার সাথে সাথে এ পাড়ার জীবনেরও ঘটে আবর্তন-বিবর্তন। এই ক্রম-বিবর্তনের চাকা ঘুরতে ঘুরতে একদিন এমন ঠাঁই এসে পৌঁছোয় সেদিন আকাশ মেঘ-মেদুর নোতুন বর্ষার ধারাপাতে টৈ-টম্বুর সোনামুখী বিল। তার হৃদ্যতা এসে কোলাকুলি করে এ-অচ্ছ্যুৎ পাড়ার গায় গায়। ছোঁয়া-ছুয়ির বাছ-বিচার একেবারে তলিয়ে দিয়ে। হটিয়ে ফেলে। জলের বলয়-রেখা মেখলার মতো ঘিরে ফেলে পাড়াকে। ছিঁড়ে ফেলে বাইরের যোগসূত্র। জল এসে ওঠে কারো উঠোনে, কারো ঘরের পোতায়, কারো দেওয়ালের গায়।

ধোঁসে ধসে পড়ে মাটির ঘর, দোর, দেওয়াল। পচা কাদায়, ময়লা আবর্জনায়, পশুর হাড়-গোড়-চামড়ার গন্ধে নরকুণ্ডে কিল-বিল কোরতে থাকে এই অচ্ছ্যুৎ পোকাগুলো। ছুঁৎমার্গের পথিকরা ইদানিং তো বড়ো কেউ পা বাড়ায় না এ-পাড়ায়। নেহাৎ দায় বেদায়-এর তাগিদ ছাড়া। প্রায় বছরই এ-সময় নাকানি-চুবানি খাওয়া এ-পাড়ায় মড়ক আনে টায়ফয়েড-কলেরা-নিউমোনিয়া। অচিকিচ্চেয়-অভাছক্তে পোকার মতন মরতে থাকে মানুষ। বিশেষ কোরে শিশুরাই। আর বুড়ি ভদ্দরের চরে ওদের আলাদা শ্মশানে শেয়াল-কুকুরের মতনই গর্ত কোরে পুঁতে মাটি চাপা দিয়ে রেখে আসে। দিনকতক মাথা ভাঙা-ভাঙি। আকাশ ফাটানো আর্তনাদ। তারপর চুপচাপ। গতানুগতিক জীবনধারার বিষণ্ণ প্রবাহ।

একদিনের ঘটনা। মুষলধারে বরষা হোয়েচে সারাদিন। থৈ থৈ কোরচে মাঠ ঘাট। হাবুডুবু খাচ্চে সোনামুখী বিল। নুরপুর খরডাঙার মধ্যেকার শীর্ণ সোঁতায় তীব্রবেগে বইছে ঘোলা জলের স্রোত। শশী-সতীশরা পাটা ঘিরে দোয়াড় পেতে অজচ্ছল মাছ মেরেছে। হরেক রকম মাছ—গুতে, পাঁকাল, চ্যাং, ডানকোনা, পুঁটি, সরপুঁটি। হরদম বিলিয়েচে। আরো নাদা-কলসী-ভাঁড় ভরে জিইয়ে রেখেচে। এমনই প্রচুর মাছ মুচিপাড়ার সবাই মেরেচে। একমাত্তর ইষ্টমের বরাতে জোটেনি। চার-পাঁচ দিন সে বাড়িছাড়া।

—শশী কী হোচ্চে ?

তখোন সন্ধ্যে উত্‌রে গেছে। গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি পড়চে। মাদারী রান্নাঘরে। ভাত চড়িয়ে দিয়ে মাছ কুটতে বসেচে। আর শশী মুখোমুখি হোয়ে বসে ফিসফিস কোরে গল্প কোরচে। শশী আজকাল বড়ো একটা কোথাও বেরোয় না। রাতে বেলায় তো মোটেই না। মাদারীর সাথে গল্প ওর অফুরন্ত।

এক গাল ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে শশী বলে :

—কী রে ? কখোন এলি ?

—এই তো কেবল মাত্তর। তোরা তো মেরে ফন্দ-ফায়ার কোরেচিস। চল। মাছ মেরে আসি গে।

শশী গাছ থেকে পড়ে, কোথায় ?

—ক্যান ? বিলে।

মুখ কাচুমাচু কোরে জবাব দেয় শশী :

—আর ইচ্চে কোরচে না। ভোর দিন ভিজে ভিজে……।

ইষ্টম চেপে ধরে :

—ওরে চল। বেজায় মাগুর-জিয়েল মাছের গোন হোয়েছে। বাবা বোলেছিলো আরো চারো পাতা আছে বাঁধালে। চারোতেও মাছ বাঁধবে ঠিক। ছাক্কা শোল-কই। এই ছাখ, কতো বর্শা। বলতে বলতে সে গামছায় জড়ানো বোচকা খুলে ফেলে। ছাখা যায় সত্যিই একগাদা শোলার বর্শা। কুশ পোকার সুতো জড়ানো। সুতোর মুড়োয় বড়শীও গাঁথা। এমন কি ছাঁচি-কেঁচোর টোপ পর্যন্ত গেঁথে এনেছে ইষ্টম।

শশী চুপচাপ। মাদারী এর মধ্যে চোখ ইশেরায় বারণ কোরে দিয়েচে শশীকে। শশীর এ মৌনতা তারই ফলশ্রুতি।

—কই ওঠ। তুই অতো আলসে হোয়ে গেলি ক্যান?

ইষ্টমের এ মন্তব্য একেবারে অর্থহীন না। বিয়ের পর শশীর শিকার প্রতিভায় ভাটাই লেগেছে। সে নিজেই মাদারীর শিকার হোয়ে বসেচে।

ইষ্টম আবার বলে:

—নে চল দেখবি, এ মুড়ো থেকে বর্শা পেতে ও-মুড়োয় যাবো। তার পর ঘুরে এসে তুলতে থাকবো। একটা বর্শাও ফই যাবে না। এক মোত্তরে ভাও দিয়ে ফেলবো মাছ মেরে।

শিকার মাত্রই একটা বাতিক বিশেষ। কিন্তু মাছ মারা বাতিকের মোতন এমন পাজি নেশা আর নেই। মাছুড়েদের মন্তব্য, মাছ খাওয়ার চেয়ে মারাই আনন্দ। তাই শশীর শিকার প্রতিভা মোজে গেলেও সে-মজা গাঙে বান ডাকলো।

—দেরি কোরবো না বৌ। এখুনি ঘুরে আসবো আমরা। বলতে বলতে সে ঢেঁকি ঘরে গিয়ে ঢোকে। এবং বিশ কাঠিওলা চবকখানা নিয়ে ইষ্টমের সাথে বেরিয়ে পড়ে।

ওপোর মেঘ অস্বচ্ছ। তারা বিরল আকাশ। আর নীচেয় সোনামুখী বিল। বিলের অচতলায় তরল ইস্পাত—জল বোয়ে যায় কালো রাতকে টেক্কা মেরে। অকস্মাৎ অজস্র বর্ষার ফলে বড়ান ধান বাকুঁই—কারশালরা জল কাটিয়ে মাথা তুলতে পারেনি। বিল কোলাচে ছোটান ধান ক্ষেতগুলো জাগনো। ঐ ধান বোনে নেমে সার বেঁধে বর্শা পেতে চলে শশী-ইষ্টম। প্রায় দু'শো হাতের মতন চলে যায় ওরা বর্শা ফেলতে-ফেলতে। এর পরেই একটা লম্বা বাঁধাল। ঐ বাঁধালের ফাঁকে ফাঁকে বাঁশের চারো—আটালি পাতা। আওতা মনে কোরেই অথবা চলা-ফেরার পথ মোনে কোরেই হোক, মাছরা ঐ-যন্তরের মধ্যে ঢুকে বসে। তখোন তাদের দশা হয় ঠিক সপ্তরথীর ব্যূহ বেষ্টিত অভিমন্যুর মতন। নির্গমনের পথ পায় না। মোটা

মোটা বাঁশের ফলায় ছুলন্ত আগাওয়ালা। অবিকল বাণধারী ভীম-দ্রোণরা।

ইষ্টম বলে :

— চল শশে, এবার চারো, আটাল দেখে আসি। বাবা সকালে পেতে রেখে গেছে। আর দেখেনি।

বিস্ময় প্রকাশ করে শশী। বলে :

—তাই নাকি? চল তবে। ইষ্টম বাঁধালের ধারে এগিয়ে যায়। এবং প্রথম আটালখানা খুলেই দেখে বেশী আধ আটাল মাছ। কই, মাগুর, জিয়েল। উল্লাসে লাফিয়ে উঠে ইষ্টম। বলে :

—দেখেচিস, মাছের মরণ? শশীও অবাক। বলে :

—তাইতো। 'উজুসে' মাছ কিনা। আমদানী জল পেয়ে মেতে গেছে সব।

আটাল—চারোয় খানছয়েক। আর একখান মাত্তর চারো বাকী। এরি মধ্যে ইষ্টম যে ভাঁড় এনেছিলো সেটা তো বোঝাই হোয়েই গেছে। অধিকন্তু একখানা আটালের মুখ খুলে তাতেই মাছ রাখতে হোয়েছে। ইষ্টম শেষ চারোখানার ধারে এগিয়ে যায়। ছাখে সে-খানা খুব জোরে জোরে আন্দোলিত হোচ্চে।

—শশে রে! খুব পেল্লাই মেনে মাছ বেঁধেছে। হয় গজাল নয়তো বোয়াল। আর একটা দেশুলই আনতো। ওঃ টেনে তুলতে পারচি নে।

গাঁট থেকে বিড়ির কোটোর মধ্যে রাখা দিয়াশলাইটা বের কোরে নিয়ে খচ কোরে জ্বালে। এবং নিরীখ কোরে দেখে আঁৎকে ওঠে :

—ওরে, সাপ, সাপ, বোড়া সাপ।

একটা মস্ত জল বোড়া চারোর মধ্যে ঢুকে মাছ খেয়ে আরো মস্ত ডাগর হোয়ে উঠেচে। এবং অপরিসর চারোর মধ্যে কোনো রকমে গোটো সোটো হোয়ে ভীড় পাকিয়ে কেবল মাত্তর মাথাটা উঁচু কোরে বূ্যহ ভেদের ব্যর্থ চেষ্টা কোরচে। শশী আঁৎকে উঠে, সাপ, সাপ, বোড়া সাপ বলে চ্যাচানোর সাথেই ইষ্টম ভালো কোরে ঠাওরে দেখেচে কি ছাখেনি, চারোটা, চারোটা, ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। ইত্যবসরে শশী দেখতে পায় আকাশ প্রতিফলিত চকচকে জলের ওপোর দিয়ে শোলার বর্শা বোঁ-বোঁ কোরে ছুটছে। দেখেই চেঁচিয়ে ওঠে শশী :

—এই ইষ্টম, বর্শা মাছে খেয়েছে।

সাপ ঢোকা চারোর সমস্যা মুলতুবি রেখে বর্শার দিকেই ধাওয়া করে দু'জন। বর্শাখানা ধান গাছের ঝাড়ে আটকে গিয়ে থেমে গেছে ততখ্যণ। উরুৎ-জল ভেঙে জোর পায় চলে ইষ্টম। কিন্তু বর্শাখানা ধোরেই সরাসরি টেনে তুলতে পারে না।

মাছটা ঘুরপাক খেয়ে ধান গাছে সুতো জড়িয়ে ফেলেছে। ধীরে-সুস্থে পেঁচগুলো খুলে মাছটা টেনে তোলে ইষ্টম। মাঝারী রকমের একটা বোয়াল মাছ। টোপ গেলার সাথে সাথে বর্শাটা চোখ ফুড়ে বেরিয়েছে। জোর করে ফসকে যাওয়ার রাস্তা নেই আর। মাছটা খুলে নিয়ে আটালে রাখে এবং কোচড় থেকে টোপ নিয়ে বর্শাতে ফের গেঁথে দেয়। আবার একটা একটা কোরে বর্শা দেখতে দেখতে ওমুড়োর দিকে যেতে থাকে। কোনোটায় মাছ বেঁধে আছে। শোল, কই, কী মাগুর মাছ। কোনটাতে টোপ খেয়ে গেছে। কোনটায় সুতো ধান-ঝাড়ে আচ্ছা মতো জড়িয়ে রেখে মাছ ফসকে গেছে। ইষ্টম বর্শা বেঁধা মাছ খুলে নেয়। ছাড়িয়ে নেয় ধান গাছে পেঁচানো সুতো। এবং প্রত্যেকটা বর্শায় গেঁথে দেয় নোতুন টোপ। এবম্বিধ একই ধারায় পৌণপৌণিকভাবে চলে মাছ শিকার। আকাশে অভ্রাযোগ কাটেনি এখনো। পূর্ব দিগন্তে থেকে থেকে ঝিলিক দিচ্চে। আর ঐ ঝিলিকের আলোয় সোনামুখীর প্রশান্ত জল দেখাচ্চে ঠিক অন্তহীন সমুদ্দুরের মতনই। গ্রাম-গ্রামান্তর ধৃত এ জলাভূমি কী শশী আর কী ইষ্টম দু'জনেরই বুক আতংকিত কোরে তুলচে। কিন্তু সে ঐ ঝিলিকের মতনই সাময়িক। ক্যানো না কী শীত, কী বর্ষা, ছয় ঋতুর সোনামুখীর সাথে এদের যে গভীর যোগ। এদের জীবন যে সোনামুখী বিলেরই প্রতিচ্ছবি, প্রতিফলন।

মাথার ওপোরে বিলচরের দীর্ঘ শীর্ব ঝাউ-দেবদারু গাছের মগ-ডালে ভুতুম পেঁচা ডাকচে। নীচেয় নোতুন জলের জলসা ঘরে সোনা-কোলার ধৈবৎ রাগিনী, কটকটে ব্যাঙের, নাম না জানা হরেক-রকম জোলো পোকার ঐক্যতান, সাপে ধরা ব্যাঙের আর্তনাদ, ঘিতে খাওয়া কেউটে সাপের শামুক ভাঙার ঠনাস্ ঠনাস্ শব্দ জোট বেঁধে ওদের মনকে হর্ষ-ভয়ের নাগর দোলায় দোল খাইয়ে চলেচে। কিন্তু পৃথিবী যে আকর্ষণে পতনশীল ফলকে টেনে আনে আপন বুকে, সোনামুখীও ওদের টেনে রেখেচে ঐ একই আকর্ষণ দিয়ে। শশী অবিশ্যি এর মধ্যে বার দুই ঝুল দিয়েচে বাড়ি ফেরার। কিন্তু এই যাচ্চি চল, আর একটা ফিরে বর্শা বেয়ে নিই। এমনি কোরেই ইষ্টম আটকে রেখেচে ওকে।

—ঠনাস্—স্, ঠনাস্—স্।

শশী কান খাড়া কোরে ধরে বলে :

—ঐ শোন ইষ্টম। শুনেচিস ?

ওদের থেকে হাত পনেরো দূরে একটা 'আপা'র ধারে উই টিপির মতন

একটা মাটির গাদা। শব্দটা আসছে ওখান থেকেই। কাল কেউটে শামুক ভাঙচে।

ইষ্টম বলে :

—কখোন শুনেছি। ও কি নোতুন শুনচিস তুই? ক্যানো? তোর কি ভয় কোরচে শশে?

—ভয়! না—মানে।

—তবে? বৌ-এর জন্যি 'পেরান' পুড়ছে?

'পেরান' না পুড়লেও পেরান টানচে ঠিক। ইষ্টমের কথায় আঁতে ঘা লাগে শশীর। সে আমতা আমতা কোরে বলে :

—না রে। তবে…।

—তবে কী?

মানে আমি না ফিরলে ওতো খাবেও না, শোবেও না। টেমি জেলে বসে থাকবে নে দোর গোড়ায়।

—এর মধ্যি এতো! বৌ তোরে খুব ভালোবাসে। না শশে?

—তা বাসে, ক্যানো, পাতাসীও তো তোরে খুব ভালবাসে।

—বাসলেও পাতাসীর ভালোবাসা আর বিয়েব বৌ-এর ভালোবাসা অনেক ফারাক রে।

—তা তুই এক কাজ কর ইষ্টম। পাতাসীকে বিয়ে কর না। পেরজাপতির মতন উড়ো মধু আর কতোকাল খাবি? তার চেয়ে মৌমাছির মতন চাক বাঁধ।

—কিন্তু মা তো রাজী হয় না। বাবাও।

—কী বলে?

—বলে, দসাসই মাগী, গর মানান। মানে, তোরে মা যেমন বলতো সুখোর কথা। আচ্চা শশে, সুখোর কথা তোর মনে আছে? তারে ভালোবাসিস আজও?

শশীর মনের গায় ঠিক ঐ আকাশের মতন ঝিলিক খেলে যায়। বেজায় মুশকিলে পড়ে সে। মনের মতন সঠিক উত্তর খুঁজে পায় না। টেনে টেনে বলে :

—মনে ঠিক আছে রে। তবে আগে যেমন চোখের আড়াল হোলে থাকতে পারতাম না, এখোন আর তা হয় না।

ইষ্টম বলে :

কিন্তু শরৎ গণক তো বলেছিলো সুখো বেঁচে আছে। ওরে পরীর দেশে চালান দিয়েছে ওঝারা। এখোন যদি পরীরা আবার তোর কাছে রেখে যায়। সুখো যদি

ফিরে আসে ? কী করিস তুই ? বিয়ে করিস ?

—বিয়ে ! কী কোরে তা হয় ?

—তবে ? একটা উপায় কোরে দিবি তো তার ?

এ কী প্রশ্নের বেড়াজাল দিয়ে ইষ্টম ঘিরলো ওকে ! এর কী জবাব দেবে শশী ?

সে আমতা-আমতা কোরে বলে :

উপায় ? বলবো, তোকে একটা জোয়ান ছেলে দেখে দিচ্চি। তাকে বিয়ে কোরে ঘর-সংসার কোরগে যা। আমার আশা ছাড়। নইলে আর একটা পরের মেয়ের সব্বনাশ হোয়ে যাবে।

ইষ্টম হেসে ওঠে। বলে :

—কিন্তু সে যে তোরেই পছন্দ কোরেচে। পরের মেয়ে ঘরে আসার আগের থেকেই ইজ্জত দিয়েচে তোরে। তার কী :

ইষ্টমের এ প্রশ্নের কী জবাব দেবে শশী ? যে বালিকা-বধূ এখোন ওর জন্য আলো জেলে দোর গোড়ায় বসে আছে। আয়ত চোখ জোড়া জলে-জলে লাল কোরচে. ঘন ঘন তুলচে হাই। ও বাড়ি ফিরলে ওকে খাইয়ে তারপর খাবে। তারপর বিছেনায় শুইয়ে দিয়ে টেনে নেবে আপনার নিটোল বুকে আকণ্ঠ খিদে-তেষ্টা মেটাবে যে, তার প্রতিপক্ষে জেহাদ ঘোষণা করার মতন হিম্মৎ হয় না শশী শিকারীর। সহসা তার চিন্তা সূত্রে টান পড়ে। আঙুল উঁচু কোরে বলে ওঠে, গ্যাখ ইষ্টম, হাঁড়ির তলার মতন হামির মেঘ উঠচে। ভর না এলো বলে।

ইষ্টম চেয়ে গ্যাখে, সত্যিই কালো পাহাড়ের মতন একখানা মেঘ পূব-দখিণ কোণে মাথা চাড়া দিয়ে উঠচে। ঘনো ঘনো বিদ্যুৎও চমকাচ্চে সর্পিল রেখায়।

ইষ্টম বলে :

—আর না। চল এবার।

কিন্তু বেশীদূর আর এগোতে পারে না ওরা। ডাঙায় উঠতেই সারা আকাশ ছেয়ে যায় মেঘে। জোনাকীছিদ্র রাত হোয়ে আসে ছিদ্রলুপ্ত। আর জোর পুবে হাওয়ার সাথে নেমে আসে বিষ্টির মুষল-ধারা— ভিজতে ভিজতে লুপ্ত পথরেখা বেয়ে চলে দুজন।

এবারও বার্ষিক নিয়মের ব্যতিক্রম হয় না মুচিপাড়ায়। মহামারীর অস্পষ্ট পদধ্বনি কানে আসে। এরই মধ্যে তিনটে শিশু মারা গেছে। মাত্তর একবার ভেদ একবার বমি। সাথে সাথে নাড়ী বসে যায়। হাত পা ঠাণ্ডা। কালী ঢেলে

পড়ে সারা মুখে। তারপর সব শেষ। নিস্‌কালী জোড়া পাঁঠা বলি দিয়ে রক্ষাকালী তলায় পুজো দেয়। খোল বাজে। হরি সংকীর্তন হয়। কিন্তু কিছুতে কিছুই হয় না। দেখতে দেখতে অস্পষ্ট পদধ্বনি ঘনিয়ে আসে। সুরপুর ঘরভাঙায় ঘরে ঘরে, আঙিনায় আঙিনায়। পোকার মতন মানুষ মরে। আর শিয়াল-কুকুরের মতন তাদের সংকার হয় বুড়ি ভদ্দরের চরে এক ঘোরে শ্মশানে। গর্তের মধ্যে মাটির চাঙ চাপা দিয়ে। পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই। নেই ডাক্তার-কবিরাজ। ওষুধ ইনজেকসান। এপিডেমিক শুরু হওয়ার সাথে সাথে আর সব পাড়ায় কলেরা ভ্যাকসিন দেওয়া হোয়েছে। হয়নি কেবল এ-অছুৎ পাড়ায়। যাদের দৈবাৎ ছুঁলে চান কোরে তুলসী জল মাথায় দিয়ে শুচি হোতে হয়, কে আসবে তাদের ইনজেকসান দিতে? বিশেষ কোরে গায়ের ছোঁয়াচ নয়। রক্তের ছোঁয়াচ লাগিয়েই ইনজেকসানের সূচ অশুচি কোরতে? গংগা জলে ধুলেই তো সে সূচ জাতে উঠতে পারবে না।

খোল বাজে না। শোনা যায় না হরিধ্বনি। কে বাজাবে? কে গাইবে? এ-বেলা যে মানুষটা সুস্থ-সবল, ভালোমন্দর কুশল বারতা দিচ্চে নিচ্চে। ও-বেলা সে-ই কোরেচে শেষের যাত্রা, বাঁশের দোলায় শুয়ে জাত-বেহারার কাঁধে চড়ে। এখোন যে শিশু হাসচে, নেচে গেয়ে খেলে বেড়াচ্চে, তখোন সেসব খেলাধূলো ভুলে মায়ের বুক ছেড়ে বাবা কাকা কি অন্য কোনো আত্মীয়র কোলে আড়কোলা হোয়ে শুয়ে চলেচে বুড়ি ভদ্দরের চরে। সন্ত্রাসের অবাধ রাজত্ব চলেচে মহামারীর।

নেহাল উদ্দিন ফকির আসে। নিশি-রাত্তিরে মশাল জেলে কোরান শরিফ পড়ে গাঁ বন্ধ করে। বাঁশ পুঁতে গণ্ডি দেয়। চালান দেয় মড়ক—মহামারী—ফের যাতে গণ্ডী মাড়িয়ে পাড়ায় না ঢুকতে পারে। কিন্তু মাকড়সার জালের মতন সে গণ্ডী ছিঁড়ে ফেলে দাপটে চলে বিসুচিকা দেবীর রথ। চক্রনেমীর তলে ডলে পিসে পিঁপড়ে মারা মারে অছুৎ পাড়ার মানুষগুলোকে। এবার আসেন গোলাম আলী ফকির। নেহাল উদ্দিনের ওস্তাদজী। আবার পাড়া বন্ধ। কোরান পাঠ। নিশেন উড়োনো বাঁশ পোতা, মশাল জ্বালা। নোতুন সরায় আতাল কুরচির ছুরো—লিখে ঘরে ঘরে টাঙানো। দোয়া-তাবিচ দেয়া। ফলশ্রুতি যথাপূর্বম তথা পরম্। যে শীর্ণ সোতাটা ঘরভাঙা-সুরপুরের মধ্যে বিচ্ছিন্ন রেখা টেনে দিয়েছিলো, সে রেখাটা একদম অবলুপ্ত কোরে দিয়ে মহামারী মই দিতে থাকলো।

মুচিপাড়ার এ দুর্দিনে সরকার বাবুরা কিন্তু একদম নির্বিকার। দিনকে দিন

পাড়া উজোড় হোয়ে যাচ্চে। বেতশিল্পী, বাঁশশিল্পী, যন্ত্রশিল্পীরা মরচে। মরচে তাদের উত্তর পুরুষরা। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই বাবুপাড়ার। হিরু বাছাড়, গুরুদাস নন্দী প্রমুখ মাতব্বর মহলও মজা দেখচেন। অনন্যোপায় মনুঠাকুর বাবুদের বাড়ি যান। যেহেতু মুচিপাড়া তাদের ভিটে বাড়ির প্রজা। বারো মাসে তেরো পার্বনের মজুরিহীন মজুর। এ বে-দিনে তাদের একবার জানানো উচিত। হোমরা-চোমরা বাবুরা এখোন বাইরে। কেউ কোলকাতায়, কেউ বম্বে, কেউ বা দার্জিলিঙ, কালিংপনে। একমাত্তর ছোটোবাবুই বাড়ি থাকেন। তিনি শুনে মুখ বেঁকিয়ে হাসেন। মন্তব্য রাখেন :

—ও ঠিক হোয়েচে। অমন হওয়াই দরকার ছিলো। পাশে দাঁড়িয়েছিলো শান্তি-ভূপেন ছোকরাবাবুরা। শান্তি জিগ্যেস করে :

—সে বাচ্চা চুলিটার খবর কী? সেটা মরেচে তো ঠাকুরমশায়?

শান্তির কথা শুনে মনুঠাকুর ঘৃণায় রাগে ফেটে পড়েন :

—তোমরা নাকি ভদ্দর ঘরের ছেলে!—ছি! ছি! ছি! যাও, যাও।

শান্তিও সুরে সুর মিলোয় :

—ক্যানো? অভদ্দরের কী হোয়েচে?

—তোমরাই বুঝে দ্যাখো গে। হাজার হোক একটা বাচ্চা ছেলে। তার সম্পর্কে এমনই একটা কথা মুখে আনতে পারলে! ছি! ছি!

এবার ছোটবাবু প্রতিবাদ করেন :

—মুখে আনতে বাধ্য হোয়েচে ঠাকুরমশায়। সেদিন ছোঁড়াটার আদিখ্যেতা দেখলেন তো। আমাকে ছুঁয়ে পা'র ধুলো নিলে! শান্তিদের মুখোমুখি কথা কাটাকাটি কোরলে! আমাদের সাথে ঠাকুর ঘরে উঠে অঞ্জলি পর্যন্ত দিতে সাহস কোরলে। অবিশ্যি অতটুকুন ছেলের মাথায় খেলেনি অতোখানি। শিখোনি আছে নিশ্চয়ই। এখোন তারাই ঠেকাক। আগুন নিয়ে খেলা! মুচি। গোরুখেগো জাত। মা'র মন্দিরে উঠে অঞ্জলি দেয়া? সইবে ক্যানো? যাক। ভিটে আজোড় হোয়ে যাক। আমরা বাইতি প্রজা বসাবো ও-পাড়ায়। ওরা ঢের ভালো বাজোনদার।

—সে বসান, যখোন বসাবেন। এখোন মরতে বসেচ তারা। এখোন তাদের বাঁচানোর···।

ছোটোবাবু গর্জে ওঠেন :

—বাঁচানোর? বাঁচানোর আমি কী কোরবো? আপনি-ই তো লাই দিয়ে

ওদের গাছে তুলেছেন। আপনিই এখোন নামান। আপনি, সাঁইপণ্ডিত, আপনারা যদি আসকারা না দিতেন, তাহলে মাথায় চড়ে বসতে সাহস কোরতো? অতোটা বাড়ানী সইবে ক্যানো। এখোন আপনি যেমন বাড়িয়েছেন, ঠ্যাকান গে আপনি। আমাদের বোয়ে গেছে। বোলতে বোলতে ভেতরে চলে যান ছোটোবাবু।

মনুঠাকুর অগত্যা ফিরে আসেন। পথে ভুতোর সাথে দেখা। চোখে মুখে তার উৎকণ্ঠা। হনহন কোরে ছুটেছে সে। মনুঠাকুরকে দেখে দাঁড়িয়ে যায়।

—কী রে ভুতো? কোথায় যাচ্চিস?

—আপনার খোঁজে।

—ক্যানো।

—কাকার পেট নামচে। ইষ্টমেরও ভেদ বমি হোচ্চে।

—কখোন থেকে রে!

—এই তো সকাল তে। কাকা তো একদম বিছেন ধরা। ইষ্টমের চোখ-মুখ একেবারে খোরোলে পড়ে গেছে। আপনি শিগ্‌গির চলো।

মনুঠাকুর কী ভাবছিলেন। বলেন, তুই চলে যা ভুতো। কেশবপুর থেকে আমি ডাক্তার নিয়ে আসচি! কথাটা বোলেই মনুঠাকুর এক রকম ছুটতে ছুটতে কেশবপুরের বড়ো রাস্তা ধরেন।

বাইসার বিধু ডাক্তার এল, এম এফ। কেশবপুর চেরিটেবল ডিসপেনসারীর মেডিক্যাল অফিসার। মনুঠাকুর হাঁপাতে হাঁপাতে গিয়ে ডাক্তারখানায় পৌঁছান। বিধু ডাক্তার তখোন আউটডোরের রোগীদের প্রেসক্রিপসান লিখচেন। মনুঠাকুরকে দেখে জিগ্যেস করেন:

—কী ঠাকুরমশাই?

—আপনাকে এখুনি যেতে হবে ডাক্তারবাবু। বলবৎ রুগী।

প্রেসক্রিপসান লেখা বন্ধ কোরে বিধু ডাক্তার চশমা পরা চোখে চান। জিগ্যেস করেন:

—কোথায়?

—মুচিপাড়ায় ডাক্তারবাবু।

—মুচিপাড়ায়! কী 'কেস'?

—কলেরা। আপনি একটু তাড়াতাড়ি চলুন ডাক্তারবাবু।

বিধুবাবু টেনে টেনে বলেন:

—মু—চি—পা—ড়া—য়?

—ক্যানো ? মুচিপাড়ায় যাবেন না।

—না, না, তা বোলছি নে। পয়সা পেলে বিধু ডাক্তার মুচি, ম্যাথর, মুদ্দোফরাস ছ্যাখে না। চাই টাকা। কিন্তু মুচিরা কী টাকা দিতে পারবে ! পয়সা-পিচাশ বিধুবাবুকে বরাবরি চেনেন মনুঠাকুর। পয়সার বেলায় কোনোই খাতির নেই এর কাছে। এটা জেনে শুনেই এসেচেন তিনি। তবু আর একবার মন পরীখ্যে করে তিনি বলেন :

—দেবে বই কি ডাক্তারবাবু। যদি কিছু বাকী-বুকী থাকে সেরে উঠে…।

—না, না, ঠাকুরমশায়। ঐ বামুনে বুদ্ধিতে কি ডাক্তারী করা চলে ? বিয়ে ফুরোলে বাজনা ! আর ঝড় ফুরোলে আম ? মানে ঝড মাথায়ই আম কুড়োতে হয় ঠাকুরমশায়।

—আচ্ছা, তাই-ই কুড়োবেন ডাক্তারবাবু। নেন তাড়াতাড়ি নেন। রোগী এখোন তখোন।

—কিন্তু কলেরা 'কেস্'। দুটো রোগী বোলচেন। তিনশো টাকার কম কিন্তু পেরে উঠবো না ঠাকুরমশায়।

স্যালায়িনের বোতল, ইনজেকসনের সাজ-সরঞ্জাম, ওষুধ-পত্তরে ঠাপে-টোপে বোঝাই এক ব্যাগ, মনুঠাকুর ঘাড়ে নেন।

পথে যেতে যেতে বিধু ডাক্তার জিগ্যেস করেন :

—মুচিপাড়ায় অতো লোক থাকতে আপনি যে এলেন ঠাকুরমশায় ?

—কী করি বলুন ? ওদের সাহস হয় না আপনাকে ডাকতে।

যোগিশ্বরদের বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছতেই কানে আসে কান্নার রোল। উঠোন ভরা লোক। মনুঠাকুর জোর পায় হেঁটে যান। তাকে আসতে দেখে আড়ের দোর পর্যন্ত ছোটোকানাই এগিয়ে আসে। বলে :

—আর ডাক্তার লাগবে না বট্‌ঠাকুর। হোয়ে গেছে। আপনি শিগ্‌গীর শিগ্‌গীর ও-বাড়ি যাও। ইষ্টমের অবস্থা বেজায় খারাপ।

তারণদের উঠোন দিয়ে মনুঠাকুর ডাক্তরবাবুকে নিয়ে আড়াআড়ি পথে ইষ্টমদের বাড়ি যান। দো-চালা ঘর। অগুচ্চ স্যাঁতস্যেঁতে এক ফালি বারান্দা। একটা ছেঁড়া পটির উপোরি একখানা তেল-চিটে ময়লা কাঁথা পাতা। তারই পরে ইষ্টমকে শোয়ানো। চোখ-মুখ বসে গেচে তার। হাত-পা ঠাণ্ডা। ডাক্তারবাবু কোনো রকমে বাঁহাত দিয়ে তার নাড়ীটা টেপেন। মন্তব্য রাখেন মনুঠাকুরের পানে তাকিয়ে :

—নাড়ী বেজায় দুর্বল। স্যালাইন দেয়া চলবে না। হার্ট ফেল করবে। ওষুধ দিয়ে চিকিচ্ছে কোরতে হবে। শিশি কই? চট-পট।

মনুঠাকুর শিশির এগিয়ে দেন। দুটো শিশি। বিধু ডাক্তার ওষুধ দিতে দিতে বলেন:

—এই ছ' দাগ ওষুধ থাকলো। আধ ঘণ্টা অন্তর পর পর খাইয়ে দেবেন। তারপর কেমন থাকে জানাবেন।

এমন সময় শশী হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে আসে। এবং মনুঠাকুরের হাতে এক তাড়া নোট দেয়। ডাক্তার সাথে নিয়ে আসার সময় শশীর সাথে তার দেখা হয়। তিনি শশীকে বাড়ি পাঠিয়েছিলেন শৈলজার কাছ থেকে টাকা আনবার জন্য।

উঠে দাঁড়ান বিধু ডাক্তার। বলেন:

—ঠাকুরমশায়, আমার ভিজিট দেন।

সম্মিত মুখ মনুঠাকুরের। জিগ্যেস করেন:

—কী দেবো ডাক্তারবাবু?

—আমি তো বলেই দিয়েছি। কুঁচে চোখের তীব্র দৃষ্টি হেনে বিধু ডাক্তার বলেন:

—কথা ছিলো তো দুটো রোগী দেখবার। কিন্তু···।

মনুঠাকুরের মুখের কথা কেড়ে নেন বিধু ডাক্তার:

—কিন্তু—কিন্তু আমি কী কোরবো? আমি কি মেরে ফেলেছি রোগী? পুরো ভিজিট আমাকে দিতেই হবে।

আর কথা কাটাকাটি করেন না মনুঠাকুর। দশ টাকার কোরে তিরিশখানা নোট গুণে দেন বিধু ডাক্তারের হাতে। ডাক্তার মুচিপাড়া পেরিয়ে বড়ো রাস্তায় বোধ করি পা দেন নি তখোনো। এমন সময় কান্নাকাটি পড়ে যায়। নীলমণি দুম কোরে এসে লুটিয়ে পড়ে মনুঠাকুরের পায়ের ওপোর:

—বট্‌ঠাকুর আমার ইষ্টমকে বাঁচিয়ে দাও। মাথা ভাঙতে থাকে ইষ্টমের মা। আমি কী পাপ কোরেছি? যার জন্যি তুই আমাকে ছেড়ে গেলি বাবা!

মনুঠাকুর প্রবোধ দেওয়ার ভাষা খুঁজে পান না। হাঁটুর মধ্যে মাথা গোঁজেন। শশীও মেয়েমানুষের মতন গলা ছেড়ে কাঁদতে থাকে। সুখোর জন্য ও এমন কাঁদা কাঁদেনি।

যোগিণ্যেশ্বরের সাথে সাথে এ পাড়ায় উনিশ শতকের শেষ মানুষটা চলে যায়। চলে যায় একজন ওস্তাদ শিল্পী, একজন গো চিকিৎসক, একজন ঠাণ্ডা মাতব্বর।

আর ইষ্টম চলে যাওয়ার সাথে সাথে এ পাড়ার পট-পরিবর্তন হয়। শুরু হয় নোতুন ইতিহাসের। ঘটনাটা বলার প্রয়োজন। সুরপুরের মাইল দশেক তফাতে সিমলা নাম কোরে একটা গেরাম। জিরেন ডাক্তার এ গাঁয়ের খুব নামী লোক। জিরেন জাতিতে ছিলো কিন্তু মুচি। খুব কষ্টে সংসার চলে। পুঁজি তার ডাক্তারী। মানে ডাক্তারী না ঠিক, কোবিরাজী বলাই ভালো। দেশীয় গাছ-গাছড়া বেটে বড়ি বানায়। তাই দিয়ে রোগী চিকিচ্চে করে। পনেরো-ষোলো ঘর মুচি নিয়ে এক পাড়া। রোগীর মধ্যে ঐ পনেরো-ষোলো ঘরই তার সম্বল। ক্যানো না অ-মুচিরা অছুৎ মুচি কবিরাজ বাড়ি কেনো আসবে? রোজ রোগী-পত্তর জোটে না। পনেরো-ষোলো ঘর লোক। তিনশো পঁয়ষট্টি দিন কোথা থেকে রোগী যোগাবে। তাই দুঃখের দোলনায় কাটে জিরেনের দিনগুলো। এমন সময় এক পাদরী সাহেবের খপ্পরে পরে যান ডাক্তার। সাহেব তাকে নানান রকম সুখ-সুবিধের লোভ দেখিয়ে খৃষ্টান হওয়ার পর পড়তা ফিরে যায় জিরেনের। পাদরী ওকে টিন টিন পাউডার মিল্ক, ঘি, ডিমের গুঁড়ো বিলোয়। গরম জামাকাপড় দেয়। ওর ছেলেমেয়েদের ভর্তি করিয়ে দেন কৃষ্ণনগর মিশনে। অসুখ-বিসুখ হোলে সাহেব ডাক্তার বাড়ী আসে। বিনা পয়সায় ইনজেকসন, ওষুধ-পথ্য দেয়। জিরেনের দেখাদেখি গোটা পাড়াটা খৃষ্টান হোয়ে যায়। তারপর একদিন বিশপ আসেন। খুব খুশী হোয়ে যান দেখে। মাসখানেকের মধ্যে খাড়া হয়ে যায় আকাশছোঁয়া গীর্জা ঘর মিশনারী পাঠশালা। এরপর অছুৎপাড়ার ছেলেরা ঢুকতে থাকে আমেরিকার কারখানায়। যেমন 'বাটা', 'এসো'। আর যে সাথে সাথে বর্ণ হিঁদুরাও ঢুকতে থাকে খৃষ্টান ডাক্তার জিরেনের ডিসপেনসারীতে। এখোন আর কেউ জিরেনকে ছুঁয়ে চানও করে না, গংগা জলও মাথায় দেয় না। জিরেন ডাক্তারের বাড়ি এসে মাদুরেও বসে। হুঁকো না টানলেও হুঁকোর মাথা থেকে কলকে তুলে নিয়ে তামাক খেতে ইচ্ছে করে। সকাল থেকে সন্ধ্যে উৎরে যাওয়া পর্যন্ত বিশ-তিরিশখানা গোরু-মোষের গাড়ি জমায়েত হোতে থাকে ডিসপেনসারীর সামনে। সাইকেল রাখার আলাদা স্তর। নৈকষ্য কুলীন বামন কায়েতদের মেয়েরা, সূর্যও যাদের মুখ দেখতে পায় না তাদের এখোন রোগী হোয়ে আপনাদের দেখাতে আসে জিরেন ডাক্তারকে।

সুরপুর-ঘরভাঙার দুরবস্থার পানে জিরেন ডাক্তার পাদ্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়েছিলো। তাই অনেকদিন থেকে পাদ্রী সাহেবরা এ পাড়ায় হাঁটাহাঁটি

কোরছিলো। সুখ-সুবিধের লোভও দেখিয়েছিলো প্রচুর। উদাহরণস্বরূপ জিরেন ডাক্তারের নজীরও তুলে ধোরেছিলো। এমনই কোরে ফাদার ওদের মনের মোড়ও ঘুরিয়ে নিয়েছিলো আর কী। কিন্তু মনুঠাকুর শক্ত মুঠোয় হাল কষে ধরে রুখে দাঁড়ান। ফলে ঐ দু-পাড়ার মন—ঘোড়ার গতিবেগ হয় সংযত। বোধকরি তখোনো মনুঠাকুরের মন গোঁড়ামির আওতায় ঘুরছিলো। এতোগুলো মুচি। হিঁদু তো এরা। হিন্দুধর্মের কৃষ্টি-ঐতিহ্য বিসর্জন দিয়ে পরধর্মের আশ্রয় নেবে। এতোগুলো হিন্দু কমে যাবে তার ধর্ম থেকে। এমনই একটা সঙ্কীর্ণ দরদ, আপনার ঐতিহ্যের ওপোর অন্ধ মমত্ব ছিলো বইকি মনুঠাকুরের। তাই তিনি সাঁইপণ্ডিতকে নিয়ে আপ্রাণ চেষ্টা কোরেছিলের এদের বাঁচানোর। ব্যক্তিগত উদারধর্মী মনের ডানা মেলে দিয়ে আগলে রেখেছিলেন পাখির ছা'র মতন। কিন্তু আর পারেন না। আজ তিনি সবদিক দিয়েই রিক্ত, নিঃস্ব। পৈতৃক সম্পদ, মান-সম্মান সবই খোয়াচ্ছেন তিনি।

মহামারীর দাপদাপট তেমনই অব্যাহত। যোগিশ্বরের মরণ যতোটা না তার চেয়ে ইষ্টমের মরণ চার গুণ বেশী দমিয়ে দিয়েছে দু-পাড়ার মন। মনুঠাকুর নিজেও পড়েছেন বেজাই দমে। এমনধারা যুবক ছেলেগুলো মরে যাবে অচিকিচ্ছেয় আর তিনি নিয়তির ঘাড়ে সব দায়-দায়িত্বর বোঝা চাপিয়ে বহাল তবিয়তে থাকবেন। এ তার বিবেককে চাবুক মারে। এমনই ক্ষত-বিক্ষত বিবেক নিয়ে আরো দিন দুই কাটে। যোগিশ্বর-ইষ্টম মারা যাওয়ার পর আরো সাত-আট জন তাদের পথ অনুগমন কোরেছে। সারা মুচিপাড়াটা কেমন এক থমথমে ভাবের মধ্যে। যেন ঘাড় মোচড়ানো ঝোড়ো কাক। বুকের মধ্যে ধড়ফড় কোরছে জীবনপিণ্ড। কখোন কার কপালে উষ্ণ নিশ্বেস পড়বে মহামারীর। কখোন কার পালা আসবে বিষ্ণু শর্মার—বাঘের গালে ঢোকবার। এমনই মুমূর্ষু মুহূর্তে আবার পাদ্রী সাহেবের আবির্ভাব। ওষুধ পথ্য—চিকিচ্ছে এবং আরো নানারকম সুযোগ-সুবিধের প্রলোভন। তারণ-ভুতো-ভ্যাবল-ফুলবর প্রমুখ মাতব্বররা এবার আর এ প্রলোভনকে ঠেলতে পারে না। হাতের কাছে প্রত্যক্ষ প্রমাণ জিরেন ডাক্তার। খৃষ্টান হোয়ে সে এখোন আর অছুৎ নেই। অবস্থাও ফিরিয়ে নিয়েচে। ছেলেরাও মানুষ হোয়েচে। চাকরী পেয়েচে। জিরেনের দেখাদেখি গোটা পাড়াটাই হেঁটেচে ঐ পথে। এবং উঠেও গিয়েচে। তবু মাতব্বররা মনুঠাকুরকে তাদের মনের ভাব খোলাখুলি জানায়। ঠাকুরমশায় ওদের সুখে-দুখে সব সময় সাথে-সংগে আছেন। তার কাছে ওরা হারামী হোতে পারে না। মনুঠাকুর সব শোনেন।

এবং সর্বান্তকরণে সায় দেন তিনি। তার চোখ খুলে যায়। ধর্মের চেয়ে জীবন সমস্যাকে অনেক বড়ো কোরে দেখতে পান তিনি। চুলোয় যাক কৃষ্টি-ঐতিহ্য। খৃষ্টান হোলে মুচিরা ওষুধ-পথ্য পাবে। পোকার মতন মরতে হবে না। শেয়াল-কুকুরের মতন হোতে হবে না গর্তসই। মানুষ হিসেবে তো বাঁচতে পারবে তারা।

মুচিপাড়ার লাগোয়া যে-বিস্তীর্ণ মাঠ কালিখড়ের ভুঁইয়ের গা ঘেঁষাঘেঁষি, ওটারও মালিক মনুঠাকুর। ঐ মাঠে প্রকাণ্ড তাঁবু খাটানো হোয়েছে। মিশন থেকে এসে গেছে একদল ডাক্তার। আর গাদা গাদা ডিসটিলড্ ওয়াটার। ইনজেকসনের অ্যাম্পুল, ওষুধ-পত্তর। এদের নেতৃত্ব কোরচেন রেভারেণ্ড প্যালক। পাইকারী হারে দেয়া হোচ্চে কলেরা ভ্যাকসিন, রোগীদের স্যালাইন, ওষুধ, খাট-মশারী-বালিশ-বিছেনা। পানীয় জলের বাবদ দুটো কোরে চারটে টিউবওয়েল পোঁতা হোয়ে গেছে দু-পাড়ায়। তেসিরপুকুর কি বুড়িভদ্দরে না নামার জন্যে হুঁশিয়ার কোরে দেয়া হোয়েচে। এবার মহামারীর দাপটকে হার মানতে হয়। রোগীরা ভালোর দিকেই যেতে থাকে। দিন পনেরো হোয়ে যায়। নোতুন আক্রমণ আর হয় না।

মুচিপাড়ার দশা এখোন ঝোড়ো রাত পোহানোর সকাল। উপড়ে-পড়া গাছগাছালী। ভাঙা-চুরো ডালপালা। ঝরা পাতায় আকীর্ণ পথ। উড়ে-যাওয়া চাল। হুমড়ে পড়া ঘরদোর। জীবনধারার ওলোট-পালট। ছন্দ নেই। আবেগ নেই। তারপর সূর্য ওঠে। খুশীর মতন ঝলমল করে রোদ্দুর। শুরু হয় গতানুগতিক জীবন-চলাচল। মিশনের ডাক্তাররা চলে গেছে। গুটিয়ে নিয়ে গেছে তাঁবু। রেভারেণ্ড প্যালকের কিন্তু আনাগোনার বিরাম নেই। প্রত্যেক রোববারে বাইবেল পড়ে যিশুর অমৃত বাণী শোনান। ঘরে ঘরে ঘোরেন। কার কী অভাব-অভিযোগ, শোনেন। শুধু শোনা নয় সমাধানও কোরে দেন। সাতদিন অন্তর ঘি, মিল্ক পাউডার ডিমের গুঁড়ো, কোটোয় আঁটা রান্না করা মাছ বিলোন। শিশুদের টফি, বিস্কুট, কমলালেবু খাওয়ান। পিঠ চাপড়ে আদর করেন। বাংলা ভাষার ওপোর বিশুদ্ধ দখল প্যালকের। শোনা যাচ্ছে শিগ্গীর শিগ্গীর স্কুল হবে। আর একটা গীর্জ ঘর। সিমলার চেয়েও বড়ো হবে সে গীর্জা। ইস্কুলও হবে দোতলা। স্থান নির্বাচনও হোয়ে গেছে। সাঁইপণ্ডিত যেখানে ইস্কুল কোরেছিলেন সেই ভিটেয়। তারণ-ভুতোদের মুখে সাঁইপণ্ডিতের কথা প্রথম শোনেন প্যালক। তারপর মনুঠাকুর আদ্যোপান্ত ঘটনা প্যালকের কাছে বিবৃত কোরেছেন। সাহেবরা গুণোগ্রাহী লোক। তাই গুণী সাঁইপণ্ডিতের অসম্পূর্ণ

কাজের পূর্ণ রূপ দেবেন তিনি এ-প্রতিশ্রুতিও দিয়েচেন। নুরপুর-ঘরভাঙার তাবৎ মুচিদের খৃষ্টান হওয়ার খবর বাবুবাড়ি পৌঁছয়। ছোটবাবু শুনে তাতাল খাঁ হোয়ে ওঠেন। তিনি সে খবর পৌঁছে দেন কোলকাতার বড়বাবু-মেজোবাবুদের কানে। পুজোর মাস দেড়েক মাত্তর বাকী। শুনে বাবুরা নির্দিষ্ট সময়ের আগেই বাড়ি ছোটেন। এবং মাতব্বরদের ডাকেন। ভিটে বাড়ির মুনিব। হাজির হোতেই হবে ভুতো-তারণ-ভ্যাবলদের।

কাছারীবাড়ি। তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসে বড়োবাবু গড়গড়া টানছেন। অম্বুরী তামাকের গন্ধে কাছারী মশগুল। পাশে বসে মেজোবাবু, ছোটোবাবু। পৃথক খাটে নায়েব বসে খেরোওয়ালা খাতা লিখচেন। মাতব্বররা সামনে গিয়ে দাঁড়ায়।

বড়োবাবু কি মেজোবাবু প্রজাদের বড় কাউকে চেনেন না। মেজোবাবু নায়েবকে জিজ্ঞেস করেন :

—এ কারা নায়েবমশায় ?

উত্তর দেন কিন্তু ছোটোবাবু :

—মুচিপাড়ার মাতব্বররা। ওর নাম তারণ। আর ঐ ভ্যাবল।

মেজোবাবু গর্জে ওঠেন :

তাই নাকি। বলি ব্যাপার কি তারণ ? ও ভ্যাবল ? তোমাদের মুখ দেখলেও প্রায়শ্চিত্ত কোরতে হয়। বড়োবাবু জানতে চান, ব্যাপার কী ?

—ঐ যে খবর পাঠিয়েছিলাম। ঘরভাঙা-নুরপুরের মুচিদের সেই ব্যাপারটা। ওরা তো সব খৃষ্টান হোয়েচে।

—ও-ও। হ্যাঁ, হ্যাঁ। ক্যানো ? খৃষ্টান হোলো ক্যানো ? প্রশ্নকর্তা বড়োবাবু।

—পাদরী সাহেব দোলা-ঘোড়া কোরে দেবে।

—নায়েবমশায়; এখোনো ওদের ভিটেয় রেখেচেন ? আগুন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেননি ক্যানো ?

আমতা আমতা কোরে জবাব দেন নায়েবমশায় :

—আপনাদের হুকুম…।

তাড়া দিয়ে ওঠেন মেজোবাবু :

—হুকুম। এর আবার হুকুম লাগে ? এক্ষার আগুন লাগান। কুকুর খেদান খেদিয়ে দেন ভিটে থেকে। কাজটা সেরেই আমাদের খবর পাঠানো উচিত ছিল।

বড়োবাবু শাসিয়ে বলেন :

—শোনো মাতব্বররা, আজ থেকে তিনদিনের মধ্যে ভিটে ছেড়ে চলে যাবে তোমরা। নইলে বলো লালে লাল কোরে দেয়া হবে। এন্তার ঘরভাঙা-হুরপুর মুচিপাড়ায় ডোম আর বাইতি বসানো হবে। চলে যাও।

মেজোবাবু সায় দেন :

—বাইতিরা খুব ভালো বাজনদার। ডোমরাও ডালা-কুলো গড়ে ঢের ভালো। ভালো বেতশিল্পী ওরা।

তারণ-ভ্যাবলরা বাড়ী ফেরে। বাবুদের মন্তব্য জানায় মনুঠাকুরকে। জানায় ফাদার প্যালককে। প্যালক শুনে মাথা ঝাঁকান। মুখ টিপে হেসে রায় দেন :

—বোঝা যাবে বাবুদের হিম্মৎ। জমিদার বলে ওনাদের পাখনা হোয়েচে! না? চোদ্দ পুরুষের ভিটে থেকে ওদের উচ্ছেদ কোরবেন! তাহলে বাবুরা যেনো মনে করে ওদের ভিটেয় একখানা ইট পর্যন্ত রইবে না।

তারণ বক্তব্য রাখে :

—কিন্তু সময় তো মাত্তর তিনদিন সায়েব। তিনদিনের মধ্যি ভিটে না ছাড়লে আগুন জ্বালাবে ওরা।

চোখ গোল গোল হোয়ে ওঠে প্যালক সায়েবের। বলেন :

—আগুন! ওরা যদি আগুন লাগায় তোমাদের ঘরে, তাহলে পাকা বাড়ি হোয়ে যাবে তোমাদের। আর তা হোয়ে যাবে বাবুদের টাকায়।

ভ্যাবল বলে :

—কিন্তু হুকুম হোয়ে গেছে যে সায়েব? বড়োবাবু, মেজোবাবু হুকুম দিয়েচে নায়েবকে। তিনদিনের মধ্যি ভিটে না ছাড়লে ঘরে আগুন দেবে ওরা।

—না, না। পারবে না। জোর দিয়ে প্রতিবাদ করেন রেভারেণ্ড প্যালক।

তবু তুমি একবার যাও সায়েব। আমাদের ঘর-বাড়ি পুড়িয়ে দিলে কোথায় দাঁড়াবো আমরা? বালবাচ্চা নিয়ে?

মাতব্বররা চেপে ধরে প্যালক সায়েবকে। মনুঠাকুরও সুপারিশ করেন, আপনি একবার যান স্যার। ওরা জমিদার। বেয়াড়া লোক। একবার আগুন দিয়ে বসলে দাঁড়াবে কোথায় ওরা। আপনি হয়তো অনেক জল বেড়োবেড়ি কোরে জব্দ কোরলেন বাবুদের কিন্তু ততোদিন ওরা কোথায় দাঁড়াবে?

ফ্যাদার প্যালক রাজী হন। জমিদার বাড়ি যান তিনি। আর বাবুদের কাছে জানতে চান, মুচিদের ক্যানা ভিটেছাড়া করা হবে? ক্যানো জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেয়া হবে ওদের ঘরবাড়ি? সাদা চামড়ার বেজায় মাহাত্ম্য। এবার মেজোবাবুর

দাপদাপট থেমে যায়। নরম কাটেন তিনি। বলেন :

—মুচিরা নিষ্করভোগী চাকর। ওদের প্রজা নয়। জমির ওপোর প্রজার স্বত্ব নেইও ওদের। বারোমাসের তেরো পার্বণে ফাই-ফরমাস কুলোবে। গাফিলতি কোরলে উঠিয়ে দেয়া হবে।

প্যালক প্রশ্ন করেন :

—কিন্তু ওরা কি গাফিলতি কোরেছে আপনাদের কাজে ?

মেজোবাবু উত্তর দেন :

—কোরচে বইকি। ওদের ভারী দেমাক হোয়েচে সায়েব। আমাদের আর কেয়ার কোরতে চায় না আজকাল।

মোদ্দা কথা, আসল কথা প্রকাশ করার সৎসাহস হয় না মেজোবাবুর। যেহেতু খৃষ্টান হোয়েচে মুচিরা। এখোন ওরা আরো বেশী অশুচি, বিধর্মী, মেলেচ্ছ। না পারবে পুজোর বাজনা বাজাতে, না পারবে ধান ভানতে, ডালা-কুলো জোগাতে। আরো অনেক ফাই-ফরমাস কুলোতে।

কিন্তু সে সৎ-সাহসের পরিচয় দেন ফাদার প্যালক। তিনি প্রতিবাদ করেন :

—কই না। তেমন কিছু তো শুনিনে। ওরা পুজোয় বাজনা বাজায়। সব কিছু হুকুম মেনে চলে। দোষ ওদের, ওরা খৃষ্টান হোয়েচে। কিন্তু সে তো আপনারাই বাধ্য কোরেছেন ওদের ধর্ম ত্যাগ করাতে। ওদের পুষে রেখেছেন কুকুরের মতন হোলেও তবু কতক। শেয়ালের মতন। কেনা গোলামের মতন হুকুম তামিল করাতে। অনেক দিন ধোরে হাঁটাহাঁটি কোরচি আমি ওদের পাড়ায়। দেখচি তো ওরা পথের কুকুর, বনের শিয়াল পোকা-মাকড়ের সামিল। রোগে ভুগচে। ওষুধ নেই। পথ্য নেই। পোকামাকড়ের মতন পালে পালে মরচে। শেয়াল-কুকুরের মতন গর্তে গাদা হচ্চে। চোখ ফিরে দেখেচো কোনোদিন ? শুনুন বাবুমশায়রা, ওরা যদি আপনাদের হুকুম তামিল না করে, গাফিলতি করে, ভিটে বাড়ী খাজনা কোরে দেন। রীতিমত খাজনা আদায় করুন। না দেয় নালিশ-ফরিদ চালান। তাই বলে উচ্ছেদ কোরতে পারবেন না। খবরদার। তাহলে আমি লড়বো। ভারতবর্ষের সব জমিদারীগুলো কিনে নেয়ার হিম্মৎ রাখে আমার মিশন।

আর একমোত্তর দাঁড়ান না রেভারেণ্ড প্যালক। বাবুরা দমে যান। আর নড়াচড়া করেন না। এরই কিছুদিন বাদে এসে যায় বড়ো পুজো। আনন্দময়ীর আগমন হয়। কিন্তু সে আনন্দ আসে না বাবু বাড়ি। গেলো বাঘের মতন বাচ্চা

ঢুলি সতীশ নেচে নেচে ঢোল বাজিয়ে শ্রোতা-দর্শকদের চিত্ত নাচায় না। জয়ঢাক-জগঝম্প বাজে না। সানাই বোল ধরে না। শিল্পীর সুর-প্রতিভায় ঝলমল করে না পূজাঙ্গন। ছোটোবাবুকে ডোবায় না নাকের জলের চোখের জলের গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গমে। কেবল হাজরা আর বন্ধা বাইতির ঢোলোক-কাঁসি টুং-টাং কোরে বাজনা পর্বে নিয়ম রক্ষে কোরে দেয়। সমস্ত পুজোটা মনে হয় অঙ্গহীন। বাবুরা মুচিদের অভাব অন্তরে অন্তরে অনুভব করেন এখোন।

—ওমা, ভাখ এসে। পেয়ারাতলায় পা দিয়েই সতীশ ডাকে ময়নাকে। ময়না তখোন বারান্দায় গল্পর আসর জমকে বোসেচে। সে ডাক শোনে :

—কী রে ?

—ভাখ এসে। শিগ্‌গীর আয়। সতীশের কণ্ঠস্বর বোঝায় ও বুঝি মস্ত এক দাঁও মেরে এসেছে। এখোন তারই আত্মম্ভরিতায় আটখানা।

ছেলের ডাক শুনে উঠি উঠি করে ময়না। কিন্তু ওকে আর উঠতে হয় না। সতীশ তার আগে এসে হাজির হয় উঠোনে দড়ি বাঁধা একটা লাল খাসি টানতে টানতে। প্রকাণ্ড খাসি। তেল কুচকুচে গা। চর্বিওয়ালা ভুঁড়ি তুলতুল কোরচে। লম্বা লম্বা শিং জোড়া পেছন দিকে বেঁকে গেছে।

—বল তো মা, কতো হোয়েছে খাসি। বলতে পারলে…।

খুঁটির গায়ে দড়িটা গেরো দিতে দিতে সতীশ বলে যাচ্ছিল। আরো অনেক কিছু বলবার ছিলো তার। খাসিটা অনেক সস্তা দরে কিনেচে। আর সেটা ওরই কেরামতিতে। মা ময়না যদি ওর দর বলতে পারে তাহলে বকশিস দেবে মাকে। এমনই অনেক কিছু। কেনা দরটা কিন্তু হঠাৎ বারান্দায় বসা অচেনা এক মেয়ে-ছেলেকে দেখে তার আর কিছু বলা হয় না। থতোমতো খেয়ে যায় সে।

ময়না বুঝতে পারে। বলে :

—কী বলছিলি ? বল। লজ্জা কিসের ? ও তোর মামী হয়।

সতীশ চেয়ে চেয়ে ভাখে। জিগ্যেস করে না কিছুই। কে ঐ অচেনা ? কোথাকার মামী ? কোনোই আগ্রহ প্রকাশ পায় না। খিদেয় ওর নাড়ী বাপন্ত কোরচে। সে রান্নাঘরে ঢুকতে ঢুকতে হাজরাকে বলে :

—হাজরা, তুই খেয়ে আয়। আমি খেয়ে নিই।

ময়না চেঁচিয়ে বলে :

ঐ সানকিতে ভাত বেড়ে নে। আর মালসায় তরকারী আছে।

এমন সময় প্রাত্যহিক নিয়মমাফিক বেদানা আসে ছেলে কোলে কোরে। ময়না

একফালি পাটি টেনে ছায়। বলে :

—বোস। চিনিস এ নোতুন মানুষটাকে? বেদানা ঠাওরে দেখে খিলখিল কোরে হেসে ওঠে।

—আরে, কুসমীদি না?

কুসমী বলে :

—মনে হয় যেন।

—কিন্তু তুমি তো বেশ মোটাসোটা হোয়ে গেচো মাইরি। থাক্ থাক্। কুলটি ঝুলে পড়েচে। ফরসাও হোয়েচো আগের চেয়ে। কোলে কী ছেলে?

—দিব্যি ফুটফুটে ছেলেটা। কুসমীর কোলের ওপোর ঘুমোচ্চে। চাদরে গা ঢাকা। সে বলে :

—কী জানি?

বেদানা উঁচু কোরে দেখে খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে। জিগ্যেস করে :

—কবে হোয়েচে তোমার খোকা?

—এই কাত্তিকে বছর পুরবে।

—কবে এসেচো কুসমীদি?

—কাল।

—একলা একলা?

—না রে কাকা গিছলো। তাই নিয়ে এলো।

কাকা মানে অভয়। অন্নর গেঁয়াতি কাকা। স্বামীর ঘর ছাড়লেও সেদিনকার সুবাদটা ছাড়তে পারেনি কুসমী। ওর ছেলে হওয়ার খবর সুরপুর-ঘরভাঙায় এর অনেক আগে পৌঁছে গেছে। অন্ন-নোচাও যে শোনেনি তা নয়। কিন্তু সে প্রতিহিংসার প্রবৃত্তি আর কারো মনে নেই। ঐ ঘটনার পর অন্ন কি নোচা অনেকবার কাকমারা গেছে। পঞ্চগোঁসাইও এসেচে সুরপুর-ঘরভাঙায়। পঞ্চগোঁসাই-এর সাথে কুসমীর আকস্মিক অন্তর্ধান গালে মাছি যাওয়ার কাণ্ড সৃষ্টি কোরেছিলে সেদিন। হেনো লোক ছিলো না, যে ওর নামে অবঘৃণায় নাক কুঁচকোয় নি। ময়না-বেদানা তো একছি, শতেকছি কোরেছিলো। ধিক্কার দিয়েছিলো ওর পতিভক্তি—দেবানুরক্তিকে। ছিনাল, খানকী এমনই সহস্র আখ্যায় কোরেছিলো আখ্যায়িত। একমাত্তর ওর স্বামী অন্নই ওর সতীত্বর আসন কেড়ে নেয়নি। কলঙ্কর তুলি টানেনি ওর পতিভক্তির কপালে। তাই কুসমীর স্মারক চিহ্ন আহরণ কোরে রেখেছিলো সে পুজোর ফুলের সাজিতে। আজ

আবার সেই কুসমীকে এ-গাঁয়ে পা বাড়াতে দেখে বিস্মিত হোয়েচে এ গেরাম। বিশেষ কোরে এ দু:পাড়া। ওকি লজ্জায় মাথা একদম ভাতে দিয়ে খেয়েছে। একেবারে গেছো গেছো ছেনালরাও তো এমনটা পারে না। ময়না-বেদানাও হুবহু এমন মন্তব্য কোরেছে মনে মনে।

অনেক কথা হয় ময়না-বেদানার সাথে কুসমীর। অনেক জেরা কোরেছে ওরা দুজন কুসমীকে। ক্যানো ও গোবেচারা অম্নকে নাকের জলে চোখের জলে ভাসিয়ে চলে গেলো? কী অপরাধ বেচারা অম্নর? খেতে পরতে কোনোই কষ্ট দেয়নি কুসমীকে। মুচিপাড়ার সেরা খেয়েচে। সেরা পরেছে কুসমী। এক থাকতে আর যোগায়েছে অন্ন। একটা নখের আঁচড়ও দেয়নি কোনোদিন ওর গায়। মুখ কালো করে কথাও বলে নি একটা। তবে ক্যানো তাকে ছেড়ে গেলো কুসমী!

আর গেলো, গেলো। যুবতী বয়েসেই গেলে পারতো। বুড়ো বয়েসে ধেড়ন্ত গুয়ে পা দিলে ক্যানে? পইত্রিশ-ছত্তিরিশ বছর মেয়ে মানুষের বুড়ো বয়েস ছাড়া আর কী। এ বয়েসে কারো কামোড় থাকে নাকি পর-পুরুষের সাথে বেরিয়ে যাওয়ার মতন? এ ভর্ৎসনার জবাবও দেয় কুসমী। সে জবাব যেমন ব্যথা দেয় ময়না-বেদানাকে, তেমনই ওদের মন থেকে ধুয়ে-মুছে দেয় কুসমীর ওপোরকার ঘৃণা অবজ্ঞা। যৌবনের খিদের তাড়না সংবরণ করবার মতন প্রচুর ধৈর্যশক্তি ছিলো কুসমীতে। না হলে শিখণ্ডী অম্নকে নিয়ে ছত্তিরিশ বছর বয়েস কাটাতে পারতো না। এ দীর্ঘদিন স্বামী নিয়ে ঘর কোরেচে। স্বামীর কাছে শুয়েচে। শুয়েচে আয়ানের কাছে রাধার মতন। কিন্তু কৃষ্ণ কলঙ্কিনী হয়নি। যৌবনের তাড়না পারেনি ওকে উন্মাদ কোরতে। পেরেছে মাতৃত্বের তাড়না।

কুসমীর ঐ কথাগুলো গঙ্গা জল হোয়েই স্পর্শ করে ময়না বেদানার বুক। এ নারীর ওপোরকার সব ঘৃণা-অবজ্ঞা ধুয়ে মুছে পবিত্র কোরে দেয়। বোধকরি বিশ্ব সংসারে গোটা মনটাই এমনই কোরে গঙ্গা জলে ধুয়ে পবিত্র কোরে দেবে। একজন প্রখ্যাত লেখক মন্তব্য কোরেচেন, এ যুগে মাতৃত্ব অচল। কিন্তু ঐতিহাসিক চরিত্র কুসমীর মতন মানুষকে পাওয়ার পর ঐ মন্তব্যের নীচেয় তীক্ষ্ণ সমালোচনার আঁচড় টানতে হয়। এবং সহরের পার্কে-ড্রেনের মধ্যে আর পাড়াগাঁয়ের পগারে ঝোপে-ঝাড়ে ফেলে-যাওয়া ভ্রূণ শিশুদের ওপোর নজর রেখেও বলতে হয় পৃথিবীতে মাতৃত্ব আজও বেঁচে আছে। আজো ঝলমল কোরছে তার কপালখানা। যদি তেমনই দুর্ভাগ্য কোনোদিন আসে পৃথিবীর তখনো পল্লবে আর মুকুল ধোরবে না।

গাছের ডালও পড়বে না ফলের ভারে নুয়ে।

অনেকক্ষণ চুপচাপ কেটে যায় তিনজনের মধ্যে। তারপর ফোঁস কোরে একটা নিশ্বেস ফেলে বেদানা বলে :

—দিনকতক থাকবে তো কুসমীদি ?

কুসমী কী ভাবছিলো। উত্তর দেয় :

—না রে। একলা বাড়ী আছে, খেয়ে না খেয়ে দিন কাটচে। তারপর কাকার অবস্থা তো জানিস ? ওর ঘাড়ে···।

বেদানা বাধা দেয় :

—না-হয় আমাদের বাড়ীও তো···।

ময়না। গা ঝাঁকা দেয় বেদানার। বলে :

—দূর, আমরা খ্রীষ্টান না ?

—কুসমী বলে :

—না—না। তা না ঠাকুর-জ্বি। আচ্ছা ভালো কথা, তোমরা খ্রীষ্টান হোলে ক্যানো ঠাকুর-জ্বি ?

—না হোয়ে আর উপায় কী ছিলো ভাই ? হোয়েছিলাম বলে আজ একটা মুখ দেখছিস্ পাড়ায়।

—ক্যানো।

—ক্যানো শুনিস্ নি। মড়ক লেগে পাড়া ছাপ কোরে দিয়ে গেছে না একদম। ক দিনের মধ্যেই ঝোড়ো আমের মতন ঝেঁটিয়ে পেড়ে নিয়ে গেলো মানুষগুলো। পাড়ায় কী লোক আছে ?

—মোটেই থাকতো না। যদি পাদরী সায়েব না আসতো তখোন। বেদানা বলে।

—তাই নাকি।

—তাই না তো কী। বট্‌ঠাকুর বাবুর বাড়ি গেলো। বাবুরা শুনে দুর দুর কোরে হাঁকিয়ে দিলে। বললে, আমরা কী কোরবো ? মুচিদের মরার দরকার। বেজায় দেমাক হোয়েছে ওদের। তারপর মাতব্বররা সব মিলে মত দিলেন, খ্রীষ্টান হবে। বট্‌ঠাকুরও সায় দিলে। অমনই ডাক্তার এসে গেলো। গাদা গাদা ওষুধপত্তর এলো। বট্‌ঠাকুরদের মাঠে তাবু খাটালো। পাদরী সায়েবরা বাড়ি বাড়ি ঘুরে দেখতে থাকলো। সে কী হুলুস্থুল কাণ্ড রে দিদি।

—তা সকলেই কি খ্রীষ্টান হোয়েছে পাড়ায় ? কুসমী জিগ্যেস করে।

জিগ্যেস করে বেদানাকে। কিন্তু উত্তর দেয় ময়না :

—তা পেরায় সব। ঘর চারেক বাদে। তোমার কাকারা। খুদেরা। আর অন্ন দাদা—হুচা দাদা। ওরাও হোতো। তা যেমন দু-একজন মোরেচে পাড়ায় আর অমনি সব পলান মারলো। বেশ আছি ভাই খ্রীষ্টান হোয়ে।

বিস্মিত হয় কুসমী। বলে :

—তাই নাকি ঠাকুর-জ্যি।

—তাই না তো কী।

—ক্যানো?

—তাও শুনবি? জানিস তো আগে কেউ আসতো এ পাড়ায় নেহাৎ দায় না ঠেকলে? কেউ ছুঁতো আমাদের? দৈবাৎ ছোঁয়া পড়লে চান কোরতো। তুলসী জল মাথায় দিতো। এখোন আর তা করে না। রোববারে গা ভেঙে আসে পাড়ায়। পাদরী দেখতে। যীশুর ভজন শুনতে। এক মাদুরে বসে। ছোঁয়া লাগলে চানও করে না। তুলসী জলও মাথায় দেয় না। সেদিন মথুর বাছাড় এক কাণ্ড কোরেচে বুঝলি বৌদি?

—কী ঠাকুর-জ্যি? কুসমী জিগ্যেস করে। ময়না বলে :

—ও পাড়ার ফুলবর মাতব্বর ওদের ক্ষেতে গেচে লাঙল চষতে। এমন সময় মথুর আসে। ও তখোন বাবলা তলায় দাড়িয়ে হুঁকো টানচে। ফট্ কোরে মথুর ওর হুঁকোর মাথা থেকে কোলকে তুলে নিয়ে টানতে থাকলো। ভুতো আকাশ থেকে পড়ে। মন্তব্য করে :

—ও ছোড়দা, করো কী? ওতে আমাদের পাপ…।

মথুর বাধা দেয় :

—ওরে না—না ভুতো। আবার পাপ কিসের? এখোন তো তোরা আর মুচি নেই। খ্রীষ্টান। এখোন তোদের বাড়ী আসবো। একসাথে উঠবো, বোসবো, এক কলকেয় তামাক খাবো। তোরা তো আর মরা গোরু খাস নে। খাস জ্যান্ত। ওতো মোছোলমানরাও খায় তাদের সাথে আমরা উঠছি বোসছি। কোলকে নিচ্চি। মোছোলমান বাড়ির রস-গুড়-পাটালী খাচ্চি। তা তোদের সাথে ক্যানো তেমনটা কোরবো না এখোন? শুনলি বৌদি?

কুসমী শুনছিলো। এবং মন দিয়েই শুনছিলো খুব। কিন্তু সে বুঝে উঠতে পারছিলো না, কোন্ দেশী বিচার এ? খ্রীষ্টান হোয়ে মুচিরা কী কোরে রাতারাতি ছুৎমার্গে পৌঁছে গেল! মোছলমান খ্রীষ্টানরা গোরু খায়। জ্যান্ত গোরু। কিন্তু

সে তো আস্ত আস্ত গিলে খায় না। ওদেরি মতন রান্না কোরেই খায়। তবে তারা অছুৎ হোলো না! অছুৎ হোলো মুচিরা? কীসে? শুধু মরা গোরু খাওয়ার দরুণই কি! তাহোলে যারা মরা পচা মাছ খায়, তারাও তো আইনতঃ অছুৎ। কিন্তু তা হয় না কেন?

সহসা কুসমীর মনে একটা প্রশ্ন জাগে:

—আচ্ছা ঠাকুর-ঝি!

—কী?

—তোমরা তো খ্রীষ্টান হোয়ে তাহোলে ওপোরে উঠে গেছো। তবে শুনছিলাম যে তোমাদের দিয়ে নাকি বাবুরা আর পুজোর কাজ-কম্ম করাবে না। ধান ভানাবে না। ডালা-কুলো-আড়ি বানিয়ে নেবে না। বাজনা বাজাতে পারবে না বাজনদাররা। কেন?

ময়না বলে:

—তা পারবে কেন? আমরা তো আর হিঁদু নেই এখোন।

এখোন খ্রীষ্টান। ম্লেচ্ছ। আমাদের দিয়ে হিঁদুয়ানী হবে ক্যানো?

আরো গুলিয়ে যায় কুসমীর বোধ বুদ্ধি। বলে:

বারে মজা! খ্রীষ্টানের কলকেয় বাধল না। ছোঁয়ায়-ছুঁয়িতে বাধল না। বাধল চাকে-ঢোলে! আর ডালা-কুলোয়! আবার হিঁদু হোয়েও আটকালো হিঁদুর ছোঁয়া-ছুয়িতে। হুঁকো-কলকেয়। অথচ আটকালো না ডালা-কুলো পুজোর সাজিতে। ঢাক-ঢোলের বাদ্যিতে। আচ্ছা মজার কল তো! ক্যানো ঠাকুর-ঝি?

ময়না ঠাকুরঝিকে চেপে ধরে কুসমী এ জিগ্যেসার উত্তর পেতে। ময়না চুপচাপ। কোনোই সদুত্তর দিতে পারে না। বোধকরি—পৃথিবীর কোনো পণ্ডিতই দিতে পারবেন না।

এমন সময় ঘুমন্ত খোকা জেগে কেঁদে ওঠে। কুসমী ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে স্তন দেয় খোকার গালে।

সতীশ চাঁদাড়ে এসে আঁচাতে আঁচাতে গলা ছেড়ে দিয়ে হাজরাকে ডাকে, হাজরা, ও হাজরা, ধাক্ কোরে আয়।

হাজরা ডাক শোনে। আর অনতিপরেই ছুটে আসে মুখ মুছতে মুছতে।

—মা, হাটতে আসিগে। বোলতে বোলতে খুঁটির থেকে দড়িটা খোলে এবং টানতে টানতে খাসিটাকে নিয়ে কেশবপুরের হাটে চলে। ছাটি হাতে

হাজরাও যায় ওর পেছন পেছন। সতীশ-হাজরা দুজন মিলে ছাগোলের কারবারে নেমেচে। গেরাম ঘুরে ছাগোল কিনে কেশবপুরের বাজারে কসাইদের কাছে বেচে। তাতে দু পয়সা কামায়। অবিশ্যি পুঁজি এবং পথ দেখানো দুটোই বনমালীর।

—আসি ঠাকুর-জ্যি। ওঠবার উদ্‌যোগ করে কুসমী।

—বোসো, বৌদি। বেদানা বলে।

—না ভাই। কাল যেতেই হবে। বললাম না…।

—আর না গেলে হয় না বৌদি? দাদা গোবেচারীকে কেটে কেটে আর নুন না দিলি।

জিব কামড়ে কুসমী বলে:

—ও মা! বললি কী তুই! আমাকে ঘরে নেয় আর! ছি! ছি!

চকচক কোরে ওঠে বেদানার মুখ। বলে:

—বাজি রাখ তবে বৌদি। যদি নেয়, যাবি তুই? ভুলতে পারবি তোর গোঁসাইকে?

—গোঁসাইকে দেখে ভুলে কোনোদিন বেরোইনি। তুই তা ভাবিস নে ঠাকুর-জ্যি। বললাম কী তবে?

—কিন্তু গোঁসাই তো তোরে দেখে ভুলেচে। তার উপায়?

—না। না। ওরাও ভোলার ছেলে না। ওরা সাঁই মানুষ। ওদের তো নিত্যি ঘর বদল। ওরা সংসার ধম্ম চায় না। সন্তান চায় না। ওরা চায়, সাপের মাথায় ভেকের নাচনী।

—উঠি। এবার সত্যিই কুসমী উঠে দাঁড়ায়।

ময়না বলে:

—তা যাবি.যাবি, বৌদি, কিন্তু কাল-পরশু দুটো দিন তোকে ভাই, থেকেই যেতে হবে।

—ক্যানো, কাল-পরশু কী ঠাকুর-জ্যি?

—দেখিস নি? সাঁইপণ্ডিতের ইসকুলের ভিটেয় কতো বড়ো ইসকুল ঘর উঠেচে? তার পাশে দো-মহলা গীর্জে। দেখিস নি?

—তা তো দেখেচি।

—পরশু দিন বিশপ আসবে ওখেনে। দেখবি কতো আমোদ-সামোদ হবে। না দেখে কিছুতেই যেতে পারবিনে। তা বলে দিচ্চি।

অনেকের প্রত্যাশিত এবং প্রতীক্ষিত সেই লগ্নটি আজ। মুচিপাড়ায় মহামান্য বিশপ আসবেন। দেবদারু পাতায়, নানান রকম মরশুমী ফুলে, রঙীন কাগজের শেকলে সাজানো হোয়েচে গীর্জা ইসকুল ঘর। নুরপুর-ঘরভাঙার মুচিপাড়া তকৃতক্-ঝক্ঝক্ কোরচে। ঝলমল কোরচে ময়লা মুখগুলো। রেভারেণ্ড প্যালকের দেয়া নোতুন জামাকাপড় ক্রুশ পরে ছুটোছুটি কোরে বেড়াচ্চে ছেলে-মেয়ে-বৌরা। হৈ-হুল্লোড়, কল-কাকলি, হাসি-মশকরায় মুচিপাড়ার বুকখানা ঠিক পাকা ফসল ভরা সোনামুখীর বিল। তবু কিন্তু এ ফসল সব থেকে বেশী সার্থক ময়নার গোলায়। ওর বুকখানা টাপে টোপে বোঝাই স্বর্ণ শস্য ভাণ্ডার। গীর্জার জন্য নয়। ইসকুলের জন্য সাঁইপণ্ডিতের ভিটেয় আবার নোতুন কোরে বিদ্যায়তন উঠলো। বাস্তবায়িত হোলো তার নিবে যাওয়া স্বপ্নবাতি। আজ তিনি বেঁচে থাকলে হয়তো এ বিদ্যামন্দির তারই হাতে প্রতিষ্ঠা হোতো। কিন্তু মানুষ তো চিরকাল বেঁচে থাকে না। তার জন্য শোক কোরেও লাভ নেই। সুতরাং কাজের মাঝ দিয়ে তিনি বেঁচে থাকুন। এ কাজ তো তাঁরই কাজ। প্রধান উদ্যোক্তা যথোন তিনি। আজ সকাল থেকে তাই ময়নার মনে খুব ভালো লাগছে। অবসরে-অনবসরে এক একবার চোথ চেয়ে যাচ্চে বড়ো রাস্তার পানে। ঐ পথে বিশপ আসবেন। ব্যাণ্ড পার্টি গেচে কেশবপুর। ওথান থেকে তাকে সমারোহ কোরে আনা হবে। নেহাৎ গ্রামাঞ্চল ট্যাক্সি আসে না। সাইকেল-রিক্সা নেই। পাল্কীর যুগ ফুরিয়ে গেছে। তাই বিশপ আসবেন গোরুর গাড়ীতে। ভ্যাবল গাড়োয়ান মনুঠাকুরের গাড়িথানা নিয়ে গেছে। বালিস, গোদি-বিছেনাপত্তর দিয়ে গাড়িথানা সাজিয়ে দিয়েচেন তিনিই।

সহসা ব্যাণ্ডের আওয়াজ ভেসে আসে কানে। উচ্চকিত হোয়ে ওঠে মুচিপাড়া। ময়না ঘরের মধ্যে কী একটা কোরছিলো। ছুটে এসে চোথ চায় বড়ো রাস্তার পানে, ছাথে গোরুর গাড়ী এগিয়ে আসচে। ধীর মন্থর গতি। সাহেবী পোষাকপরা বাজনাদাররা ইংরেজী বাজনা বাজিয়ে তালে তালে পা ফেলচে। দুরু-দুরু দুলে ওঠে ময়নার বুক। এমনি কোরে ঐ বুকখানা আর একদিন দুলিয়ে ছিলো ওর বিয়ের রাতের বাজনা। ইস্কুল প্রাঙ্গণে গাড়ী এসে থামে। বিশপ নামেন গাড়ী থেকে। সাত ফিট লম্বা ফিগার। বিরাট পুরুষ। চওড়া সাদা টাক। টম্যাটোর মতন লাল টুকটুকে মুখ। ভবানী পিসিমা শৈলজা দেবীও এসেছেন সভায়। তাঁরা এগিয়ে যান। এবং সম্পূর্ণ হিন্দুয়ানী প্রথায় শাঁক বাজিয়ে উলু দিয়ে স্বাগত জানান বিশপকে। খুশীতে

বিশপের বাঁধানো দাঁত মুক্তোর চেয়েও ঝিকমিকিয়ে ওঠে।

অনুন্নত গেরাম নুরপুর-ঘরভাঙা। তাতে আবার অনুন্নততম পাড়া মুচিপাড়া। যদিও হালে খৃষ্টান পাড়া হোয়েছে। সেখানে সাহেব আসবেন! তাও আবার যে সে সায়েব না। বিশপ সায়েব। তাই গেরাম-বেগেরাম ভেঙে পিল পিল কোরে লোক এসে জমায়েৎ হয়। রাজার জাত। সভ্য জাত। বৃটিশ আমল। সুতরাং সূর্য অস্ত না যাওয়া রাজ্যের মানুষের জাত আসচেন মুচিপাড়ায়। হাল খৃষ্টান পাড়ায়। এ গাঁয়ে জমিদার আছে। একথা তাঁর অজানা থাকবে না। আর তাঁরা যদি এ সভায় পা না বাড়ান তাও তিনি টের পাবেন। অদরকারী হলেও বিরোধী দলরা নিশ্চয় তার কানে তুলে দেবে। তাতে কোরে জমিদারীর দিক থেকেও ফ্যাসাদ আসা অসম্ভব নয়। হয়তো বা এমনই মনে করেও টুকটুক কোরে ছোটোবাবু আসেন। ছোকরা বাবুরাও বাদ জান না। দেখাদেখি তারাপদ ভট্‌চায্যি, বাছাড়মশায় প্রমুখ মাতব্বররাও গা ঢাকা দিয়ে ভীড়ের মধ্যে এসে দাঁড়ান।

সভার কাজ শুরু হয়। বিশপ বাংলা জানেন না। তিনি বক্তৃতা দেন ইংরেজীতে। আর সেটা বাংলায় তর্জমা কোরে বুঝিয়ে দেন ফাদার প্যালক। বিশপ বক্তৃতার প্রথমেই যে মানুষটা রেনেসাঁচের যুগের আলো হাতে কোরে অবজ্ঞাত এ মেরু অঞ্চলে এসেছিল তাঁর নামোল্লেখ কোরতে ভুল করেন না। ভুল করেন না তাঁকে অশেষ শ্রদ্ধা জানাতে। তাঁর আত্মার শান্তি কামনা কোরতে। বিস্মৃতপ্রায় সাঁইপণ্ডিতের কথা শুনে জনতার চোখে জল আসে। অঝোর অশ্রুর বসুধারা নামে ময়নার গালে। সে বারবার চোখ মোছে আঁচলে। তবু তার অবাধ্য অসংযত সে বাঁধভাঙা চোখের জল। ময়নার বাঁ পাশে বসেছিলো কুসমী। ডান পাশে বেদানা। ওদেরও চোখের পাতা জলে টই-টম্বুর। কুসমী বলে, ও কী ঠাকুর-জি্য? তুমি কাঁদচো নাকি? কাঁদতে নেই। বেদানা অনেক আগেই দেখেচে ওর অবাধ্য চোখের জল। কিন্তু সে সান্ত্বনা দিতে পারচে না। তার গলা ভারী হোয়ে এসেচে। সান্ত্বনা দিতে গিয়েও নিজেই কেঁদে ফেলবে। তার চেয়ে ও কাঁদুক। মনের আবেগ মিটায়ে কাঁদুক। এ কান্নায় ওর খুশী আছে। এ খুশীর থেকে বেদানা তাই চায় না ওকে বঞ্চিত কোরতে।

স্বল্প সংক্ষিপ্ত ভাষণ বিশপের এবং ঐ একই মামুলী গদ,—যিশু একমাত্র ত্রাণকর্তা। আমাদের অনন্ত জীবন যিশুতে আছে। তাকেই ভজনা করো।

চুরি কোরো না, পরদ্রব্যে লোভ কোরো না। ইত্যাদি। এর পর বিশপ নিজের হাতেই শিশুদের চকোলেট বিতরণ করেন। তারপর প্রার্থনা। তারপর সভা ভঙ্গ।

ইস্কুলের দ্বারোদঘাটন কোরে বিশপ চলে যাওয়ার পর বেশ কিছু দিন চলে যায়। পুব আকাশ ফ্যাকাশে হোয়ে ওঠে। সাথে সাথে গীর্জায় ঘণ্টা বাজে—ঢং-ঢং-ঢং। মেয়ে-পুরুষমহল চার্চে যায়। যোগ দেয় প্রার্থনায়। তারপর যে যার বাড়ি ফেরে। দৈনন্দিন কাজে চলে যায়।

দেখতে দেখতে জমজমে হোয়ে ওঠে ইস্কুল। চার পাঁচজন মাস্টার আসে। বাঙালী, কেরালিয়ান, আমেরিকান খৃষ্টানরা। এবার আর সাঁইপণ্ডিতের মুচি ছাত্তরের ইস্কুল না। খৃষ্টান মিশনারী ইস্কুল। তাই অমুচি ছেলেরাও পিল পিল কোরে সেঁধিয়ে যায় ইস্কুল ঘরে। ছাত্তর সংখ্যা দিনকে দিন বাড়তে থাকে জ্যামিতিক হারে। যার ফলশ্রুতি বুড়ি ভদ্দরের তীরে সাঁইপণ্ডিতের ইস্কুলে মুচি-অমুচি ছেলেদের মধ্যেকার যে গণ্ডী রেখা টানা ছিলো সেটাকে দেয় একদম নিশ্চিহ্ন কোরে।

ধোরে বেঁধে রাখার মতন কোরে যে কুসমীকে ময়না আটকে রেখেছিলো বিশপ আসা পর্যন্ত—সেই বিশপ আসেন। ইস্কুলের দ্বারোদঘাটন কোরে চলে যান। তারপর নোতুন মাস্টাররা কাজে যোগ দেন। জমকে ওঠে ইস্কুল। কুসমী কিন্তু নড়ে না। কাকমারার কাকের কথাও বুঝি ভুলেই ফেলেছে একদম, গাঁয়ের লোকেরা অবাক হোয়ে যায়। পাড়ার লোকেরা আরো অবাক। অভয় কাকার বাড়ি ছেড়ে কুসমী বড়ো একটা কোথাও বেরোয় না। দৈবী-সৈবী ময়নাদের বাড়ী ছাড়া। ময়না অবিশ্যি মাঝে-সাজে জিগ্যেস করে :

—কবে যাচ্চো বৌদি? কুসমী নানান্ ছুতো-নাতা শুধায়। কাকা বাড়ি নাই। ছেলের অসুখ। ওর নিজের শরীর খারাপ। এমনই একটা না একটা কিছু।

হঠাৎ একদিন সকালবেলা উঠে আকাশ থেকে পড়ে মুচিপাড়া। আথে কোমরে আঁচল জড়িয়ে বাড়ির কাজে লেগে গেচে কুসমী। মানে অম্বর বাড়ি গিয়ে উঠেচে। অম্বর কোলে বাচ্চা ছেলেটা। উঠোনের কোণে রোদ পিঠ কোরে বোসে আদর দিচ্চে শিশুকে।

সেদিনই বিকেলে ময়না বেদানাকে সাথে কোরে বেড়াতে যায় ওর অম্বদাদার বাড়ি। আথে বাড়ীর ভোল একদম পাল্টে গেছে। উঠোন যেন হাসছে। তকতক্

ঝকঝক্ কোরচে নিকোনো ঘর-দোর। সিঁদুর পলে খুঁটিয়ে নেয়া যায়। অনেকক্ষণ ময়নাদের আটকে রাখে কুসমী। ওর জীবনের অনেক গল্প শোনায়। গোঁসাইয়ের কাছে ও আর ফিরে যাবে না। সে পঞ্চরামের কাছ থেকে ওর স্বার্থ-সিদ্ধি কোরে নিয়ে এসেচে। সে স্বেচ্ছায় ঘর ছেড়েছিলো। গোঁসাই ওকে গুন-গেয়ান কোরে নিয়ে যায় নি। এখোন কুসমীর ওর শিখণ্ডী স্বামীর কাছেই থাকবে, থাকবে আয়ানের পাশে রাধার মতন। সে জানে না স্বামী কী সুখের লালসায় ওকে ছত্তিরিশ বছর পর্যন্ত আঁকড়ে রেখেছিলো। সেই না জানা সুখের লেগেই স্বামীর পাশে চিরদিনের মতন ও থেকে যাবে। অন্য কিন্তু অন্যরকম বুঝলো, গোঁসাই ওকে গুন-গেয়ান কোরেই বের কোরে নিয়ে গেছিলো। মন্তর-তন্তরের কাজ চিরদিন থাকে না। মেয়াদ ফুরিয়ে গেছে। বৌ চলে এসেচে। কুসমী কি ওর তেমন মেয়ে-মানুষ?

সেই যে সেদিন রাতে দিদি শাশুড়ী রূপো শশী আর মাদারীকে একরকম জোর করেই টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে ঘরের দখল দিয়েছিলো সে দখলি স্বত্ব শশী আর ছাড়লে না। ফলে তারণকে গিয়ে উঠতে হোলো টোঙে। মন্থরা প্রথম বারান্দায় শুতো। কিন্তু দু-এক রাত পরে তাকেও তারণের পাশে টোঙ ধরা কোরতে হয়। কেনো না ছেলে-বৌ সারারাত কী সব ভিটির-ভিটির করে। খস্-খুসানি। জড়াজড়ি, ক্যাত-কেতী। দুটো রাত মন্থরা চোখের পাতা বুজোতে পারেনি। এরপর থেকে ও ঘরের সম্পর্ক এ রকম চুকিয়েই ফেলেছে কি তারণ, কি মন্থরা। বিশেষ কোরে রাতের বেলায় তা।

আটটার আগে শশীর ঘুম ভাঙে না আজকাল। ঘুম হয়তো ভাঙে। ওঠে না। সারারাত ফুরতি করে। ভিট্‌মন্তর পড়ে বৌ-এর সাথে। তাই শেষরাতে হয়তো বা ঘুমিয়েই পড়ে। মাদারী কিন্তু রোজ ভোরে ভোরেই ওঠে। ঘরের কাজে লেগে যায়। অনেকদিন শশী উঠতে দেয় না। বলে:

আর একটু শোও। এখোনো ফরশা হয়নি। রোদ ওঠেনি। কিন্তু মন্থরা তার অনেক আগেই উঠে গেছে। গোবর-ছড়া দিচ্চে। চুড়ির টুং-টাং আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। ঝাঁটার শব্দ কানে আসচে। তখোন জোর কোরেই উঠে যায় মাদারী। কোনো কোনো দিন জুলুম কোরেই শশী কোলের মধ্যে টেনে নেয়। ওর বুকের পরে ওঠে। তারপর একরকম জোর-জবরদস্তিই বলা চলে।

তারণ ডাকতে ডাকতে হয়তো বা কাজে এসে বোসলো একটু শশী। হাত-খানেক চাঁচ বুনলো। এক আধ গোছা শলা বানালো বা। পরক্ষণে উঠে গেলো।

আবার সেই ভিট্‌মন্তর পড়া শুরু। তিতে ত্যক্ত হোয়ে যায় তারণ। মুখ খিঁচি করে মন্থরার সাথে। বলে:

—ছাগোলের হোলো কী। মেয়ে-মানুষ পেয়ে মনে ভাবচে পাঁঠা আমি কী হনু? নলের গুড়ের পাটালি পেয়েচেন পাঁঠার-পাঁঠা।

মন্থরা মুখ টিপে হাসে। তারপর রসান দিয়ে বলে:

ক্যানো? তুমি যে বোলতে, ঘানে জুড়ে দিলে ষোলো চুঙোর বুদ্ধি এক চুঙোয় ঢুকবে। তাই ঢুকেছে বাচাধনের। এখোন অমন কোঁতরা-কুতরি করো ক্যানো?

—সব তেলানি মাটো। বলতে বলতে তারণ শলা বানানোর তলতা বাঁশের ফালি টেনে নিয়ে চিরতে লেগে যায়।

বিয়ের পর শশী কী ঘর, কী পর সবারই কাছে ঠাট্টা তামাসার, ভৎ´সনার পাত্র হোয়ে দাঁড়িয়েচে। ওর সাঙাতরাও কী কম ছ্যাঁচন ছ্যাঁচে ওকে? অবিশ্যি ইষ্টম বেঁচে থাকলে মাত্রা ডিঙিয়েই যেতো ঐ ছ্যাঁচনটার। তবু বোষ্টম কী ছেড়ে কথা কয়? সে প্রায়ই বলে, তুই শালা মেয়ে-মানুষ খোর। শালা মাগীর পোঁদের কাছ থেকে একদণ্ড নড়তে চাস নে।

বোষ্টমের বক্তব্যটা অতিরঞ্জিত মোটেই না। বিয়ের পর বাড়ি ছেড়ে এ রকম বেরোয়ই না সে। রাত প্রবাস তো উঠেই গেছে।

শশীর হাট গেছে। মাঠ গেছে। ঘাট গেছে। এমন কি সব চেয়ে ঝাঁকালো নেশা শিকার, তাও ছেড়েছে সে। তবে মালীরবাগে অবিশ্যি সে যায়। কিন্তু শিকার কোরতে না। বিহার কোরতে। কাঠ কুড়োনোর ছল কোরে মাদারীকে সাথে নিয়ে যায় মালীরবাগে। বন পুঁই কোকালতা, কুকুরে আলুর কষাড় জঙ্গলে ঢোকে। শুকনো পাতা কুড়োয়। ডাল কুড়োয়। নাগরভাটার ডিম খোটে। এই ডিম খুঁটতে বসে চঞ্চল হোয়ে ওঠে শশীর মন। মাদারীর বুকের মধ্যে হাত ঢুকোয়। হাত ঠেলে দেয় মাদারী। ফিস্‌ফিসিয়ে বলে, ছি। কিন্তু ঐ পর্যন্ত। শশী নিমরাজী মাদারীকে পাতার বিছেনায় শোয়ায়ে ফেলে। এরপর ছোটোখাটো দু-একটা ঠেলা নিশ্চয় খেতে হয় শশীকে। তারপর মাদারীই আকর্ষণ করে ওকে। নিবিড় আকর্ষণ।

সুখোর সাথে বনে ঢোকার সময় শশীর মনে ছিলো ভীরুতা, ত্রস্ততা। কিন্তু মাদারীর বেলায় সে ভীরুতা থাকলেও হালকা। যদিও ওদের এ-গোপন কীর্তি ফাঁস হোয়ে যায়, লজ্জার কথা হোলেও কেলেঙ্কারী নেই। লোকে হেসেই উড়িয়ে

দেবে। কেননা, লোকেই তো ঢাক-ঢোল বাজিয়ে ঘড়ি-ঘটা কোরে মাদারীকে সঁপে দিয়েছে শশীর হাতে। তাই মাদারীর সাহচর্য নির্বিঘ্নিত। রতি সুখে চরম অভিষিক্ত। তবু সুখোর কথা একদম ভুলে ফেলেচে শশী এ বললে অন্যায় বলা হবে। নির্জলা মেঘের গায় মরা ঝিলিকের মতন মাঝে মাঝে ঝিলিক দেয় ওর মনের আকাশে।

রেভারেণ্ড প্যালকের দৌলতে মুচিপাড়ার পরিস্থিতিটা অনেকটা বদলাতে শুরু কোরেচে। অর্থনীতির দিক থেকে নয় অবিশ্যি। বাইরের চাকচিক্যর দিক থেকে, চলাফেরার দিক থেকে। আর কুসংস্কার ঠাসা মনের দিক থেকে। আমাদের দিগন্ত ছিলো কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। ইংরাজী শিক্ষার ফলশ্রুতি আর যা-ই না করুক এই সংস্কারের কুয়াশা সরিয়ে দিয়েছে। এরই মধ্যে ইস্কুলের ধারে মাস্টারদের থাকবার কতকগুলো কোয়ার্টার উঠে গেচে। ক্লাব ঘর হোয়েচে। নাইট ইস্কুল গড়ে উঠেচে। প্যালক সাহেবে এখানে একরকম স্থায়ী আস্তানা গেড়েচেন। সতীশ-বোষ্টমরাও নাইট ইস্কুলে ঢুকেচে। ঢুকেচে বয়স্ক খৃষ্টান-অখৃষ্টানরাও। পর্যক্রামক দোষের আগল নেই বলেই ঢুকতে পেরেচে এখানে।

সংস্কারের আওতা থেকে সরে আসতে থাকা এমনই মুহূর্তে একদিন মন্টুঠাকুর পিসিমার নিকট প্রস্তাব করেন :

—পিসিমা অনেকদিন থেকে আমি একটা কল্পনা কোরে আসচি। এখোন সেটাকে রূপ দিতে চাই। বোঝো তো রূপ দেওয়া কাকে বলে?

ভবানী পিসি ফ্যাল ফ্যাল কোরে তাকান, না তো, কী রে?

—মানে হাতে-কলমে কোরতে চাই।

পিসিমা আরো উৎসুক হোয়ে ওঠেন। জানতে চান, কী রে সেটা?

মন্টুঠাকুর ঢোক গিলে নিয়ে বলেন :

—জানো তো তুমি পিসিমা, মুচিদের কোনো জমি-জায়গা নেই!

পিসিমা বলেন :

—খুব জানি। ওদের ভিটে বাড়িটুকো তো ওদের না। বাবুরা এতোদিন তো তুলেই দিতো। কেবল পাদরী সায়েবের ভয়ে পারচে না।

—ঠিকই বলেচো। তবে তুলতে আর পারবে না। বড়ো জোর খাজনা আদায় কোরতে পারে। তাও একদিন মুকুব হোয়ে যাবে।

—যাবে! কবে রে? বিশাল হোয়ে উঠে পিসিমার চোখ জোড়া।

হাসতে হাসতে মন্টুঠাকুর বলেন :

—শিগ্‌গির-ই।

—আমরা দেখে যেতে পারবো ?

—পারবে বই কি। সে কথাই তো বোলচি। শোনো :

ভবানী পিসিমা গ্যাঁট হোয়ে বসেন মন্টুঠাকুরের মাদুরের ওপোর, মন্টুঠাকুর বলে যান :

—আমার যে ক' বিঘে জমি আছে পিসিমা, মনে কোরচি মুচিদের দিয়ে দেবো। তা বলে তুমি যেন মনে কোরো না, আমি এটা দান কোরচি ওদের, দান করার কোনোই কথা ওঠে না। কারণ এ জমির নেয্য শরিক ওরাও। ওদের শরিক-আনা স্বত্ব ফাঁকি দিয়ে বাপ-ঠাকুর-দাদাদের আমল থেকে আমরা ভোগ কোরে আসছিলাম। এখোন সেটাই ফিরিয়ে দিতে চাইছি পিসিমা। এ আমার দানও না। দয়াও না। এখোন তুমি কী বলো ?

ভবানী পিসিমা উত্তর দেন :

—সত্যিই যদি এ তোদের ফাঁকি দেওয়া সম্পত্তি হয় মন্টু, এখুনি ফিরিয়ে দে তা হলে। আমার আশীর্বাদে তোর অভাব হবে না।

—সত্যিই পিসিমা, এ জমি ফাঁকি। একদম জবর দখল। এ চালাকি আর বেশী দিন টিকবে না। কাল যা হবে আজ তা আমি স্পষ্টই দেখচি। তাই এ মনন কোরেচি পিসিমা।

—বেশ তাই কর। তবে সুশান্তর জন্যি একটুকরো রেখে দিস। একটু মাটি থাক ওর।

রাখতে চাইছিলাম না। কেননা যারা মাটির মানুষ মাটি তাদেরই হোক। ঐ যে অতো বড়ো একটা বিল। এতো মাটি, এতো ধান, এতো সোনা। এ পাড়ার একেবারে শিয়রে, তবু এদের এক টুকরো মাটি কি একমুঠো ধানের শরিক হোতে পারলো না ওরা। কিন্তু এর শরিকানা স্বত্ব ওদের হাতে এলো বোলে পিসিমা। এ কেউ ঠেকাতে পারবে না।

প্রশস্ত চোখে চান ভবানী পিসিমা। বলেন :

—তাই হোক, বাবা মোনো। তাহলে আমি খুশী হবো খুব, আমার বাবা গোঁসাইও তাই চান, ভালো কথা মোনো, বাবা গোঁসাই একদিন এক সন্ন্যাসীর কথা বলছিলেন, কী যেন নামটা ? সেই ভূদানযজ্ঞ না কি কোরচেন।

মন্টুঠাকুর হেসে ওঠেন, ও ভাবেজী। বিনোবা ভাবে তাঁর নাম পিসিমা।

—তিনি বুঝি গরীব দুঃখীদের ভূমিদান কোরবার ব্যবস্থা কোরচেন না

ঝোনো ?

—একরকম তাই। তবে তিনি যা ব্যবস্থা কোরচেন সেটা ঠিক না পিসিমা। ওতে সমস্যা মিটবে না।

পিসিমা প্রশ্ন করেন :

—ক্যান রে ? একটু বুঝিয়ে বলতো আমায়।

ভূদান-যজ্ঞের ওপোরে মনুঠাকুর বেজায় চটা।

তবু পিসিমা যখোন শুনতে একান্ত আগ্রহী, বোলতেই হয় তাঁকে, বলেন :

—শোনো পিসিমা, তোমার সেই সন্ন্যাসী ঠাকুরের ব্যবস্থাটা। জমিদার-জোতদারদের দোরে দোরে ভূমি ভিখ্যে কোরে বেড়াচ্চেন তিনি। মস্ত জমির মালিক তাঁরা। মরা অকেজো জমি মানে যেখানে না ফলবে ফসল, না হবে ঘর দোর, তাই এক আধ টুকরো দিচ্চে কেউ কেউ। ঐগুলো উনি তাদের দেবেন যাদের জমি-জায়গা নেই। ফকির সেজে দয়াপ্রার্থী হোয়ে দোর দোর ঘুরচেন তিনি। কিন্তু দয়া কি ভিখ্যের কোনো কথা নেই এতে পিসিমা। ভগবানের কাছ থেকে জোতদার জমিদাররা কিছু মৌরসী স্বত্ব লিখে আনেনি জমিদার। বরং সে কায়েমী স্বত্ব তাদের যাদের মাটি নেই, যারা মাটি ছানে, গতর ঘামায়, ফসল আজ্জায় তাই ভাবেজীর ঐ ভিখ্যেবৃত্তি দিয়ে হাতে আসবে মরা জমি, অকেজো মাটি। তার ফলশ্রুতিও হবে অকেজো মরা।

সাঁইপণ্ডিতের স্বপ্নের পাপড়ি খুলতে থাকে। মানে খুলতে থাকে মুচিদের চোখ। জমির মালিক হওয়া পাপ। লেখাপড়া শেখা বংশহানির কারণ। এ ভ্রান্তি ছুটে যায়। ঠিক রোদ উঠলে কুয়াশা যেমন, মুচিরা বুঝতে থাকলো, সোনামুখী বিল ওদের মুঠো ভোরে সোনা দিতে হাত বাড়িয়েচে। সে সোনার ওরাও শরিক। ভৌম লক্ষ্মী উদার বুক দিচ্ছেন, মা যেমন স্তন দেন ছেলেকে। ধানের শীষ বাতাসের সুরে সুর মিলিয়ে বোলচে, এ-দুধ পান কর। এ-ভোগ গ্রহণ কর। প্রত্যাখ্যান করা পাপ। এমনই উর্বর লগ্নে মনুঠাকুর একদা তিন বিঘে মাত্তর জমি সুশান্তর জন্য রেখে বাদ বাকীটা দিয়ে দেন মুচিদের। যৌথভাবে ঐ জমি মুচিরা চাষ কোরবে আর ফসল বণ্টন কোরে নেবে সমান ভাগে। এমনই কোরে অনাগত যুগের ছবি তুলে ধরলেন তিনি জনতার সামনে।

চার বছর পরের ঘটনা। কী একটা পর্ব অথবা রোববার উপলক্ষে সুশান্ত বাড়ি আছে সেদিন। কেশবপুর ইস্কুল থেকে মাইনের পাশ কোরে সে এখোন বিদ্যানন্দ-কাটি আর, বি, ইনষ্টিটুশনে পড়ছে। সে এখোন থার্ড ক্লাসের ছাত্তর। মানে অষ্টম-

শ্রেণী। সে পায় পায় খড়ের জমির দিকে যায়। সেখানে নিয়ো-বিপ্‌নে খড় কাটচে। মনুঠাকুরের সাত বিঘে ঐ খড়ের বন্দটা গুটিয়ে দু বিঘেয় আনা হোয়েচে। মানে বাকী চার বিঘেয় শুরু হোয়েচে ধান চাষ। আউস ধান। ঐ জমির উত্তর-পশ্চিম কোণায় একখানা দু চালা ঘর উঠেচে। উদ্দেশ্য ছিল ঐ ঘরখানা বাবুই তাড়ানোর। ধান পেকে উঠলে বাবুই পাখির ঝাঁক এসে পড়তো পাকা ধান খেতে। তাই নিয়ো পটপটে বাজিয়ে বাবুই খেদাতো এ-ঘরে বসে। তারপর মুচিপাড়ায় মড়ক লাগলো। তখোন নিয়ো, বিপ্‌নে আর তার বৌ এসে উঠলো ঐ ঘরে। সেই থেকে ঐ ঘরেই আছে তারা। মড়ক থেমে গেলে আর বাড়ি ফেরেনি, খৃষ্টানও হয়নি।

সুশান্তর পাঠশালার সে বাতিক এখোনো বজায় রেখেছে। ফাঁক পেলে পোকা-মাকড়, ধান ঘাসের নাম দিয়ে এখোনো যা তা ভরতি করে। আজ অবিশ্যি ঐ উদ্দেশ্য নিয়ে নিয়ো-বিপ্‌নেদের ধারে ওর আসা।

সুশান্তকে এগিয়ে আসতে দেখে নিয়ো ডাকে :

—এসো, খোকাঠাকুর। আজ তুমি ইস্কুলে যাও নি যে?

—না রে, আজ তো ছুটি।

—ও ছুটি?

হ্যাঁ। কিন্তু সেই একদিনের কথা তোর মনে আছে? বল তো কী বোলেছিলি?

নিয়ো হাতড়াতে থাকে ওর মনের খাতা। কিন্তু খুঁজে পায় না। বলে :

—কী খোকাঠাকুর? বেজি? না খয়রা? ও টিয়ে পাখীর ছা তাই না?

—তোর মুণ্ডু। মনে নেই! একদিন বোলেছিলি, তোদের পাড়ায় নিয়ে যাবি। মেলা পোকা-মাকড় আছে। তাদের নাম লিখিয়ে দিবি। মনে নেই?

—ও-ও। সে কবের কথা! ঐ কি মনে থাকে?

—আমার তো আছে, চল। আজই।

—আজগের? ক্যানো কাল তোমার ছুটি নেই খোকাঠাকুর?

—ছুটি? কালকের দিনও ছুটি আছে। কিন্তু কাল বললে আর হবে না। এই ত্যাখ, কতো বড়ো খাতা এনেছি। বলতে বলতে সে একখানা রঙীন মলাটওয়ালা একসারসাইজ খাতা বের কোরে নিয়োকে দেখায়। সুন্দর-সুরম্য বাঁধাই খাতা দেখে অবাক হোয়ে যায় নিয়ো। বলে :

—কাল ঠিক যাবো খোকাঠাকুর। আজ খড় কেটে সাবাড় কোরে নেই।

তা'হলে আর বট্ঠাকুর বকতে পারবে না।

তবু পিড়াপিড়ি করে সুশান্ত। বলে :

—ও তোর মনে থাকবে না নিরো। কোথায় কোন্ মাঠে হয়তো ডুব দিবি। খুঁজে পাব না।

—না খোকাঠাকুর। ঠিক মনে থাকবে। কাল না হলে আর হবেও না। আমরা তো চলে যাচ্চি তোমাদের বাড়ি থেকে।

বিস্ময় ফুটে ওঠে সুশান্তর চোখে-মুখে, ক্যানো রে?

—বটঠাকুর তো আর জমি-জমা রাখলো না। সবই মুচিদের বিলিয়ে দিলো।

সুশান্ত সে-কথার কোনো জবাব দেয় না। বলে :

—কাল কিন্তু খুব সকালে যাবি। বলতে বলতে মাঠমুখো চলে যায় সে। বোধ করি নোতুন কোনো পোকা-মাকড়ের সন্ধানে।

সত্য কথাই বলেছিলো নিরো। গোটা মুচিপাড়াটা একটা মস্ত পোকা। আর তার গা-ময় কিলবিল কোরচে অজস্র পোকারা। সুশান্তর স্বজাতি পোকারা। পোকার মতন জন্মমৃত্যু তাদের। পোকার মতন আহার্য। পোকার মতন জীবন-যাপন। সারাদিন ধরে নিরোর সাথে সুশান্ত মুচিপাড়া ঘুরলো। খাতা ভরে লিখলো তার স্বজাতীয় পোকা-মাকড়দের নাম। ওর জীবনের দিগদর্শনের কাঁটা গেলো ঘুরে। খুলে গেলো ওর তৃতীয় চোখ। এতোদিন ভূগোলে পড়ে এসেছিলো সুশান্ত দুটো মেরুর কথা,—উত্তর মেরু আর দক্ষিণ মেরু। এবার নোতুন ভূগোলের খোঁজ পেলে সে। আর আবিষ্কার কোরলে ওদের ঘরের দোরেই আর একটা মেরুপ্রদেশ।

—তৃতীয় মেরু। এখানেও এস্কিমোদের গেয়াত-গোত্তররা আছে। এদেরও জীবন তেমনই দুর্গম। দুঃখের রুক্ষ শিলা ঠিক তুন্দ্রাদেশের বরফের মতনই আঘাত হানচে এদের। মরণ-ব্যাধি-বেদনা এখানে অজস্র সহস্র ভূমিকায় রাতদিন নামচে। মঞ্চস্থ কোরে চলেচে একের পর আর নাটক। জমিদার-মহাজন-মুনাফাখোরদের অত্যেচার, রোগের যাতনায়, চুরির দায়ে, সাপের কামড়ে, উপোষে অহরহ পুড়িয়ে মারচে নিরীহ এই পোকাগুলোকে। চোখভরা জল আর খাতাভরা এই পোকা-মাকড়দের ইতিকথা নিয়ে সন্ধ্যের সময় বাড়ি ফেরে সুশান্ত।

থার্ড ক্লাশ থেকে সেকেণ্ড ক্লাশে অর্থাৎ নবম শ্রেণীতে উঠলো সুশান্ত প্রথম হোয়ে। সে বছর সারা ভারতবর্ষে গান্ধীজির হরিজন আন্দোলনের বেজায় তোড়। সে ঢেউ লাগলো এসে সুরপুর-ঘরভাঙায়। বাবুরা ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

গোবিন্দদেবের মন্দির প্রাঙ্গণে মজলিস বসলো। সে মজলিসে ডাকা হল মুচিদের। ডাক পড়লো গ্রাম-গ্রামান্তরের মোড়ল মাতব্বরদের। হ্যাজাক জ্বলল। শামিয়ানা টাঙানো হোলো। পাতা হোলো উঠোনজোড়া সতরঞ্চি। জমজমে মিটিং বসলো। অস্পৃশ্যতাবর্জন সম্পর্কে সভায় যে যার বক্তব্য রাখলেন। তারপর ভোটাভুটি হোলো। মুচিদের তুলে নেয়া না নেয়ার পক্ষাপক্ষে। এবং তার ফলশ্রুতি বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ কোরলে মুচিদের তুলে নেয়ার পক্ষ। কিন্তু একটা শর্ত খাড়া কোরে তারাপদ ভট্টচায্যিরা ক্যাঁকড়া তুলে বসলেন। মুচিদের গো-মাংস ছাড়তে হবে। ছাড়তে হবে চামড়া কাটা, চামড়ার কারবার।

মন্টুঠাকুর প্রতিবাদ আনেন :

—গো-মাংস খাওয়া না খাওয়া মুচিদের রুচির ওপোর নির্ভর করে। শখ হয়, খাবে। না হয়, খাবে না। কিন্তু চামড়ার কারবার বন্ধ কোরলে অর্থনীতির দিক থেকে মুশকিল আসবে। ওরা বাঁচবে কী কোরে তা হলে ?

প্রতিবাদের প্রতিবাদ করেন তারাপদ ভট্টচায্যি :

—ক্যানো ? বাঁশ আছে। বেত আছে। জোন-মজুর খাটা আছে। তা দিয়েই স্বচ্ছন্দে চলবে ওদের। চামড়া না কাটলে বুঝি সংসার অচল হোয়ে যাবে ওদের। কী যে বলো তুমি মন্টু !

মন্টুঠাকুর তর্ক করেন :

—কিন্তু চামড়া যদি ওরা না কাটে, কে কাটবে ? চামড়া শিল্প তো নষ্ট হোয়ে যাবে দেশ থেকে। তার কী···?

তারাপদ ভট্টচায্যি চটে ওঠেন :

—কিন্তু চামড়া যদি ওরা কাটে কে তুলে নেবে ওদের ? তুমি পারবে ওদের হাতে খেতে ?

—আমি ? ক্যানো পারবো না ?

—তা তুমি পারতে পারো। আমরা পারবো না মন্টু। বড়োবাবু কী বলেন ? মেঝোবাবু ? আপনারই বা মত কী ?

মিটিং উপলক্ষে বড়োবাবু মেঝোবাবুরা এসে গেচেন। গান্ধীজির মস্ত বড় চেলা এরা। ভট্টচায্যির বক্তব্য শুনে দুজনেই একসঙ্গে বলে ওঠেন :

ছি! ছি! ছি! রাম! রাম! রাম! মন্টুঠাকুর মশায়ের ঘাড়ে ভূত ঘেঁতেছে। ওনাতে আর উনি নেই। মুচিরা গোরু খাবে। চামড়া ছানবে। আর আমরা ওদের ছোঁবো! হাতের খাবো! একথা উনি বলতে পারলেন

বামুনের ছেলে হোয়ে।

মন্টুঠাকুরও সুরে সুর মিলোন :

—ক্যানো পারবো না বড়োবাবু? মোছলমানরা গোরু খায়। খৃষ্টানরা খায়। বুদ্ধরাও। তাদের ছোন কী কোরে? তাদের সাথে ওঠা বসা করেন কী কোরে? কী কোরেই বা তাদের বাড়ির রস, গুড়, পাটালি খান? না তারা খায় জ্যান্ত গোরু। আর মুচিরা মরা? এইজন্য নাকি বড়োবাবু?

বড়োবাবুর মনের উষ্মার উদ্রেক হয়। কিন্তু মনের মতন জবাব খুঁজে পান না তিনি। তবু কিছু একটা বলতে হয়। তাই বলেন :

—সে আলাদা কথা। ওরা আমাদের ঠাকুর ঘরে ঢুকতে পায় না। মুচিদের যদি গোবিন্দদেবের মন্দিরে উঠতে হয়, ওদের হাত দিয়ে যদি আমাদের প্রসাদ নিতে হয় তবে ওসব নোংরামি ছাড়তে হবে আগে।

—কিন্তু মুচিরা যদি চামড়া কাটা ছেড়ে দেয় শুধু দলে উঠবার জন্য, তাহলে আপনার পায়ের জুতো বানাবে কারা? কারা বা ছাইবে ঢাক-ঢোলকের তলা। আপনার মন্দিরের দেব-দেবীর চিত্তবিনোদন কারাই বা কোরবে বাজনা বাজিয়ে? হ্যাঁ বড়োবাবু?

বড়োবাবু আমতা আমতা কোরে বলেন :

—ক্যানো? কারিগরের কী অভাব হবে? কোলকাতায় চীনে বাজার দেখে এসো। সেখানে কী ভাবে জেঁকে বোসেচে মিস্তিরীরা।

মুখে একরকম শব্দ কোরে মন্টুঠাকুর জবাব দেন :

—বলিহারি পরিকল্পনা। দেশের শিল্প বিদেশীরা এসে দখল কোরে বোসল। আর দেশী শিল্পীদের আমরা দ ল তুলে নিলাম। কী ভাঙা ঘরই না গড়ে দিলাম ওদের। ওর মধ্যে মন্টুঠাকুর নেই বড়োবাবু। যদি ডিগনিটি অব লেবার না দিতে পারেন মুচিদের, তা হলে ওরা যেখানে আছে সেখানেই থাক।

—তার মানে? প্রশ্নকর্তা মেঝোবাবু।

শ্রেণীবৈষম্য তুলে দেন বড়োবাবু। কিন্তু ছোটো-বড়ো সব কাজকে সমান চোখে দেখতে শিখুন। সমাজের তাগিদে মুচিরা কোরবে জুতো সেলাই। আর ভট্‌চায্যিরা কোরবে চণ্ডীপাঠ। কিন্তু মানুষ হিসেবে আমাদের ঠাঁই সমান। প্লাটফরম এক। এই শর্তে যদি পারেন তবে ওদের তুলে নেন গে।

বলতে বলতে মন্টুঠাকুর মিটিং থেকে বেরিয়ে যান। অনেক রাত পর্যন্ত ঘোট মোঙ্গল হয়। তারপর তারাপদ ভট্‌চায্যি প্রমুখ মাতব্বরদের প্রস্তাবে আবার

ভোটাভুটির পালা শুরু। আর ওই ভোটে মনুঠাকুরের ঘটে শোচনীয় পরাজয়।

মাত্তর পাঁচ-সাত ঘর মুচি ছাড়া বাদ বাকি সবাই খৃষ্টান হোয়েচে। বাবুরা একদিন খৃষ্টান পাড়ায় এলেন ওই মিটিংয়ের পর এবং বক্তব্য রাখলেন মাতব্বরদের কাছে। ওরা যদি ফের ইচ্ছে করে তা হোলে এ-হরিজন আন্দোলনের সুযোগে আবার হিন্দুধর্মে ফিরে আসতে পারে। বাবুরা আগ্রহ দিয়ে ওদের গ্রহণ করবেন। এমনকি ছোটোবাবু এও ব্যক্ত কোরতে ভুললেন না, মুচিদের অবর্তমানে পুজোর চণ্ডীমণ্ডপ একদম কানা পড়ে গেছে। ওরা যদি আবার ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে আসে, তাহলে ঢাক-ঢোলকের-সানাইয়ের সুরে আবার মধুর হোয়ে উঠবে সমারোহ। কিন্তু অনেক বলা-কওয়া সত্ত্বেও রাজীনামা দেয় না মাতব্বররা। আরো দুদিন সময় দেয়া হয় ভাববার। কিন্তু মত বদলায় না মাতব্বররা। বলে হিঁদু থেকে আমরা হিঁদুরের কাছে অছুৎ ছিলাম। খৃষ্টান হোয়ে উঠে গেছি। এখোন বাবুরা পর্যন্ত আমাদের বাড়ি আসে। মাদুরে বসে। হুঁকোর মাথা থেকে কলকে তুলে নেয়। তামাক খাওয়ার ইচ্ছে করে। আমরাও বাবুপাড়ায় গেলে উঠোনে আর তুলসী-জল ছিটোয় না। এরপর আর কথা কাটাকাটি চলে না।

যা হোক নির্দিষ্ট দিন মাফিক গোবিন্দদেবের মন্দিরে মুচিদের চান্দ্রায়ন ব্রত অনুষ্ঠিত হয়। আর ধেনু ভক্ষণজনিত জন্ম-জন্মান্তরীয় পাপক্ষয় কামনায় সাড়ে বাইশ কাহন ধেনু মূল্য এবং তৎসম পরিমাণ দক্ষিণে দিয়ে ঋষি পুত্রগণ দলে উঠে যায়। খুব জাঁকজমক কোরে ধামা ধামা বাতাসা হরিলুট দেওয়া হয়। আর প্রসাদ বিতরণের ভার পড়ে অন্ন মুচা দু-ভায়ের ওপোর। স্বয়ং তারাপদ ভট্চাযি্য মশায় সপ্ত সাগর মিশ্রিত গঙ্গা জল ঢেলে দিয়ে যুগ যুগ ধোরে চামড়া ছেনা হাত শুচি কোরে দেন। এবং প্রসাদ বিতরণের পর হরিজন আন্দোলন সফল কোরে যে যার ঘরে চলে যান।

অনেকদিন মাদারী বাপের বাড়ি যায়নি। সেদিন ঝোড়ো এসেচে মেয়ে নিতে। মনের দিক থেকে মাদারীর অবিশ্যি বাপের বাড়ী যাওয়ার খুব ইচ্ছে না। শশীরও ইচ্ছে না বৌ পাঠানোর। কিন্তু তারণ কি মন্থরা আটকাতে চায় না। নোতুন কুটুমের সাথে চায় না ওরা অ-সরস কোরতে।

তারণ বলে :

—বেয়াই, বৌমাকে নিয়ে যেতে এসেচো। তা কবে দিন ?

ঝোড়ো বলে :

—কাল-পরশু যেদিন হয়।

—কিন্তু দিন-খ্যান না দেখে অ-দিনে অ-খনে তো পাঠানো যায় না। কাল ঠাকুরবাড়ি থেকে দিন জেনে আসি।

ঝোড়ো বলে :

—বেশ তাই হোক। অ-দিনে আমিও চাইনে নিয়ে যেতে।

পরদিন তারণ ঠাকুরবাড়ি যায়। মধুঠাকুর পাঁজি দেখে দিন ঠিক কোরে দেন। আসচে সোমবার। মানে আজ থেকে তিনদিনের দিন।

বাধ্য হোয়ে তিনদিন ঝোড়োকে থাকতে হয়। বরাবর তারণ খুব খোরচে মানুষ। কুটুম-সাখ্যেত এলে হেউ হেউ কোরে খাওয়ায়। ঝোড়ো আরো নোতুন কুটুম। অন্ত ভিন্ন কুটুম না। নোতুন বেহাই।

রাতে ঝোড়োর শোবার বিছানা হয় উত্তরের ঘরের বারান্দায়। মানে যে ঘরে শশী-মাদারী শোয়। আর বাসঘর তো মাত্তর ঐ একখানা। আর তারণ-মন্থরার তো বরাদ্দ টোঙ আছে।

মাঝ রাতে একবার তারণের ঘুম ভেঙে যায়। ঘর-কুটি আঁধার। বিছেনা হাতড়ে ভাখে মন্থরা পাশে নেই। চারদিক ফালুক-ফুলুক কোরে তাকায়। নিছিদ্র রাত আর নির্জনপুরী। হঠাৎ নজরে পড়ে আমতলার দিক থেকে একটা ছায়ামূর্তি এগিয়ে আসচে। মন্থরাই। তারণ চুপচাপ শুয়ে পড়ে। এবং ঘ্যাঁত-ঘ্যাঁত কোরে নাক ডাকিয়ে ঘুমোতে থাকে। মন্থরা চুপিসারে পাশে এসে বসে। গা ঝাঁকা দিয়ে ডাকে, ওগো, শুনচো ?

ঘুম ঘোরে উ-উ কোরে ওঠে তারণ। মন্থরা আবার গা ঝাঁকা দেয়, ওগো, শুনচো ?

—কী মুশকিল। বলচো কি ?

—ওঠো। বাইরে থেকে এসো গে। কই ? আবার গা ঝাঁকা দেয়।

এবার তারণ ওঠে। বাইরে থেকে পেচ্ছাব কোরে আসে। তারপর শুয়ে পড়ে। মন্থরার বুকের ওপোর একখানা হাত রেখে বলে, উঃ! এমন কাজ কোরেচো তুমি বৌ!

দুরু দুরু করে ওঠে মন্থরার বুক। ভীরু গলায় জিগ্যেস করে, ক্যানো! কী কোরেচি ?

—খাসা একটা স্বপ্ন দেখছিলাম। যেনো কোথায় এক বিয়ে বাজাতে গিয়েছি। খুব ধুমধাম কোরে বিয়ে হোচ্চে। হৈ-হল্লা। বাজি-বাজনা। বর দাঁড়িয়েছে উঠোনের মাঝখানে। টোপর মাথায় দিয়ে। ঘর থেকে মেয়ে নিয়ে আসচে

পিঁড়িতে বসিয়ে। সাতপাক হবে। ঠিক এমনই সময় তুমি গা ঝাঁকা দিলে। স্বপ্ন দেখে মনটা বেজায় খারাপ ঠেকছে।

—ক্যানো! বিয়ে স্বপ্ন তো ভালো।

—না, না। তুমি জানো না বৌ। বট্ঠাকুরের মুখে শুনেচি, বিয়ে স্বপ্নে দেখলে সে আর বেশী দিন বাঁচে না! চাপা নিশ্বাস ফেলে তারণ।

—তাই তো তোমার মন খারাপ। ও সব কিছু না। অমন কতোদিন বিয়ে স্বপ্নে দেখেচি আমি। ও খাটে না। বলতে বলতে মন্থরা কাৎ হোয়ে শোয়া আর চিৎ হোয়ে শোয়া তারণের গায়ের ওপোর একখানা ঠ্যাং তুলে দিয়ে দোলাতে থাকে। উদ্দেশ্য তারণের মনের মোড় ফিরিয়ে দেয়া।

তারণ বলে :

—তা না বৌ। মরণ? ওতে আমি ভয় পাইনে। শুধু একটা আক্ষেপ আমার।

—কিসের আক্ষেপ?

শশের একটা গুঁড়ো দেখে যেতে পারতাম! ওই এক মাত্তর সাধ আমার। আচ্ছা বৌ, ওর কী ছেলে-পুলে হবে না? বয়েস তো কম হোলো না।

মন্থরাও সায় দেয়, বয়েস কম! এতোদিন দুটো-তিনটের মা হোতে পারতো।

—তুমি ফকির-কাকার ছাখাও। নেহালউদ্দিনের থানে যাও একদিন।

—এবার ঘুরে আসুক বাপের বাড়ির তে।

পরদিন পিঠে গড়ার ধুমধাম। ঝোড়োকে বরাবর খাওয়ানোয় মন্থরার অগাধ খুশী। মনুঠাকুরদের ঢেঁকি থেকে চাল কুটে আনে। হরেক রকমের পিঠে বানায়,—কাঁচিপোড়া, পুলি, আধোসা, পাটি-সাপটা, সরু চুষি। সাজিয়ে দেয় মেটে শান্‌কির কানায় কানায়। দু বেহাই পাশাপাশি বসে। যাচাই কোরে পরিবেশন করে মন্থরা। হাসি-মস্করা চলে। পিঠের বোলোক আওড়ায় মন্থরা। আধোলা পাটি-সাপটার রূপক সম্পর্কীয় খিস্তি-খেউড় করে। বেহায়ের সাথে ঠাট্টা-তামাসার সুবাদ চিরকাল অর্গলমুক্ত। মন্থরা সেটাকে আরো আল্‌গা কোরে দেয়। তারণ কিন্তু তেমন মন খুলে ওদের এ রঙ-তামাসায় যোগ দিতে পারে না। বরাবরই সে অল্প কথা কয়। কেবল রেগে গেলে ওকে ঠেকানো দায়।

তারপর পান-তামাক খাওয়ার পর্ব।

আর এক পশলা হাসি-গল্প। তারপর বেহাইকে শুইয়ে দিয়ে পান খেয়ে ঠোঁট লাল কোরে শুতে যায় মন্থরা। তারণ তখোন নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে।

ওর পাশে গিয়ে শুয়ে পড়ে সে। তারণের গায় হাত দেয়। কপাল পর্শ করে। পাশ ফিরে শোয়। হাই তোলে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যায়। ঘুম নেই মন্থরার চোখে। তারণ কিন্তু অচেতন। সমানে তারণ নাক ডেকে চলেচে কামারের যাঁতার মতন। আরো খানিক সময় কাটে। সারা পাড়া পড়ে নিশুত হোয়ে। সোনামুখী বিল পারান্তরে শেয়াল ডাকে। গভীর রাতের বিজ্ঞপ্তি জানায়। এমন সময় চোরের মতন চুপিসারে মন্থরা ওঠে। হাতের চুড়ির আওয়াজ না হয়। মচমচ শব্দ না করে টোঙ। এমনই নিঃশব্দে উঠোনে নামে। মোক্তর খানেক বাদে তারণেরও কপট ঘুম ভেঙে যায়। সেও উঠে বসে। এবং আরো মোক্তর কয়েক বাদে পা টিপে টিপে আমতলামুখো চলে যায়। আমতলায় কতকগুলো চাঁচ পাতা রয়েছে। ভাটি ঝোপের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে তারণ দেখে দুটো ছায়ামূর্তি চাঁচের উপর বসলো গিয়ে। খাশখুশ কোরে কথা বোলল। মন্থরা তারপর শুয়ে পড়ল চাচের পরেই। অপর জন মন্থরার বুকের ওপোর। ব্যাপার দেখে চোঁ কোরে তারণের মাথায় রক্ত উঠে যায়। উজোন সোঁত বইতে থাকে শিরায়-শিরায়। ইচ্ছে হয় একবার হাতের কাছের বাঁশ ফালিখানা নিয়ে এক বাড়িতে দুটোকে শেষ করে দেয়। আর নয়তো বিছেনার তলা থেকে গোরু কাটা হোগোলপাত ছুরিখানা ছুটে গিয়ে নিয়ে এসে একসাথে দুটোকে গেঁথে ফেলে। কিন্তু অনেক কষ্টে সামলে যায় তারণ। ভাবে ঘরে তার ছেলে, ছেলের বৌ। এ কেলেংকারী ছড়ালে খুনের পেছন খুন। পুরী শুদ্ধ ধ্বংস। তা কোরে কাজ নেই। যা করার সে পরেই কোরবে ও। আধ ঘণ্টার পর দুজন উঠে দাঁড়ায়। ঝুঁটি কোরে চুল বাঁধে মন্থরা। সামলে নেয় পরণ কাপড়। তারণ তার আগেই বিছেনায় গিয়ে শুয়ে পড়ে। চাঁদাড়ের কলসী থেকে হাত পা ধুয়ে মন্থরা এসে শুয়ে পড়ে তারণের পাশে। ওর পেছনে পেছনে ঝোড়োও এসে বারান্দায় গিয়ে ওঠে। সবই টের পায় তারণ। মন্থরা ওর গায় গা ঠেকায়। কপালে হাত দেয়। গায়ের ওপোর ঠ্যাং তুলে দেয়। কিন্তু সাড়া পায় না। তারপর ঘুমিয়ে পড়ে সে। তারণ কিন্তু চোখের পাতা বুঁজোয় না। এক একবার মন আগুন হোয়ে ওঠে। নিশ্‌পিশ্‌ কোরে ওঠে ডান হাতখানা। বিছেনার নিচেই তো ছুরি। টেনে নিয়ে মন্থরার বুকে ডাবিয়ে দিলেই তো সব ফয়সা। মরা গোরুর মতন ও পড়ে রয়েছে এখন। মরা গোরুর বুকে তারণ যেমন কোরে ছুরি ডাবায় তেমনি কোরে ডাবিয়ে দিয়ে টেনে আনলেই তো ব্যস। কিন্তু

অনেক কষ্টে সামলে যায় তারণ।

তার পরদিন ঝোড়ো চলে যায় মাদারীকে নিয়ে। মন্থরাও ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ে। শশী থাকলে বারান্দায়। তারণ টোঙ ছাড়ল না। প্রাত্যহিক অভ্যাস মাফিক খুব সকালে ওঠে মন্থরা। ছাখে খালি টোঙ। তারণ নেই। হয়তো বিলে গিয়ে থাকবে। চারো, বর্শা পাতা আছে। কিন্তু অনেক বেলা হোয়ে যায়। উৎরে যায় ফেরার সময়। তবু ফেরে না তারণ। বিলমুখো শশী গেল। পেলে না। চারিদিকে লোক ছুটল। ভূতো, শশী। ছোটো কানাইও। কিন্তু খুঁজে বের কোরল ফুলবর। সে ছুটতে ছুটতে এসে জানালে, মালীরবাগে আমগাছে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলচে তারণ! আর তার কালো হুলো বেড়ালটাও গাছের তলায় মরে আছে। পাড়া ভেঙে লোক মালীর-বাগমুখো ছোটে কাঁদতে কাঁদতে। ভূতো তাড়াতাড়ি গাছে উঠে দড়ি কেটে দেয়। কিন্তু তাড়াতাড়ির তাগিদ তার অনেক আগেই ফুরিয়ে গেছে। কাটের মতন শক্ত হোয়ে গেছে তারণের দেহখানা।

থানায় খবর পাঠানো হয়। পুলিশ আসে।

চোটপাট করে মন্থরা-শশীর ওপোর। তারপর ঘুষ-ঘাষে পকেট গরম কোরে লাশ পোড়ানোর হুকুম দিয়ে চলে যায়।

তারণ যে কেনো মরল পাড়ার কেউ জানল না। জানল এক মন্থরা। আর তারণ নিজে। কিন্তু তার বেড়ালটার মরণ-রহস্য চিরদিন অজানা রয়ে গেলো। সেও কি আত্মঘাতী হোলো! না তারণ তাকে মেরে মরল!

মাস পাঁচ-ছয় নাগাত হরিজন আন্দোলনের জোয়ার বেশ জোরেই বয়ে চলল মুচিদের মধ্যে। তারপরই ভাঁটা শুরু। ঐ ছ' মাসের মধ্যে খোট্টা মুচিরা জমকে বোসেচে কেশবপুরের হাট-বাজার। গাঁয়ের এলেকাগুলোও দখল কোরে নিয়েছে তারাই। মানে গাঁয়ে ঢুকে মরা গোরুর খাল তুলে নিয়ে যায়। কুড়িয়ে নিয়ে যায় হাড়-গোড়। মোটা কাঁচা পয়সা কামায়। ঘরভাঙা-সুরপুরের দেখাদেখি এ অঞ্চলের বহু গাঁয়ের মুচিরা খৃষ্টান হোয়েচে। বাদ-বাকীরা ঢুকে গেছে হরিজন আন্দোলনের আওতায়। যার ফলে কেশবপুর, মণিরামপুর, রাজগঞ্জ প্রভৃতি নামকরা বাজারগুলোর চামড়া শিল্প ক্যাপ্চার কোরে বোসেচে অবাঙালী মুচিরা। কাঁচা পয়সার রস শুকিয়ে যাওয়ায় দেশী শিল্পীদের ভাত মারা গেলো। ঘরে ঘরে উঠল হাহাকার। তারাও মরতে

থাকল শুকিয়ে। পেট-মহাজন এমনি একজন মহাজন যার কাছে ধর্মাধর্ম, ন্যায়-অন্যায়, উপরোধ-অনুরোধ কেউই পাত্তা পায় না।

একদিন বুড়ি ভদ্দরের ধারে মনুঠাকুর দেখেন, অন্ন-মুচা একটা মরা গোরু বাগানের মধ্যে টেনে নিয়ে তার খাল তুলছে। ঠাকুরকে দেখেই তো ওদের চোখ ছানাবড়া। না জানি কী বোলে বোসবেন উনি।

যা হোক অন্ন কিন্তু ঠেকার আগেই চিৎ। মানে মনুঠাকুর কোনো রকম বক্তব্য রাখবার আগেই অন্ন বোলে ওঠে :

—বট্‌ঠাকুর, আপনার কথাই খাটল। ক্যানো যে আপনার কথা না শুনে হরিজন কোরতে গেছিলাম।

মনুঠাকুর জিগ্যেস করেন :

—ক্যানো? কী হোলো অন্ন?

—আমরা এখোন না খেয়ে মরি বট্‌ঠাকুর। আর আমাদের মুখের ভাত কেড়ে নিয়ে খাচ্চে খোট্‌টা-মোট্‌টারা। কোন্ কম্মে লাগবে দলে উঠে? যদি মরেই গেলাম? আমাদের বাল-বাচ্চারা শুকিয়ে গেলো?

স্মিতমুখে মনুঠাকুর বলেন :

—ভুল কোরেচো তোমরা অন্ন। আর তোমাদেরই বা কী দোষ? ভুল বাবুদের। ত্যাঁদড়ামি ওদেরি।

অন্ন বলে :

—না। এর মধ্যে আর আমরা নেই বট্‌ঠাকুর। আমি তো গোপনে গোপনে আরম্ভ কোরে দিয়েছি। হাটে যাইনে বট্‌ঠাকুর। খোট্‌টারা গাঁয়ে এলে, খালগুলো ওদের কাছে বেচে দিই।

—তা তোমার খুদে-টুদে কী বলে?

—ওরাও আর ওতে নেই বট্‌ঠাকুর। ওরা তো গোপনে-গাপানে খেতেই লেগে গেছে।

—তাই নাকি!

—তাই না তো কী?

মনুঠাকুর হাসতে হাসতে চলে যান। ওরাও চামড়াখানা একটা বস্তার মধ্যে পুরে নিয়ে বাড়ি ফেরে। কিন্তু এ-গোপনীয়তা ঢিলে হোয়ে যেতে থাকে দিন দিন। শেষটা বাবুদের কানে কানে পৌঁছয় এ-খবর। হরিজন আন্দোলনে ওপোরে ওঠা মুচিরা আবার নিচের তলায় নেমে গেছে। সার্ধ-দ্বাবিংশ কার্যাপানী ধেনুমূল্য দান

কোরে ঋষি পুত্রগণ জন্ম-জন্মান্তরীয় যে পাপ প্রক্ষালন কোরেছিলো, তা আবার নতুন কোরে শুরু হোয়েচে। শুনে তো বাবুরা চটিতং। ডেকে পাঠান মুচিপাড়াকে। অন্ন-সুচা-খুদিরামরা হাজির হয়।

ছোটোবাবু চোটপাট কোরে ওঠেন :

—অন্ন, ব্যাপার কী? শুনচি নাকি তোমরা আবার ঐ সব নোংরা ঘাটতে লেগেচো? সত্যি?

অন্ন বরাবর সাত চড়ে এক কথা না কওয়া মানুষ।

সে গ্যাঁ-গুঁ কোরতে থাকে :

—আঁগ্যে ছোটোবাবু, আঁগ্যে আপনার……

ছোটোবাবু তাড়া দিয়ে ওঠেন :

—গ্যাঁ-গুঁ কোরচো ক্যানো? সত্যি কথা বল।

সুচা লোকটা খেজো-গোণ্ডা ক্লাশের। সে ছোটোবাবুর সুরে সুর চড়ায় :

—দাদা কবে কী ছোটোবাবু? ওতো গোমড়া। আমি বোলচি, সত্যি ছোটোবাবু। আমরা আবার চামড়া কাটচি। খাওয়াও শুরু কোরেচি।

ছোটোবাবু গর্জে ওঠেন :

—ক্যানো?

—কী কোরবো? না খেয়ে মরবো? আমাদের মুখের ভাত কেড়ে খেয়ে যাবে উড়ে-খোট্টা-মুচিরা? আর আমরা হাত-পা কোলে কোরে নিয়ে বোসে-বোসে তাই দেখবো। বাল-বাচ্চারা ছটফটিয়ে মরবে।

—তোদের পেটে এতো খোল! হারামজাদা! তোদের চোদ্দো পুরুষের ভাগ্যি হাতে কোরে আমাদের প্রসাদ বিলোতে পারলি।

আর আমরাও তা খেলাম। শালার শকুন তো। আকাশে উঠলেই কী হবে? নজর ভাগাড়েই।

সুচা বক্তব্য রাখে :

—আমরা শকুন। শকুনই থাকি ছোটোবাবু। চোখ আমাদের গো-ভাগাড়েই থাকবে। এই শর্তে যদি দলে রাখতে পারেন, রাখবেন।

বোলেই জোর পায় চলে যায় সুচা। অন্ন-খুদিরামও অনুসরণ করে তার। এরপর থেকেই হরিজন আন্দোলন খতম হোয়ে যায় এ অঞ্চলে।

তারণ মারা যাওয়ার পর দীর্ঘ পাঁচ বছর চলে যায়। মাদারী নিঃসন্তান। এজন্য চেষ্টা-চরিত্তির খুবই কোরেচে মন্থরা। তার ঐ সবেধন নীলমণি। টিম্‌টিম্‌

কোরে জ্বলা শিবরাত্তিরির সলতে। নিবলে অছিদ্র আঁধার। প্রথম প্রথম নেহাল উদ্দিনের দাওয়াই চলল। তারপর তার ওস্তাদজী গোলাম আলি ফকিরের। কিন্তু গুরু-শিষ্য দু'জনেই ফেল্ মারল। তখন পাড়ার লোক মন্তব্য রাখে, ছেলে-পিলের দফায় ধোপাবুড়ির মতন ওস্তাদ এ-তল্লাটে আর নেই। তাইই করে মন্থরা। একদিন মাদারীকে নিয়ে যায় আলতাপোল ধোপাবুড়ির কাছে। ধোপা-বুড়ি দেখে রায় দেয়, এ-ঘোড়াবাধক। বাধকের মাদুলি আর ওষুধ দিলে তিন মাসের মধ্যে ফল আসবে। ধোপাবুড়ি তাবিচ পোরে। ওষুধ দেয় খেতে। ঘোড়ার খুর ঘষা; কাঁটানটের শেকড়, কাঁচাদুধ, কাঁচাহলুদ অনুপান দিয়ে। কিন্তু তিন মাস তো তিন মাস, ছ মাস—বছর উৎরে যায়। ফল ধরে না বাঁজা গাছে। বরং শরীর ভাঙতে শুরু করে। তখন ভগ্নবুক মন্থরা শরৎ জ্যোতিষীর শরণাপন্ন হয়। জ্যোতিষী হাত দেখে মন্তব্য রাখেন পণ্ডিতী ভাষায়, এর রাহু বক্রী। বন্ধ্যা দোষ।

মন্থরা জানতে চায়, সে আবার কী? তাতে কী হয় গোঁসাই?

জ্যোতিষী বলেন, ওর গ্রহ কাটাতে হবে। মানে রাহু-রবির পুজো দিতে হবে। আর "বংশ-লাভাখ্যা" কবচ ধারণ করতে হবে।

—তা হোলে ছেলে হবে তো?

চোখ কপালে ওঠে শরৎ জ্যোতিষীর। কপালের চামড়া যায় কুঁচকে, বলো কী তুমি! শাস্ত্রর কখনো মিথ্যে হয় গো? আমি মরেও যদি ওর পেটে যেতে হয়, তবু যাবো।

মন্থরা জিগ্যেস করে:

—তা কদ্দিন পরে ফল আসবে, গোঁসাই?

জ্যোতিষীর টাটকা জবাব, ত্রি-পক্ষের মধ্যেই। আবার কদ্দিন?

—তার মানে? তিন ব-ছ-র।

হেসে ওঠেন জ্যোতিষী। বলেন:

—না, না। তিন পনর দিন। মানে দু-কুড়ি পাঁচদিনের মধ্যে।

আশ্বস্ত হয় মন্থরা। এবং মোটামুটি দখ্যিনে খসিয়ে গ্রহ কাটায়। মাদারীকে ধারণ করায় "বংশ-লাভাখ্যা" কবচ।

জ্যোতিষীর নির্ধারিত ওয়াদা তিন পক্ষ। কিন্তু তিন-তিরিক্কে ন পক্ষ চলে যায়। চলে যায় ন মাস।

সন্তান সম্ভাবনায় কোনই লক্ষণ নেই মাদারীর। এর মধ্যে হঠাৎ একদিন

দুঃসংবাদ আসে ওর বাবা ঝোড়ো সাপের কামড়ে মারা গেছে। এই আকস্মিক শোকে মাদারী একদম ভেঙে পড়ে। শশী ওকে সাথে কোরে নিয়ে যায় রায়পটন।

বাপের বাড়ি থেকে ঘুরে এলে হয়তো ওর শরীর-মন দুই-ই সেরে উঠবে।

মাস দুই বাদে বাপের বাড়ি থেকে ফিরে আসে মাদারী। সে সাথে নিয়ে আসে ফিটের ব্যামো। ছ-সাত দিন অন্তর ফিট হয়। হাত-পা খিঁচোয়। দাঁতে দাঁত লেগে যায়। মাথায় জল ঢালাঢালির পর জ্ঞান ফিরে আসে। কেউ বলে, ভূতে পেয়েচে। কেউ বলে, জেনের দৃষ্টি। আবার কারো মন্তব্য, ওর গায় লেগেচে কবরের বাতাস। কথাটা যুক্তিসম্মত মনে হয় অনেকের। রায়পটন যেতে হোলে অনেক মোছলমান পাড়ার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। যেতে হয় অনেক মরজার খোলার ধার ঘেঁষে। আরেক দফা ঝাড়-ফুক চলে। ফকির-ফাকার ওঝা-বদ্যি ডাকাডাকি। আ-ঘাট দিয়ে নেমে ঘাট দিয়ে উঠে আনা জলে নাওয়ানো। দোয়া-তাবিচ-সুতোপড়া পরানো। ফলশ্রুতি কিন্তু যথা পূর্বং তথা পরম্। বরং আগে হোত ছ-সাত দিন অন্তর ফিট্, আর এখোন হয় দু-তিনদিন অন্তর। বেহুঁশ হোয়েও থাকে অনেক সময়।

নিরুপায় মন্থরা ঠাকুরবাড়ি যায়। মনুঠাকুর শুনে বলেন :

—ডাক্তার দেখাও শশীর মা। মনে হয় সেরে যাবে।

মন্থরা কেঁদে ফেলে। বলে :

—আপনি যা ভালো বোঝো বট্‌ঠাকুর, তাই করো। আপনি গিয়ে ডাক্তার ডেকে আনো কাল।

—আচ্ছা, তাই আনবো। তুমি কেঁদো না, শশীর মা।

আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে শশীর মা বলে :

—উনার বড্ডো সাধ ছিলো বট্‌ঠাকুর, শশের একটা গুঁড়ো দেখে যাবে। সে আশায় তো ছাই পড়ল। এখোন বৌ নিয়ে নে থো।

কাঁদতে কাঁদতে চলে যায় মন্থরা। পরদিন মোটারকম ভিজিটের রফা কোরে মনুঠাকুর বিধু ডাক্তারকে নিয়ে আসেন। ডাক্তার রোগী দেখে রায় দেন, এ হিষ্টিরিয়া। এ-বয়সে এ-ধরনের রোগ প্রায়ই হোয়ে থাকে। বাচ্চা হোলে সেরে যাবে।

কিন্তু বাচ্চা হোলে তো সারবে, সে বাচ্চার খোঁজ-খবর কই ? তখোন পাড়ার সবাই এমন কি ভবানী পিসীমা পর্যন্ত প্রস্তাব করেন :

—নিশিনকালি হাজরাতলায় নিয়ে যাও শশীর মা। শেষবারের মতন চেষ্টা

কোরে ত্থাখো।

তথাস্তু।

নাভারণ ষ্টেশন থেকে মাইল দশেক উত্তরে এই নিশানকালি হাজরাতলা। এখানে নাকি অমাবস্যের রাতে ভুতের কাছারি হয়। আপনা আপনি মাদুলি পোরা হয়। বন্ধ্যা সন্তানবতী হয়। মৃতবৎসা হয় জীববৎসা। বোবার কথা ফোটে। বধির পায় শ্রুতি-শক্তি। খোঁড়ারা সত্য-সত্যই দৌড়ে বেড়ায়। এমনি অগুণতি জনশ্রুতি চলে আসছে যুগযুগ ধোরে।

বিলের পর বিল পাড়ি দিয়ে, এক বেঁশে সাঁকোওয়ালা খালের পর খাল পেরিয়ে দুর্গম নিশানকালি পৌছয় মন্থরা মাদারীকে নিয়ে। বিশাল বাঁওড়। তার পরে বিশাল ছাতরানো বটগাছ—হাজরাতলা। সেবাইত শিবেন ঠাকুরের নির্দেশ মাফিক বাঁওড় থেকে স্নান কোরে আসে মাদারী। "শয়াল" খাটতে খাটতে। তারপর ভিজে আঁচোল পেতে তার ওপোর একটা মাদুলি রেখে "হত্যে" দেয়। মাদারীর ঘুম এসে যায়। সহসা এক স্বপ্ন দেখে ওর ঘুম ভাঙে। উঠে বসে। ত্থাখে মাদুলির মধ্যে ওষুধের গুঁড়ো।

তারপর হাজরা ঠাকুরের পুজো দেয়। "ভারা" বাঁধে। মন্থরা মানসা করে, শশীর ছেলে হোলে জোড়া পাঁঠা দিয়ে হাজরা ঠাকুরের পুজো দিয়ে যাবে।

মাদারীর শরীর ভেঙেই চলেচে। হিষ্টিরিয়ায় ভুগচে। সন্তান হোচ্চে না। শশীর ভালোবাসার চোখে এককুটি কুটো পড়েনি তবু এ যাবৎ। কিন্তু হায়রে দুরদৃষ্ট। অকস্মাৎ ঐ দাম্পত্য প্রেমের মাঝখানে এক বিপর্যয় এসে যায়। সে আর কেউ না, সুখো। একদা শরৎ জ্যোতিষী বোলেছিলেন সুখোকে পরীর দেশে চালান দিয়েচে। সে পরীরাই বুঝি ওকে ডানায় কোরে উড়িয়ে এনে রেখে গেছে। এতোদ্দিন বাদে। শুধু তাই না, পরীর রূপ-রঙও বুঝি খানিকটে পেয়ে এসেচে ও। তার মানে আগের থেকে সুখোর গায়ের রঙ ফিরে গেছে। মোটাসোটা হোয়েচে। বুকের কাপড় ঠেলে অনেকখানা বুক উঁচু হয়ে উঠেচে। কেউ কারো সাথে কথা কয় না আজো। তবু দুজন ওৎ পেতে থাকে দুজনের চলার রাস্তায়। চোখাচোখি হোলে চোখ হানে সুখো।

একদিনের ঘটনা। সুখো মালীরবাগে গেছে কাট কুড়োতে। জেনেই হোক আর না জেনেই হোক শশীও গেছে তার খানিক পরে। সুখো কাট কুড়িয়ে মস্ত একটা বোঝা বেঁধেচে। অনেক চেষ্টা কোরচে কিন্তু বোঝাটা চাগিয়ে তুলতে পারেনি মাথায়। এমন সময় শশীকে দেখে উল্লাসিত হোয়ে ওঠে সুখো। বলে :

—শিকারী নাকি ? ও শিকারী, শিকার-টিকার চলছে কেমন তোমার ?

ঢোক গিলে শশী বলে :

—শিকার-টিকার তো কোরিনে আজকাল। চলে গেলি। আমিও শিকার ছেড়ে দিলাম।

—তা যে শিকার বাগিয়েচা তুমি, ওর কাছে ঘুঘু শিকার আর কোথায় লাগে ? কোন্ দুখ্যে শিকার কোরতে যাবে আর ? যাক। তুমি একটা উপকার কোরবে ? মাইরি, বোঝাটা মোটে চাগাতে পারছি না। একটু তুলে দ্যাও না। দেবে ?

—ক্যানো দেবো না।

—দ্যাও তবে। তাড়াতাড়ি। আবার কে কোথা থেকে দেখে ফেলবে।

শশী এগিয়ে যায়। বলে, ধর।

বোলেই একধার ধোরে উঁচু করে বোঝাটা। সুখো আরেক ধার ধোরে হেঁচকা দিয়ে ওর কাঁধে তুলতে গিয়ে কাঁকালের খোট খুলে বে-সামাল হোয়ে যায়। কাপড়টা সামলে নিতে বাধ্য হোয়ে সুখোকে কাটের বোঝা ছেড়ে দিতে হয়। শশীও ছেড়ে দেয়। ঝপ কোরে মাটিতে পড়ে যায় বোঝাটা। সুখোর কোমরে কাপড় নেই। বুকও আলগা। ঐ নির্জন নগ্নরূপ দেখে শশীর শিকারী মন গা-ঝাড়া দিয়ে ওঠে। সে দু-হাত দিয়ে মুঠো কোরে ধরে ওর উঁচু বুক দুটো।

সুখো ফিশ্‌ফিশিয়ে কয়, ছিঃ! তুমি কী! না, না।

পাশেই মুক্তোঝুরির কসাড় লতাবন। শশী ওর হাত ধোরে টেনে নিয়ে যায় বনের মধ্যে।

সুখোর মুখের ইচ্ছে নেতিবাচক হোলেও মনের অনিচ্ছে জোরালো না। এটা বেশ বুঝে ফেলে শশী শিকারী।

এতো অনেকদিনের পিরীত। চালু ছিলো না। কিছুদিন। এই যা। এখোন চালু হওয়ার পর চাকা আবার ঘুরতে থাকে ফনফনিয়ে। প্রথম প্রথম শশী চুরি কোরে যাওয়া-আসা করে সুখোর কাছে। যার দরুণ তার পূর্বানুবর্তী নিয়মের তাল যেতে থাকে কেটে। আগে শশীর কাজ ছিলো সাঙাৎদের সাহচর্য এড়িয়ে সংসারের কাজ-কর্মে ফাঁকি দিয়ে মাদারীর সান্নিধ্যে সামিল হওয়া। আর এখোন তার সম্পূর্ণ উলটো। সব সময় ফাঁক তালাস করা। মাদারীর সঙ্গ থেকে সুখোর সঙ্গে পৌঁছানো। এ-চুরি কতোদিন ফাঁস না হোয়ে থাকে ? আজকাল আবার শিকারের বাতিক ফিরে পেয়েচে শশী। নোতুন ছিলা পরিয়েছে ধনুকে। আর গুলির পরিবর্তে তীর। এবার তীরন্দাজ হবে সে। তারই

নোতুন মহড়া চোলেচে। এবার আর সাঙাৎ-সাথী কেউ না। সে একলা-একলা। সারাদিনটা কাটায় মালীরবাগে। হোরেল ঘুঘু গৌণ। মুখ্যশিকার সুখোকে কব্জায় রাখা। ফিরতে বেলা গড়িয়ে যায়।

মাদারী জিগ্যেস করে :

—এতো বেলা কোথায় ছিলে ?

চটপট জবাব ছায় শশী শিকারী, মালীরবাগে। আজ একটা গুই ঘড়েল যা দেখছিলাম না বুঝলি বৌ, বাগাতে পারলে একগাদা মাংস হোত। বরাত খারাপ, গত্তকে ঢুকে গেলো। যাবে কোথায় শালা ? গত্তক দেখে এসেচি। বাগাবই ঠিক।

ছলা-কলায় অভিনয় কোরে মাদারীকে এমনিভাবে বুঝিয়ে দেয় যে সত্যিই সে বোঝে তার শিকারী স্বামী গুই ঘড়েলের পাল্লায় পড়েই ফেরার সময় ঠিক রাখতে পারেনি, ঠিক রাখতে পারেনি খিদে-তেষ্টায় তাগিদ। সুখোর সাথে আড্ডা জমিয়ে প্রায় দিনই বাড়ি ফিরতে ওর দুপুর রাত পেরিয়ে যায়। মাদারী রান্না কোরে মন্থরাকে খাইয়ে দেয়। তারপর ওদের খাবার এ-ঘরে টেনে এনে চাপা দিয়ে রাখে। দোরের "হাঁক" বন্দ কোরে ছায়। পলতে টেনে ল্যাম্পটা টিমটিম করে জ্বালিয়ে রাখে। শশীর ফেরার প্রতিক্ষায় প্রহরের পর প্রহর গোণে তারপর। আর প্রত্যেকটা শব্দ মারফতে ঠকতে থাকে। থাকে নিরাশ হোতে। ঘনঘন হাই তোলে। ঝিমোয়। বিছেনায় ওপর ঢলে-ঢলে পড়ে। সহসা দোরে টকা পড়ে। দোর খুলে ছায় মাদারী। চোরের মতন ঘরে ঢোকে শশী।

—এতো রাত করলে ক্যানো ? তোমার কি ভয়-ডর নেই ? অভিযোগ করে মাদারী।

অমনি তুড়ুক জবাব আসে শশীর থেকে :

—ক্যানো বোলিস্ বৌ, শুনলাম, কেশবপুরের বাজারে ঢপ গান হোচ্চে। মধুকানের ঢপ। বোষ্টম ব্যাটা ছাড়লে না টানতে টানতে নিয়ে গেলো। খুব ভালো গান রে। এক মাগী গান কোরলে। কী গলা ! বাঁশীর মতন। তোদের মতন বয়েস হবে তার। কী ঢুস্‌কী মাগীরে। কী খেয়ে যে গতর লাগায় ওরা। সরলা মাদারী তাই-ই বুঝে যায়। ইষ্টম মারা যাওয়ার পর বোষ্টমই আজকাল ওর প্রধান সাঙাৎ। বয়েসের দিক থেকেই খাপ খায় না বোলেই অতটা মিশতে পারে না। তাই বোষ্টমের খপ্পরে পড়েই ও ঢপ গান শুনতে গেছে। নইলে যাওয়ার মতলব ওর আদৌ ছিলো না। কিন্তু সত্য মিথ্যে কেউ ধামা চাপা থাকতে

চায় না। বিশেষ কোরে মিথ্যেটা।

পরদিন কী এক জরুরী মতলব নিয়ে বোষ্টম আসে শশীর সাথে দেখা কোরতে। ফালুক-ফুলুক কোরে তাকিয়ে ওকে না দেখে ডাকে, শশে, ও শশে!

ঘরের মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসে মাদারী। বলে :

—বাড়ি নাই তো।

—কোথায় গেছে? মুল্লুক খুঁজেও তো পেলাম না। করে কী?

—ক্যানো? তোমাদের বাড়ি যায়নি সকালে?

—সকালে! মোটে চুলের টিকি দেখলাম না আজ দুদিন। পরশু দিন দেখছিলাম মিনিট খানেক। কাল বিকেলে দেখা করার কথা ছিলো। তাও গেলো না।

ছ্যাৎ কোরে ওঠে মাদারীর বুকখানা। ঠিক লাল দগদগে লোহা জলে ছোঁয়ালে যেমন হয়। তাহলে কাল রাতে ঢপ গান শুনতে যাওয়ার টাটকা সত্যি কথাটা একদম জলজ্যান্ত মিথ্যে! শশী তাহোলে ওর সাথে মিথ্যে কথা বলে! কথাটা ভাবতে ভাবতে হটাৎ ফিট হয় ওর। মন্থরা ছুটে আসে। ঘাড়টা উঁচু কোরে ধরে মাদারীর। বোষ্টম জল ঢালতে থাকে। কতক্ষণ বাদে জ্ঞান ফিরে আসে। এখন থেকে শশী সম্পর্কে ওর মনে সন্দেহর প্রথম ছায়াপাত হয়। এরপর ভূরি ভূরি প্রমাণ পায় মাদারী, ওর সাথে শশী যা বলে, তার পেরায় ষোল আনা মিথ্যে। ক্রমে ক্রমে সুখোর ব্যাপারটাও কানে এসে যায় ওর। শশীর পুরোনো পিরীতির মানুষ সে। মাঝখানে তার অন্তর্ধানের কারণটাও শোনে। আর ইদানিং আবার শশী সুখোর কাছে যাওয়া-আসা করে। এটা শুধু লোকের মুখে শুনেই বিশ্বাস করে না। হাতে-নাতে প্রমাণও পেয়ে যায় একরকম। বরাবর মাদারীর ওপোর ওর আসক্তি মাত্রা ডিঙোনো। এজন্য প্রায় রাতই বকুনি খেতো শশী। মাদারী বোলেচে, তুমি কী! শরীলের দিকে মোটে লক্ষ্য করো না। খাবার ঘরে থাকলে বুক ঠাণ্ডা। অমন দু-হাত দিয়ে খেতে আছে? কিন্তু কোনো উপরোধ অনুরোধ শোনেনি শশী। কিন্তু আজকাল একদম ভাঁটা লেগেচে সে-আগ্রহে। শশী অনেক রাতে বাড়ি ফেরে। তারপর খেয়ে বিছেনায় শুয়ে পড়ে। আর শুতে শুতেই নাক ডেকে ওঠে। *নেই সে আগ্রহ আসক্তি। সে জুলুম জবরদস্তি। বরং মাদারীই এখোন সরে এসে ওর গা ঘেঁষে শোয়। ইশেরা ইঙ্গিতে আগ্রহ প্রকাশ করে কিন্তু শশীর দিক থেকে আদৌ তাগিদ দেখা যায় না।

নিশানকালি হাজরাতলা থেকে আসার পর অনেক দিন চলে যায়। সেবাইত

শিবেন ঠাকুরের দেওয়া সময়ও যায় উৎরে। মন্থরা কপালে ঘা দেয়। এ-গাছে ফল ধরবে না। এ বাঁজা গাছ। তারণ মরেচে অফলা আশা নিয়ে। তারো কপালে ঐ। শশীর পরে এ ভিটেয় আর পিদীম জ্বলবে না। তবু মন্থরা এ যাবৎ মাদারীকে কোনো অযত্ন করেনি। না গালিগালাজে, না, না-খেতে না-পরতে দিয়ে। গ্রাম বাংলার পৌনে ষোলো আনা শাশুড়িরা যা কোরে থাকে। তারণ মারা যাওয়ার পর বরং শশীকেই বকে-ঝকে মন্থরা। শশী রাত কোরে বাড়ি ঢোকে। ছোট্‌টো বৌ একলা থাকে ঘরে। এর জন্য শশী অনেক বকুনি খেয়েচে। তাই চোরের মতন বাড়ি ফেরে সে। মাদারীকে না ডেকে দোরে টকা দেয়। টোঙের পরে শোওয়া মন্থরা যাতে টের না পায়।

যা হোক, কিন্তু হাজরাতলার মাদুলি ফেল্ হওয়ার পর মন্থরা একদিক থেকে যেমন কপালে ঘা দিয়েচে অন্যদিক থেকে তার মনও গেচে বদ্‌লে। মাদারীকে আগের চোখে আর দেখতে পারচে না। কেননা বয়েসের দিক থেকে ওর সন্তান সম্ভাবনার সীমানা যতটা না ডিঙিয়ে গেচে ততটা ডিঙিয়েচে ওর শরীরের অবস্থার দিক থেকে, দুরারোগ্য ব্যাধির দিক থেকে। তবু মাদারীর ওপোরকার ওর স্নেহশীল মন এতোটা রদবদল হোতো না যদি নাকি ওর পিরীতির মানুষ ঝোড়ো বেঁচে থাকতো। ঝোড়োর মরণ সত্যিই ওকে বেজায় আঘাত হেনেচে। তারণের চেয়েও। তারণের আগুন চোখের জলে নিবোতে পেরেচে; কিন্তু ঝোড়োর আগুন ফুটতে পারেনি। তুষের আগুনের মতন খেয়ে খেয়ে উঠচে। যার ফলে শাশুড়ি-সুলভ গঞ্জনাটা উঠেচে তীব্র হোয়ে। দিনে দশবার অন্ততঃ শুনতে হয় ওকে "রুগ্‌নী" গাল। অলখ্যুনে বৌ। ঘরে এসেই শ্বশুরটা খেয়ে ফেললে। ভিটেটা নিস্পীদ্দুম কোরলে! শশীর দিক থেকেও আজকাল আর তেমন কড়া নেই মন্থরা। শশী আগের মতনই সুখোর কাছে যায়। শুনেও শোনে না। বুঝেও বোঝে না মন্থরা। ভাবে রুগ্‌নী বৌ, ছেলের পোষায় না। তাই মন মত্তি বিগড়ে গেছে ওর। অমন তো ছিলো না মাদারী ঘরে আসার পর। বড়ো কষ্টের শশীধন ওর। ওর পরেই তো সব শেষ। যা ওর মন চায় তাই কোরে নিক।

মায়ের মতন এতোদিন পরে ছেলেরও মনের রূপ বাইরে প্রকাশ পায়। সেও দাঁত-মুখ খিঁচোয় মাদারীর ওপোর হামেশাই। একটা অলখ্যুনে বৌ ঘরে এনেচে। এমনি কোরে যতো আঘাত যতো গঞ্জনা পায় মাদারী, ততই ভেঙে পড়ে। অসুখ যায় বেড়ে। রোজ দু-তিন বার কোরেও ফিট হয় আজকাল।

সেদিন তাড়ি খেয়ে অনেক রাতে সুখোদের বাড়ি থেকে ফেরে শশী। নেশায় একদম চুর। মাদারী রোজকার মতন জেগে বোসে আছে। আজ সে একটু সাজগোজও কোরেচে। ফরসা শাড়ীখানা পরেচে। চুল আঁচড়ে সিঁদুর দিয়েচে কপালে সিঁথেয়। নারকেলের তেল ঘসে মুখখানা কোরেচে চক্‌চকে। শশী এসে বিছেনায় শুয়ে পড়ে। মাদারী আলো নিবিয়ে ওর কাছে সরে যায়। এবং জড়িয়ে ধোরে টেনে নেয় কোলের মধ্যে। শশী ঠেলা দিয়ে সরিয়ে দেয়। মুখঝাড়া দিয়ে ওঠে, এই শালী, গা'র মধ্যে আসচিস্ ক্যান্?

মুল্লুক বিছেনা পড়ে রয়েচে ছাখা যাচ্চে না?

মাদারী বলে:

—না। তোমার কোলের মধ্যি শোবো। বোলতে বোলতে স্বামীর কাপড়ের মধ্যে হাত ঢুকোয়।

শশী রুখে ওঠে:

—রুগ্‌নীর এদিকে নেই, ওদিকে আছে। অতো পোক-কামড়ানি ক্যান্? সে গুড়ে বালি।

খিল খিল কোরে হেসে ওঠে মাদারী। তার হাতখানা তখোনো কাপড়ের মধ্যে নড়চে। নাড়াচ্চে।

এবার শশী স্বীকার করে, তার খিদে নেই। সুখোর কাছ থেকে সে আচ্ছা কোরে খিদে মিটিয়ে এসেচে।

রাত আরো ভারী হোয়ে আসে। রাতচরা জীব জানোয়ারদের নির্ভীক চলা-ফেরার শব্দ ওঠে পষ্ট হোয়ে। শশী হয়তো ঘুমিয়ে পড়েচে। মাদারী কিন্তু চোখের পাতা বুজোয়নি। সে গড়িয়ে আসে শশীর ধারে। বুকে বুক ঘসতে থাকে। তড়াক কোরে উঠে বসে শশী। মুখ খিস্তি করে মাদারীর বুকের ওপোর চড়ে বোসে গুম্ গুম্ কোরে কিল মারতে থাকে। তারপর চড় ঘুষি নাক মুখ খামচানি। শেষটা লাথি মেরে বলের মতন কোরে গড়িয়ে ছায় বিছেনার ও মুড়োয়। কাঁদতে কাঁদতে রাত পোহায় মাদারীর।

দিনের পর দিন মাদারীর আকাশে ঘনিয়ে আসে কালো আষাঢ়। ঢেকে ফেলে চাঁদ সূর্য। তারার ফসল। শশী এখোন একদম বেপরোয়া। রোজ সন্ধের আগে সে সাজগোজ কোরে বেরিয়ে যায়। বোলেই যায়, এই শালি, শোন্, আমি সুখোর কাছে যাচ্চি। ফিরতে রাত হবে। জেগে থাকবি। ডাকতে হয় না যেনো। তাহোলে খুন কোরে ফেলবো।

—আজ আর যেয়ো না। বাড়ি থাকো। বোলেই মাদারী ডাগর চোখ চেয়ে আকুল আবেদন জানায়।

শশী রুখে ওঠে :

—এই শুট্‌কী মাগী, যাবার সময় বাধা দিবিনে বোলচি। ছাগোল কেলান কেলিয়ে ফেলবো তাহোলে। বোলতে বোলতে বেরিয়ে যায় শশী। মাদারীর দশা হয়, 'আমার বঁধুয়া আন বাড়ি যায় আমারি আঙিনা দিয়া'।

তবু ধৈর্য হারায় না মাদারী। মনে তার প্রচুর জোর আছে। আছে প্রচুর সাহস। সে সেরে উঠবে। শশীর মনের মোড় ঘুরিয়ে আনবে। কিন্তু এবার আর পেরে ওঠে না। এমন ঘটনা ঘটে যায় যাতে সীসের বাঁধও ভেঙে পড়ে সে ঘটনা স্রোতে।

টিম্‌টিম্ কোরে ল্যাম্পো জ্বলচে ঘরে। বিছেনায় বোসে মাদারী ঝিমোয়। কোন্ রাতে শশী ফিরবে। সহসা বারান্দায় পায়ের শব্দ শোনা যায়। দোর খুলে দেয় মাদারী। শশী ঘরে ঢোকে। সাথে সুখো। আঁৎকে ওঠে মাদারী। বাজপাখি দেখে পায়রার বাচ্চার মতন। দুজনেই তাড়ি খেয়েছে। সুখোর বিশাল চোখ হোয়ে উঠে:চ বিশালতর। আয়নার মতন ঝিক্‌মিক্ কোরছে মুখখানা। মাদারী বিছেনার ও কোণায় গিয়ে গুটি-সুটি হোয়ে বোসে পড়েছে। একখণ্ড কাটের মতন হোয়ে গেছে। ঠক্‌ঠক্ কোরে কাঁপছে।

শশী গর্জে ওঠে :

—এই শালী, শুয়ে পড়। আলো জ্বলুক।

মাদারী যেমন গোটো-সোটো ছিলো তেমনি গোটো-সোটো হোয়েই বিছেনার কোণায় শুয়ে পড়ে। ওর পাশেই সুখোকে শুইয়ে দেয় শশী। তারপর নিজেই শুয়ে পড়ে ওর বুকের ওপোর। এ উৎকট দৃশ্য সহ্য হয় না মাদারীর। সে কাঁপতে কাঁপতে দোর গোড়ায় যায়। হাঁক খুলে বেরিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে।

—এই শালী। পা বাড়াবি তো খুন কোরে ফেলবো।

তর্জন-গর্জন কোরে ওঠে শশী

দম্ কোরে মাদারী মেঝেয় পড়ে যায়। সাথে সাথে ফিট্ হয়।

শরৎ জ্যোতিষী বোলেছিলেন, দশ দিন, দশ মাস, দশ বছর পরেও যদি আসে, আসতে হবে সুখোকে। আর না ফেরা পর্যন্ত বিয়েও আটকানো রইল। সে ভবিষ্যৎবাণী একদিনও ভোলেনি শশী। জ্যোতিষী বাড়ি যায়। সুখোর আসার সংবাদ জানায়। ধোরে বসে, এবার যেনো বিয়ের ব্যাপারটা সুফলাফল হোয়ে

যায়। এমনি একটা কিছু কোরে দিন শরৎ ঠাকুর।

জ্যোতিষী দস্তুরমতন দাঁউ মারেন। আর কথাও দেন, এবার আর ফসকাতে দেবেন না। এ-বিয়ে দিয়ে দেবেনই। মাদারীর সাথে বিয়েটা ঠিক লগ্ন মতন হয়নি। ও বিয়েতে শশী সুখী হবে না। ও বৌ বাঁচবেও না। এবারকার বিয়ের লগ্ন তিনিই ঠিক কোরে দেবেন। দীর্ঘদিন বিয়ে আটকে রাখবার হিম্মৎ আছে যার, সুখী সংসার গোড়ে দেয়ার শক্তিও আছে তাঁর হাতের মুঠোয়।

শশীর আবার পা পিছলে যাওয়ার ব্যাপারটা পাড়াময়—গ্রামময় রাষ্ট্র হোয়ে যায়। মন্থরা বোঝে, এবার ওর ছেলের অধঃপতন ঘটার দায়ী মাদারীর নষ্ট শরীর। আর সন্তান না হওয়া। সে শরৎ জ্যোতিষীর বাড়ি হাঁটাহাঁটি কোরছে। এবং সুখোকে বিয়ে করার তালে আছে। একথাও কানে এসেছে মন্থরার, প্রতিবাদ করেনি। কেননা নিশানকালি হাজরাতলার মতন জাগ্রত দেবতা স্থানে গিয়েও ফল না ফলার পর সে সব বিশ্বাস হারিয়েছে। মাদারী জন্ম বন্ধ্যা। ওতে আর ফল আসবে না। তাই সুখোকে বিয়ে কোরে শশী যদি সুখী হয় হোক। যদি একটা বাচ্চা পায়। শিবরাত্তিরির সলতে শশী যদি ভিটেয় আরেকটা সল্‌তে জ্বালিয়ে রেখে যেতে পারে।

এবার ভ্যাবল-ফুলবর এমন কি ভূতো মাতব্বরদের দিক থেকে প্রস্তাব আসে—শশীর বিয়ে দেওয়া উচিত। মাদারীর গর্ভে সন্তান যখোন হোলোই না, তখোন মন্থরার কর্তব্য তারণের বংশরক্ষের চেষ্টা করা। অবিশ্যি তারণ বেঁচে থাকলে, সে কর্তব্য চাপতো তারই ঘাড়ে। আরো একটা কথা, বারবার একটা পরের মেয়ের জাতমারা ঠিক না। অতএব শশীর সঙ্গে সুখোর বিয়ে হোয়ে যাক। ওরাও সুখী হোক। পাড়ারও মুখ বাঁচুক।

মন্থরা ঠাকুরবাড়ী যায়। মনুঠাকুরকে সব খুলে-খেলে বলে। তারণের মতন মানুষ নির্বংশ হোতে চলেছে। বেজায় পরিতাপের কথা। তিনি মত দিয়ে দেন। কিন্তু মুশকিল হোলো সীতেকে নিয়ে। সীতে কোট ধোরে বসে, এক বৌ থাকতে মেয়ে দেবে না ও-ঘরে। আগে মাদারীকে সরিয়ে দেয়া হোক। তারপর স্বচ্ছন্দে সুখোকে ঘরে নিয়ে যাক মন্থরা।

বিষম মুশকিল। কী কোরে সরায় মাদারীকে। তার অপরাধ স্বাস্থ্যহানি। আর সন্তান না হওয়া। কিন্তু এ অপরাধের কোনোটার জন্যই ওকে দায়ী করা যায় না। মাদারীর কানে যায় শশীর আবার বিয়ে। সুখোর সাথে। সব ঠিকঠাক। সে ঝরঝর কোরে কেঁদে ফেলে।

অসুখ বেড়ে যায়। দিনে আট-দশ বার কোরে ফিট হয়।

কেশবপুর বাজারে জারিগান। শশী যাবে। সকালবেলা মাদারীকে বলে তার জামা-কাপড় কেচে দিতে। পরপর তিন চারবার ফিট হওয়ায় সারাদিন মাদারী শুয়ে। উঠতে পারেনি কাপড় কাচতে।

সন্ধ্যের আগে শশী সেজেগুজে জারিগান শুনতে যাবে। ওর সাঙাৎরা ডাকতে এসেছে। সুখোকেও নিয়ে যাবে। আগের থেকে বন্দোবস্ত হোয়ে আছে। শশী জিগ্যেস করে:

—এই, আমার জামা কাপড় কোথায়?

মাদারী শুয়েছিলো। তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বার কোরে এনে দেয়।

শশী জামা-কাপড় পরখ কোরে ছাখে। খিচিয়ে ওঠে, এই শালি, জামা-কাপড় কাচিস নি?

কাঁপতে কাঁপতে মাদারী বলে:

—না। কাচতে পারিনি।

—কী বোললি! বারোভাতারী খানকী! তোর কোন্ নাঙ নিয়ে শুয়েছিলি? হুঁ? আমার জামা-কাপড়টা কাচার সময় পাস্‌নি? নিকেষ কোরে ফেলবো তোরে। দেখি তোর কোন্ মার ভাতার ঠ্যাকায়।

বোলতে বোলতে উন্মত্তর মতন একখানা দু-ফেলে বাঁশের চটা নিয়ে ধেয়ে যায় শশী।

মাদারী কঁকিয়ে কেঁদে ওঠে, তোমার পায় পড়ি। মেরো না। মেরো না।

—না, পুজো করবানে তোরে, হারামজাদী।

দমাদম বাঁশের চালার বাড়ি পড়তে থাকে। বোষ্টম ছুটে এসে ঠেকায়। মাদারী অজ্ঞান হোয়ে পড়ে। শশী জামা-কাপড় পরে বেরিয়ে যায়।

দিন দুই বাদে তেলীর পুকুরে জল আনতে যায় মাদারী। জলে নেমেই ফিট হয় ওর। পিঠ পিঠ ময়নাও গিয়েছিলো জল আনতে। ছাখে জলের ওপোর মাদারীর শাড়ির আঁচোল ভাসছে। ছুটে গিয়ে ওকে জল থেকে টেনে ডাঙায় তোলে। একদম বেহুঁশ তখোন। বুকের মধ্যে প্রাণটা ধুকধুক কোরচে মাত্তর। চেঁচামেচিতে পাড়া থেকে লোকজন ছুটে আসে। ধরাধরি কোরে বাড়ি নিয়ে যায়।

অনেক রাতে বাড়ি ফেরে শশী। তখোনো জ্ঞান ফেরেনি মাদারীর। শুনে চোটপাট কোরতে থাকে:

ক্যানো ওরে জল থেকে তোলা হোলো? মরলে না ক্যানো? যমের দোরে

কাঁটা দিয়ে এসেচে শালী। মরলে বুড়িভদ্দরের ছাড়ে এখুনি পুতে রেখে আসতাম। হাড়ে বাতাস লাগতো আমার।

পরদিন হুঁশ ফেরে মাদারীর। কিন্তু বিছেনা ছেড়ে উঠতে পারে না। বেজায় দুর্বল শরীর। পাকা ফোঁড়ার ব্যথা সর্বাঙ্গে। রায়পটন খবর যায়। যে পায় থাকে চট্ কোরে যেনো চলে আসে ওর মা-ভাইরা।

ঝোড়ো মারা যাওয়ার পর ওরাও খুব দুরবস্থার মধ্যে আছে। মাদারীর লাঞ্ছনা-গঞ্জনার কথা পেরায়ই কানে পৌঁছয় ওদের। আসি-আসি কোরেও আসতে পারে না। আর এসেই বা কোরবেটা কী? বুদো ছেলেমানুষ। তার ঘাড়ে বোন গিয়ে চাপলে কী কোরে চালাবে সে? পাঁচ-ছদিন পরে বুদোকে সাথে কোরে চাঁপা চলে আসে। মাদারী তখোন অনেকটা সুস্থ। চলতে-ফিরতে পারে।

পাড়ার লোকের মুখে সব শোনে চাঁপা। পাশবিক গঞ্জনা দেয় ওর স্বামী—শাশুড়ী। মাদারীর পিঠের কাপড় তুলে ছাখে মারের দাগগুলো দগ্‌দগে ঘা হোয়ে উঠেচে। মায়ের বুক ফেটে যায়। ঝরঝর কোরে কেঁদে ফেলে সে।

মাদারী মায়ের সাথে রায়পটন চলেচে। বাপের বাড়ি। হয়তো চিরতরে-ই চলেচে। কাল রাতে শশী পষ্টাপষ্টি ওর মাকে জানিয়ে দিয়েচে, বৌ যদি না পাঠিয়ে দেয় তবে ওরও দশা হবে বাবার মতন। মানে গাছে ঝুলবে। এরপরও মা'র মন আর কী কোরে বৌকে চাইতে পারে?

ঝরঝর কোরে জল ঝরচে মাদারীর চোখে। অনিবার অশ্রু। আঁচোলে মুচ্‌ছে ঘন ঘন। সে বুঝি শ্বশুর বাড়ি চলেচে। কত কথা মনে পড়চে তার। প্রথম যেদিন এ-বাড়ি সে এলো, গাড়ি থেকে নামল, শাশুড়ি কোলে কোরে ঘরে নিয়ে গিয়েছিলো। মুখে তুলে দিয়েছিলো মিষ্টি। শানাই বেজেছিলো। বেজে-ছিলো শাঁখউলু। কী সমারোহ! কী আহ্লাদ! হাসছিলো বাড়িখানা। বুড়ো শ্বশুর ওকে কোলে কোরে আনন্দে কেঁদে ফেলেছিলো। আশীর্বাদ কোরেছিলো। কিন্তু সে আশীর্বাদের ফল ওর বরাতে ফলল না।

মন্থরা উঠোনের কোণে দাঁড়িয়েছিলো। তার পায়ের গোড়ায় মাথা ঠেকায় মাদারী। মন্থরা কথা বোলতে পারে না। তার চোখের নিচের পাতায় জলের সরু রেখা চকচকিয়ে ওঠে। শুধু মনে মনে আখ্যেপ করে, যত অসুখ থাক না ওর, যদি একটা বাচ্চা হোতো বৌ-এর তাহোলে কিছুতেই ওকে ত্যাগ কোরতো না। ছেলের সঙ্গে বিবাদ-বিসম্বাদ কোরেও বৌ নিয়ে থাকতো।